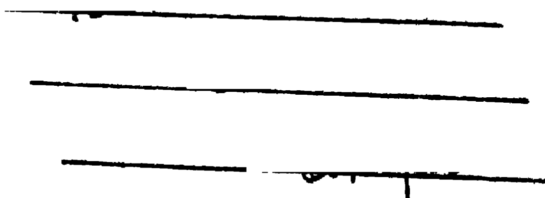
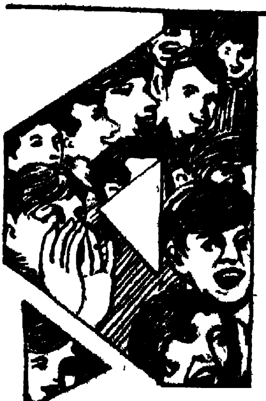
১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস
৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা-৫৪







যে সব লেখা আছে



যে সব ছবি আছে

ত্রিবর্ণ চিত্র



অমরেশ বরযাত্রী হ'ল

বিধায়ক ভট্টাচার্য

প্রথম দৃশ্য

[কথা অনেকদিন থেকেই চলছিল, এবার পাকাপাকি হ'য়ে গেল সব কিছু। ব্যাপারটা হচ্ছে গদাইয়ের বিয়ে। গদাই কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। সে ক্রমাগত একটা কথাই বলছিল,—চাকরিতে আর একটু স্থায়ী না হ'য়ে বিয়ে করাটা উচিত হবে না।

যাই হোক—অবশেষে অনেক ধরাধরির পর সে রাজী হ'ল। বিয়েটা হবে আষাঢ় মাসে। যেখানে হবে, অর্থাৎ মেয়ের বাড়ি ঘোর পল্লীগ্রামে। তা হোক, মেয়ে দেখে সকলেরই খুব পছন্দ হ'ল।

গদাই বন্ধু-বান্ধব সকলকেই খবর দিয়েছে। তারাই হবে বরযাত্রী। প্রথমে গদাই একটু আপত্তি করেছিল বিয়েতে। মাসটা—বৃষ্টি বাদলার মাস বলে। বলেছিল—বর্ষাটা কেটে যাক্,—পুজোটা বেরিয়ে যাক্,—অঘ্রাণ মাসে না হয়—! কিন্তু কেউ কোন কথা শোনেনি। অতএব বিয়ে ঠিক। প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখলাম—স্টেশনের ওয়েটিং রুম। দু একজন লোক বসে আছে, তারা যাত্রী। নানা বয়সের।

শব্দ শুনে আমরা বুঝলাম—একটা ট্রেন এসে লাগলো। একটু লোকজনের গোলমাল। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টার শব্দ। ট্রেনের বাঁশি। গার্ডের বাঁশি। গাড়ি ছাড়লো এবং চলেও গেল

টিকিটবাবুর গলা ভেসে এল—টিকিট! টিকিট! টিকিট! কই মশায়! দিয়ে যান টিকিট! এই যে! এই দিকে! বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যাত্রীরা ঢুকে টিকিট দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

গোলমাল শোনা গেল। দল বেঁধে ঢুকলো বরবেশী গদাইকে নিয়ে বরযাত্রীর দল। গদাইয়ের বরের বেশ। সবশেষে ঢুকলো মামা অমরেশ। দুজন যুবক একপাশে দাঁড়িয়েছিল। তারা এগিয়ে গিয়ে সম্বর্ধনা করলো। তাদের নাম পুলক বোস আর হরিধন সান্যাল।]

হরিধন। আসুন স্যার, আসুন!

অমরেশ। আপনারা—?

পুলক। আমরা পাত্রীপক্ষ। মেয়ের বাড়ি থেকে এসেছি—আপনাদের রিসিভ্ করতে। আপনারা তো—

অমিয়। হ্যাঁ। যা দুর্যোগ আজ। গাড়ি-টাড়ি এনেছেন?

হরিধন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এই রাস্তায় অন্য গাড়ি তো চলবে না। তাই গরুর গাড়ি—

অমঃ। সেকি মশায়! গরুর গাড়িতে বর যাবে?

পুলক। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! উপায় নেই।

ভুবন। পথে জ-জ-জলটল নেই তো?

পুলক। জল কাদা আছে বলেই তো গরুর গাড়ি। তবে আপনারা জলের ভয় করবেন না। কারণ গরুর গাড়িতে জল লাগবে না।

অমঃ। পতে!

পতিত। মামা!

অমঃ। জলের ভয় করবেন না—বলছে কেন—বল্ তো?

পুলক। আমি বলছি শুনুন! গাড়ি নিয়ে গরু জলে নামলে—তার মেজাজের ঠিক থাকে না তো তাই বলা।

হরিধন। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যাত্রী আর গাড়ি জলেই আছে, গরু দুটো চলে গেছে।

অমিয়। বাঃ! তখন মানুষকেই টানতে হয়তো গাড়ি?

পুলক। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় তাই।

অমঃ। বাঃ! খুব স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা তো!

● অমরেশ বরযাত্রী হ'ল

পুলক। কেন স্যার—স্বাস্থ্যকর বলছেন কেন?

অমঃ। বলছি—গরুর কাজ মানুষে করলে একটা এক্‌সারসাইজ হয় তো? সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

হরিধন। হ্যাঁ, সে কথা ঠিক।

ভুবন। গা-গা-গা—

অমঃ। গান বাজনার ব্যবস্থা কি এই বিষ্টি বাদলার দিনে জমে বাবা?

ভুবন। না-না-মামা! আমি বলছি যে গা-গা-গাড়ি এসে গেছে যখন—

পুলক। না স্যার, এখনো এসে পৌছয়নি, তবে এসে যাবে ঠিকই। ততক্ষণ আপনারা এই ঘরে বিশ্রাম করুন। জলখাবার টাবার খান।

অমিয়। জলখাবারের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন?

পুলক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমিয়। বাঃ!

অমঃ। আপনারা? মানে আপনাদের তো ঠিক—

পুলক। বললাম যে! আমার নাম পুলক বোস। আমরা মেয়ের তরফ থেকে—

অমঃ। ও! কন্যাযাত্রী?

হরিধন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পুলক। তবে কন্যাযাত্রী ঠিক নয়। কন্যাপক্ষ বলতে পারেন।

অমঃ। ও! আচ্ছা! আসুন, আসুন—নমস্কার!

বিকাশ। নমস্কার!

[সবাই দু চার পা এগোলো।]

অমঃ। আপনারা মেয়ের সম্পর্কে—

পুলক। রক্তের সম্পর্কে কেউ না। আমরা প্রতিবেশী।

অমঃ। ও! আচ্ছা! চলুন!

অমিয়। যাওয়া কিসে? হেঁটে নাকি?

বিকাশ। না না সেকি কথা? ছিঃ! আপনাদের বিয়ে বাড়িতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবো, একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে! সম্মানিত লোক আপনারা!

পুলক। বললাম যে! গাড়ির ব্যবস্থা আছে।

ভুবন। আমি শুনিনি। কি-খ্যি-খ্যিসের গাড়ি?

পুলক। তাও একটু আগেই বলেছি। গরুর গাড়ি। পথে যতো জলই জমুক—ঠেলে নিয়ে যেতে কষ্ট হবে না।

অমিয়। ঠেলতে হবে বুঝি?

অমঃ। আর একটা কথা পরিষ্কার করে বলুন তো? গাড়ির সামনের দিক থেকে টানতে হবে—না, পেছন থেকে ঠেলতে হবে? গদাইয়ের বিয়ে দিতে এসে কোন্ কাজটা করতে হবে জেনে রাখা ভাল।

পুলক। পেছন থেকেই ঠেলতে হবে।

অমঃ। বাঃ!



পেছন থেকেই ঠেলতে হবে [পৃঃ ৩

ভাবছেন, ঠিক ততটা কষ্ট কিন্তু হবে না।

পুলক। সড়গড় হ'য়ে গেলে আর টেরই পাবেন না।

[এমন সময় একটি ছেলে এসে পুলকের কানে কানে কী যেন বললো। নাম তার গোবিন্দ।]

পুলক। এই রে! আসল ব্যাপারই ভুল হ'য়ে গেছে।

অমঃ। কী ভুল হ'ল আবার?

পুলক। আপনাদের জন্য জলখাবার পাঠিয়েছে যে!

অমঃ। আরে ছি ছি! করেছেন কী? শীগ্‌গির নিয়ে আসুন! জলখাবার ফেলে রাখলে পাপ হয়। তোমার নাম কি হে?

গোবিন্দ। আজ্ঞে—আমার নাম বলছেন? আমার নাম হ'ল গিয়ে গোবিন্দ। তবে সবাই 'গোবে' বলে ডাকে। আপনারাও তাই ডাকবেন। নইলে হয়তো বুঝতে পারবো না—কাকে ডাকছেন।

অমঃ। বেশ। তাই না হয় ডাকবো। কিন্তু এখন একটা বুদ্ধি দাও দেখি গোবর্ধন।

গোবিন্দ। আজ্ঞে কি বুদ্ধি বলেন?

অমঃ। বুদ্ধিটা হচ্ছে—গরুর গাড়িতে যাওয়ার চাইতে হেঁটে যাওয়া অনেক ভাল। এখন কথা হচ্ছে এখানে বসে আগে জল-

অমিয়। পতে!

পতিত। কী বল্?

অমিয়। এগোবি—না, এখান থেকেই পরের গাড়িতেই ফিরবি?

অমঃ। কী-বাঁদরের মতো কথা বলছিস? বিয়ে দিতে এসে ফিরে যাওয়া চলে?

অমিয়। বিয়ে বাড়ি যাবার রাস্তা কই?

ভুবন। ওই গো-গ্যো-গ্যোরুর রাস্তা দিয়েই চলে যাব।

অমিয়। জুতো খুলে তো হাতে নিতেই হবে বুঝতে পারছি। আগে থেকে প্র্যাকটিস ক'রে নিই।

হরিধন। আজ্ঞে—যত কষ্ট হবে

খাবার-টাবার খেয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করবো, না—হাঁটা শেষ ক'রে ঠিকানায় পৌঁছে জলখাবার খাবো?

গোবিন্দ। আগ্গ্যাঁ,—এ তো খুব মুস্কিলে ফ্যালালেন বাবু! কার পেটে কীরকম খিদ্য়্যা—সে আমি ক্যামুন ক'রে বলবো? তবে—

[একটা গাড়ি আসার শব্দ হ'ল। ট্রেন থামলো। তারপর ছেড়ে চলে গেল। দু'চারজন যাত্রী টিকিট দিয়ে চলে গেল। এমন সময় দেখা গেল একটা কুলীর মাথায় বেডিং আর স্যুটকেশ চাপিয়ে চলে আসছেন অমরেশের মামা পুণ্ডরীকাক্ষ। অমরেশ যাঁকে আদর ক'রে 'পুণ্ডরী খ্যাঁকুকো' বলে ডাকে। ভুবন এতক্ষণ একপাশে বসে একটা ইংরেজী বই পড়ছিল। সে চিৎকার ক'রে উঠলো।]

ভুবন। এই মরেছে! মামাগো! পুন্-পুন্-পুন্-পুন্—

(পুণ্ডরীকাক্ষের প্রবেশ)

অমিয়। তুই থাম্! আমরা সবাই দেখেছি। আসুন দাদু! আমরা তো ভেবেছিলাম যে আপনি চিঠিই পাননি।

পুণ্ডরীঃ। চিঠি আমি ঠিক সময়েই পেয়েছি। একি! গদাই!

গদাই। আজ্ঞে?

পুণ্ডরীঃ। তুমি পাত্র? আজকের এই উৎসবের তুমিই নায়ক? কিন্তু তোমার মাথায় টোপর নেই কেন বাবা?

গদাই। টোপর তো ছিল। কে যেন তুলে নিলো।

[গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়লো। ইঞ্জিনের বাঁশি। গাড়ি ছাড়লো, এবং চলে গেল।]

পুণ্ডরীঃ। এগুলো তো ভাল কথা নয়। বরের মাথা থেকে টোপর কে তুলে নিলো, —এই খেয়াল পর্যন্ত নেই তোমাদের।

অমিয়। টোপর—তুই যে কার হাতে দিয়ে বাইরে গেলি একবার!

গদাই। ভুবন! তোকে দিয়েছিলাম রাখতে?

ভুবন। ছি ছি, আমার ও রকম খা-খা-খা-খারাপ পর্ পর্ পর্—

গদাই। থাক্।

পুণ্ডরীঃ। টোপরটা বরের মাথা থেকে পাচার হ'য়ে গেল, কেউ খবরটাও জানে না! ভারী মজার কথা বটে। এর পরে যদি তোমার পাশ থেকে কেউ নতুন বৌকে তুলে নিয়ে যায়, তুমি তো খেয়ালও করবে না।

গদাই। একবার চেষ্টা ক'রে দেখুক না।

অমিয়। তাহ'লেও কথাটা ভাববার কথা।

পুণ্ডরীঃ। নাপিত আসেনি সঙ্গে?

পতিত। হ্যাঁ। জীবনে নাপিত এসেছে। ও! হ্যাঁ, দাদু মনে পড়েছে। টোপর জীবনের হাতে আছে। বলেছে—ও কাছেই আছে। ডাকলেই চলে আসবে।

পুণ্ডরীকঃ। ভাল। তাই হবে।

[ডিসে করে জলখাবার এনে এনে পুলক আর হরিধন সকলের হাতে হাতে দিতে লাগলো। দেওয়া হ'য়ে গেলে পুলক বললো—]

পুলক। খেতে আরম্ভ করুন। জল আর চা দিয়ে যাচ্ছে, সব ঠিক করাই আছে।

অমিয়। ব্যস্‌-ব্যস্‌—তাহ'লে আর চিন্তা কী? বাঃ! বেশ ভাল ব্যবস্থাই তো করেছেন দেখছি!

হরিধন। আজ্ঞে না করলে কি ভাল দেখায়?

অমিয়। তাতো বটেই। খুব ন্যায্য কথা।

পুলক। তবে মনের বাসনা যা ছিল, তা করতে পারিনি। একে এই দুর্যোগ, তার ওপর—

অমঃ। কুছ পরোয়া নেই। যা হয়নি তা নিয়ে হা হুতাশ ক'রে কোন লাভ নেই। নাও, তাডাতাড়ি সেরে নাও। আবার এতোখানি পথ ঠ্যাঙাতে হবে তো?

ভুবন। ঠ্যাং-ঠ্যাং-ঠ্যাং—

পুণ্ডরীকঃ। থাক্। এখন আর ঠেঙিয়ো না।

পতিত। তাহ'লে আর অনর্থক দেরি ক'রে লাভ নেই। যা করবার ক'রে ফ্যালো!

পুলক। তাহলে আসুন। ওই শেডের তলায় সব ব্যাবস্থা করা আছে। গাড়িগুলোও ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। জলটল খেয়ে একবারে গাড়িতে উঠে বসবেন। ঘুমোতে ঘুমোতে চলে যাবেন।

অমিয়। হ্যাঁ, তাই চলুন!

[সবাই এক এক করে বেরিয়ে যেতে লাগলো। দু'একজন অপর জনের কানে কানে কী যেন বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি মাঝারী সাইজের ঘর। বাইরে আওয়াজ শোনা গেল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকবেন ওঁরা"। বাইরে কোথায় যেন সানাই বাজছিল। দৃশ্য আরম্ভ হ'তেই সেটা বন্ধ হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে লোকজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। "বর এসেছে" "বর এসেছে" চেঁচামিচি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কন্যাকর্তাদের একজন হাত জোড় ক'রে সবাইকে নিয়ে এল ঘরে। বললো—]

এই যে! এই ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বসুন! বিশ্রাম করুন। আমি এক এক ক'রে পান তামাক চা সব পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অমিয়ঃ পান তামাক পাঠাতে হবে না। খালি এক কাপ ক'রে গরম চা পাঠিয়ে দিন, তাহলেই হবে।

কন্যাপক্ষ। যে আজ্ঞে। চা আর জল খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভুবন। খাব্‌-খাব্‌-খাব্‌—

● অমরেশ বরযাত্রী হ'ল

কন্যাপক্ষ। খাবেন বৈকি। নিশ্চয় খাবেন। পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[তিনি চলে গেলেন। বরযাত্রীরা এক এক ক'রে ততক্ষণে সবাই ঘরে ঢুকেছে। পুলক ও হরিধন ঢুকলো—পেছনে একটি লোক। তার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। লোকটি সবাইকে চা দিতে লাগলো।]

পুলক। নিন স্যার। গরম চা খেয়ে গা গরম করে নিন।

অমঃ। গদাই, তোর তো আজ উপোস?

গদাই। হ্যাঁ।

অমঃ। এইটেই খুব জঘন্য নিয়ম।

পতিত। কেন?

অমঃ। নয়? যার বিয়ে উপলক্ষ্য-ক'রে এত খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, আনন্দ উৎসব, সেই উপোস ক'রে থেকে চিঁচি করবে, আর বাকীরা ফুর্তি করবে—

ভুবন। তা কী করা যাবে? এটা একটা পোব্ পোব্ পোবিত্র কাজ।

অমঃ। তোর পবিত্রের নিকুচি করেছে। আমার বিয়ে—আমাকেই কষ্ট দেওয়া হবে,—কী নিয়ম রে বাবা।

পতিত। শাস্ত্রের নিয়ম।

অমিয়। আচ্ছা, কনেকেও কি এই রকম উপোস করতে হয় বরের মতো?

অমঃ। আলবৎ। মেয়ের বেলায় আলাদা নিয়ম হ'তে যাবে কেন?

অমিয়। তা বটে। কিন্তু খুব যাচ্ছে-তাই নিয়ম। কোন মানে হয় না।

গদাই। তা এখন কী করা যাবে? বাপ-ঠাকুর্দার ক'রে যাওয়া নিয়মের তো কোন অন্যথা করা যাবে না। সবাই যা করেছে,—আমাদেরও তাই করতে হবে।

অমিয়। পরমানন্দে করো ভাই। কেউ মানা করবে না।

গদাই। কিন্তু একটা কথা আমি বলে রাখছি মামা। মনে রাখবেন,—এরপর কিন্তু সবাইকেই এক এক করে বিয়ে করতে হবে।

পুলক। এ আর বেশী কথা কি? হবে।

অমঃ। গদাই। চুরি ক'রে কিছু খাসনি তো?

গদাই। না।

অমঃ। দেখিস বাবা! তাহ'লে কিন্তু খুব অন্যায় হ'য়ে যাবে।

অমিয়। তখন ওই তেলেভাজাওলার সঙ্গে কী কথা বলছিলি?

গদাই। ও এমনি। দাম জিজ্ঞাসা করছিলাম।

পতিত। কিসের দাম?

গদাই। আরে ওই—আলুর চপ, বেগুনী, দোপেঁয়াজী—এই সবের। আজকাল কী রকম দাম যাচ্ছে।

অমঃ। কেন? খাবি না, ছুঁবি না,—খামোখা কী হবে দাম জেনে?



তার মানেই আমাদের লুকিয়ে সেঁটেছো ?

গদাই। এমনি। জেনে রাখলাম।

অমিয়। তার মানেই—আমাদের লুকিয়ে সেঁটেছো ?

গদাই। না না। মাইরী না। থালায় জিনিসগুলো সাজানো আছে,—দেখে ভারী ভাল লাগলো। ভাবলাম—আজই না হয় খাবো না, কিন্তু এর পরে তো খেতে পারবো! কী রকম দাম—একটু জেনেই নিই।

অমিয়। ইস্, একদম প্রেস্টিজ টাইট করে ছাড়লি! এই বরবেশে, গলায় মালা দিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বাজারে গিয়ে কিনা তেলেভাজা· ·এঃ এতক্ষণে বরের বদনামটা কতদূর ছড়ালো কে জানে! মামা, এখন উপায় ?—

অমঃ। উপায় মধুসূদন। ঐ জন্যই তো গেঁইয়া কারবারে আসতে চাইনি।

ভুবন। কা-কাল সকালে গিয়েই গ-গ-গরম গরম খাওয়া যাবে। একদম সেঁটে।

অমঃ। না চাঁদু। সকালে হবে না। সকাল বেলায় বাসি বিয়ে—কুশণ্ডিকে—এগুলো সব সারতে হবে। তা মনে কর্—সারতে সারতে সেই যাকে বলে বেলা তিনটে বেজে যাবে। খাওয়া—তারপর।

গদাই। ওঃ! বিয়েতো নয়, গোজন্মে খালাস।

[পুণ্ডরীকাক্ষ ঢুকলেন।]

পুণ্ডরীঃ। কিন্তু পরে সুখ। কী বল গদাই?

অমঃ। আপনি কী করে জানলেন?

পুণ্ডরীঃ। পাঁচজনের দেখেশুনে। তা কিসের কথা হচ্ছিল?

অমঃ। তেলেভাজার। গদাই আজ খেতে পারবে না—সেই কথা হচ্ছিল। আজ তো ওর উপোস।

ভুবন। এই উ পো স—কত্‌-কত্‌-কতোক্ষণ?

অমঃ। যতক্ষণ না বিয়ে হ'য়ে যায়—ততক্ষণ।

অমিয়। তার মানেই বাজী ভোর।

গদাই। প্রায় তাই। ভোর রাত্তিরে যখন লগ্ন।

পুণ্ডরীঃ। তা বললে কি চলে? বিয়ে বলে কথা। ঠাট্টা তামাশার ব্যাপার তো নয়। সারাজীবনের ব্যাপার। যতক্ষণ না সব চুকেবুকে যাচ্ছে, ততক্ষণ মানতেই হবে সব নিয়ম।

গদাই। ভাল।

পুণ্ডরীঃ। কিন্তু এগুলো মানার মধ্যে একটা আনন্দ আছে—দেখে নিও।

অমিয়। উপোসী পেটে আনন্দ জমে না।

অমঃ। সে কথা ঠিক। পেটের মধ্যে চিঁ চিঁ করতে থাকলে বিয়ের আনন্দ মাথায় উঠে যায়। তখন বৌয়ের চাইতে খাবারের দিকে মন পড়ে থাকে বেশী।

ভুবন। বৌও তো একধরনের খাব্‌-খাব্‌-আর! প্রথমে মিষ্টি, প-প-পরে টক্‌।

অমঃ। জিও বেটা। ভুবনও তো বেশ দিচ্ছে দেখছি! এ্যাঁ?

পুণ্ডরীঃ। তা দেবে বৈকি! এতকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে,—কিছুতো শিখবেই!

অমঃ। হ্যাঁ, তা বটে।

অমিয়। কিন্তু কথা হচ্ছে—মেয়েটাকে যে একবার দেখতে হয়!

হরিধন। কেন?

অমিয়। কেন মানে? কানা খোঁড়া যা হোক একটা ধরে মন্তর পড়ে জুটিয়ে দিল, আর আমরা ল্যাজ তুলে নাচতে নাচতে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম—এটা তো কোন কাজের কথা নয়। আগে একটু দেখা উচিত নয় কী?

হরিধন। বেশ তো! এ আর বেশী কথা কী? আসুন আমার সঙ্গে। আমি মেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

পুলক। আপনাদের জিনিস আপনারা দেখবেন—আপনাদের তো রাইটই আছে। আমি এক্ষুণি গিয়ে ব্যবস্থা করছি।

অমঃ। ঠিক আছে—তাড়া করতে হবে না। ধীরেসুস্থে হবে।

পুণ্ডরীঃ। আমি গিয়ে দেখে আসছি বৌমাকে।

হরিধন। তাই চলুন স্যার।

ভুবন। আম্-আম্-আম্-আম্—

পুণ্ডরীঃ। এটা, সময় নয়। পারবে কি ব্যবস্থা করতে?

অমিয়। না। ভুবন বলছে—ও-ও যাবে কি?

পুণ্ডরীঃ। ও! তা সে তো বেশ ভাল কথা। এস!

হরিধন। আসুন তাহ'লে।

(সবাই রওনা হ'ল।)

অমিয়। গদাই, তুই থাক। শুভদৃষ্টির আগে তোর তো বৌয়ের মুখ দেখা বারণ।

গদাই। হ্যাঁ। ঠিক আছে। তোরা দেখে আয়।

[গদাই ও দু-একজন বন্ধু রইল। বাকী সবাই চললো।]

তৃতীয় দৃশ্য

[বারান্দা। এখান থেকে উঠোন দেখা যায়। চোখে প'ড়ে ছাঁদনাতলা। দৃশ্যের পেছনে। সেখান দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে—তাও দেখা যায়। বারান্দায় এসে দাঁড়াল দুজন যুবক। একজন কনের ভাই। নাম পানু। সঙ্গীর নাম ন্যাড়া।]

পানু ওঁরা আসছেন টেঁপীকে দেখবেন।

ন্যাড়া। বেশ তো। দেখবেন। এ আর বেশী কথা কি?

পানু। না—কম-বেশীর কথা হচ্ছে না। উঠলো বাই তো কটক যাই। বিয়ের আগে কনে দেখা—এ কোন্ দেশী নিয়ম রে বাবা?

ন্যাড়া। ওঁদের কেউ কেউ টেঁপীকে দেখেননি। তাঁরাই দেখতে চাইছেন।

পানু। ঠিক আছে। আসতে বলো। আমি ভেতরে যাই। যদি টেঁপীর সাজগোজ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে একেবারে নিয়েই আসবো। কেমন?

ন্যাড়া। তাই কোরো। আমি যাই।

[ন্যাড়া বেরিয়ে গেল।

পানু কী করবে—তাই ভাবছে, এমন সময় অমিয় ঢুকলো। পেছনে আর সবাই।]

অমিয়। নমস্কার! আপনি কি মেয়ের তরফের কেউ?

পানু। হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

অমিয়। না, কন্যাপক্ষের কেউ হলে একটা কথা বলতাম।

পানু। কী আশ্চর্য! বলুন—বলুন! হ্যাঁ,—আমি পাত্রীপক্ষেরই লোক।

অমিয়। বলছিলাম—আপনাদের বাড়িতে একবারের বেশী চা দেওয়ার বিধি নেই বুঝি?

পানু। এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

[ন্যাড়া ঢুকলো। তাব পেছনে ট্রে হাতে একজন চাকর। ট্রেতে আট দশ কাপ চা সাজানো আছে।]

ন্যাড়া। নিন্—কতো চা খাবেন—খান।

অমিয়। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। এ তো দেখছি—এক একজন দু তিন কাপ করেও খেতে পারবো।

ন্যাড়া। তা পারবেন।

[সবাই চা নিতে লাগলো।
অমরেশ ঢুকলো।]

অমঃ। তাহলে আর দেরি করে লাভ কী? এই প্লেটে ঢাকা দেওয়া কী?

ন্যাড়া। এগুলো স্যার বিস্কুট। শুধু চা খেতে দিতে নেই, তাই—

অমঃ। বাঃ! এদিকে জ্ঞানগম্যিও তো আছে দেখছি। ভাল। তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। শুরু করে দাও।

[প্লেটের ঢাকনা তুলে ফেলতেই বিস্কুটের আর মিষ্টির রাশি ঝকঝক ক'রে উঠলো। সকলেই খুব খুশী হয়ে খেতে শুরু করলো। একটু পরে হাসি হাসি মুখে পানু ঢুকলো।]

পানু। মেয়ে এসে গেছে স্যার। ডাকবো?

অমঃ। নিশ্চয় ডাকবেন। এর আবার মতামতের কী আছে?

পানু। তাহলেও আপনাদের একবার জিগ্যেস করা উচিত। নয় কী?

অমিয়। যাকগে। আর বাক্যব্যয় না করে ডাকুন।

[পানু বেরিয়ে গেল।
সবাই এর মধ্যে খাওয়া শেষ ক'রে জল খেলো।]

পুণ্ডরীঃ। গদাই কি থাকবে এখানে?

পতিত। কেন? ও কোথায় যাবে?

পুণ্ডরীঃ। না, বলছিলাম,—ওরই বিয়ে তো! শুভদৃষ্টির আগে—ওর কি কনের মুখ দেখা ভালো?

অমিয়। ও নিয়ম রাজা দশরথের টাইমে ছিলো। এখন উঠে গেছে।

অমঃ। ও করবে বিয়ে,—আর মেয়ে দেখবো আমরা—এটা খুব একটা সুস্থ নিয়ম নয়।

ভুবন। তাহলে থা—থা—থাক্। ও ও দেখুক!

পুণ্ডরীঃ। আমি আসছি এখুনি।

(প্রস্থান)

[পানুর সঙ্গে পাত্রী ঢুকলো ঘরে। মেয়ে মোটামুটি দেখতে। সবাই চুপ ক'রে চেয়ে

চেয়ে দেখছিল তাকে। পাত্রীকে দেখা গেল বেশ সপ্রতিভ। সে ঘরে ঢুকে সকলের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললো—]

পাত্রী। আপনাদের সকলকেই নমস্কার।

[সবাই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল।]

অমঃ। বোসো মা, বোসো।

পাত্রী। ব্যস্ত হবেন না, আমি বসছি।

অমিয়। না, আমরা মোটেই ব্যস্ত হইনি। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেই জন্যেই বললাম।

পাত্রী। অনেক ধন্যবাদ। দাঁড়িয়ে থাকলেই আমি কম্ফর্টেবল ফীল্ করি। আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে —করতে পারেন।

অমঃ। আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই, তবে যে বিয়ে করবে, তার যদি কিছু জানবার থাকে,—কীরে গদাই? তোর যদি কিছু জানবার থাকে—

পাত্রী। যিনি বিয়ে করবেন, তাঁর নাম বুঝি গদাই?

অমিয়। হ্যাঁ।

পাত্রী। না, ও নাম তো চলবে না। নাম চেঞ্জ করতে হবে।

অমঃ। তার মানে?

পাত্রী। মানে খুব সহজ। গদাই-ফদাই আজকাল অচল। ভদ্র সমাজে পরিচয় দেওয়ার মত নয়।

গদাই। বাপ মার দেওয়া নাম—চেঞ্জ করতে হবে মানে?

পাত্রী। মানে একটা ভাল নাম রাখুন। যে নাম ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়। যেমন কদম্বকেশর নয়ত—

অমঃ। তোমার নাম কী?

পাত্রী। আমার নাম হিরণ্যবর্ণা।

অমঃ। সাবাস্! ডাক নাম?

পাত্রী। ডাক নাম বেবী।

গদাই। কিন্তু বাপ মার দেওয়া নাম —আমি চেঞ্জ করি কী করে?

বেবী। যেমন ক'রে সবাই করে। তেমনি ক'রে। আর একটা কথা তেলেভাজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছিল মশাই?—নইলে গদাই নাম হয়? ভেবে দেখলাম নামটা বদলালেই গ্রহণযোগ্য হয়— ওসব অসভ্যতার দোষ আমি সুধরে নেব ধীরে সুস্থে।

গদাই। এই সেরেছে। জানাজানি হয়ে গেছে। সর্বনাশ!

অমিয়। ইস্, প্রেস্টিজ টাইট! যা ভেবেছিলাম—গাধাটা বিয়ে করতে এসে হাটে বাজারে দাঁড়িয়ে তেলেভাজা খেয়েছে! গোমুক্খু আর কাকে বলে?

বেবী। থাক্। কিন্তু পাঁচজন ভদ্র-লোকের কাছে আমার স্বামীর নাম গদাই, —এ আমি মরে গেলেও বলতে পারবো না। তারপর কুষ্টিহীন, পেটুক,—রামচন্দ্র!

অমঃ। এটা হচ্ছে কী? এই নাম নিয়ে মারামারি চলবে নাকি? আবার বদনাম! নাঃ ভাল মনে হচ্ছে না।

বেবী। তা—কী করবো বলুন? নাম চেঞ্জ না করলে গোলমাল চলবেই। এ যুগে কারো নাম গদাই হ'তে পারে—এ তো ভাবাই যায় না।

[গদাই হঠাৎ চলতে শুরু করলো।]

অমিয়। গদাই! চললি কোথায়?

গদাই। আসছি আমি। বাপস্ বিয়ে আমার মাথায় থাক!

[বেবিয়ে গেল ঘর থেকে।]

বেবী। উনি কেটে পড়লেন। বড্ড আত্মসম্মানে লেগেছে?

অমঃ। না-না।

বেবী। আমি বলছি—উনি সরে পড়লেন। তেলেভাজার পর আর বর হয়ে পাঁচজনের সামনে মুখ দেখানো যায়?

অমিয়। ঠিক আছে। আমি দেখে আসছি। জানতাম একটা কাণ্ড বাধাবে গাধাটা। (প্রস্থান)

বেবী। (হেসে) আমার মনে হয়; আপনারাও এক এক ক'রে দেখে এলে পারতেন!

ভুবন। হ্যাঁ। সে-সে-সেই ভাল। আম্-আম্-আমরাও না হয়—দে-দে-দেখে আসি। (প্রস্থান)

বেবী। (হেসে) এবার আমি বাড়ির ভেতর থেকে একটু দেখে শুনে আসি। তেলেভাজার খবরটা রটার পর আমরা সবাই তেলেবেগুনে জ্বলে আছি। তবে এত আয়োজন ফেলে যাবেন না। এই দুর্দিনে খাবার দাবার নষ্ট করবেন না। খেয়েদেয়েই প্রস্থান করুন।

[এবার বেবীও চলে গেল।
যারা রইল, তারা বোকার মতো বসে রইল।]

অমঃ। আমার মনে হয়, যার বিয়ে—সেই বর কেটে পড়েছে কেলেঙ্কারী করে তখন শুধু শুধু আমাদের অপেক্ষা করে কী লাভ? চলো, আমরাও ঘুরে আসছি বলে সট্‌কাই। ছোঃ অপমানের চূড়ান্তো অবস্থা শুয়োরটার জন্যে! ঐ জন্যই তো গেঁয়ো কারবারে মাথা গলাতে চাইনি।

[পাত্রীর তরফের যে দু একজন তখনো দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকে না তাকিয়ে অমরেশ বেরিয়ে গেল। তার পেছনে পেছনে বাকী কজন......]



গজগোবিন্দ খাঁড়া

শক্তিপদ রাজগুরু

তিল থেকে তাল হয়ে গেল। যদুপতি জ্যোতি সংঘের নাট্য-পরিচালক, অভিনেতা-কমিটি মেম্বার। এহেন যদুপতি কিনা কমিটির সঙ্গে কথাকাটাকাটি করে একবারে গায়েব হয়ে গেল।

পটলা, গুপীনাথও বিপদে পড়েছে। হরিলাল ক্লাবের ট্রেজারার। সেইই বলে—এত ধুমধাম করে সরস্বতী পূজা না করে বরং যদুপতির কথামত কিছু টাকা বাঁচিয়ে 'মেবার পতন' চ্যারিটি শো করলে ক্লাব ফণ্ডে কিছু আসতো।

হরিলালের নজর শুধু ফণ্ডের দিকে।

অবশ্য জ্যোতি সংঘকে গড়ে তুলেছে সেই। আজ ওপাশের মাঠ, শশধরবাবুর জমি, বাগানের দু'খানা ঘর নিয়ে ওরা খেলার মাঠ, লাইব্রেরী, নাইটস্কুল, দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র ইত্যাদি করে এই এলাকার অনেকেরই উপকার করছে।

পটলা হরির কথায় বলে—গজগোবিন্দ কড়কড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে বল্লে, মহা ধুম করে পূজা হবে। প্যাণ্ডেল, দরিদ্রনারায়ণ সেবা হবে। আর বিসর্জনের প্রসেশনও করো। ব্যাণ্ড পার্টি ঢাক ঢোল রোশনী এসব চাই। গুপীনাথও এটা চায়নি।

সে জনসেবা বিভাগের সম্পাদক। তাই বলে—কচু হইবো পাঁচশো ট্যাকায়, হালায় কইলাম একটা মেডিক্যাল এড সেণ্টার খুলুম, তখন টাকা দিব না। এখন বাত্তিভাণ্ড রোশনী হইব। স্তাশের হালখান দেখছস? যদুপতি ঠিক কইছিল।

নেত্য ড্রিল পার্টির ক্যাপটেন। খেলাধুলার ব্যাপারে ভক্ত। তাই চাইছিল সে।

সে জানায়—বল্লাম,···ফু··ফুটবল আর ব···ব্যা···ব্যা

পটলা জানে ও ফুটবল আর ব্যাণ্ড পার্টির কথা বলবে। তাই থামিয়ে দেয় ওকে—সেক্রেটারীর ভেটো দিয়ে ব্যা ব্যা করতে হবে না, থাম দিকি। যদুটা গেল কোথায় কে জানে? এখন সামনের কাজটাকে তোল। আর গজগোবিন্দের টাকায় শেওলা পড়ছে। তিনকুলে কেউ নেই। ও আরও টাকা দেবে বলেছে।

এমন সময় নাটকীয় ভঙ্গীতে ঢুকলো শীর্ণ সিট্‌কে একটা ছোড়া। চটিটা ছেঁড়া। ব্যাংকে দেখে ওরা চাইল। ব্যাং বলে—মামার টাকা নিইছিস শুনলাম।

পটলা চটে ওঠে—কেন? তোর মামা কি তোকে সব লেখাপড়া করে দিয়ে যাবে?

ব্যাং শীর্ণমুখের রেখাগুলো সজাগ করে তুলে জানায়,

—ওই ভজগোবিন্দের টাকা কোন ব্যাটা হজম করতে পেরেছে আজ অবধি? তাদের ভিটেমাটি চাটি হয়ে গেছে। তোরা আর লোক পেলি না ওকে চিফ পেট্রন করতে গেছিস? সামলাবি পরে।

ছেলেরা আড়ালে বলে গজগোবিন্দ, ওর প্রকৃত নাম ভজগোবিন্দ খাড়া। লোহার চালু কারবার, তাছাড়া এই এলাকার বহু বাড়ি জমির মালিক, নিজের বাড়িখানাও কয়েক বিঘের উপর। নীচের তলার ওদিকে মালপত্রের গুদাম। দিনরাতে ট্রাক যাতায়াত করছে। তার লাগোয়া শশধর মিস্ত্রির পৈত্রিক বাগান জমি বাড়ি। এককালে শশধরবাবুদের অবস্থা ছিল অন্যরকম। এখন পড়তির দিকে। বাগানের পাঁচিল ভেঙে গেছে, মাঠে ওই জ্যোতি সংঘের ছেলেরা খেলাধুলো করে। ভজগোবিন্দবাবুও বার বার চেষ্টা করেছে ওই বিরাট পরিত্যক্ত জমি বাগানটার দখল নিতে। ওতে ওর কারবারের সুবিধে হবে। গুদামে মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য ট্রাকগুলো সোজা চলে আসবে লোকের নজর এড়িয়ে।

কিন্তু তা হয়নি শশধরবাবুর জন্যেই। নিরীহ ভালোমানুষ, ছেলেদের জন্য মাঠটা ছেড়ে দিয়েছেন। বলেন,

—ওরা যাবে কোথায়? খেলার মাঠ তো নেই।

ভজগোবিন্দ আর কথা বলেনি এ নিয়ে। ভজগোবিন্দের সবই দেবসেবায় উৎসর্গীকৃত। বাড়িতে বিগ্রহ রয়েছেন। সকাল সন্ধ্যে ভজগোবিন্দ হেঁড়ে গলায় কীর্তন করে, যেন হুংকার ছাড়ছে। সর্বাঙ্গে তিলকের ছাপ, বলিষ্ঠ কলাগাছের মত হাত, থামের মত পা, আর হাঁড়ির মত গোলগাল মুখচন্দ্রিমায় দুটো ফুল সাইজের ছানাবড়ার মত চোখ চরকির মত ঘুরছে, কদমছাঁট চুল ছাপিয়ে পুরুষ্ট একগুচ্ছ শিখা ঠেলে উঠেছে।

ভজগোবিন্দের মনটা আজ খুব খুশি খুশি। গুরুদেবের আশ্রম থেকে চিঠি এসেছে, তাঁর প্রধান শিষ্য মহারাজ ওদিকে পরিক্রমায় এলে ভজগোবিন্দকে দর্শন দেবেন।

—জয় নিতাই! হুংকার ছাড়ে ভজগোবিন্দ আনন্দে।

পটলা কোম্পানিকে দেখে আরও খুশী হয় মনে মনে। ক্লাবের দলবলকে এবার ভজগোবিন্দ যেন পুত্রবৎ স্নেহ করতে শুরু করেছে।

—এসো। এসো পটল বাবাজী। গোপীনাথ নিত্য হরি আহা বুঝলে আমাদের বাঙ্গালীরা ভক্তিমান জাত হে। দেখেছো? নামের মধ্যে ঠাকুরকে জড়ানো। উচ্চারণ. করলেই পুণ্য। মহাপুণ্য। যাক্—কাজকম্মো সব চলছে তো ঠিকমত। টাকার জন্য ভেবো না—ভালো কাজ। টাকা ঠিক আসবে।

পটল খুশী হয়ে স্বপ্ন দেখে, ভজগোবিন্দের দয়ায় এবার ক্লাবের হাল বদলে যাবে। কোনরকমে সরস্বতী পূজার ঝামেলা চুকিয়ে ওদের প্ল্যান-এর কথা বলবে। তাই আভাস দেয় পটলা।

—বুঝলেন মেসোমশাই, ভাবছি স্কুলটাকে এবার শুরু করবো। আপনি তো রয়েছেন। বিল্ডিং-এর টাকা কিছু আসবে, ওই বাগানের ধারে শুরু হবে।

ভজগোবিন্দ মনে মনে চমকে ওঠে। বাগানের জমিতে ওরা পাকাপাকি ভাবে গেড়ে বসতে চায়। ধূর্ত লোকটার গোলমুখে তবু হাসিটুকু মোছে না। তাই বলে—সবই নিতাইয়ের ইচ্ছে হে। জয় নিতাই। এখন বাপু এই কাজটাকে শেষ করো। হ্যাঁ—বাসু মুদিকে বলে দিয়েছি কাঙ্গালী ভোজনের চাল ডাল ইত্যাদি ও দেবে, পরে হিসেব মিটিয়ে দিলে চলবে। আর সমারোহ ইত্যাদির জন্য নিয়ে যাও শ'তিনেক টাকা।

হরিলাল মাথা চুলকোয়—প্যাণ্ডেল—মূর্তি—বিসর্জনের বাজি-বাজনা ইত্যাদির খরচ অনেক হচ্ছে। এদিকে ফাণ্ডে টাকাও তেমন নেই। আর আপনার কথা শুনে চাঁদা যাঁরা দেন, তাঁরা বলেন—মহাপুরুষের দয়া পেয়েছো, আমাদের দু পাঁচ টাকা আর নেবে কেন?

ভজগোবিন্দ খিক্ খিক্ করে হাসছে। কি ভেবে বলে—নিয়ো যাও পাঁচশো টাকা। পরে দেখা যাবে। লোকে যখন সবই জেনেছে বাপু, আমার মানটা যেন থাকে। জয় নিতাই।

ওদের আপাততঃ খুশী করে বিদেয় করে ভজগোবিন্দ এবার নিজের কাজগুলো নিয়ে পড়ে। গুরুদেবের কথাও ভুলে গেছে এখন। অন্ধকারের হিসাব নিয়ে পড়েছে। ট্রাকবন্দী মালপত্রের সঙ্গে ওর বিরাট বাড়ির পিছনের গুদামে এসে জমা হয় বস্তা বস্তা চাল, ডাল, কেরোসিন তেলের, সরষের তেলের টিন। আবার ঠিক রন্ধ্রপথে সে সব দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে চলে যায়।

ওই বাগান জমির দখল নেবার কথাটা ভাবে, তার কারবারের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য। কিন্তু শশধরবাবু আর ওই ছেলেদের দলই বাধা দিয়ে চলেছে। তাই ধূর্ত লোকটা সাবধানী চাল খেলেছে এবার। সোজা পথে কাজ হয়নি তাই বাঁকা পথই ধরেছে ভজগোবিন্দ।

পাড়ায় কেন সারা এলাকায় এবার জ্যোতি সংঘের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সরস্বতী পূজো করেছে সবাইকে টেক্কা দিযে। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রায় হাজার খানেক দরিদ্রনারায়ণের সেবা করাচ্ছে। কাল বিসজন, এর প্লানও হযে গেছে। পটলা গুপীনাথ নেত্য দলবল নিয়ে তদারক করে কাজকর্ম।

গজগোবিন্দ মোটা থলথলে দেহ নিয়ে কপালে বড়সড় 'ইউ'-এর আকারে তিলক লাগিযে ঘুরছে।

হরিলাল আড়ালে গজরায—ক্যাশ তো ফাঁক। সব খাতের টাকা নিয়েছি এদিকে বাসু মুদীর পাঁচশোটাকা দেনা, ব্যাণ্ড, রোশনী, ঢাক এসব কোথেকে আসবে? বায়না তো করে এলি?

গুপীনাথ অবাক্ হয়—কস্ কি?

পটলাও চোখে যেন সরষের ফুল দেখছে। এমনি করে সব চলে যাবে ক্লাবের এই এক পূজোতেই তা ভাবেনি।

গুপী বলে—কাঙ্গালী ফাঙ্গালী হঠা, হালারা আমাগোর খাইব এবার। গজগোবিন্দেরে ধর।

ভজগোবিন্দ হাতির মত ঘুরছে। নামটা তাই ওরা গজগোবিন্দই দিয়েছে ওর। ভজগোবিন্দও জানে সে দয়ে মজিযেছে তাদের। এর পর শুরু হবে তার আসল খেলা। মনে মনে খুশী হয়েছে সে, তবু বলে—ওহে বাবাজী, টাকা তো বিশেষ আনিনি, নাও শ আড়াই টাকা। কাল যেন সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। খরচার জন্যে ভেবো না।

ভজগোবিন্দ ওদের দয়ের গভীর জলের দিকে আর একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে আজকের মত 'জয় নিতাই' হুংকার তুলে চলে গেল।

পটলা আশ্বস্ত হয়ে বলে—লোকটা মহাপুরুষ, বুঝলি। টাকা ঠিক দফায় দফায় দিয়ে যাচ্ছে। সবই দিয়ে দেবে।

গুপীনাথ বিজ্ঞের মত সায় দেয়—মনে লয় হেই কথাই।

শুধু হরিলাল গজরায়—কাল খরচা কতো হবে জানিস? এই টাকা ফেরত দিয়ে এক ঢাক এক কাসিতে রিকশায় চড়িয়ে মা সরস্বতীকে কাশীমিত্তিরের ঘাটে দিয়ে আসি।

পটলা গর্জে ওঠে—এঁ্যা। গজগোবিন্দের প্রেস্টিজ পাংচার করে দিবি।

নেত্যও সমর্থন করে—এত বড় পেট্রন কেউ পায়? যা বলছে কর।

গুপীনাথও ধমকে ওঠে—চুপ কইরা থাক্ হরিলাল। সব ট্যাকাই দিব কইছে।

সারা পাড়ার রাস্তায় মাঠে লোক ধরে না। বৈকাল হবার পর থেকেই দলে দলে কিল্লি বিল্লির দল সাদা হাফ প্যাণ্ট শার্ট পরে সেজেগুজে মাথায় টুপিতে ফুল গুঁজে ব্যাণ্ড সাইড ড্রাম আর দেড়বিঘৎ সাইজের পুঁচকি বাঁশের বাঁশি নিয়ে হাজির হয়েছে—তামাম এলাকার ক্লাব থেকে এসেছে ওরা। প্রত্যেক ক্লাবকে এর জন্য নিদেন পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ডোনেশন দিতে হবে। গুপীনাথ শিয়ালদহ স্টেশনের প্রায় ডজন তিনেক ঢাক-ঢোল আর বাচ্চা কাঁসিদারের দলকে এনেছে। তাদের বাদ্যির চোটে কাক পর্যন্ত ভেগেছে পাড়া থেকে। ওদিকে এসেছে ইস্টিশানের ধারের মস্তানদের তাসা পার্টি। রাংতা বসানো জামা, গ্রীক ধরনের চকচকে রাংতা মোড়া হেলমেট পরে খড়ের আঁটি জ্বেলে তাসা তাতিয়ে ড্রুম কড়াক্ শব্দে তাসা পিটছে আর সিঁট্কে দেহ কাঁপিয়ে এঁকেবেঁকে নাচছে। তাদের সঙ্গে এসেছে দমদমের আগুনখেকো তেলিয়া মাস্তান, মুখে কেরাসিন তেল নিয়ে নাচের তালে তালে হাতের মশালের উপর ফুঁ দিচ্ছে আর ঝলকে ঝলকে আগুন জ্বলে উঠছে। সে এক পৈশাচিক ব্যাপার।

নেত্য প্রসেশন চালাবে। তার ব্যাণ্ড পার্টিও মজুত। নেত্যর সাদা ফুলপ্যাণ্ট শার্ট আর কেডস পায়ে, মাথায় লাল পালকের ফুলদার টুপি পরেছে। ডান হাতে বগলে জরিদার বাহারের দড়িতে প্যাঁচানো একটা বিউগিল নিয়ে সেনাপতির সাজে ঘুরছে।

এদিকে ঝড়ো কাকের মত হরিলাল দাপাচ্ছে।

—ক্যাশ গড়ের মাঠ। আমি রেজিগনেশন দিয়ে মামার বাড়ি চলে যাবো। এদের টাকা কে দেবে?

গুপীনাথ সারাদিন হন্যে হয়ে ভজগোবিন্দের বাড়িতে বসেছিল, কিন্তু তার দেখা মেলে নি। ব্যাং বলে—তোদের তখনই বলেছিলাম মামার কথায় ভুলিস না।

পটলাও চমকে উঠেছে। বলে —মনে হয় আজ আর রক্ষে থাকবে না। ওই ব্যাণ্ড-এর মতই তাদের পিঠেই এবার জয়ঢাক বাজাবে ওরা।

তাসা পার্টির ছোঁড়াদের দেখে গুপীনাথ বলে।—ওগোরে, আনছে কেডা? হালায় ওদের চিনবা নি? প্যাদায়ে বেন্দাবন দেখাইবো—ওর নাম তেলিয়া মাস্তান।



—ক্যাশ গড়ের মাঠ—আমি রেজিগনেশন দিয়ে·

পটলা আর্তনাদ করে ওঠে —আমাকেও বেসজ্জন দিয়ে দে গুপী, ওই গঙ্গার জলেই এবার সুইসাইড করতে হবে। গজগোবিন্দের প্যাঁচে পড়ে। যদুপতি ঠিক বলেছিল রে। সে তো সরে গিয়ে বাঁচলো, এখন আমরা যাই কোথা?

ব্যাপারটা আপনা থেকেই হয়ে যায়। নিত্য চলেছে প্রসেশন নিয়ে সোজা হয়ে ওই সাজবেশ পরে বিউগিল বাজিয়ে চলেছে। তাসা পার্টি আর ওই ব্যাণ্ড পার্টির দল চলেছে, পিছনে আলোঝলমল প্রতিমা চলেছে ট্রাকে।

তারপর রাবণের বাদ্যি বাজিয়ে চলেছে ডজন তিনেক ঢাক ঢোল। যেন জ্যোতি সংঘেরই বিসর্জন দিতে চলেছে ওরা। গুপী গজগজ করে।

—হালায় সারা সিঁথির ছাওয়াল ছেমড়িরা ব্যাণ্ড বাইবার লাগছে।

পটলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানায়—নিতেকে বলে দে, বেসজ্জন হলেই যেন হাওয়া হয়ে যায়। নইলে ব্যাটার ডাঁট ভেঙে দেবে। মুখের জিওগ্রাফী বদলে দেবে ওই তেলিয়া মাস্তানের দল।

হরিলাল গা বাঁচাবার জন্যে বলে—আমি কিন্তু রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছি।

গুপীনাথ বলে—কথাটা ওগোরে কইবি।

প্রকৃত কাণ্ডটা বাধে গভীর রাতে বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার পর। কর্মকর্তারা কে কোন্ দিকে হাওয়া হয়ে গেছে। ঢাক ঢোল ওয়ালারা টাকা পায়নি, বেদম ঢাক পিটিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে লোক জাগিয়ে ছি ছি করছে। তাসা পার্টির আগুনখেকো লীডার তেলিয়া মাস্তান এবার নিজমূর্তি ধরে হাঁক পাড়ে—কোথায় গেল সেই সেক্রেটারী ক্যাশিয়ার। ট্যাকা না দিলে পাড়া জ্বাইলে দোব না?

ওদের দলের কে বলে ওঠে—প্যাণ্ডেলের তেরপল কাপড়ই খুইলে লে।

প্যাণ্ডেলওয়ালাও বেগতিক দেখে মালপত্র খুলতে এসেছে—ওদের সঙ্গেই বেধে যায় তাদের। কোত্থেকে কে দুটো বোমা ফাটিয়েছে এই ফাঁকে। হুলস্থূল বেধে যায়। কিল্লি বিল্লি ব্যাণ্ড পার্টির ছেলেমেয়েরা ভয়ে চেঁচামেচি কান্না শুরু করেছে। তার মধ্যে তেলিয়ার ফাটা গলা শোনা যায়।

—লাল ঘোড়া ছুটিয়ে দোব। মার ব্যাটাদের। যুক্তি সংঘের নিকুচি করে মারবো আজ।

এর মধ্যে উৎসাহী কোন দল অন্ধকারেই হরিলালকে বের করে এনেছে পায়খানার ভিতর থেকে, পটলাকে আবিষ্কার করেছে কোন বাড়ির চিলে ছাদের ঘর থেকে, মাথায় ঝুল। আর গুপীনাথ ঘাপ্‌টি মেরে বসেছিল পানাপুকুরের ধারে ঝোপের মধ্যে। তাকে খুঁজে এনেছে তাসা পার্টির দল। কর্দমাক্ত অবস্থায় বলির চুবোনো পাঁঠার মত সে কাঁপছে।

আর কোন ব্যাণ্ড পার্টি তাদের সেনাপতির পোশাকের অভাব মিটিয়ে নিয়ে গেছে নিত্যকে বলপূর্বক বিবস্ত্র করে। প্যাণ্ট জামা টুপি ধড়াচূড়া আর বিউগিল হারিয়ে আণ্ডারওয়্যার সম্বল করে পদচ্যুত সেনাপতি মাঘের শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে।

ওই ঢাক ঢোলের শব্দ, চিৎকার, প্যাণ্ডেলওয়ালার সঙ্গে মারপিট হইচইয়ের শব্দে একটা পুলিস ভ্যান এসে পড়েছে। ততক্ষণে তেলিয়ার পার্টি কয়েকখানা তেরপল শালু কাপড় হাতিয়ে পথ দেখেছে। ঢাকী ঢুলির দলই নালিশ করে। বাধ্য হয়েই পুলিস অফিসার ওই ছত্রভঙ্গ কাঁপছটকানো অবস্থার কমিটিকেই বলে—থানায় চলো তোমরা।

গুপীনাথ কি বলার আগে হরিলাল জানায়—রেজিগনেশন দিয়েছি স্যার, আমি কমিটিতে নেই।

—সাট্ আপ্! পালাতে চাও টাকা হাতিয়ে, না?

কাঁদ-কাঁদ স্বরে পটলা জানায়—দয়ে মজিয়ে গেছে স্যার ওই গজগোবিন্দ।

শেষকালে পটলার কাকা, গুপীনাথের মামাবাবু, হরিলালের পিতৃদেব, পাড়ার অন্যান্য লোকজন বের হয়ে আসেন। শশধরবাবু কদিন ছিলেন না, তিনিও বাড়ি ফিরে সব শুনে এসেছেন। ততক্ষণে পটলা বাড়ির রকে কাকুর হুকুমে নাকখৎ দিচ্ছে, আর গুপীনাথ মামার ধমকে উঠ বস্ করে চলেছে। আর হরিলালের পিতৃদেব ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার নোটিশ দিয়ে বলে—এবার যদি ক্লাব মুখো হবি তাহলে বাড়ির পথ বন্ধ।

পুলিসকে শশধরবাবুই শেষকালে বলেন—যা হবার হয়ে গেছে, এখন একটা ব্যবস্থা আমরাই করছি।

পুলিস অফিসার জানান—তাই করুন। তবে আমাদের কাছে আর কোনো নালিশ গেলে আমরা ছেড়ে দোব না। পাবলিক মানি নিয়ে এইসব কাণ্ড মহা অপরাধ।

ততক্ষণে ওঁরাই অবস্থাটা সামাল দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

ক্লাবের অবস্থা চরমে উঠেছে। এতদিনের মানসম্মান খ্যাতি এক রাতের ওই কাজের পর সব হারিয়ে গেছে। চোরের মত মুখ লুকিয়ে বসে আছে ক'মূর্তি।

পটলার নাকের চামড়া ছিঁড়ে গেছে, গুপীর ওই একশো বৈঠক দিয়ে সোজা হবার কায়দা নেই। হরিলাল গজরাচ্ছে, আর নেত্য মুখ বোদা করে বসে আছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে তাদের।

পটলা বলে—যদুটাও কোথায় চলে গেল, এদিকে গজগোবিন্দ দফা শেষ করে দিলে। তবে দেখিস এর শোধ নোবই। খবর নে সে ব্যাটা কোথায় গেল।

গুপী জানায়—গজা কাল থেকে নাকি মহা ব্যস্ত। ঠাকুরদালান রংচং হচ্ছে।

নেত্য দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—উঃ, মুখ দেখাবার উপায় নেই। পঞ্চ পাণ্ডব ক্লাবের ছেলেরা বলে কি জানিস? জুতি সংঘ। যে সংঘকে লোকে জুতো মেরে যায়। বহুব্রীহি সমাস! বাকী রইল কিছু? ওই তো—

এমন সময় দেখা যায়, গজগোবিন্দের ভাগ্নে ব্যাংকে। মিষ্টির বাক্স দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে চলেছে। পটলার নাকের জ্বালাটা যেন বেড়ে ওঠে।

—তোর মামা কোথায় রে?

ব্যাং একটু ভয় পেয়ে যায়। তবু সাহস করে জানায়,

—গুরুদেব না কে এসেছে সকালেই। মহা ধুমধাম হচ্ছে। বাড়িতেই আছে।

—ছেরাদ্দ হচ্ছে। পটলা বলে।

ব্যাংও সেটা হলে খুশী হয়। ও বলে—ওকি মরবে রে? গুরু মহারাজের আশীর্বাদের জন্য হেদিয়ে পড়েছে। যাই—দেরি হলে আবার মুণ্ডুপাত করবে।

ভজগোবিন্দ সেই রাতের কেচ্ছা-কাণ্ডটা ইচ্ছে করেই বাধিয়েছিল, তেলিয়া মস্তানের দলকে সে নিজেই পাঠিয়েছিল গোলমাল বাধাবার জন্যই। আর বাসু মুদীকে সে চাল কেরাসিন তেল দেয়, ব্যবসার জন্য মূলধন টাকাও দিয়েছে। বাসুও তার কথায় ওঠে বসে। তাই বাসুও কাঙ্গালী ভোজনের চাল তেল ডালের দরুন বাকী টাকার জন্য নালিশ করেছে।

ভজগোবিন্দ জানে ক্লাবের ছেলেদের বাধা দেবার শক্তিটুকু সে ঘুচিয়ে দিয়েছে, তাই এবার শশধরের জমি বাগান খেলার মাঠটাকে দখল করবার ব্যবস্থাই করেছে।

শশধরবাবু নিরীহ মানুষ। আজ তার টাকাকড়ি নেই। ভজগোবিন্দর কথায় তবু চমকে ওঠেন। ওই জমি বাগান মাঠ শশধরবাবুর বাবা মরার আগে তার কাছে বন্ধক রেখে গেছে, হ্যাণ্ডনোটও আছে কয়েক হাজার টাকার। 'সেইসব টাকার সুদমুল জুড়ে এখন অনেক হয়ে গেছে! ভজগোবিন্দ তাই এবার ওইসব দখল নিতে চায়। চমকে ওঠেন শশধরবাবু—কি বলছেন এসব? দলিল হ্যাণ্ডনোট-এর কথা তো শুনিনি।

—ঠিকই বলছি বাবাজী। তবে কি জানো টাকা যা হয়েছে হোক। তোমাকে আরও হাজার পাঁচেক টাকা দিচ্ছি নিয়ে দখল দাও।

শশধরবাবু স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবু বলবার চেষ্টা করে—ছেলেরা খেলাধুলো করে ওখানে।

—হ্যাঁ। ওইসব ডাকাতের দলকে মাথায় তুলো না বাবাজী। ওসব আমি ঠিক করে দোব। জয় নিতাই।

ভজগোবিন্দ জানে কিভাবে দখল নিতে হয়। আর সেটা যে এবার সহজ হবে তাও অনুমান করেছে সে।

বাড়ি ঢুকে তাই দলিল পত্রের বাক্সটা টেনে সব কাগজ ঠিক করতে থাকে। পাড়ার আশপাশের অনেকের জমি বাড়ি সে দখল করেছে এইভাবে।

দলিল হ্যাণ্ডনোটও তৈরি করার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া ওই গুদামে হাজার হাজার মন চাল—টিন টিন কেরাসিন তেলের লেনদেনের হিসাব থাকে ওতে।

ভজগোবিন্দ জাল দলিলটা তৈরি করিয়েছে আগেই। সেগুলো বের করেছে, এমন সময় দরজায় কাকে দেখে চমকে ওঠে। এক তরুণ সন্ন্যাসী ওকে দেখছে।

—জয় রাধারানীর জয়। মথুরাপতির জয়। হরিদ্বারের আশ্রম থেকে গুরুদেব পাঠালেন আমায়। সংবাদ কুশল তো ভজগোবিন্দ?

ভজগোবিন্দ জীবনে অনেক পাপ করে এই বিষয় আশয় জমিয়েছে, আজও তার গুদামের অন্ধকারে স্তূপ হয়ে আছে বহু হাজার মানুষের মুখের অন্ন, আলোটুকুর জন্য কেরাসিন তেল আরও অনেক কিছু। আর বহু গরিব অনাথা বিধবাকে ঠকিয়ে তাদের বাড়িঘর জমি কেড়ে নিয়ে ইমারত বানিয়ে চলেছে। তাই বাইরে ধর্মের ভানটা তাকে আরও বেশী করে রাখতে হয়েছে। গুরুদেবের নাম শুনে ভজগোবিন্দ দলিলপত্র বাক্সবন্দী করে ওই গোল পিপের মত বপুখানা নিয়ে গোলকিপারের পেনালটী শট্ আটকাবার ভঙ্গীতে বডিথ্রো করে ওই মহারাজের পায়ে, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে—এত দিন পর অধমকে স্মরণ করেছেন প্রভু?

সন্ন্যাসীর মুখে মৃদুমন্দ মধুর হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বলেন—

—তোমার মহা ভাগ্য ভজগোবিন্দ। বেশ কিছু সম্পত্তি পাচ্ছো শীগ্‌গির।

ভজগোবিন্দ ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের কথায় খুশী হয়। মহাপুরুষ চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছেন। ওই বাক্সটাও চোখে পড়েছে তাঁর, আর ওতে কি সব বস্তু আছে তাও কিছুটা দেখেছেন তিনি, ভজগোবিন্দের কথায় অভয় দেন—ষোড়শ প্রহরের মধ্যে সে সব হস্তগত হবে।

ভজগোবিন্দ আবেগভরা স্বরে বলে—হবে প্রভু? তাহলে গুরুদেবের নামেই মন্দির করে দোব। কিন্তু অনেক যে শত্রু বাবা।



এত দিন পর অধমকে স্মরণ করেছেন প্রভু? পৃঃ ২৩

—সব প্রতিবন্ধক গুরুকৃপাতেই দূর হবে। আমিও যাগযজ্ঞ করবো।

ভজগোবিন্দ হাঁড়ির মত মাথাটা সন্ন্যাসীর পায়ে ঠুকে হামলে ওঠে —তাই করুন বাবা।

সন্ন্যাসী হাত তুলে অভয় দেন তাকে।

তার জোরেই ভজগোবিন্দ মনে মনে মত্ত গজের শক্তি পেয়ে গিয়ে এবার উঠে-পড়ে লেগেছে। জানে ও পটলার দলকে পুলিস আবার এসে শাসিয়ে গেছে। বাসু মুদীকেও ঠেলে থানায় পাঠিয়েছিল ভজগোবিন্দ। ওদের মুখ বন্ধ করার মতলবে সে প্রথম থেকেই এই পথে চলেছিল আর সেই কাজটাও হয়েছে নিখুঁত-ভাবে।

তাই তার কাজে বাধা আসেনি। রাতারাতি লোকজন মিস্ত্রী এসে গেছে, ট্রাক ট্রাক ইটও ফেলা হয়েছে পাহাড়প্রমাণ করে। রাতের বেলায় ওর গুদামে ট্রাক অনেক আসে তাই পাড়ার লোক তেমন কিছু সন্দেহ করেনি। আর ভজগোবিন্দ সেদিন পাড়ার লোকদের তার নাটমন্দিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে গুরুদেবের উৎসব উপলক্ষ্যে। সন্দেশের স্তূপ—ফুলমালার খোসবু ওঠে, দামী ধূপ জ্বলছে। সেই ধোঁয়াচ্ছন্ন আসরে জটাজূট আর বিরাট দাড়িগোঁফ নিয়ে নিমীলিত নেত্রে বসে আছেন সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ হয়ে। আজ তাঁর মৌনদিবস।

ভজগোবিন্দ ওই কীর্তনের সুরে মাঝে মাঝে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে ওঠে—জয় নিতাই। নিতাই হে—

সর্বাঙ্গে তিলক ছাপ, কদমার মত ইয়া বড় সাইজের দুটো চোখ পাক খাচ্ছে। সমবেত জনতা ওর ভক্তির প্রবাহে মুগ্ধ।

সকাল বেলাতে পাড়ার লোকজন চমকে ওঠে। শশধরবাবু অসহায় দর্শকের মত ব্যাপারটা দেখছেন; পটলা হরিলাল গুপী নেত্যও এসে গেছে। ততক্ষণে তছনছ হয়েছে জায়গাটা, তাদের লাইব্রেরী ঘর, ক্লাবের ক্যারাম আলমারি ফুটবল ক্রিকেট প্যাড এদিক ওদিকে ছড়ানো। বইগুলো মাঠময় ছত্রাকার করা। ওই ভাঙ্গা ঘরের দরজাটা আর নেই। সারা মাঠ জুড়ে লোকজন মিস্ত্রীরা পাঁচিল তুলছে।

ওদিকে দাঁড়িয়ে ভজগোবিন্দ, সমবেত জনতাকে জানাচ্ছে—দেনার দায়ে সব জড়িয়েছিল বাবা, এতদিন চুপ করে থাকলাম, ভাবলাম টাকাটা দেবেন শশধরবাবু, কিন্তু না পেয়ে এই দখল নিতে হল বাবাসকল। তবে নিজের জন্য এ জমি নিচ্ছি না, গুরুদেবের নামে মন্দির হবে, দেবসেবা অতিথি-সৎকার নামকীর্তন এই সব হবে এখানে।

পটলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—সব গেল রে গুপী!

গুপী আর্তনাদ করে ওঠে—জ্যোতি সংঘের সমাধি হইয়া গেল গিয়া!

পাড়ার দু'একজন তবু বলেন—ছেলেরা খেলাধুলো করছিল—লাইব্রেরীও ছিল।

ভজগোবিন্দ উদাত্ত হাসি হেসে ওসব কথা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে জানায়,—ভক্তি নাই, ধর্ম নাই—একালের ছেলেদের কথা বলবেন না। সরস্বতী বিদ্যাদেবী, তার পূজো নিযে কি কাণ্ডটা করল? ছিঃ···ছিঃ—

নেত্য গর্জে ওঠে আড়ালে—দ—দোব আধলা ইট কষে ব-ব্যাটার টাকে?

গুপী বলে—থানায় লই যাবো আবার। ওই তো আবার, ওগোর আসনের কি হইল রে?

নিত্য চুপসে গেছে পুলিস দেখে, ক'দিনেই তাদের দিব্যজ্ঞান হয়ে গেছে। তাই বলে—চ—চল ক—কেটে পড়ি। উঃ!

এমন সময় ভজগোবিন্দ স্বয়ং গুরুদেবকে এখানে আসতে দেখে চমকে ওঠে, পুলিসের দলবলও রয়েছে, আর ব্যাং-এর মাথায় তার মূল্যবান সব বিচিত্র দলিল, অন্ধকারের গুদামের হিসাবের খাতা।

সন্ন্যাসীকে দেখে ভজগোবিন্দ গর্জে ওঠে—কে তুমি?

সন্ন্যাসী একটানে দাড়িগোঁফের জঞ্জাল সাফ করে মাথার জটার বাহার খুলে ফেলতেই ওরা সকলে চমকে ওঠে।

—যদুপতি, যেদো! তুই!

যদুপতি বলে—এত দিন অভিনয় করে লোক ঠকিয়েছি, আজ একজন পাকা অভিনেতা ওই গজগোবিন্দকেই ঠকালাম। উনি অবশ্য কতজনকে ঠকিয়েছেন সে খবর পুলিস বের করবে। গজগোবিন্দ—বৎস, তোমার সব বানানো জাল দলিল, হ্যাণ্ডনোট আর গুদামের ঠাসবন্দী চাল-ডাল-কেরাসিন তেল প্রভৃতির লেনদেনের হিসাবের কাগজপত্রও পুলিসের হাতেই পড়েছে।

ভজগোবিন্দের সারা শরীর অসহ্য রাগে ফুলে ওঠে। চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে যদুপতির দিকে এগিয়ে যায়, ওকে ছিঁড়ে ফেলবে এইবার। তার আগেই পটলা তৈরি ছিল, ল্যাং মারতেই ভজগোবিন্দের বর্তুলাকার প্রকাণ্ড দেহটা ছিটকে পড়তে গিয়ে দুজন কনেস্টবলের চেষ্টায় কোনরকমে কাত মেরে দাঁড়ালো। ভজগোবিন্দ গর্জাচ্ছে—খুন করেঙ্গা।

থানা অফিসার এতদিন ধরে খবর পাচ্ছিলেন রাতের কারবারের, কিন্তু সেসব যে ভজগোবিন্দের এখানে ঘটছে তা ভাবেন নি। তাই বলেন—থানায় যেতে হবে গোবিন্দবাবু। তার আগে আপনার বাড়ি গুদামও সার্চ করবো। চলুন।

ভজগোবিন্দের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তবু ফুঁসিয়ে ওঠে—এসব মিথ্যা।

নেত্য আনন্দের বেগে হেঁকে ওঠে—জ…জ…জয় নিতাই।

ভজগোবিন্দ জালে ধরাপড়া মাছের মত দাপাচ্ছে। ওরা তাকে নিয়ে গাড়িতে তুলল।

জায়গাটার রূপ বদলে গেছে। শশধরবাবু বলেন—এসব মিথ্যা যদুপতি? উঃ—জোর করে মিথ্যা দলিল নিয়ে এসেছিল?

—নয়তো কি! এ্যাই ব্যাটারা পালাচ্ছিস কোথায়? ধর ওদের। যদুপতি ওই মিস্ত্রীদের হাঁক পাড়ে। পটলার মাথাতেও বুদ্ধিটা আসে। তাই হেঁকে ওঠে সে—এ্যাই নিতে, গুপী বইপত্তর তোল। জিনিসগুলো তছনছ করে গেছে। ওই মিস্ত্রী মজুরদের দিয়ে ভাঙ্গা ঘর-দরজা মেরামত করে নে, তবে ছাড়বি। ভজগোবিন্দের হয়ে সব্বোনাশ করতে আসা বের করছি।

মিস্ত্রী মজুররাও বুঝেছে একটা মস্ত অন্যায়ই করেছে তারা, তাই ওদের ধমকে এবার ঘরের মেরামতি শুরু করেছে।

যদুপতি বলে—অভিনয় কি জিনিস দেখলি তো? সবাই তো পথে বসেছিলি, ডাঙ্গায় তুললো কে? এই যদুপতি তার মেকআপ আর অভিনয়। তবে ব্যাং ছোঁড়াটাও মদৎ দিয়েছে। এবার ওকে ভালো পার্ট দেবো।

পটলা বুদ্ধি বের করে—তাই বলছিলাম ধার দেনা শোধ দিতে হবে, চ্যারিটি শো করো ওই 'মেবার পতন'।

গুপী আজ পূর্ণ সমর্থন জানায়—হঃ ঠিক কথা। করো যা হয়—বুঝলি যদো, বুকখান চৌচির হইযা গেছিল গিয়া, এহন আবার যুইড়া গেছে। জ্যুতি সংঘের জ্যোতি নিভাইব কোন্ হালায় র‍্যা?

হরিলাল এবার মুখ খোলে—তাই বল। আমি রেজিগনেশন উইথড্র করছি।

● মাসীমা এরে কয়



ভাইপোর পাল্লায় ভূত



ধনঞ্জয় বৈরাগী

প্রথম প্রথম বেশ মজাই লাগছিল।

কলকাতায় আজকাল মারাত্মক রকম মানুষ বাড়ার ফলে ভূতেরা অনেকদিন কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। রাস্তায়, ঘাটে, মিটিং-এ, ট্রামে বাসে হামেশা কত অদ্ভুত অদ্ভুত লোক দেখতে পাই, কিন্তু ভূত একটিও না। বাড়ির চাহিদা এত বেড়েছে যে একটিও ভুতুড়ে বাড়ি আর নেই। আমরা ছোটবেলায় শুনতাম হেস্টিংস সাহেবের ভূত ঘোড়ায় চড়ে ভোরবেলা টগবগ করে ময়দানে ঘুরে বেড়াত। এ কাহিনীও এখন আর কেউ বলে না।

তাই চেঞ্জে এসে যখন শুনলাম, যে বাড়িতে আমরা উঠেছি, ঐ অঞ্চলে তাকে বলা হয় ভুতুড়ে বাড়ি, আমার তো মহা আনন্দ। এ শুধু বায়ু পরিবর্তনের জন্য চেঞ্জে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে রীতিমত ভুতুড়ে রোমাঞ্চ। আরও আনন্দ হল এই

জন্যে যে ঐ বাড়ি আমি ঠিক করিনি, সব ব্যবস্থা করেছে আমার ভাইপো, শ্রীমান বীরবাহু, ওরফে বীরু। বীরু তো এখন শুধু পাড়ার মাতব্বর নয়, বাড়ির সকলের হীরো। এমন কি ওর কাকীমারও।

চেঞ্জে যাবার প্রস্তাবও আমি করিনি, কারণ ঘর থেকে বেরলেই তো খরচা। কিন্তু বীরু এসে যখন সানন্দে ঘোষণা করল সাঁওতাল পরগনায় বিনা ভাড়ায় একখানা বাড়ি যোগাড় করেছে তখন ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে আমি আর না করতে পারলাম না।

জায়গা ভাল। প্রাকৃতিক শোভা অপরূপ। একটা উঁচু টিলার ওপর বাড়ি। দুপাশ দিয়ে দু'খানা নদী বয়ে যাচ্ছে। অফুরন্ত হাওয়া। টনিকের মত কুয়োর জল। মুরগী সস্তা। ডিম অজস্র। এক কথায় বলতে খরচার যে ভয় পেয়েছিলাম, দেখলাম তা নয়। কলকাতায় থাকলেই বরং বেশী খরচা হত। কিন্তু গোল বাঁধাল বাড়িটা।

কোথাও বাইরে গেলেই প্রথমে আমি যাই পোস্ট আফিস, পোস্টমাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, খুব অমায়িক। আলাপী তো বটেই। কিন্তু যেই শুনলেন এই বাড়ির কথা, অমনি চমকে উঠলেন, বলেন কি মশায়, ওখানে উঠেছেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে?

জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কি হয়েছে?

ভদ্রলোক কপালে হাত ঠেকিয়ে কয়েকবার বিড়বিড় করলেন, রাম, রাম, রাম, রাম। না মশাই, ওখানে থাকবেন না। ভুতুড়ে বাড়ি। ক'দিন থাকলেই টের পাবেন। কতরকম আওয়াজ, কান্নার শব্দ। এক ভদ্রলোক গোঁয়ারতুমি করে থাকতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ বাড়িতেই মারা যান। আমি তাঁর মৃতদেহ দেখেছি। চোখে, মুখে আতঙ্ক।

আমি বললাম, কদিন দেখি, অসুবিধে হয় চলে আসব।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, উহুঁ, একদিনও থাকা উচিত নয়।

একই রকম কথা বললেন মুদীর দোকানের মালিক রামাবতার। বিহারী লোক, কিন্তু বাংলা বলেন চমৎকার—চেঞ্জের পক্ষে এ জায়গাটা ভাল। অনেকেই তো বেড়াতে আসেন। আমার দোকান থেকেই মাল যায়, তাই জান পহ্চান সকলের সঙ্গেই হয়। আপনি যে বাড়িতে উঠেছেন ওটা একটা বাঙালী বাবুর। কলকাতায় ব্যবসা আছে। প্রায় পনের বছর আগে একবার ডাকাতি হয়। সেই ডাকাতরা ঐ বাবুর বৌ, ছেলে,

মেয়ে, দু'তিনজনকে কেটে ফেলে। তারপর থেকে উনি আর এখানে আসেননি। অমনি পড়ে থাকে। দু'একবার ভাড়া নিয়ে কেউ কেউ এসেছিল, কিন্তু সকলেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। একজন মারাও গেছে।

বললাম, না জেনে আসা আমাদের ভুল হয়েছে দেখছি।

—ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার হাতে দু'তিনটে মোকান আছে। একটা দিয়ে দেব।

—অনেক ধন্যবাদ। দরকার হলে জানাব।

বাড়ি ফিরে এসব কথা বলার দরকার হ'ল না। দেখলাম সকলেই ইতিমধ্যে কানাঘুষো শুনেছে।

খুকি বলল, জানো বাপী। আমাদের খাবার ঘরের মেঝেয় একটা লোহার হুক পোঁতা রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কি হ'ল।

—নিশ্চয়ই ঐ ঘরে কেউ মরে ভূত হয়েছে। যাতে সে জ্বালাতন না করে তাই ওর আত্মীয়রা মেঝেতে লোহা পুঁতে রেখেছে।

আমার গুণধর পাতানো ভাইপো এককোনায় গোঁজ হয়ে বসেছিল। মন্তব্য করল, বাজে বকবক করিস না। আগে ভূত বেরুক তারপর—

মেজখোকা থামিয়ে দিয়ে বলে, কিন্তু বীরুদা কাল রাত্তিরবেলা কে যেন আমার খাটের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখন ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখছি। এখন বুঝতে পারছি। নির্ঘাত ওটা ভূত!

বীরু চেঁচিয়ে ওঠে—ভীতু, ভীতু তোরা সবাই ভীতু।

আমি বললাম, তা বললে তো চলবে না। পোস্টমাস্টার মুদি সকলেই যে এখানে থাকতে বারণ করছে। বলছে এটা ভুতুড়ে বাড়ি।

আমার মুখ থেকে কথাটা শোনার জন্যেই যেন ছোট খোকার মা অপেক্ষা করছিল। ব্যস্ত হয়ে বলল, আর কথার দরকার নেই বাবা, চল আমরা অন্য কোন বাড়িতে চলে যাই।

আমিই বা এ সুযোগ ছাড়ি কেন, বললাম, কেন, তোমার আদরের বাহাদুর ভাইপোকে জিজ্ঞেস কর, এমন একটি দুর্লভ বাড়ির উনি সন্ধান পেলেন কোথায়?

বীরু গজগজ করে, কোথায় আবার জুতোর দোকানে।

এবার আমার বিস্ময়ের পালা—জুতোর দোকানে বাড়ির খবর!

—হ্যাঁ। জুতো কিনতে কলেজ স্ট্রীটের একটা জুতোর দোকানে ঢুকেছিলাম। দোকানের মালিক বলাবলি করছিল সাঁওতাল পরগনায় ওদের একটা বাড়ি আছে। কেউ চেঞ্জে যেতে চাইলে দিতে পারে।

—কিন্তু তোমায় হঠাৎ বলতে গেল কেন।

—আহা আমি কেন। সবাইকেই তো বলছিল। আমি যাবো বললাম, তাই চাবি দিয়ে দিল।

আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ি—তোমাকে চেনে না, জানে না। অমনি হুট করে বাড়ির চাবি দিয়ে দিল। তাও আবার বিনা ভাড়ায়। ব্যাপারটা খুব গণ্ডগোলে মনে হচ্ছে—তোমার একটু তলিয়ে দেখা উচিত ছিল।

শ্রীমান বীরবাহু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। আমি সাবধান করে দিয়ে বললাম—দেখ বীরু বই লিখে, থিয়েটার করে, ফেরার হয়ে, আমার গুচ্ছের টাকা তুমি নষ্ট করেছ, এবার যদি আবার ভূতের পাল্লায় পড়ে আক্কেল সেলামী দিতে হয়, তাহলে তোমায় আমি দেখে নেব।

ওখানে আর না দাঁড়িয়ে আমি অন্য ঘরে চলে গেলাম। শুনতে পেলাম বীরু বেশ জোরে জোরে বলছে, এইজন্যে কারুর উপকার করতে নেই। নিঃখরচায় এমন চমৎকার বাড়ি যোগাড় করে দিলাম, কোথায় তার জন্যে 'থ্যাংক্‌স্‌' দেবে, তা নয়, বলে কিনা আমি ভুতুড়ে বাড়িতে এনেছি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কটা ভূত আসে! আজকের মাগগি গণ্ডার বাজারে ভূত কি এতই সস্তা যে না চাইতেই পাওয়া যাবে?

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাবেলা থেকে ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। আমি আর অরুণা (মানে বীরুর কাকীমা) সবে বেড়িয়ে ফিরেছি, দেখি তিন ছেলে আর খুকি মোমবাতি জ্বালিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছে। মুখগুলো সাদা ফ্যাকাশে। আমাদের দেখে যেন ওদের ধড়ে প্রাণ এলো।

জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী?

সবাই একসঙ্গে কথা বলে। খুকিটা তো ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারি না।

থামিয়ে দিয়ে বললাম, আহা চেঁচিও না, এক একজন করে কথা বল।



টর্চের আলো ফেলে দেখি একটা মাথার খুলি

বড় খোকা পরিষ্কার করে বোঝায়, আমরা সবাই বিকেল-বেলা নদীর পাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বালির উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল। গল্প করতে করতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করি। কিছুটা এসেছি হঠাৎ মনে হল কে যেন কাঁদছে। ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের কান্না।

—তোমরা সবাই শুনেছ?

সমস্বরে জবাব, হ্যাঁ আমরা সকলে। বীরুদাও শুনেছে।

—তারপর।

বড় খোকা আবার ধারা বিবরণী শুরু করে, কান্না শুনেই খুকির যা ভয়, সে লাফিয়ে বীরুদার কোলে উঠে পড়ল। আর আমরা পায়ের জুতোগুলো হাতে নিয়ে লাগালাম ছুট। প্রথমটা আস্তে, কিন্তু কান্নার আওয়াজ ক্রমশঃ বাড়ছে দেখে আমরাও জোরে ছুটতে লাগলাম। প্রায় বাড়ির কাছাকাছি যখন এসেছি ছোট খোকা কিসে যেন হোঁচোট খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল! টর্চের আলো ফেলে দেখি একটা মড়ার খুলি।

ছোট খোকার মা আঁতকে ওঠে, বলিস কি!

খুকি ককিয়ে ওঠে, হ্যাঁ মা ভূতের মাথা।

—তারপর শোনো না।—বড় খোকা অন্যদের থামিয়ে দেয়। সেখান থেকে পড়ি কি মরি করে ছুটে তো বাড়িতে পৌঁছলাম, কিন্তু যেই এই ঘরে ঢুকেছি ঐ লণ্ঠনটা দপ দপ করে কবার জ্বলে নিভে গেল।

মেজ খোকার গলা, কী ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। বাপরে।

—বীরুকে দেখছি না। ও কোথায়?

—মোমবাতি জ্বালিয়ে আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে গেল। বোধহয় বস্তির লোকেদের কাছে খোঁজখবর নিতে।

খোকাদের মার তৎক্ষণাৎ ঘোষণা, আর খোঁজখবরে কোন দরকার নেই। চল কালই আমরা এ বাড়ি থেকে উঠে যাই।

একটু পরেই বীরু ফিরে এলো, দিব্য হাসিমুখে, সবাইকে মায় নিজেকেও যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—কেন যে আমরা মিথ্যে ভয় পাই। একটু ভেবে দেখবো তো। আরে কে না জানে মড়ার খুলির মধ্যে দিয়ে হাওয়া খেললে যে আওয়াজ বার হয়, ঠিক মনে হয় বাচ্চা ছেলের কান্না।

বীরুর কাকীমাই ওর বক্তৃতা থামিয়ে দেয়, তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ঐ মড়ার খুলিটা ওখানে এলো কি করে?

বীরুর প্রাণ জল করা ব্যাখ্যা। আহা এখানে তো আর কেওড়াতলা নিমতলার মত পাকাপোক্ত কোন শ্মশান নেই, তাই নদীর পাড়ে মড়া পোড়ায়। অতএব মড়ার মাথা—

কাকীমার বিরক্তি, তোমার মাথা।

ছোট খোকার প্রশ্ন, তাহলে লণ্ঠনের আলোটা অমন অসভ্যের মত নিভে গেল কেন?

—কেরাসিন তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই দপ দপ করে নিভে গেল।

আমিই আসর ভেঙ্গে দিলাম। যাক্‌গে আজ রাত্রে তো কিছু হবে না। এখানেই যখন থাকতে হবে, রান্না বাড়ার ব্যবস্থা দেখ। না খেয়ে রাত কাটাতে আমি রাজী নই।

রাতটা নিরুপদ্রবে কাটায় সকালে আর বাড়ি বদলের প্রসঙ্গ উঠল না। কিন্তু পোস্টমাস্টারমশাই সব কথা শুনে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন—এই শুরু, কোথায় শেষ কে বলতে পারে। অপদেবতা বলে কথা বুঝলেন না। মোটেও সময় নষ্ট করবেন না, আজই ওখান থেকে সরে পড়ুন।

সঙ্গে মেজখোকা ছিল, তাকে সাবধান করে দিলাম, দেখো এর কথা যেন বাড়িতে কাউকে বল না, সবাই ভয় পাবে।

পল্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, না বলবো না।

মুদির দোকানেও গিয়েছিলাম তবে রামাবতারের কাছে আর কালকের কথা কিছু বলিনি। ও অবশ্য জানতে চেয়েছিল আমাদের ঐ বাড়িতে কোন অসুবিধা হচ্ছে

কিনা। মেজখোকার সঙ্গে ভাব করে ওকে এক মুঠো লজেন্স দিয়েছিল খেতে। হেসে বলেছিল, পল্টুবাবু যখন যা দরকার আমার দোকান থেকে নিয়ে যাবে, কেমন?

সেই রাত্রের ঘটনা কিন্তু আরও রোমাঞ্চকর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল কে যেন কাকে দূর থেকে ডাকছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না, শুধু নদীর জল চিকচিক করছে। কিন্তু স্পষ্ট গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে। কোন মেয়ের গলা। কার নাম ধরে ডাকছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কান খাড়া করে রইলাম।

…প…ল…টু চ…লে আ…য়!

আরে এ যে মেজখোকার নাম ধরে ডাকছে। অন্যরা না শুনতে পায় তাহলেই হয়েছে। ওমা পেছু ফিরে দেখি এরই মধ্যে সকলে গুটিগুটি পায় আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—চোখে মুখে আতঙ্ক। সকলেই ঐ রহস্যময়ীর ডাক শুনেছে—প⋯ল⋯টু, চলে আ⋯য় !!

পল্টু 'আমার কি হবে গো' বলে চিৎকার করে মাকে জড়িয়ে ধরে।

তার মাও তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, তবু চাপা গলায় বলল—তোমাদের রসিকতা আর আমার ভালো লাগছে না। দেখছো ভূতের বাড়ি। আজ আবার একটা ভূতনী চেঁচাচ্ছে, তবু তোমাদের আক্কেল হবে না। এখানে থাকলে কাল নির্ঘাত আমাদের ঘাড়গুলো দেবে মটকে। তোমাদের আর বাড়িভাড়া বাঁচাবার দরকার নেই, যা লাগে আমি দেব। রাত পোয়ালে এক মিনিটও আমি এখানে থাকবো না॥ অন্য বাড়ি যোগাড় করতে না পারো গাছতলায় গিয়ে উঠবো।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য গাছতলায় গিয়ে উঠতে হয়নি। ভোরবেলায় মালপত্তর নিয়ে আমরা রামাবতারের দোকানে গিয়ে হাজির। সে খুব খুশী মনেই আমাদের জন্যে মোকান ঠিক করে দিল। মাসিক দক্ষিণা দু'শো টাকা। তবু রক্ষে, বেকায়দায় পড়েছি দেখে আরও বেশী চায়নি। আমি কিন্তু মনে মনে শ্রীমান বীরুর মুণ্ডপাত করলাম। চেপ্পে এনে আবার আমার বাড়তি দু'শো টাকা খসাল। তবে এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম, ভূতের পাল্লায় পড়ে আমার ঐ বাহাদুর ভাইপোটির মুখ চুন হয়ে গেছে। ওর জন্যেই যে আমাদের এই দুর্দশা, তা ওকে বলতে কেউ ছাড়েনি, মায় ওর কাকীমা থেকে ছোট খুকি পর্যন্ত সবাই। বীরু বেশির ভাগ সময় নতুন বাসায় এসে চুপচাপ থাকে। কারুর সঙ্গে বেশী কথাও বলে না। সকালে বেড়াতে বেরলে একেবারে

দুপুরে খাবার সময় বাড়ি ফেরে। কোথায় যায়, কি যে করে আমাদের কাউকেই কিছু বলে না। আমরাও ওকে নিয়ে মাথা ঘামাই না।

কিন্তু এরই মধ্যে একদিন রামাবতারের দোকানে থানার দারোগার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক চৌকির ওপর পা তুলে বসে' ঘন ঘন নাকে নস্যি ঠুসছিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হতে বললেন, বীরুবাবু তো আপনার ভাইপো?

বললাম, হ্যাঁ।

—খুব হুঁশিয়ার ছেলে। বাহাদুর।

মুখে কোন প্রতিবাদ করলাম না, তবে মনে মনে ভাবলাম কাকার টাকা খসাতে খুব হুঁশিয়ার।

দারোগাবাবু এক সময় জিজ্ঞেস করলেন রামাবতারকে, হাঁ মশাই, যে ভাড়াটে ঐ ভুতুড়ে বাড়িতে মারা যায়, সে নাকি আত্মহত্যা করেছিল?

রামাবতার তার গোল গোল চোখ দুটো আরও বড় করে ফিসফিসে গলায় বলে, সাচ্ বাত। গলায় দড়ি দিয়েছিল। যারা দেখেছে তারা বলে সিঁড়ির ওপরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছিল। আবার কেউ কেউ বলে ভূতেরা ঘাড় মটকে ওকে ওইখানে দড়ি দিয়ে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল।

আমি ওদের কথা শোনার জন্যে আর ওখানে বসিনি। সামান্য কিছু বাজার করার ছিল। তাই নিয়ে নতুন বাসায় ফিরে আসি।

বাড়িতে ভূতের প্রসঙ্গ একরকম প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছিল, কারণ নতুন বাসা একেবারে বাজারের কাছে, চারদিকে লোকজন। দিনরাতই হইচই হচ্ছে। অতএব ভয় পাবার কোন সুযোগ নেই।

এমনি একদিন হঠাৎ বীরু এল আমার ঘরে। মনে হল কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু পারছে না।

অগত্যা প্রশ্ন করলাম, কিছু বলবে?

বীরুর পালটা প্রশ্ন, তুমিও কি ভূতের ভয় পাও?

—ভূত! না। ভয় পাব কেন? ভূতে আমি বিশ্বাসই করি না।

বীরুর মুখে বাঁকা হাসি, খোকাখুকির সঙ্গে যেমন করে পালিয়ে এলে, আমার তো মনে হল তোমারও ভয় ঢুকেছে।

এ কথায় বিরক্ত না হয়ে পারি না। অযথা জোরের সঙ্গে বলে উঠি, ভয় কি, আমি তাই জানি না। কত রাত আমি শ্মশানে কাটিয়েছি জানো। কত সন্ধ্যে—,

—তাহলে কাকা আজ সন্ধ্যেবেলা চল না, ঐ বাড়িতে যাই।

আমি চমকে উঠি, কোন্ বাড়িতে?

—ঐ যে বাড়িতে আমরা ছিলাম।

—ঐ ভুতুড়ে বাড়িতে?—, কেন?—হঠাৎ?

বীরু বোঝাবার চেষ্টা করে, আমাদের দুজনেরই যখন ভূতের ভয় নেই, তাহলে ঐ বাড়িতে যেতে আর আপত্তি কি? আর কাউকে বলবার দরকার নেই, তুমি আর আমি বিকেলবেলা দুটো টর্চ নিয়ে বেড়াতে বেরব। ঐ বাড়ির চাবি তো আমার কাছেই আছে। এঘর, ওঘর, বারান্দা ঘুরে, কিছুক্ষণ বসে আমরা চলে আসব।

—তাতে লাভ কি হবে?

—প্রমাণ হবে আমরা দুজন অন্ততঃ ভূতের ভয় পাই না। কি রাজী তো?

এরপর রাজী না হওয়া খুবই মুশকিল। তাহলেই বীরু আমাকে ছাড়বে না, ভূতের ভয় পাই বলে পেছনে লাগবে। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করলেও অনেক চেষ্টায় মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, বেশ তো, যাওয়া যাবে।

অগত্যা আবার সেই ভুতুড়ে বাড়িতে যেতে হল। সন্ধ্যা তখন হব হব। ভুতুড়ে বাড়ির পরিবেশ যেমন হয় ঠিক তেমনটি। ক্যাঁচ কোঁচ কত রকম শব্দ। গা-ছমছম করা পাখির ডাক। হুহু করে হাওয়া। নদীর ধার থেকে সেই বাচ্চা ছেলের কান্না। তবু ভয় পেলে চলবে না। পেলেও তা প্রকাশ না পায়। বীরু কিন্তু বেশ খোশ মেজাজে এগিয়ে চলেছে। সত্যিই বোধহয় ছোঁড়াটার ভয়ডর কম।

সঙ্গে চাবি থাকলেও বীরু সামনের দরজা খুলে ভুতুড়ে বাড়িতে ঢুকল না। আমাকে নিয়ে গেল খিড়কির দরজা দিয়ে। একতলার ঘরে ঢুকে দেখি মেঝেটা কেমন যেন তেলতেলে। আমাদের দুজনেরই হাতে টর্চ। তার আলোয় আমরা পরীক্ষা করলাম, মনে হল সরষের তেল।

জিজ্ঞেস করলাম, এখানে তেল এল কি করে? আমরা যখন এ বাড়ি ছেড়ে গেছি, মেঝেগুলো তো শুকনো ছিল।

বীরুর নির্বিকার উত্তর, আজকালকার ভূত তো, বলা যায় না হয় তো তেলেভাজা খেতে ভালবাসে।

অন্ধকারে ওর মুখটা দেখতে পেলাম না, তাই বুঝতে পারলাম না আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে কিনা।

খানিক পরেই দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিসফিস করে বললাম, কেউ আসছে মনে হচ্ছে।

বীরুর ততোধিক ফিসফিসে উত্তর, ভূতেরা বোধহয় বেড়িয়ে ফিরল। তুমি ওই কোনাটায়, টেবিলের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাক। আমি ঘরের অন্য কোনায় আছি, বলেই বীরু অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমিও আর দেরি করলাম না। ছুটে গিয়ে টেবিলের পেছনে লুকোলাম। অন্ধকার তখন চোখে সয়ে গেছে, স্পষ্ট দেখলাম সামনের দরজা খুলে গেল। নিঃশব্দে কারা যেন ঢুকল। কালো মিশমিশে চেহারা। অন্ধকারের চেয়েও কালো। যেন ছায়ামূর্তি।

আর তো অবিশ্বাস করা যায় না। এটা তাহলে সত্যিই ভুতুড়ে বাড়ি। এতগুলো ভূত নিয়ে এ বাড়িতে ক'দিন যে রাত কাটিয়েছি তা ভেবেই পেটটা কিরকম গুড়গুড় করে উঠল। নিজের অজ্ঞান্তে বিড়বিড় করে দু'চার বার রাম নামও বোধহয় উচ্চারণ করে ফেললাম।

ভূতগুলো চোখের সামনে হাওয়'য় মিলিয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস নিয়ে। কারুর মাথায় যেন জালা, কারুর হাতে চৌকোন বাক্স, কারুর ঘাড়ে হাঁড়ি।

কিছুই বুঝতে পারলাম না। এইসব নিয়ে ওরা এখন খেলা শুরু করবে নাকি। বীরুটারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে একটু পরামর্শ করব।

এমন সময় দোতলায় একটা দড়াম করে আওয়াজ হল। সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে কিছু একটা নেমে আসছে। সেই সঙ্গে হা হা করে অট্টহাসি। আমার মত ভূতগুলোও ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় সভয়ে দেখলাম সিঁড়ির ওপরের কড়িকাঠ থেকে গলায় দড়ি বাঁধা একটা ঝুলন্ত কঙ্কাল। তালে তালে দুলছে, আর তার সঙ্গে তাল রেখে সেই প্রাণ কাঁপান হাসি।

তাই না দেখে ভূতগুলো তারস্বরে 'বাবাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠে জিনিসপত্র ফেলে সামনের দরজার দিকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ততক্ষণে দলবল নিয়ে দারোগা সাহেব ঢুকে পড়েছেন। তাদের হাতের লণ্ঠনের আলোয় ভৌতিক পরিবেশ নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। দেখলাম কালো জামাকাপড় পরা ছায়ামূর্তিগুলো হাতজোড় করে দারোগাবাবুর কাছে মাপ চাইছে।

● ধনঞ্জয় বৈরাগী



কড়িকাঠ থেকে গলায় দড়ি বাঁধা একটা ঝুলন্ত কঙ্কাল [পৃঃ ৩১

দারোগা সাহেব কিন্তু গর্জে উঠলেন—এদের বেঁধে ফেল। তারপর সিঁড়ির দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে ডাকলেন, নেমে আসুন বীরুবাবু, জব্বর হেসে ছিলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আমারই ভয় করছিল।

বীরুকে নামতে দেখে আমিও টেবিলের পেছন থেকে বেরিয়ে এলাম, জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি?

দারোগার উত্তর, সারা দেশে যা হচ্ছে এখানেও তাই, তেল, ঘি, চিনি এ সবের চোরা কারবার। রামাবতারের মুদীর দোকানে কিছুই পাবেন না। এই বাড়িটা তার লুকোন গুদোম। তাই ভুতুড়ে বাড়ি বলে কাউকে টিকতে দেয় না। রামাবতারকে আজ বিকেলেই আমরা থানায় ধরে নিয়ে গেছি। এখন এই সাঙ্গপাঙ্গগুলোকে নিয়ে চললাম। কিন্তু এ কিছুই সম্ভব হত না, যদি না আপনার ভাইপো আমাদের সাহায্য করতেন। তাই তো সেদিন আপনাকে বলছিলাম, সত্যি বাহাদুর ভাইপো আপনার।

আমি আড়চোখে বীরুর মুখখানা একবার দেখলাম। সে তখনও নির্বিকার। ওপরের কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, বেচারীকে এবার বালির ভেতরে শুইয়ে দিয়ে আসতে হয়।

দারোগা বললেন, সে সব দায়িত্ব আমাদের। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বীরুবাবু।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আমি না বলে পারলাম না, শেষ পর্যন্ত রামাবতার!

বীরুর ছোট্ট উত্তর, এরাই তো আজকালকার ভূত। ভূত নয় অদ্ভুত।



হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

গতবারের 'ভূত নেই' কাহিনী তোমরা পড়েছ। কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে ফোনে, পত্রযোগে আমাকে প্রশ্ন করেছে। কয়েকজন যেমন অনিন্দ্য বসু, গীতা চক্রবর্তী, মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবার কথাও লিখেছে। এও জানিয়েছে যদি সে বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়ে কোন বিপদ আসে, তাহলে আমি আর বাড়িওয়ালা কোনরকমেই দায়ী হব না।

ইতিমধ্যে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে আমি কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি রাজী নন।

তিনি বললেন, তাঁর বাড়িতে উপস্থিত ভাড়াটে রয়েছে এবং বেশ সুখেই আছে, নিরুপদ্রবে। কাজেই এখন যদি আমি ভূতের সঙ্গে মোলাকাত করবার জন্য লোক

পাঠাই, তা হলে ভাড়াটেরা ভয় পেয়ে যাবে। হয়তো বাড়িও ছেড়ে দিতে পারে। সুতরাং বাড়িওয়ালার এরকম ক্ষতি করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না।

ভেবে দেখলাম কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে।

তাছাড়া বাড়িওয়ালা রীতিমত প্যাঁচালো ব্যক্তি। আমার জন্য তাঁর কোনরকম আর্থিক ক্ষতি হ'লে, হয়তো আমার নামে মামলাই ঠুকে দেবেন।

তখন আমাকে লেখা বন্ধ রেখে দিনের পর দিন কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। টাকার শ্রাদ্ধ।

নানাদিক চিন্তা করে আমি থেমে গেলাম।

ওই প্রসঙ্গে ছোট একটি মেয়ে, ফোনে কণ্ঠস্বর শুনে মেয়েটিকে ছোটই মনে হয়েছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনি নিজে ভূত দেখেছেন?

দেখিনি, কাজেই বললাম, না।

তাই শুনে মেয়েটি বলল, সবাই তাই বলে। নিজের চোখে কেউ ভূত দেখেনি, কেবল পরের মুখে শুনেছে। এর কোন দাম নেই।

মেয়েটি ফোন রেখে দিয়েছিল। তার নামটা জানবার সুযোগ হয়নি। ঠিকানাও নয়।

কিন্তু মেয়েটির কথাগুলো আমি অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছি।

অবশ্য নিজের চোখে যা দেখিনি, তার অস্তিত্বই নেই, এটা খুব দুর্বল যুক্তি। আমেরিকা আমি দেখিনি, কাজেই আমেরিকা নেই? আমার ঠাকুর্দাকে আমি দেখিনি, সুতরাং তিনি কোনদিন ছিলেন না, এমন যুক্তি কেউ মানতে চাইবে না।

ভূত যে আছে একথা পৃথিবীর বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, লিখেছেন। তাঁদের কথা উড়িয়ে দেবার নয়।

তাছাড়া, অনেক অলৌকিক কাণ্ড পৃথিবীতে ঘটে যার বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

এ রকম দু একটি ঘটনা নিশ্চয় তোমাদেরও শোনা।

স্বামী স্ত্রী ফটো তুলেছে, সেই ফটোতে স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে আর একটি মেয়ের মুখ। মুখটি অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়, কিন্তু বেশ দেখা যায়।

দোকান থেকে ফটোটা যখন বাড়িতে দিয়ে গেল, তখন স্বামী অফিসে। স্ত্রী ফটো দেখেই চমকে উঠল।

এরকি, ফটো তোলবার সময় স্টুডিয়োতে তো খালি তারা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। এ মেয়েটির মুখ এল কোথা থেকে?

ফটো প্রিণ্ট করার সময় অন্য কোন ফটোর সঙ্গে জুড়ে গেছে?

স্ত্রী রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল।

স্বামী অফিস থেকে ফিরতেই স্ত্রী ফটোটা নিয়ে তার কাছে ছুটে গেল। একেবারে বাজে স্টুডিয়ো, দেখ আমাদের ছবিটা কিভাবে নষ্ট করে দিয়েছে।



ফটোটা দেখেই স্বামী চমকে উঠল

ফটোটা দেখেই স্বামী চমকে উঠল।

এরকি, আশ্চর্য কাণ্ড।

তাদের দুজনের মাঝখানে যে মুখটি দেখা যাচ্ছে সেটা তার খুব চেনা। কিন্তু তার পরিচয় স্ত্রীর কাছে সে দেবে কি করে?

মেয়েটি তার প্রথম পক্ষের পরিবার। বিয়ের ছমাস পরেই সে মারা গিয়েছিল। তার কোন ফটো তোলা হয়নি। অথচ এ ফটোতে তার মুখ এল কি করে।

স্বামী যে আগে একবার বিয়ে করেছিল, সে কথা স্ত্রী জানে না। তাকে বলা হয়নি।

ফটোটা নিয়ে স্বামী বলল, আমি এখনই স্টুডিয়োতে যাচ্ছি। এভাবে ফটো নষ্ট করার জন্য খুব কড়া কথা শুনিয়ে দেব।

স্টুডিয়োর মালিককে স্বামী সব বলতে, মালিক বলল।

আর বলবেন না মশাই। আমরা কিছু ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। যতবার ওয়াশ করি, ওই একই ব্যাপার, মেয়েটির মুখ ফুটে ওঠে। আপনি মেয়েটিকে চেনেন নাকি?

না, না, আমি চিনব কি করে। এ ফটো আপনারাই রেখে দিন, আমার দরকার নেই।

ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য স্বামী ফটোটা স্টুডিয়োতেই রেখে এসেছিল। কিন্তু তাতে বিপদ কমেনি।

মাঝরাতে স্ত্রী চিৎকার করে বিছানার ওপর উঠে বসেছে।

কি হ'ল, কি হ'ল? বলে স্বামীও ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

সেই মুখটা আমাকে কি সব বলছে।

কোন্ মুখ?

যে মুখ আমাদের ফটোতে দেখা গিয়েছিল। চোখ দুটো লাল করে খোঁনা খোঁনা গলায় আমাকে শাসাচ্ছে।

এ আমার বাড়ি, আমার স্বামী। তুই যা, যা এখান থেকে। নইলে তোর গলা টিপে ধরব।

স্বামী স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে।

তুমি মিছামিছি ভয় পাচ্ছ। তোমার কোন ভয় নেই। স্বপ্ন দেখে ওরকম মনে হয়।

স্বামী কিছু না বললেও, পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে স্ত্রী কথাটা শুনতে পেল। তারাই বলে ফেলল, বারণ সত্ত্বেও, যে স্বামীটি আগে একবার বিয়ে করেছিল। প্রথম স্ত্রী কুয়োতলায় জল তুলতে গিয়ে পা পিছলে সিমেন্টের ওপর পড়ে মাথায় চোট পায়। দুদিন পরেই মারা যায়।

এর পরের খবর আমার জানা নেই। এটা বোধ হয় "পরলোকের কথা" বইতেই পড়েছিলাম।

যাক, এবার নিজের কথা বলি।

ভূত সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছেলেবেলা থেকেই। বড় হয়ে ইংরাজী বাংলা ভূত-তত্ত্বের বই যোগাড় করে পড়েছি। ঠিক কোন সমস্যায় পৌঁছতে পারিনি।

ভগবানকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যেমন মোটামুটি তিনটে দল আছে।

আস্তিক, নাস্তিক আর সন্দেহবাদী। ভূতের বেলাতেও ঠিক তাই। আমি এই সন্দেহবাদীদের দলে।

ভূত থাকতেও পারে, আবার না থাকলেও আশ্চর্য হব না।

কিন্তু গত নভেম্বর মাসের একটা ঘটনার পর, নিজের মত বদলাতে বাধ্য হয়েছি।

সভা-সমিতির ব্যাপারে আমি চিরকালই ভয় পাই। বিশেষ কোথাও যাই না। সবিনয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি।

কিন্তু জামশেদপুরের এক সাহিত্য সম্মেলনে যেতে হয়েছিল, কারণ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে সম্মেলনের উদ্যোক্তা।

আমার সঙ্গে আরো যে তিনজন সাহিত্যিক গিয়েছিলেন, তাঁরা আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য রয়ে গেলেন। সভার অধিবেশন শেষ হতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম।

তার অবশ্য কারণ ছিল।

ঘাটশিলার আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু মুকুল চক্রবর্তী বিশেষ করে আমাকে লিখেছিল, সভা শেষ করেই ফেরার পথে ঘাটশিলায় যেন কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই তার কাছে।

বিভূতিভূষণের স্পর্শে ঘাটশিলা সাহিত্যিকদের তীর্থস্বরূপ।

কিন্তু মানুষ গড়ে আর ভগবান ভাঙে।

ট্রেন গিডনীর কাছ বরাবর গিয়ে আটকে রইল।

একদল লোক লাইনের ওপর বসে পথ অবরোধ করে। ট্রেন তারা একচুল নড়তে দেবে না, যতক্ষণ না তাদের আবেদন মঞ্জুর হয়।

কি তাদের আবেদন ?

এত দিন বম্বে এক্সপ্রেস গিডনীতে থামত। হঠাৎ নতুন সময়পঞ্জীতে নিয়ম হয়েছে সে আর থামবে না। হাওয়ার বেগে স্টেশন অতিক্রম করে যাবে।

তাই গিডনীবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

ড্রাইভার আর গার্ড তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এ ট্রেনটা আজকের মতন অন্ততঃ চলতে দিক। কারণ, আজ রবিবার। চক্রধরপুরে খবর দিলেও কোন লাভ হবে না। ছুটির দিন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা কেউ অফিসে আসে না, অথচ তারা ছাড়া এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বিক্ষোভকারীরা চুপচাপ। এসব কথা তাদের কানে গেছে এমন মনে হল না।

দু ঘণ্টা পার হয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার। কয়েকটা জোনাকি উড়ছে।

কামরা থেকে নেমে পড়লাম।

একজন মাতব্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাই, কখন ট্রেন ছাড়বে?

আমার দিকে অবহেলাভরে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে লোকটা বলল, আমাদের দাবি মানলেই ছাড়বে। আজ ছুটির দিন, কর্তারা বুঝি কেউ নেই, কাজেই কাল বেলা দশটার আগে তো ছাড়ছেই না।

সরে এলাম। কামরার মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগল না। তা ছাড়া এক মরোয়াড়ী দম্পতি দুটি নাবালক নিয়ে আমার সহযাত্রী। ইতিমধ্যে সঙ্গে যে খাবার ফলমূল ছিল নাবালক দু'টি খেয়ে শেষ করেছে, কিন্তু তাতেও ক্ষুধা মেটেনি। দুজনে তারস্বরে চিৎকার করছে। কামরার মেঝে ফলের খোসা, জল আর শালপাতায় নরককুণ্ডের রূপ নিয়েছে।

রেললাইন ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। কলকাতার দিকে নয়, এমনই হাঁটার উদ্দেশে।

মেঘে চাঁদে লুকোচুরি খেলা চলছে। ফলে, কখনও আলো, কখনো অন্ধকার। আকন্দ গাছ, বনতুলসী আর ছোট ছোট কাঁটাগাছের ঝোপ।

বেশ কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

চারদিকে ধু ধু মাঠ। এলোমেলো হাওয়া বইছে। ম্লান জ্যোৎস্না।

স্পষ্ট দেখলাম মাঠের ওপর একটি মেয়ে শুয়ে। দুটো হাত বুকের ওপর। মাথার বেণী ছড়িয়ে পড়েছে।

এমন জায়গায় মেয়েটি এল কি করে? শাড়ি পরার ধরনে বাঙালী মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। বয়স চোদ্দ পনেরর বেশী নয়।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম, তারপরই কথাটা মনে পড়ল।

মেয়েটিকে কেউ মেরে ফেলে এখানে রেখে যায়নি তো? তাই হওয়া সম্ভব, না হ'লে মেয়েটি এমন নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকত না।

চিন্তাটা মনে আসতেই পিছিয়ে এলাম।

মেয়েটির কাছে গিয়ে বিপদ ডেকে আনব নাকি? হঠাৎ যদি পুলিসের লোক ধরে ফেলে। কি বলব তাদের?

ট্রেন আটকেছে, তাই ফাঁকা মাঠে একটু পায়চারি করছি, এমন একটা কথা নিজের কানেই অসংলগ্ন ঠেকল।

তারপর আমি যে নির্দোষ তা হয়তো প্রমাণ করতে পারব, কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিসে ছুঁলে চুয়ান্ন। মনোকষ্ট, অর্থনাশ, স্রেফ ঝামেলা।

কয়েক পা গিয়ে কৌতূহলের বশে ফিরে দেখলাম।

কোথাও কেউ নেই। তাহলে কি চোখের ভুল? অনেক সময় ফিকে চাঁদের আলো বিভ্রমের সৃষ্টি করে।

কিন্তু এত কাছ থেকে ভুল দেখলাম!

এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু দাঁড়ানোই নয়, আমার দিকে ফিরে ফিক ফিক করে হাসছে।

তবে কি মেয়েটি এই ট্রেনের যাত্রী। ট্রেন চলবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমারই মতন নেমে পড়ে এদিক ওদিক হাঁটছিল।

তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিল, কিংবা ঘুমিয়েই ছিল, আমি দেখে মৃত মনে করেছিলাম।

মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি করছ?

মেয়েটি হেসেই বলল, আপনার মতন বেড়াচ্ছি।

কেন, ট্রেনে ভাল লাগে না?

বিচ্ছিরি। লোকের ভীড়ে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এ জায়গা আমার খুব চেনা। চলুন আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।

বুঝতে পারলাম মেয়েটি কাছাকাছিই থাকে। সম্ভবতঃ গিডনীতে। স্বাস্থ্যের জন্য অনেকেই গিডনীতে আসে।

বললাম, চল। ট্রেন আবার ছেড়ে দেবে না তো।

দিক না, ট্রেনের চেয়ে আগে আমি ছুটতে পারি।

কথাটা সত্যি। কারণ কোন মেয়ে যে এত দ্রুত হাঁটতে পারে তা আমায় ধারণার অতীত ছিল। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলেও তার নাগাল পেলাম না। সে আমার চেয়ে অন্ততঃ চার পাঁচ গজ আগে রইলই।

তুমি থাকো কোথায়?

আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি ফিক করে হাসল।

ওই তো রেললাইনের ধারে।

বুঝতে পারলাম মেয়েটি পরিহাস করছে। আসল ঠিকানা আমাকে বলতে চায় না।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। উঁচু নীচু জমি। মাঝে মাঝে পাথরে হোঁচট খাচ্ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য একটানে মেয়েটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিলাম।

মেয়েটি বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিল।

হাত বাড়িয়ে বলল, আপনারা কলকাতা শহরের লোক কিনা, তাই হাঁটতেই পারেন না। একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠেন। নিন, হাত ধরুন।

মেয়েটি আমার হাত ধরল।

ঠিক মনে হল আমার হাতের ওপর যেন বরফের স্পর্শ। আমার সব রক্ত জমে হিম হয়ে গেল। সারা হাত অবশ।

তোমার হাত এত ঠাণ্ডা যে?

মেয়েটি আবার ফিক করে হাসল।

সব সময়েই বাইরে বাইরে থাকি কিনা। তাছাড়া, শরীরে রক্তই যে নেই।

মেয়েটি প্রায় টানতে টানতে আমায় নিয়ে চলল।

চাঁদের ফালি মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। সব অন্ধকার।

অনেক কষ্টে মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাটির ওপর বসে পড়লাম!

আর চলতে পারছি না।

চলতে তোমাকে হবেই।

মেয়েটির গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলেই চমকে উঠলাম।

কোথায় মেয়েটি! তার জায়গায় একটা নরকঙ্কাল। শুধু দুটো চোখ দিয়ে যেন আগুনের দীপ্তি বের হচ্ছে।

বাতাস লেগে দাঁতগুলো কড়মড় শব্দ করে উঠছে।

আমি খুব ভীরু প্রকৃতির নই। বন্ধুমহলে সাহসী বলে নাম আছে, কিন্তু মেয়েটিকে এভাবে নরকঙ্কালে রূপান্তরিত হতে দেখে, আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল।

এত কাছ থেকে এ রকম চোখের ভুল হতে পারে?

ওঠ, চলে এস।

কণ্ঠস্বরও স্বাভাবিক নয়। অন্ততঃ মেয়েটির গলার সঙ্গে কোন মিল নেই।

বহুকষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। দুটো পা-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। একবার ভাবলাম, তীরবেগে পিছন দিকে দৌড়াই, কিন্তু বুঝতে পারলাম, তাতেও মেয়েটির কাছ থেকে নিস্তার পাব না।

দুটি হাত দিয়ে হয়তো কণ্ঠনালী চেপে ধরবে। আমার প্রাণহীন দেহ এই তেপান্তর মাঠে পড়ে থাকবে।

মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম। মেয়েটি নয় একটা কঙ্কাল।

প্রতি পদক্ষেপে আওয়াজ হ'ল, ঠক, ঠক, ঠক।

আমার চারপাশ ঘিরে ঠাণ্ডা বাতাসের আমেজ। মনে হ'ল, ধারে কাছে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে।

নিজের শক্তিতে নয়, কঙ্কালের আকর্ষণে ছুটে চলেছি।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, এগোবার সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালটি লম্বায় বাড়ছে। ছ'ফুট, সাত ফুট, আট ফুট। গাছ ছাড়িয়ে কঙ্কালের মাথা। পাঁজরের মধ্য দিয়ে বাতাস বইছে। তার শন্ শন্ শব্দ।

ভয়ে চলবার শক্তি হারালাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কঙ্কাল কয়েক পা গিয়েই ফিরে দাঁড়াল। দু চোখে আগুনের হলকা। আমার অবস্থা দেখে হা হা করে পৈশাচিক হাসি হেসে আমার দিকে দীর্ঘ মাংসহীন হাত বাড়িয়ে দিল।

চিৎকার করে জ্ঞান হারালাম।

কতক্ষণ অচেতন ছিলাম, জানি না। যখন জ্ঞান হল, দেখলাম অন্ধকার আর নেই, প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

উঠে বসলাম। চারদিকে মাটির হাঁড়ি, বাঁশের টুকরো আর হাড় ছড়ানো। বোঝা গেল জায়গাটা শ্মশান।

সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

অনেক দূরে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে দুজন লোক যাচ্ছিল, হাততালি দিয়ে তাদের ডাকলাম।

কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, গিডনী স্টেশন এখান থেকে কত দূর ?

একজন বলল, তা মাইল সাতেক হবে।

সাত মাইল ! কাল রাতে এই দীর্ঘ সাত মাইল কি করে হেঁটে এলাম, তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগল।



এতটা পথ ফিরব, দেহে এমন শক্তি নেই। অথচ ফিরে আমাকে যেতেই হবে।

খুব ধীর পদক্ষেপে এগোতে আরম্ভ করলাম। নিজেকে বোঝালাম, কাল রাতে যা ঘটেছে, নিজের চোখে যা দেখেছি, সবই আমার মনের কল্পনা। কোন কারণে ভয় পেয়েছিলাম, ভয় থেকেই মনগড়া মেয়েটির মূর্তি জন্ম নিয়েছে।

গিডনী স্টেশনে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আর আমার দাঁড়াবার মতন অবস্থা নয়।

বোধ হয় অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, চোখ খুলে দেখলাম আমার চারপাশে ছোট একটা জনতা।

যাও, যাও, ভীড় কর না এখানে।

স্টেশন মাস্টার লোকজন সরিয়ে দিয়ে আমার হাত ধরে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন। পোর্টারকে বলে এক গ্লাস গরম দুধ এনে মুখের সামনে ধরলেন।

দুধ খেয়ে অনেকটা চাঙ্গা হলাম।

স্টেশন মাস্টারকে প্রশ্ন করলাম, বম্বে এক্সপ্রেস কি ছেড়ে দিয়েছে?

না। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চক্রধরপুর থেকে ট্রলি করে কর্তারা আসছেন। তাঁরা কথা দিলে তবে গাড়ি ছাড়বে। কিন্তু আপনি কে, ওই শ্মশানে কি করছিলেন?

শ্মশানে কি করে গেলাম, স্টেশন মাস্টারকে সবিস্তারে বললাম।

সব শুনে তিনি শিউরে উঠলেন।

সর্বনাশ, আবার সেই রেবা সোমের ব্যাপার।

রেবা সোম? সে কে?

বছর দুই আগের ঘটনা। এই বম্বে এক্সপ্রেসেই। যাত্রীর ছদ্মবেশে কয়েকজন ডাকাত মেয়েকামরায় উঠেছিল। তাদের আগাগোড়া বোরখা ঢাকা। হঠাৎ রাত্রে তারা বোরখা খুলে পিস্তল ছোরা নিয়ে মহিলাদের সামনে দাঁড়াল।

সর্বনাশ তারপর?

সবাই অর্থ, অলংকার সব খুলে দিল, কেবল চোদ্দ পনের বছরের একটি মেয়ে রুখে দাঁড়াল। না, কিছু দেব না। এখনই শিকল টানব।

শিকল আর তাকে টানতে হয়নি। একটা ডাকাত তার গলাটা সাঁড়াশির



●
অনেক দূরে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে দুজন লোক যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের ডাকলাম। [পৃঃ ৪৭
●

মতন হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরল, তারপর নিস্পন্দ দেহটা কামরার জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল।

তারপর প্রায়ই রেবা সোমকে দেখা যায়। কখনও কামরার ভিতরে, কখনও জানলার বাইরে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে।

ভয় পেয়ে অনেকে অনেকবার চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে।

তাহলে আমি যাকে দেখেছিলাম—

নিঃসন্দেহে সে রেবা সোম। আপনার ভাগ্য খুব ভাল মশাই, প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছেন। আর একবার লাইন মেরামত হচ্ছিল, ট্রেন আধঘণ্টার জন্য থেমেছিল। একটি কলেজের ছোকরা আপনার মতন ট্রেন থেকে নেমে মাঠে দাঁড়িয়েছিল। ব্যস, তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার। টর্চ জ্বেলে অনেকে নেমে পড়ে দেখে, ছেলেটি পড়ে আছে। গলায় দশ আঙুলের ছাপ। শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

লোকের ধারণা কোন দুর্বৃত্ত ওৎ পেতে ছিল, সুযোগ বুঝে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছে।

আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিনি।

দুর্বৃত্তই যদি ছেলেটিকে মারবে, তাহলে তার পকেটের ব্যাগ, হাতের ঘড়ি এসব ঠিক থাকবে কি করে? কেউ কাউকে বিনা উদ্দেশ্যে কখনও হত্যা করে?

অবশ্য কেবল রেবা সোম ছাড়া। তার আত্মা প্রতিহিংসা নেবার জন্য হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব পুরুষ মানুষের প্রতি তার ক্রোধ, ঘৃণা। কারণ পুরুষ মানুষের দ্বারাই সে নিহত হয়েছে, এবং তার চরম বিপদে কোন পুরুষ মানুষ তাকে রক্ষা করতে ছুটে আসেনি।

সেবারে ঘাটশিলায় আর নামিনি। কোথাও নামতে সাহস হয়নি।

সোজা কলকাতায় ফিরে এসেছি।

অবসর সময়ে নিজের মনের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, যা কিছু ঘটেছে সব মিথ্যা, মনের কল্পনা। ভূতের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার চারপাশে ঠাণ্ডা একটা বাতাসের বলয় অনুভব করেছি। হাত থেকে এক গোছা কাচের প্লেট ভেঙে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমনই শব্দ করে কে যেন হেসে উঠেছে।

রেবা সোম বুঝি বলতে চেয়েছে, ওরে অবিশ্বাসী, আমরা আছি। অর্থহীন যুক্তি দিয়ে আমাদের উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

ক্রমে যেন বিশ্বাসের বাঁধন শিথিল হয়ে আসছে। রেবা সোম আছে, তারা চিরদিন ছিল, থাকবেও—এই সত্যই স্বীকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

———



বড়লাট ও এক বেয়াদপ বাঘ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

তখন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব। আমরা যাঁকে বড়লাট বলতুম, তিনি কিন্তু ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর প্রতিনিধি অর্থাৎ ভাইসরয। তিনিই রাজা বা রানীর নামে ভারত শাসন করতেন। এমনি ভাইসরয বা বড়লাট একজন ছিলেন লর্ড রিডিং।

তখন এদেশে রাজামহারাজাদের যুগও বটে। অনেক ছোট-ছোট রাজ্য ভারতে ছিল। সেখানে ইংরেজ শুধু বার্ষিক কয়েক লাখ টাকা কর নিয়েই খুশী থাকত। তাদের ভেতরের ব্যাপারে নাক গলাত না। এই রকম একটা ছোট্ট রাজ্য ছিল গোয়ালিযর।

রাজামহারাজারা সব সময় ইংরেজ বড়লাটকে বেজায় খাতির করে চলতেন। কিসে তিনি খুশী হবেন, তার খোঁজখবরও নিতেন। নিজের রাজ্যে নেমন্তন্ন করে আনতেন তাঁকে। খুব ধুমধড়াক্কা পড়ে যেত। উৎসব হত। এতে বেশ কয়েক লাখ টাকাও খসে যেত নিশ্চয়। কিন্তু তাতে কী? বড়লাট খুশী হলে রাজত্ব চালানো নির্ঝঞ্ঝাট হয়। ইংরেজের দাপট তখন সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। বাঘ আর গরুকে

একঘাটে জল খাওয়ানোর ক্ষমতা ইংরেজ ছাড়া তখন কারই বা আছে? তাকে চটানোর সাহস কোথায়?

নতুন বড়লাট লর্ড রিডিংকে গোয়ালিয়রের মহারাজা তাই নেমন্তন্ন করলেন। আর বড়লাট বলে কথা। একা তিনি তো আসছেন না, আসছে তাঁর পাত্রমিত্র সভাসদ দেহরক্ষী বাবুর্চি খানসামা মিলিয়ে কয়েকশোজন। রাজ্যে হইহই পড়ে গেল। খানা-পিনা, গানবাজনা, বাজি পোড়ানো, আদিবাসীদের নাচ, কুস্তিগীরদের কুস্তি, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, তীরন্দাজদের তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতা—কিছুই বাদ পড়ল না। মহারাজার একটা চিড়িয়াখানা ছিল। সেখানে পোষা বাঘ ছিল কয়েকটা। বাঘে মানুষে লড়াই দেখানোও হল।

একটা চারদিক ঘেরা ছোট্ট স্টেডিয়ামে বাঘেমানুষে লড়াই দেখতে দেখতে লর্ড রিডিং হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,—মহারাজা, ওটা কি সত্যিকার বাঘ?

মহারাজা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন,—কেন—কেন ইওর এক্সেলেন্সি? (বড়লাটদের সম্মান জানাতে ইওর এক্সেলেন্সি বলা হত)

লর্ড রিডিং আরও গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনি বলেছিলেন, এই বাঘগুলো বাচ্চা থেকে বড় করা হয়েছে আপনার চিড়িয়াখানায়। কসরত শেখানো হয়েছে। তাই এরা কখনও সত্যিকার বাঘ হতে পারে না। সত্যিকার বাঘ জঙ্গলে থাকে।

মহারাজা মাথা চুলকে বললেন—ঠিক বলেছেন ইওর এক্সেলেন্সি!

বড়লাট একটু হেসে বললেন—মহারাজা, আমি একটা সত্যিকার বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখতে চাই।

বড়লাটের মোসাহেবরা অমনি এক সুরে বলে উঠল—অবশ্যই, অবশ্যই! মহারাজার পক্ষে এ আর কঠিন কী? এ তো খাসা প্রস্তাব।

মহারাজা মনে মনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। সর্বনাশ, জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়াই করার সাহস তাঁর কোন্ কুস্তিগীরের হবে? আর সে তো মরাবাঁচার লড়াই। কেবল সিং নামে পালোয়ানটি এতক্ষণ পোষা বাঘের সঙ্গে যা করল, তা শেখানো কসরত মাত্র। বাচ্চা বয়স থেকে বাঘটাকে ওই রকম তালিম দেওয়া হয়েছে। কেবল সিং কি জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি সত্যিকার লড়াই করতে রাজী হবে? খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন মহারাজা। কিন্তু বড়লাটকে বিমুখ করাও তাঁর পক্ষে কঠিন। তাই মুখে খুব

উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন—এ আর কঠিন কথা কী ইওর এক্সেলেন্সি? খুব হবে। আজই ব্যবস্থা করে ফেলছি।

কেবল সিংকে চুপিচুপি ব্যাপারটা জানাতেই কিন্তু সে রাজী হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকে বনে-জঙ্গলে ঘুরে সে মানুষ। কত বাঘ সে বর্শা বা টাঙির আঘাতে মেরেছে। আবার বন্দুকবাজ শিকারী হিসেবেও তার নাম আছে। একবার পাগলা হাতির কবল থেকে সে অনেক মানুষকে বাঁচিয়েছিল—এমনি অব্যর্থ তার বন্দুকের টিপ। এদিকে কুস্তিগীর পালোয়ান হিসেবেও সারা ভারতে সে নাম কিনেছে। সে বলল—চিন্তার কারণ নেই হুজুর। সে আমি পারব। কিন্তু আগে বড়লাটবাহাদুরকে জিগ্যেস করুন, তিনি দৃশ্যটা দেখতে পারবেন তো? নাকি পয়লা রাউণ্ডেই ভিরমি খাবেন? সত্যিকার বাঘ কিন্তু সত্যিকার হাঁক দেয়। তখন কানের পর্দা ফাটবে না তো?

মহারাজা জিভ কেটে বললেন—চুপ, চুপ। কে শুনতে পাবে।

কেবল সিং হাসতে হাসতে সরে গেল। মহারাজা তখন মন্ত্রণাসভা ডাকতে গেলেন। আয়োজনটা সহজ নয় মোটেও। গোয়ালিয়রে জঙ্গল তখন অনেক, বাঘও ছিল অসংখ্য। কিন্তু বড়লাটের সামনে লড়াইটা ঘটানো নিয়েই যত সমস্যা। দিনের আলোয় বাঘ বেরোবে না। বেরোলেও লড়াইটা তারিয়ে তারিয়ে বড়লাটকে দেখতে দেবে কিনা, সে তার মর্জি। তাছাড়া বড়লাটকেও অক্ষত শরীরে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আছে।

অনেক পরামর্শ হল। কিন্তু কিছু ঠিক করা গেল না। তখন ডাকা হল রাজ্যের বনবিভাগের বড় অফিসারকে। তাঁর নাম কর্নেল কেশরী সিং। দুর্দান্ত শিকারী তিনি। তলব পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে সব শুনে বললেন—আচ্ছা, দেখা যাক্।

কর্নেল কেশরী সিং কিন্তু কেবল সিংয়ের গুরু। গুরুশিষ্যে পরামর্শ হল। রাজ্যের জঙ্গল এলাকায় এখন ম্যানইটার বা মানুষখেকো বাঘ থাকলে বেশী হাঙ্গামা করতে হত না। কিন্তু শেষ মানুষখেকোটি গত মাসে কর্নেল সিং মেরে ফেলেছেন। এখন কিছু গরুচোর বাঘ নানা এলাকায় আছে। তারা তো নেহাত চোর। তাই যেমন ধূর্ত, তেমনি গা বাঁচিয়ে চলাফেরা করতে ওস্তাদ। দিনে তাদের লেজের ডগাটিও দেখতে পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। জ্যান্ত ছাগল বা মোষের টোপ বেঁধে রাখলেও দিনদুপুরে সে ব্যাটা হামলা করবে না। এলে সেই সন্ধ্যাবেলায়।

হঠাৎ কেবল সিং বলে উঠল—স্যার, এখন তো বাঘের সঙ্গী খোঁজার ঋতু?



মহাবাহু। ভভ েট বললেন—চুপ, চুপ [পৃঃ ৫৩]

—তাই তো! বলে কর্নেল সিং লাফিয়ে উঠলেন। এমন সহজ রাস্তা থাকতে বাঁকা রাস্তায় ঘুরে মরছিলেন!

কেবল সিং জঙ্গলে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটানোর ফলে নানা জন্তুর ডাক অবিকল নকল করতে পারত। এপ্রিল মাসে পুরুষবাঘ সঙ্গিনীর খোঁজে জঙ্গল তোলপাড় করে। আবার স্ত্রীবাঘও সঙ্গীর খোজে ভীষণ ডেকে বেড়ায়। কেবল সিং বাঘের ডাক ডাকলে নিশ্চয় কোন না কোন বাঘ এসে হাজির হবে। তখন সে লড়াই দেবে। আর, এজন্যে তাকে বাঘের ছাল গায়ে ঠিকঠাক পরে অবিকল বাঘ সাজতে হবে। ভেতরে কিন্তু থাকবে পাতলা ইস্পাতের পোশাক। পায়ে ও হাতের আঙুলে ধারালো ইস্পাতের নখও থাকবে। মুখ ও মাথাতেও ইস্পাতের টুপি ও মুখোশ পরতে হবে। শুধু চোখদুটো বিশেষ ধরনের শক্ত কাচে ঢাকা থাকবে। তাছাড়া তো এর ওপর বাঘের চামড়া বসানো রইলই।

কর্নেল সিং জানতেন, মাইল পনের দূরে খের খো নামে একটা গ্রামে লোকেরা কদিন থেকে একটা বাঘের ডাক শুনতে পাচ্ছে। দিনদুপুরেই ডাকে বাঘটা। তার ফলে ভয়ে চাষীরা মাঠে যেতে পারছে না। রাখালরা গরু-মোষ চরাতে যেতে ভয় পাচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারছে না কেউ।

ঠিক হল, সেখানেই বাঘেমানুষে লড়াই দেখবেন মহামান্য বড়লাট বাহাদুর।

খের খো গ্রামটা একটা নদীর ধারে। খো মানে ঘোড়ার খুর। ওখানে নদী ঘোড়ার খুরের মতো বেঁকে গিয়েছে। তাই গ্রামটার চেহারা ওরকম এবং নামও খের খো। চারদিকে পাহাড়ী রুক্ষ পরিবেশ। বড় বড় পাথর, কাঁটা ঝোপ আর ক্ষড়াখর্কুটে মেখু গাছের ঘন জঙ্গল। গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে যেখানে বাঘটাকে শেষবার ডাকতে শোনা গিয়েছে, সেখানে খাড়া পাথরের দেয়াল নদীতে নেমেছে। ওপরে পাহাড়ের কিছু অংশ ওইসব ঝোপ জঙ্গলে ভরা। পাহাড়ে অনেক গুহা আছে। কর্নেল সিংয়ের মনে হল, বাঘটা কোন গুহাতেই সম্ভবতঃ থাকে।

কিন্তু কাছাকাছি তেমন কোন ফাঁকা সমতল জায়গা পাওয়া গেল না, যেখানে বাঘেমানুষে লড়াই হবে। সবখানেই পাথর, ঝোপঝাড়, উঁচুনীচু জমি। সবচেয়ে বড় কথা, বড়লাট নিরাপদে বসে লড়াই দেখবেন, এমন জায়গা তো চাই। যদি বা কোথাও সমতল কিছু ফাঁকা জায়গা মিলল তো কাছাকাছি কোন উঁচু গাছ নেই যাতে মাচান বাঁধা হবে বড়লাটের জন্য। কেউ কেউ বললেন, বড় বড় শালকাঠ পুঁতে উঁচুতে টাওয়ার তৈরি করা হোক। কিন্তু ওই পাথুরে মাটিতে শাবল দিয়ে গর্ত করতে পুরো মাস কাবার হয়ে যাবে। অত সময় কোথায় বড়লাটের?

কর্নেল সিং নদীর ধারে পাহাড়টার ওপর দাঁড়িয়ে ওপারটা লক্ষ্য করছিলেন। ওপারেও পাহাড় রয়েছে। নদীর ধারে অজস্র নলখাগড়া জাতের জঙ্গল গজিয়েছে। তাছাড়া পাহাড়টা এপারের মতো রসকষহীন নয়, শুকনো ঘাস আর গাছপালাও রয়েছে। হঠাৎ সেখান থেকে একটা বাঘের গর্জন ভেসে এল।

কী কাণ্ড! বাঘটা তাহলে ওপারে রয়েছে। কর্নেল সিং তক্ষুণি ওপাশের উপত্যকায় নেমে এলেন মহারাজের কাছে। মহারাজা দলবল নিয়ে উৎসাহে চলে এসেছেন। বড়লাট তখন হাতির পিঠে একটু দূরে অপেক্ষা করছেন।

বিরক্ত হলেন কর্নেল সিং। এর কোন মানে হয়? সব ঠিকঠাক করে খবর যাবে, তবে তো ওঁরা আসবেন।

মহারাজা বললেন—হিজ এক্সেলেন্সি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনটা না হলে আর উনি থাকবেন না। তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করে ফেলো কর্নেল সিং।

কর্নেল সিংয়ের মনে পড়ল, যে পাহাড়টায় এখন দাঁড়িয়েছিলেন, তার ওপাশে নদীর দিকে একটা চাতালমতো আছে। তার দুহাত নীচে নদীর জল। ওই চাতালে বসলে বাঁদিকে হাত তিরিশ দূরে একটা বালির চড়া চোখে পড়ে। চড়াটা আন্দাজ

পনের হাত চওড়া, কুড়ি হাত লম্বা। তার চারদিকে একসার নলখাগড়া ও শরের জঙ্গল রয়েছে। কিন্তু চাতালটা থেকে জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়।

চাতালটা নিরাপদ হবে বড়লাটের পক্ষে। কর্নেল সিং মহারাজাকে তাঁর মতলবটা জানিয়ে দিলেন। বড়লাটকে খবর পাঠানো হল তক্ষুণি।

কেবল সিং বাঘ সেজে তৈরী হয়ে সেই বালির চড়ায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। কর্নেল সিং পাহাড়ের ওপর থেকে ইশারা দিলে কেবল সিং বাঘের ডাক ডাকবে।

বড়লাট লর্ড রিডিং কিন্তু নিরস্ত্র বসতে চান না। বনের বাঘকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই সঙ্গে একটা রাইফেল নিলেন। শুধু মহারাজা ছাড়া আর কাকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন না। মহারাজা বড়লাটের দেখাদেখি একটা রাইফেল নিলেন। তারপর কর্নেল সিং দুজনকে সাহায্য করলেন চাতালে বসতে।

এবার কর্নেল সিং ওপরে গিয়ে ইশারা দিলেন কেবল সিংকে। অমনি কেবল সিং বাঘের ডাক ডেকে উঠল। বার তিনেক ডাকার পর ওপারের পাহাড় থেকে বাঘটার পালটা ডাক ভেসে এল। নদীর ওপর দিয়ে এসে ডাকটা পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল দ্বিগুণ জোরে। মনে হল একসঙ্গে কয়েকশো কামান গর্জাল। পাহাড়ের ওপর বড়লাট ও মহারাজার পাত্রমিত্র মোসাহেবরা হামাগুড়ি দিয়ে বসেছিলেন কর্নেল সিংয়ের নির্দেশে। সত্যিকার বাঘের ডাক শুনে তাঁদের অবস্থা হল শোচনীয়। ঠকঠক করে কেউ কাঁপতে শুরু করলেন, কেউ দিশেহারা হয়ে গড়াতে গড়াতে পাথর আঁকড়ে ভিরমি খেলেন। সে এক করুণ অবস্থা। বেচারা কর্নেল সিং যত তাঁদের চাপা ধমকান, তত তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। কেউ ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেললেন—বাঘটা যদি বড়লাট বাহাদুরকে ধরে ফেলে, রাজত্ব চালাবে কে?

ওদিকে কেবল সিং আর ওপারের বাঘটা পালটাপালটি ডাকাডাকি করছে। গর্জনে-গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে সবার। মহারাজা আর বড়লাট পাথরের বেদীর ওপর একেবারে দুটি পাথরের মূর্তি—তবে দাঁড়ানো নয়, অদ্ভুত ভঙ্গীতে হুমড়ি খেয়ে বসে রয়েছেন। কর্নেল দূরবীনে চোখ রেখে ওঁদের দেখলেন। ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু এখন হাসির সময় নয়। ভয় হচ্ছে, বড়লাটবাহাদুর আবার জলে না পড়ে যান। খুব কাছে থেকে বনের বাঘের ডাক শুনে নার্ভ ঠিক রাখার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে।

হঠাৎ দেখা গেল, বাঘটা ওপার থেকে নদীর জলে নামল। খুব আশা জাগল

এবার। বাঘেমানুষে লড়াই আসন্ন। ভয়ের সঙ্গে উত্তেজনায় এখন প্রতিটি চোখ বড় হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এ কী! বাঘটা যে বালির চড়ার দিকে যাচ্ছে না। সোজা চলে আসছে পাথরের চাতালটার দিকে—যেখানে মহারাজা আর বড়লাট বসে রয়েছেন! সর্বনাশ! প্রমাদ গণলেন কর্নেল সিং। ওঁদের নিরাপদে রাখার দায়িত্ব তো তাঁরই।

তিনি তক্ষুণি দৌড়ে নামতে শুরু করলেন চাতালটার দিকে। ততক্ষণে বাঘটা তরতর করে চলে এসেছে। চাতালটার প্রায় হাত পনের দূরে তার প্রকাণ্ড মাথাটা শুধু জলে ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কর্নেল সিং রুদ্ধশ্বাসে বললেন—ইওর এক্সেলেন্সি। বাঘ, বাঘ! গুলি করুন!

লর্ড রিডিং বড়লাটী মেজাজে বললেন—এমন তো কথা ছিল না, বাপু! আমি বাঘেমানুষে লড়াই দেখব বলেছিলাম। নিজে লড়াই করব, তা তো বলিনি!

—ইওর এক্সেলেন্সি! বাঘটা এখন খুব হিংস্র অবস্থায় আছে। কারণ সে সঙ্গীর ডাক শুনে আসছে। গুলি করুন, শীগগির!

লর্ড রিডিং খাপ্পা হয়ে বললেন—যেমন তোমরা, তেমনি তোমাদের দেশের বাঘ! এমন তো কথা ছিল না! ইউ শুড কিপ ইওর প্রমিজ! তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি রাখছ না!

তখন বাঘটা মাত্র হাত দশেক দূরে চলে এসেছে। এসময় বাঘের মেজাজ ভীষণ হিংস্র থাকে। ওর চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল সিং মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন—বাঘটা আপনার ওপর হামলা করতে আসছে ইওর এক্সেলেন্সি!

কী! ভারতের বড়লাট বাহাদুরের ওপর হামলা করবে ওই তুচ্ছ একটা নেটিভ বাঘ? লর্ড রিডিং এবার সেই ঔদ্ধত্য টের পেয়েই রাইফেল তুলে বাঘটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলেন—পরপর দুবার। কিন্তু বাঘটার কিছুই হল না। গুলি লাগলই না।

কর্নেল সিং চেঁচিয়ে উঠলেন—মহারাজা, মহারাজা!

মহারাজা এতক্ষণ বেকুব বনে গিয়েছিলেন। এবার রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপলেন। ক্লিক করে একটু আওয়াজ হল। গুলি বেরলো না। ব্যাপার কী? দেখা গেল, গুলি আদতে ভরাই হয়নি।

তখন তিনি কোটের পকেটে হাত পুরে একটা কার্টিজ বের করলেন। সেটা রাইফেলে ঠেসে ফের ট্রিগার টিপলেন। হা হতোস্মি! রাইফেল জ্যাম হয়ে গেল যে?

হন্তদন্ত হয়ে খুলে দেখেন, কোথায় কার্টিজ? আসলে পকেট থেকে যেটা বের করে রাইফেলে পুরেছেন, তা একটা হুইস্‌ল্‌।

ওদিকে বড়লাটের কাছে আর বাড়তি গুলি নেই। কারণ, তিনি তো গুলি করার জন্য তৈরী হয়ে আসেননি—এসেছেন বাঘেমানুষে লড়াই দেখতে। মহারাজাও তাই। এদিকে কেশরী সিংও তাঁর রাইফেল আনেননি সঙ্গে। চাতালে নামবার সময় একবার ভেবেছিলেন ওটা নিয়ে আসবেন। কিন্তু বড়লাটবাহাদুরের কাছে তাঁর বিনি হুকুমে রাইফেল হাতে যাওয়া বেয়াদপির শামিল। এখন উপায়?

তখন বাঘটা মাত্র হাত পাঁচেক দূরে জলের মধ্যে ডাঙা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর গা নাড়া দিয়ে জল ঝাড়ছে। তারপর সে সামনে তিনটি কাকতাড়ুয়া মূর্তি দেখে একবার ঘাড় কাত করে সাংঘাতিক একখানা হালুম ঝাড়ল। যেন বলল—কে রে বেয়াদপ? পথ আগলে বসে আছিস, তোদের সাহস দেখছি কম নয়।

মহারাজার হাতে একটি ছড়িও ছিল। রাইফেলের বদলে ছড়ি তুলে তিনি রাজকীয় হুংকারে বলে উঠলেন—যা, যা! ভাগ! ভাগ! তফাত যা!

বাঘটা চুপচাপ জলে দাঁড়িয়ে বড়লাটকে দেখছিল। এতক্ষণে যেন হাসির ভঙ্গীতে হাঁ করল। তার ধারাল দাঁতগুলো দেখে ভয় পেয়ে বড়লাট চেঁচিয়ে উঠলেন—গেট আউট, গেট আউট!

পাহাড়ের চূড়ায়—ওঁদের ঠিক মাথার ওপরেই দেহরক্ষী আর পাত্রমিত্ররা এতক্ষণে যেন টের পেল, কী ঘটছে। তারাও একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করল—গেট আউট, গেট আউট!

একসঙ্গে ওপরে ও নীচে এই বিকট চ্যাঁচানি শুনে বাঘটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর ভারী বেজার হয়ে শেষ ডাক ছেড়ে ঘুরল। ফের জলে নামল। তারপর ধীরে সুস্থে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই সাঁতার কেটে চলল। একটু পরে তাকে ওপারে উঠতে দেখা গেল। এক লাফে সে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হল।

এবার পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নদীর জলে গুলি ছুড়তে শুরু করেছে বড়লাটের দেহরক্ষীরা। সব গুলি শেষ করে তারা চেঁচাতে চেঁচাতে বড়লাট বাহাদুরের কাছে দৌড়ে আসতে থাকল। লর্ড রিডিং তখনও সমানে চেঁচাচ্ছেন—গেট আউট, গেট আউট!

কর্নেল সিং হাসবেন না কাঁদবেন ঠিক করতে না পেরে আস্তে আস্তে চলে গেলেন

সেই বালির চড়াটার দিকে। আশ্চর্য তো, কেবল সিং এতক্ষণ চুপ করে আছে তো আছেই। তার ঘন ঘন বাঘ-ডাক ডাকা উচিত ছিল। তাহলে বাঘটা ফিরে ওর দিকেই চলে যেত। কাজেই এত কাণ্ডের জন্যে কেবল সিংই দায়ী। কেন সে তখন হঠাৎ চুপ করে গেল?

কর্নেল গিয়ে দেখেন, কেবল সিং বাঘের বেশে বালিতে উপুড় হয়ে পেটে হাত চেপে পড়ে আছে। কী ব্যাপার? উদ্বিগ্নমুখে দৌড়ে গেলেন কর্নেল।—কেবল সিং, কেবল সিং! কী হয়েছে?

না—তেমন কিছু হয়নি। কেবল সিং তখন থেকে কেবল হাসি সামলেছে, তাই পেট ব্যথা করছে। পেট ব্যথা নিয়ে কি কেউ বাঘের ডাক ডাকতে পারে? কর্নেল ধমক দিয়ে বললেন—কিন্তু ওদিকে বড়লাট ক্ষেপে গেছেন যে।

কেবল সিং করুণ মুখে বলল—এক কাজ করলে বরং ওঁর ইচ্ছেটা মিটত স্যার?

—কী কেবল সিং?

—আমার মতো আরেকজন মানুষ অবিকল বাঘ সাজলে আমি তার সঙ্গে লড়াই করতুম। বড়লাট মজাসে দেখতেন। কোন ঝামেলাও হত না!

তাও তো বটে। কর্নেল সিং বললেন—চমৎকার প্রস্তাব! কিন্তু আগে এটা মাথায় খেললে ভাল হত। রোস, সে ব্যবস্থা করেই মহারাজার মুখরক্ষা করা যাক। বড়লাট বাহাদুরের সাধ মিটুক। কাকেও জানতে না দিলেই হল যে বাঘটা সত্যিকার বাঘ নয়।

একেই বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। দুজনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন বড়লাট ও মহারাজার কাছে।

কিন্তু বড়লাট তখন একেবারে রেগে কাঁই। তিনি কিনা ব্রিটিশ সিংহের প্রতিনিধি, আর নগণ্য এক ভারতীয় বাঘ তাঁর সামনে বেয়াদপি করে নিস্তার পাবে? ফেলো তাঁবু, আনো কার্তুজ! ওই বেযাদপটাকে টিট না করে লর্ড রিডিং আর রাজধানী দিল্লীতে ফিরবেন না।

সাজো সাজো রব পড়ে গেল। দেখতে দেখতে সেই অসমতল উপত্যকাতে তাঁবু পড়ল অগুনতি। মহারাজা লোক পাঠিয়ে কয়েক বাক্স বুলেট আনিয়ে দিলেন। সব চেয়ে সেরা রাইফেলটি হাতে নিয়ে লর্ড রিডিং বাঘটাকে কোতল করতে তৈরী হলেন।

মণিদীপা

কর্নেল সিং আর কেবল সিং ছাড়া আর কে বড়লাটের বাঘ শিকারে সাহায্য করবে? সন্ধ্যার আগে দুজনে নদীর ওপারে গিয়ে একটা জুতসই জায়গা খুঁজে বের করলেন। একটা মস্তো বট গাছ ছিল পাহাড়ের খাঁজে। তার ডালে মজবুত মাচান বাঁধা হল।

বট গাছের বিশ-তিরিশ হাত তফাতে পাহাড়ের গায়ে কিছু ঢালু কিছু সমতল খানিকটা ঘাসে ঢাকা জমি ছিল। জমিটা একেবারে ফাঁকা। সেখানে শক্ত করে গোঁজ পুঁতে একটা হৃষ্টপুষ্ট মোষের বাচ্চা বাঁধা হল।

বট গাছটার ডাইনে কিছু দূরে একটা বড় মেথু গাছ ছিল। তার ডালে বাঁধা হল আরেকটা মাচান।

এবার বড়লাট আর মহারাজাকে নিয়ে কর্নেল কেশরী সিং আর পালোয়ান কেবল সিং ওপারে চললেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে! হালকা গোলাপী রোদের শেষ ছটাটুকু নদীর জল থেকে মুছে যাচ্ছে। নৌকোটা ওঁদের চারজনকে ওপারে পৌঁছে দিয়েই চলে এল।

বট গাছের মাচানে বসেছেন লর্ড রিডিং আর কর্নেল সিং, মেথু গাছের মাচানে বসেছেন মহারাজা আর কেবল সিং। কথা আছে—বড়লাট বাদে আর কেউ গুলি করবেন না। তবে বড়লাট যদি হুকুম দেন, সে আলাদা কথা।

সন্ধ্যার আবছায়া নামছিল নির্জন পাহাড়ী জঙ্গলে। পাখির ডাকও থেমে গেল কখন। মোষের বাচ্চাটাকে চুপচাপ ঘাস খেতে দেখা যাচ্ছিল। ক্রমশঃ তাকেও আবছা দেখাল। এবার কেবল সিং বাঘের ডাক ডাকবে।

কর্নেল শিস দিতেই সে কথামতো বাঘের ডাক ডেকে উঠল। মোষের বাচ্চাটা অমনি মুখ তুলে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর খুব কাছে থেকেই সেই বেয়াদপ বাঘটা সাড়া দিল। তার প্রচণ্ড গর্জনে পাহাড় কেঁপে উঠল। মোষের বাচ্চাটা লাফালাফি শুরু করেছে তখন। অন্ধকার ঘন হচ্ছে দ্রুত। কিন্তু সামনে ওদিকের পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে। দুমিনিটের মধ্যেই ফিকে জ্যোৎস্না এসে অন্ধকারটুকু মুছে ফেলল। হ্যাঁ, দিব্যি দেখা যাচ্ছে, বেয়াদপ বাঘটা ধীরে সুস্থে ফাঁকা জায়গাটায় আসছে। এসে সে মোষের বাচ্চাটার সামনে দাঁড়াল। বেচারা মোষের বাচ্চা তখন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফোঁস ফোঁস করতেও ভুলে গিয়েছে।

কর্নেল সিং অবাক্ হয়ে দেখলেন, লর্ড রিডিং রাইফেল তুলছেন না। তাই ফিসফিস করে বললেন—গুলি করুন ইওর এক্সেলেন্সি!



[illegible]

বড়লাট ফিসফিস করে বললেন—আমার শিক্ষা অন্য রকম হে! মড়িতে না বসলে বাঘকে গুলি করতে নেই। বড় শিকারীদের কাছে শুনেছি।

বাঘটা কিন্তু মোষের বাচ্চাটার সামনে তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এ খুব অদ্ভুত ব্যাপার।

কর্নেল সিং দেখলেন, সুযোগ চলে যাচ্ছে। তাই ফিসফিস করে বললেন—ইওর এক্সেলেন্সি, এরপর আর সুযোগ পাবেন না।

বড়লাট রেগেমেগে বললেন—থামো তো বাপু! মড়িতে বসুক।

বাঘটা এবার গাছের ডালে মানুষের ফিসফিসানি টের পেল। এদিকে মুখ তুলে একখানা সরেস হালুম ঝাড়ল।

অমনি বড়লাট নার্ভাস হয়ে তাড়াহুড়ো করে পরপর দুবার ট্রিগার টিপে দিলেন। একটা গুলি গিয়ে মোষের বাচ্চাটার গায়ে লাগল। সেটা ঘাড় দুমড়ে পড়ে গেল। আর বাঘটা একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

আর পস্তে লাভ নেই। বড়লাট ক্ষুব্ধভাবে বললেন,—এ রাইফেলের নলের মাছিটা ভুল জায়গায় রয়েছে। তা না হলে বেয়াদপটা কি বেঁচে যায়?

কর্নেল সিং বললেন—ঠিক বলেছেন ইওর এক্সেলেন্সি!

—চলো, নামা যাক। আজ রাতে ব্যাটা আর আসবে না।

অগত্যা তাই। সিঁড়ি নামানো হল। বড়লাট নামছেন, কর্নেল মইটা ধরে রয়েছেন—পাছে টাল না খায়। হঠাৎ দেখা গেল, বাঘটা আবার একলাফে মরা মোষের কাছে এসে হাজির হল। বড়লাটকে কিছু বলার আগেই তিনি তখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মহারাজকে ডাকছেন।—মহারাজা, মহারাজা! নেমে আসুন!

বাঘটা গ্রাহ্যও করল না। অমন তাজা ভোজ তাকে উপহার দিয়েছেন বড়লাট বাহাদুর। সে হাপুস হুপুস করে খেতে ব্যস্ত।

চাঁদের আলোয় মাত্র হাত পঁচিশ তিরিশ তফাতে দাঁড়িয়ে লর্ড রিডিং হাঁ করে বাঘটার বেয়াদপি দেখতে লাগলেন।

এদিকে তাঁর রাইফেল তখন কর্নেল সিংয়ের হাতে, কিন্তু কার্তুজ বড়লাটের পকেটে।

ওখানে অন্য মাচান থেকে মহারাজা আর কেবল সিং হতভম্ব হয়ে সব দেখছেন। বড়লাটের গুলি করার হুকুম না পেলে তো গুলি করা যাবে না।

কিন্তু বড়লাট কী বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছেন, ভাবতেই গা শিউরে উঠল কর্নেলের। সিঁড়ি বেয়ে তিনি নেমে এসে রাইফেল তুলে দিলেন। ইশারায় কার্তুজ ভরে গুলি করতে বললেন।

লর্ড রিডিং রাইফেলটা নিলেন মাত্র। কোন ব্যস্ততা দেখালেন না। ওদিকে বাঘটা এত কাছে মানুষের উপস্থিতি বরদাস্ত করতে পারছিল না। মাঝে মাঝে খেতে খেতে ঘাড় ঘুরিয়ে গজরাতে লাগল। তারপর মোষটার ঘাড়ে কামড়ে টানতে টানতে

ঝোপে ঢুকল। বোধহয় চক্ষুলজ্জার ব্যাপার। মানুষজনের সামনে কি হ্যাংলার মতো খাওয়া যায়? হাজার হলেও সে তো জঙ্গলের রাজা।

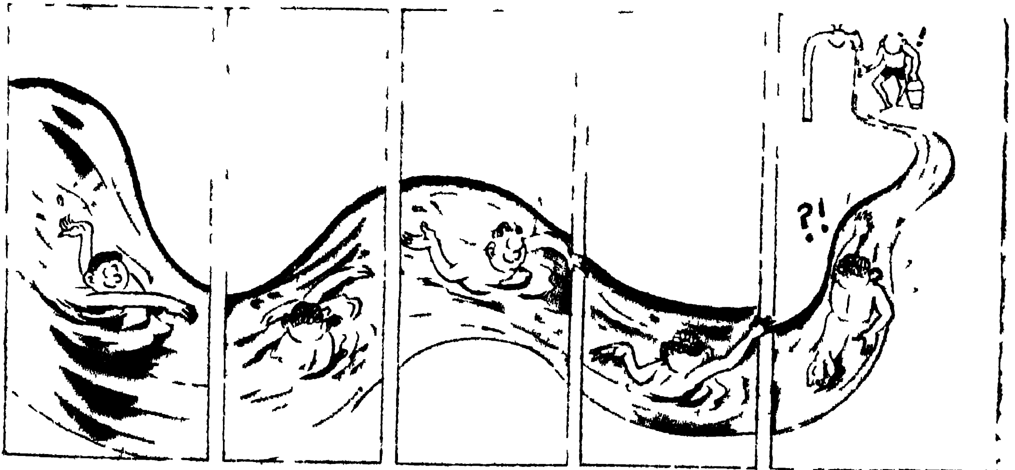
কর্নেল সিং এবার মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন—বাঘটা যে মড়ি নিয়ে পালাল ইওর এক্সেলেন্সি!

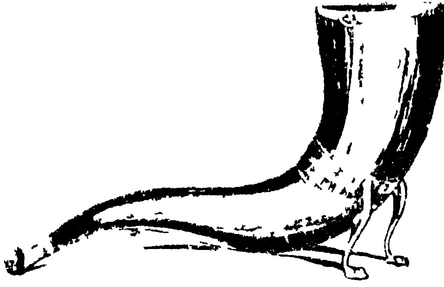
লর্ড রিডিং গম্ভীর—বেজায় গম্ভীর হয়ে বললেন—আরে, তোমাদের সবই দেখছি পোষা ট্রেণ্ড্ বাঘ।

পরে লর্ড রিডিং বিলেতে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—এ দেশেব করদ রাজ্যের রাজামহারাজাদের মতো ধূর্ত আর নেই। তারা মহামান্য ভাইসরয়দের আমন্ত্রণ জানান শিকারে। ভাইসরয় মহোদয়রা বাঘ মেরে নিজেদের বীরত্বে গর্বিত হন। কিন্তু জানেন না যে ওসব বাঘ আসলে রীতিমতো ট্রেণ্ড্ অথাৎ শিক্ষিত বাঘ। সাকাসে যেমন থাকে। এতদিন ভারতে থেকে একটি সত্যিকার বাঘের লেজও আমি দেখলুম না। তাই বন্ধু, তোমাকে আগেভাগে সতর্ক করে দিচ্ছি। যে ভারতীয় মহারাজা তোমাকে শিকারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁকে বোলো—ওসব নকল বাঘ শিকারে তোমার আনন্দ নেই। তখন ওঁর মুখের অবস্থা দেখলে তোমার হাসি পাবে। দেখবে, সব ধূর্তামি ফাঁস হয়ে গেলে মানুষের মুখটা কেমন হাস্যকর খড়িতে আকা মুখের মতো দেখায়।

— —

● **সাঁতরে যায় নদীর মুখে**





জয় শিঙার জয়

পূরবী দেবী

সম্পত্তি নিয়ে দুজন লোকের মধ্যে বিবাদ বেধেছে। একজন বলে এ সম্পত্তি আমার, ওর কোন অধিকার নেই। অন্যজন বলে, দাবি করলেই হল। সব মিথ্যে কথা। আমার দখলে যখন আছে তখন এ আমার সম্পত্তি।

তর্কাতর্কিতে যখন বিবাদের মীমাংসা হয় না তখন তারা আদালতের আশ্রয় নেয়।

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের অধিকার প্রমাণ করবার জন্য কোন দলিল আছে?

যে দলিল দেখাতে পারে বিচারক তাকেই মালিক বলে রায় দেন। কিন্তু দলিলের বদলে যদি সে ফুঁ দিয়ে বাজান একটা শিঙা বার করে বলে, হুজুর এই আমার দলিল, বিচারক কি সে প্রমাণ গ্রহণ করবেন?

না।

কিন্তু শিঙা যে একবার দলিলের মত কাজ করেছে এ নজির ইতিহাসে আছে। আজ সেই ঘটনাই বলছি—

প্রায় হাজার বছর আগেকার ঘটনা। ১০১৬ সাল। ইংলণ্ডের উপর নর্মান আক্রমণের পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

ডেনমার্কের অধিপতি ছিলেন রাজা ক্যানুট। আর ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন আয়রন-সাইড। দুই রাজা সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ। ইংলণ্ডের রাজাকে হারাবার জন্যে রাজা ক্যানুট গুপ্তচর উইলিয়াম পুষিকে শত্রুপক্ষের গোপন সংবাদ নিয়ে আসার ভার দিলেন। রাজার আদেশ পালন করবার জন্যে পুষি মেষপালকের ছদ্মবেশে শত্রুশিবিরে ঢুকে সব খবর নিয়ে এলেন। পুষির কাছ থেকে ইংলণ্ডের রাজার যুদ্ধ-কৌশলের গোপন খবর পেয়ে ক্যানুট যুদ্ধ-ব্যবস্থায় সেই মত আয়োজন করলেন। যুদ্ধে ক্যানুট ইংলণ্ডের আক্রমণ প্রতিহত করে সেবারের মত রক্ষা পেয়ে গেলেন। এই যুদ্ধ বিজয়ের সব কৃতিত্ব উইলিয়াম পুষির। তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রাজা ক্যানুট যে জমিতে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন সেই জমিটা পুষিকে দিয়ে দিলেন আর প্রমাণস্বরূপ দিলেন একটা সোনার শিঙা যার দাম প্রায় এক মিলিয়ন ডলার।

একশ বছরের মধ্যে পুষির বংশ লোপ পেয়ে গেল। পুষির বংশের শেষ বংশধর নিজের ভাগ্নেকে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে দেয়। ভবিষ্যতে যখন এই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন লর্ড চ্যান্সেলারের হাতে ক্যানুটের দেওয়া শিঙাটা তুলে দেওয়া হয়। শিঙার গায়ে লেখা ছিল ক্যানুট উইলিয়াম পুষিকে এই শিঙাটা দিয়ে জমি দখল করার অধিকার দিচ্ছে।

কোর্টে শিঙা দলিলের জয় হল একথা বলাই বাহুল্য।

* রিপ্লে থেকে



হা হা করে পৈশাচিক হাসি হেসে...দীর্ঘ মাংসহীন হাত বাড়িয়ে দিল।

আবার ভূত—পৃঃ ৪৭



তিমির পেটে মানুষ

বীরু চট্টোপাধ্যায়

(রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা)

কে কবে শুনেছে এমন তাজ্জব এক বিস্ময়কর ঘটনা! প্রথমটা শুনলে সত্যি সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হয়। বলে কি? এও নাকি সম্ভব!

অথচ সত্যি সত্যিই সম্ভব হয়েছিল। এবং ঘটেছিল এই লোমহর্ষক ঘটনা।

একটা জলজ্যান্ত মানুষকে গিলে খেয়ে ফেলেছিল এক বিশালকায় তিমি। এটা অবশ্য এমন কিছু পরমাশ্চর্য ঘটনা নয়, এ ধরনের ব্যাপার আকচার না হলেও মাঝে মাঝে যে না ঘটে তা নয়।

তবে এ কাহিনীর পরম বিস্ময়কর অংশ হল যে উক্ত মানুষটি তিমির পেটের মধ্যে নিদারুণ ৬০ ঘণ্টা অসহনীয় অবস্থানের পর বেঁচে ফিরে এসে তাঁর সেই অকল্পনীয় বীভৎস অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছিল।

কাহিনীর শুরু ইকোয়েটার-এর দক্ষিণে সমুদ্রের ওপর ভাসমান তিমি-শিকারী জাহাজ "স্টার অব দ্য ঈস্ট"-এর মধ্যে।

হ্যামিশ নামে একটি শিক্ষানবীশ ছেলে ডেকে দাঁড়িয়ে কি একটা কাজ করছিল। সহসা এক তীব্র আর্তচিৎকারে সচকিত হয়ে সে যে দৃশ্য দেখলো তাতে তার সর্বাঙ্গ প্রথমটা অবশ হয়ে গিয়ে, পরমুহূর্তে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলো, ঘটনার বীভৎসতায়।

তার চোখের সামনে ২০০ ফুট উচ্চ মুল মাস্তুলের ওপর থেকে একটা মানুষ হাত পিছলে পড়ে, আশে পাশে প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে খেতে, ডেক-এর ওপর আছড়ে পড়ে, হাড় গোড় ভেঙ্গে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের এক তালগোল পাকানো ভয়াবহ শব-এ পরিণত হল।

এ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ছেলেটির অনিবার্যভাবে বমনোদ্রেক হল। সে দুহাতে চোখ ঢেকে প্রায় কেঁদে উঠলো।

—এই বোকা ছেলে, ত্রেপলটা ধর। ঐ নির্বোধটার মৃতদেহ মুড়ে ফেলি।—ধমকের সুরে বলে উঠল পাশে দাঁড়ানো হারপুন-নিক্ষেপকারী (তিমি-শিকার অস্ত্রবিশেষ) জেমস বার্টলে, অতো দুর্বল মন নিয়ে সমুদ্রে চলাফেরা করা যায় না, বুঝলে ছোকরা! ওর জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই হে, ব্যাটাকে কতবার বলা হয়েছে সতর্ক ও সাবধান হতে কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য করেনি।

অপর এক নাবিক বললে, ব্যাপারটা বড়ই অশুভ ঠেকছে। সাত দিন ধরে আমাদের মাস্তুলের ওপরকার নিরীক্ষণকারী নাবিকের নজরে একটাও তিমি পড়লো না। তার ওপর একজন কাজের লোকের অপঘাতে মৃত্যু হল।

হারপুন-নিক্ষেপকারী বার্টলে বললে বালক হ্যামিশকে, বুঝলে ছোকরা, বুকটাকে পাষাণ করে তোল। ইস্পাতের মত শক্ত করে ফেলো। তবেই প্রকৃত তিমি-শিকারী হয়ে উঠবে। দুর্বল হয়েছ কি গেছ, তাহলেই জানবে মৃত্যু অনিবার্য।

জেমস বার্টলে প্রকৃতই একজন দুর্ধর্ষ নাবিক ও সুদক্ষ তিমি-শিকারী। বিপুলদেহী এই মানুষটির যেমন দেহবল তেমনি মনোবল। চরম বিপদের মুখে এবং জরুরী অবস্থায়ও তার কর্মক্ষমতা এবং শান্ত বিচারবুদ্ধি সত্যিসত্যি বিস্ময়কর, তিমি শিকারের হাজারো বিপদসংকুল জীবন-মৃত্যুর মাঝে, বার্টলে একজন যারপরনাই নির্ভীক সৈনিক।

'স্টার অব দ্য ঈস্ট' সমুদ্রে ভেসে ভেসে এগোচ্ছে। দিন চারেক বাদে, মাস্তুলের

ওপরের নিরীক্ষণকারী নাবিক চিৎকার করে ওঠে, ঐ যে ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে এক অতিকায় তিমি। স্টার বোর্ডের দিকে (জাহাজের ডানদিকে) তিন পয়েণ্ট-এ। মাইল দুয়েক দূর দিয়ে তিমিটা ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে ভেসে যাচ্ছে!

শোনামাত্র সাজ সাজ হইহই পড়ে গেল তিমি শিকারী নাবিকদের মধ্যে। ছ'জন করে এক একটি দল ছোট ছোট নৌকো সমুদ্রে নামাবার জন্য প্রস্তুত হল। উত্তেজনায় সবাই অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল।

কুড়ি ফুট দীর্ঘ আর পাঁচ ফুট চওড়া এই নৌকো ঐ অতিকায় তিমি শিকারের পক্ষে যেন হাস্যকরভাবে ছোট মনে হয়। কিন্তু এই-ই নিয়ম, এই প্রচলিত নৌকো পদ্ধতিতেই ঐ দানবাকৃতি জলজন্তুটিকে শিকার করা হয়ে থাকে।

হারপুন-নিক্ষেপকারী জেমস বার্টলে সামনের গলুইতে বসে পজিসন নিল। একজন বসেছে পেছনের হালে। পাঁচজন জোয়ান ছেলে ১৮ ফুট দীর্ঘ দাঁড় প্রাণপণে বেয়ে বেয়ে নৌকো নিয়ে যাচ্ছে ঐ দূরে ভেসে যাওয়া অতিকায় স্পার্ম জাতীয় তিমিটার দিকে।

জাহাজ থেকে হ্যামিশ ছেলেটি সে দিকে তাকিয়ে ছিল, আর মনে মনে আক্ষেপ করছিল, কবে তাকে এই পরম রোমাঞ্চকর শিকারে অংশগ্রহণ করতে দেবে বার্টলে।

···কালো রঙের বিপুল পিঠওয়ালা তিমির খুব কাছাকাছি এসে গেল নৌকোটি। জেমস বার্টলে প্রস্তুত হযে গেল। ব্র্যাকেট থেকে হারপুন বের করে, শক্ত করে হ্যাণ্ডেল ধরে, ছোঁড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নৌকো আরও কাছে এগিয়ে গেল।

তিমিটার বিশাল গায়ে সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ কিছু লেগে রয়েছে। শুয়োরের মত তার চোখ দুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সমস্ত অঙ্গ ইস্পাতের মত বারেক শক্ত হয়ে উঠল জেমস বার্টলের। পরক্ষণে বিদ্যুৎবেগে হারপুন নিক্ষেপ করলো সে বিশাল জলজন্তু তিমিটার দিকে। হিট! চমৎকার হিট হয়েছে। একেবারে গেঁথে গেছে।

উন্মত্তের মত প্রবলভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল ছোটখাটো পর্বতের মত ঐ তিমিটা। সমুদ্রজল যেন উথাল পাথাল হয়ে উঠল চোখের নিমেষে। চতুর্দিকে শুধু ঢেউ আর ফেনা।

● শৈকৃ চ.ট্টোপাধ্যায়

টাল খেয়ে গিয়েও সামলে নিল সুদক্ষ শিকারী জেমস্ বার্টলে। কালক্ষেপ না করে সঙ্গে সঙ্গে লৌহ বর্শারূপী দ্বিতীয় হারপুনটিও নিক্ষেপ করল সে। হিট! এবারও নিখুঁতভাবে সেই মোক্ষম অস্ত্র গিয়ে গেঁথে গেল অতিকায় তিমিটার কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গে।

সে ভীষণ সামুদ্রিক আলোড়ন বর্ণনার বাইরে। কুড়ি ফুটের নৌকোটা যেন মোচার খোলার মত উথালি পাথালি করতে লাগলো। "পেছন দিকে—শীগগির পেছন দিকে দাঁড় টান।" ফার্স্ট মেট চিৎকার করে আদেশ দেয়। "প্রাণ বাঁচাতে হলে দূরে সরে চলো।"

আহত তিমিটা অসহ্য বেদনায় ও প্রচণ্ড ক্রোধে মোচড় খেতে খেতে যেন উন্মত্ত হয়ে গেল। ওলটপালট খেয়ে সে সহসা লম্বা ডুব দিল সমুদ্রগর্ভে।

পরমুহূর্তে আচমকা সেটা ভুস্ শব্দে জলে ভেসে উঠলো ফের। নিদারুণ বেদনা-কাতর তিমিটার মুখটা হাঁ হয়ে গিয়ে বিরাট গহ্বর দেখা দিল, অসংখ্য করাল দাঁত ঝিকমিক করে উঠলো।

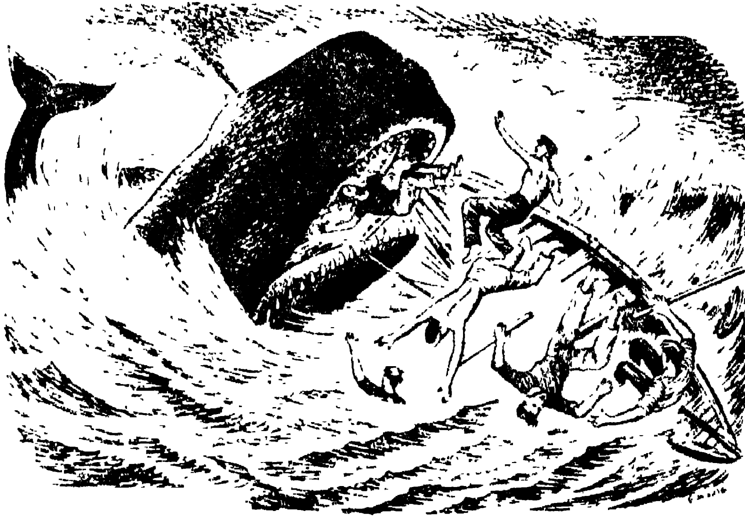
তারপর সে নৌকোটার দিকে বীভৎস নিষ্ঠুর ও হিংস্র দুই চোখের দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো। তা দেখে অসমসাহসী এইসব শিকারী নাবিকদেরও ভয়ে আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেল।

মেট এর পর এক লাইন কথাই মাত্র উচ্চারণ করতে সক্ষম হলঃ লাফিয়ে পড। লাফিয়ে পড় সমুদ্রে বৎসগণ। দানব ব্যাটা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।

জলে লাফ দিয়ে পড়ে নাবিকরা সেযাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল। অবশ্য তারা দেখতে পেল না কিভাবে সেই অতিকায আহত তিমিটা মুহূর্তমধ্যে নৌকোটাকে বিরাট মুখ দিয়ে চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

জেমস্ বার্টলেও অপরাপর নাবিকদের সঙ্গে লাফ দিয়েছিল জলে পড়বার জন্য কিন্তু তিমি দেহের ধাক্কায় প্রথমে নৌকোটা শূন্যে উঠে কাত হয়ে গেল। জেমস-এর দেহও শূন্যে উঠে গেল। আর অবিশ্বাস্য গতিতে তিমিটা বিরাট হাঁ করে মানুষটাকে শূন্য থেকেই মুখে পুরে নিল।

সমুদ্রজলে ভাসমান অপরাপর নাবিকরা সভয়ে ছানাবড়া চোখ নিয়ে দেখলো, কিভাবে, নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত সুদক্ষ হারপুন-নিক্ষেপকারী জেমস বার্টলে তিমির মুখের মধ্যে পড়ে, তার পেটে নিমেষে ঢুকে গেল। তাদের চোখে পড়ল বার্টলের সাংঘাতিক ভয় পাওয়া মুখ। আর কানে এল তার বুকফাটা অন্তিম আর্তনাদ। হায় হায়,



তিমিটা বিরাট হাঁ করে [illegible] শুদ্ধ নৌকোকেই মুখে পুরে নিল পৃঃ ৬৮

নিমেষে অদৃশ্য হয়ে, শেষ হয়ে গেল প্রিয়জন মানুষটা। ততক্ষণে তিমিটার বিরাট হাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। সব শেষ। জলের প্রলয় কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে এল! তিমি ফের টানা ডুব দিল সমুদ্রগর্ভে।

দ্বিতীয় নৌকোটা কাছে গিয়ে এবার জলে পড়া নাবিকদের তুলে নিয়ে ফিরে এল, স্টার অব দ্য ঈস্ট জাহাজে।

হ্যামিশ দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। সান্ত্বনা দিয়ে বুড়ো ক্যাপ্টেন বললে, কেঁদ না বৎস। জেমস খুব বেশী কষ্ট পায়নি, ঐ দানবটার নারকীয় পাকস্থলীতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটেছে। আর এ ধরনের দুর্ঘটনা খুবই বিরল। লাখেও একটা হয় না। অতএব অযথা ভয় পেও না বৎস।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কিছু তিমি দৃষ্টিগোচর হল। এবার সমস্ত নাবিকরা দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অনেকগুলি তিমিকে বধ করে ফেললো, বদলা নেওয়ার ভঙ্গিতে।

সন্ধ্যের পর জাহাজের ডেক-এ সমস্ত নাবিকরা বিষণ্ণ মুখে জমায়েত হল। ক্যাপ্টেন

বাইবেল থেকে কয়েক লাইন পড়ে জেমস বার্টলের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করল।

পরদিন সকালে সামনে কিছুদূরে সমুদ্রবক্ষে দেখা গেল একটা বিশাল তিমির দেহ ভাসছে। ফুলে উঠেছে দেহটা। দেখে মনে হয় বেশী দিনের মড়া নয়।

জাহাজের ক্রেনের সাহায্যে সেই ১০০ টনের দানব দেহটাকে টেনে ডেক-এর উপর তোলা হল। তিমির দেহের চর্বি কেটে নেওয়ার জন্য কজন নাবিক এই ছোট-খাট পিছলে-পাহাড়ের ওপর কাঁটাওয়ালা জুতো পায় দিয়ে উঠে, খণ্ড খণ্ড করে বিরাট বিরাট চর্বির চাঁই কেটে ফেলতে লাগলো।

শুধু একটা নয় অনেকগুলো তিমির দেহেই এই ধরনের কসাই-এর কাজ চললো চর্বি সংগ্রহের জন্য পুরো ৪৮ ঘণ্টা ধরে। রক্তে রসে জাহাজের ডেক সাংঘাতিক পেছল ও দুর্গন্ধময় হয়ে উঠলো।

শিক্ষানবীশ ছেলে হ্যামিশের মনে প্রথম পাক খেলো কথাটা। সে ক্যাপ্টেনকে বলে উঠল, স্যার সম্ভবতঃ এইটেই সেই তিমি যেটা মিঃ বার্টলেকে গিলে খেয়েছিল।

—না না সেটাকে তো এখান থেকে বহু দূরে হারপুন মারা হয়েছিল। এত দূরে তার মৃতদেহ আসবে কি করে? স্কিপার জবাব দেয়।

কথাটা অবশ্য আদৌ মনে ধরলো না ফার্স্ট মেট-এর। সে বললে, না স্যার, হয়ত এটাই সেই তিমি। কেন না এটার দেহে দুটো হারপুনের আঘাত রয়েছে এমন জায়গায়, আমার যতদূর স্মরণ আছে, ঠিক তেমনি স্থানেই মিঃ বার্টলে হারপুনের আঘাত হেনেছিলেন সেদিন।

হ্যামিশ বায়না ধরে, এটার পেট চিরে ফেলা হোক স্যার। তাহলে হয়ত মিঃ বার্টলের মৃতদেহটা এখনও সেখানে পেতে পারি।

মেট বুঝি প্রথমটা একটু ভয় পেল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন তার। ক্যাপ্টেন যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করেছেন, সে মানুষের মৃতদেহ······কি জানি কি ভয়ংকর বিকৃত হবে তার রূপ······সে আত্মা এখন প্রেতাত্মা বনে গেছে অবশ্যই······

উপস্থিত সকলে অজানা অজ্ঞাত নামহীন এক ভয়ে সাময়িক বুঝি নির্বাক্ নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এবার পক্ককেশ বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল, যদি বালকের সন্দেহ সত্যি হয়, তাহলে সত্য উদ্‌ঘাটন করা হবে আমাদের পক্ষে মহান ক্রিশ্চান-কর্তব্য।

তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু হয়ে গেল। কয়েকজন নাবিক তীক্ষ্ণ ও বিশাল ছুরিকা নিয়ে পাহাড়সদৃশ সেই অতিকায় তিমির কণ্ঠ থেকে তলপেট পর্যন্ত, প্রাণপণ পরিশ্রমে, চিরে ফেলতে লাগলো ঘর্মাক্ত কলেবরে।

অবিশ্বাস্য রকম বড় সেই পাকস্থলী উন্মোচিত করতে নাবিকদেরও দানবীয় শক্তি প্রয়োগ করতে হল।

কর্তব্যরত নাবিকটি এবার সংস্কারবশতঃই বুঝি মাথা নত করে অস্ফুটে কি প্রার্থনা করল, বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলো, অতঃপর ছুরির এক প্রচণ্ড টানে পাকস্থলীর শেষ দেওয়াল ভেদ করে ফেললো।

রক্তাক্ত প্রচুর তরল পদার্থ ছিটকে এসে পড়ল তার গায়ে। আরে! এই তো··· আর কোন কথা বের হল না নাবিকটির। বিস্ময় ও ভীতিবিহ্বল চাউনিসহ সে দেখলো পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে স্পষ্ট একটি রক্তমাখা মনুষ্য দেহের আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

আরও কয়েকটি ছুরির আঘাতে পাকস্থলীর শেষ পেশীসমূহ কেটে, একদা যে ছিল জেমস বার্টলে নামে পরিচিত এক মানুষ, তার দেহটাকে টেনে বের করে আনবার জন্য প্রস্তুত হল!

—খুব হুঁশিয়ার, খুব সতর্কভাবে ওকে বের করবে বৎসগণ, গুরুগম্ভীর বিষাদ-মাখা কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে।

ভয়ংকর এক দৃশ্যের অবতারণা হল। মিঃ বার্টলের সারা দেহটি সম্পূর্ণ ঢেকে রয়েছে তিমির গাঢ় রক্তে। তার মুখের অভিব্যক্তি নিদারুণ বেদনায় ভয়াবহ বিকৃত।

বালক হ্যামিশ হাঁটু গেড়ে বসে মিঃ বার্টলের রক্তমাখা কবজি ধরে সহসা চেঁচিয়ে উঠল, স্যার মিঃ বার্টলে এখনো জীবিত আছেন। আমি তাঁর নাড়ীর স্পন্দন পাচ্ছি।

—অ্যাঁ! বলো কি? ওরে জল! গরম জল নিয়ে আয় এক্ষুণি। ক্যাপ্টেন উত্তেজনায় কেঁপে ওঠেন, ঈশ্বরের কৃপায় হয়ত জেমস বেঁচে যেতে পারে।

অতীব যত্নসহকারে ওরা জেমস-এর সারাদেহ পরিষ্কার করে ধুয়ে দিল। হাত ও পায়ে ম্যাসেজ করে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধিতে সাহায্য করল।

এইভাবে রিলে করে পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা ধরে চললো মালিশ ও ম্যাসেজ। তারপর এক সময় মিঃ বার্টলে কেশে উঠল এবং মৃদুকণ্ঠে গোঙাতে লাগলো। অবশেষে সহসা সে উঠে বসলো। চোখ দুটো তার সাংঘাতিক ভয়ে আতঙ্কে যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। অকস্মাৎ সে পিলে চমকানো এক জান্তব আর্ত চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার শুনে নাবিকদের রক্ত জল হয়ে এল। তাদের সন্দেহ হল যে বার্টলের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।

বহুদিন পর্যন্ত জেমস বার্টলে কাউকে চিনতে পারল না। ক্যাপ্টেনের কেবিনের এক বাঙ্কে তাকে বেঁধে শুইয়ে রাখা হল। বালক হ্যামিশ রইল তার শুশ্রূষায়।

ইংলণ্ডে ফিরে আসবার মুখে সমুদ্রপথে বার্টলে কখনো আধা জ্ঞান কখনো দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সে চিৎকার করে মাঝে মাঝেই বলতো তার সর্বদেহ যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে নারকীয় কোন এক অগ্ন্যুৎপাতে।

—আমায় একা ফেলে যেও না, হ্যামিশের হাত আঁকড়ে ধরে সে শিশুর মত কেঁদে উঠত, বলত ঐ ভয়াবহ অন্ধকার যেন আমায় গ্রাস না করে। উঃ আমায় ওরা উনুনে পুড়িয়ে মারতে চাইছে।

কোথায় সেই অপরিসীম নির্ভীকতা, যে বিপদকে একদা হেসে উড়িয়ে দিত, তার স্থলে ভীতসন্ত্রস্ত সূর্যাস্তে আতঙ্কগ্রস্ত একটি অদ্ভুত ভীরু মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

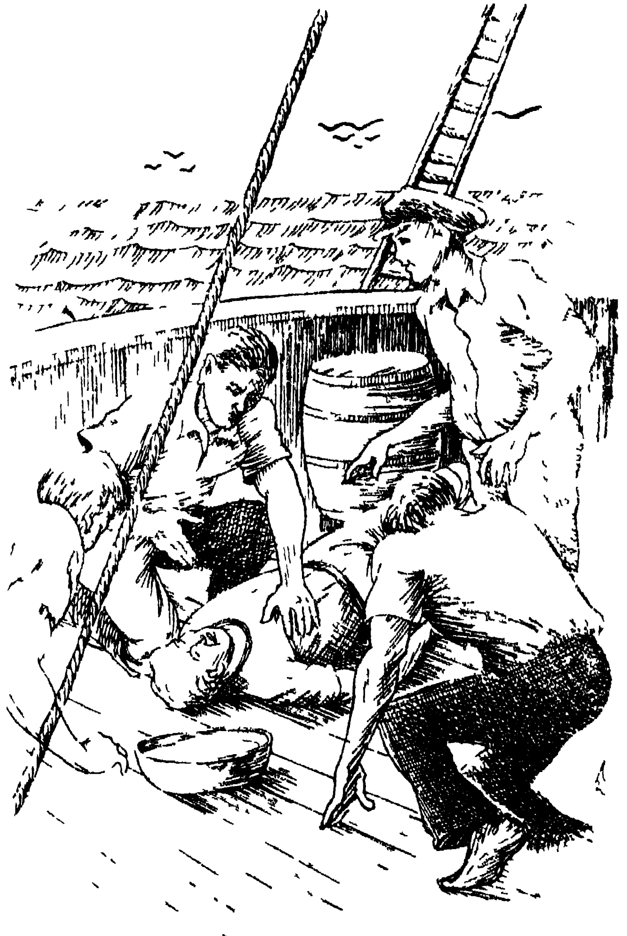
এরপর বাকী জীবন বার্টলে আর ভালভাবে ঘুমতে পর্যন্ত পারেনি। অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল সে। তবে তাকে ফের কোন দিন জাহাজে ওঠাবার বা সমুদ্র-দর্শন করাবার কথা উচ্চারণের শক্তি বুঝি এ দুনিয়ায় কারুর ছিল না।

এবার জেমস বার্টলের নিজের ভাষায় শোনা যাক।

—এখনো মনে আছে নৌকো থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে যাই, তারপর যেখানে গিয়ে পড়ি, মনে হয় পায়ের তলাটায় যেন কি এক অতি নরম তুলতুলে বস্তু রয়েছে।

আমি উপর দিকে চাইতে দেখি বিস্তৃতাকার লাল ও সাদা মেশানো একটা চাঁদোয়ার আচ্ছাদন যেন নীচের দিকে নেমে আসছে আমাকে আবৃত করে। পর-মুহূর্তে আমি অনুভব করি, আমি যেন নীচের দিকে এক গহ্বরের মধ্যে উপুড় হয়ে

পড়ে নেমে যাচ্ছি, মাথাটা আগে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম তিমিটা আমায় গিলে নিচ্ছে।



ওরা জেমস-এর সারা দেহ বিস্তার করে ধুয়ে দিল। পৃঃ ৭২

আমাকে কে যেন অদৃশ্য এক টানে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়ে নিচ্ছে, টেনে নিচ্ছে, আমার দেহের চতুর্দিকে নরম পেছল ধরনের মাংসের দেওয়াল অনুভব করতে পারছিলাম। বেশ যেন চাপ দিচ্ছিল, অবশ্য সে চাপ তেমন কঠোর চাপ নয়, তাতে ব্যথা পাচ্ছিলাম না আদৌ। সামনের দিকের নরম সেই মাংসের দেওয়াল আমার দেহের সামান্যতম ধাক্কায় খুলে খুলে পথ করে দিচ্ছিল।

অকস্মাৎ আমি গিয়ে পড়লাম বিরাটকায় একটা যেন থলের মধ্যে। আমার দেহের চেয়ে অনেক বড় সেই থলের অভ্যন্তরটা নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকার।

আমি হাত চালিয়ে চারদিকে অনুভব করলাম অনেক মাছ। তাদের কয়েকটি মনে হল তখনও জীবিত রয়েছে। সেগুলো আমার হাতের ভেতর থেকে পিছলে গিয়ে আমার পায়ের কাছে জমা হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আমার মাথার ভেতর প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করলাম। নিঃশ্বাস নিতে ক্রমশঃই কষ্ট হচ্ছিল। একই সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভূত হল, সাংঘাতিক গরম। মনে হল এই অকল্পনীয় উত্তাপরাশি আমায় পুড়িয়ে রোস্ট করে ফেলবে। (তিমির গায়ের সাধারণ উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রী)

মাথার মধ্যে আমার চোখ দুটি যেন জ্বলন্ত কয়লার চুল্লিবিশেষ মনে হল। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছিলাম, আমি তিমির পেটে ঢুকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছি। অচিরেই আমার মৃত্যু হবে। মরুভূমির দ্বিপ্রহরের বালির উত্তাপ যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

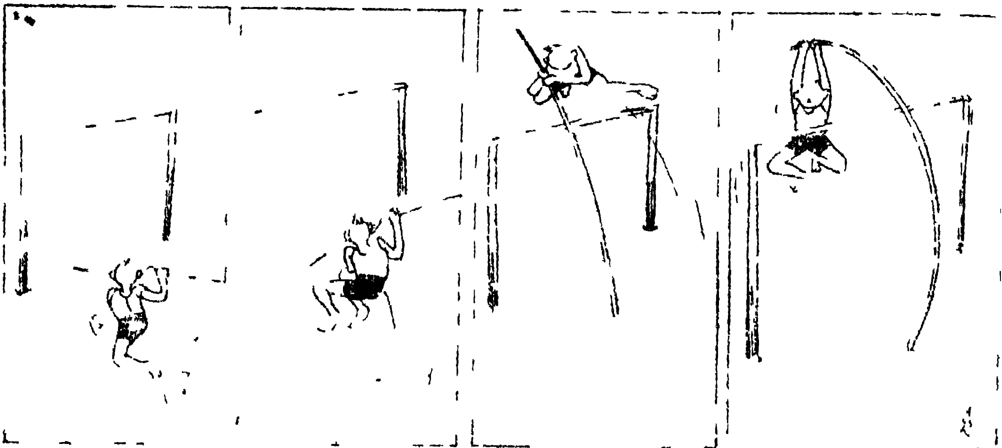
মৃত্যুভয় এবং ভয়ংকর দুঃসহ নৈঃশব্দ আমায় যেন পাগল করে তুললো। আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম হাত পা নাড়াতে, চেষ্টা করলাম প্রবল আর্ত-চিৎকার করতে। কিন্তু তার কোনটাই আমার দ্বারা সম্ভব হল না। আমার সর্বদেহ যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। তবে দেখে আশ্চর্য হলাম যে তখনো আমার মস্তিষ্ক কাজ করে যাচ্ছিল ঠিক। তাই নিজের নিদারুণ ও ভয়াল পরিণামের কথা ভাবতে ভাবতে আমি একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

* * * *

এই কাহিনীটি যখন প্যারিসের "জারনাল দ্য ডিবাটস্" নামক সাময়িকীতে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সারা বিশ্বে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

এও নাকি সম্ভব? অতিকায় এক স্পার্ম তিমির পেটের মধ্যে সুদীর্ঘ ৬০ ঘণ্টা বাস করে কোন মানুষ ফের ফিরে এল জীবিতাবস্থায়, এ ঘটনা এ সংসারে বুঝি নিরবধিকালে একবারই সংঘটিত হয়।

● **লাঠির চালাকি**



একনাথ

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

●



সাধু একনাথ তীর্থে চলেন
রামেশ্বরের পথে,
সারাটি জীবন ধরে সেধেছেন
মানব সেবার ব্রতে।
সাথে চলে তাঁর সঙ্গী ক'জনা,
মাথায় কলস ভারি,
প্রয়াগ হইতে নিয়ে চলেছেন
পূত গঙ্গার বারি।
রামেশ্বরের পূজা করিবেন
ঢালি জাহ্নবী জল,
সাথে মিশাইয়া হৃদয় গলানো
ভক্তি, বিল্বদল।
চলেছেন সাধু তদ্গত চিত্ত, জলে ভিজে, রোদে পুড়ে,
পুলকের বেগে অবিরত তাঁর দুইটি নয়ন ঝুরে।
ছিন্ন চরণ, ছিন্ন বসন, ক্লান্ত, শীর্ণ দেহ,
আহার করেন আপনা হইতে যদি কিছু দেয় কেহ।
রামেশ্বরের কাছাকাছি এসে সাধুর চক্ষে পড়ে,
তপ্ত বালুতে গর্দভ এক বুঝি তৃষ্ণায় মরে।



তাড়াতাড়ি তিনি গাধার মুখেতে
ঢালেন গঙ্গা জল,
সঙ্গীরা বলে, তীর্থযাত্রা
হ'ল তব নিষ্ফল।
প্রয়াগ হইতে বহিয়া আনিলে
জাহ্নবী জল ভাই,
শিবের সলিল গর্দভে দিলে
এ দোষের ক্ষমা নাই।
তোমার ভাগ্যে রামেশ্বরের
দর্শন পাওয়া ভার,
ঘরে ফিরে যাও, আমাদের সাথে
মিছে আসিও না আর।
হাসি একনাথ বলেন সবারে,
সত্য বলেছ ভাই,
আমার চক্ষে জীবে আর শিবে
ভেদাভেদ কিছু নাই।
গাধার মাঝারে দেবাদিদেবেরে দেখেছি মিথ্যে নয়,
রামেশ্বরের পূজা যে আমার পথেই পূর্ণ হয়।
কষ্টে আমার শিব এসেছেন জীবরূপে পূজা নিতে,
জীব-শিবে পূজি ফিরে যাব ঘরে আমি যে হৃষ্ট চিতে।

গুণধর গণু

নারায়ণ দেবনাথ














খাতামে এখুনো একঠো কেস ভি লিখা হোয়নি। ফির বিটমে টহল লাগাই।


ক্যা হুয়া।


ওঃ, চাকাটা পেয়ে গেছি! বাবা ওটা ওখানে ছুঁড়ে ফেলেছে!

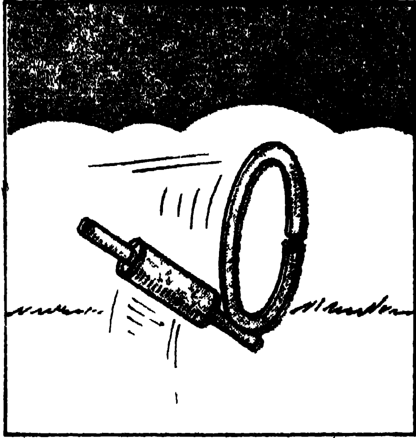

আলতু ফালতু কোই বাত শুনেগা নেহি। ফির এইসা হোবে তো গিরেপতার কোরে লিযে যাকে!

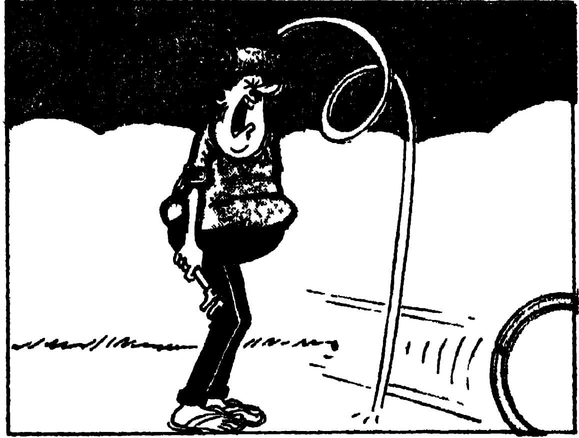

এবারে চাকা আমাকে আর কোন ঝামেলায় ফেলতে পারবে না।
অ্যাঁ! আমার চাকা ভেঙে দিলো!


শিগগিরিই আবার একজস্ট পাইপটা লাগিয়ে ফেলতে পারবো।
কুক! কি সুন্দর একটা পাইপ!


সহজে বেঁকে গিয়ে বেশ সুন্দর চাকা তৈরি হয়ে গেলো।


কি ব্যাপার? আমার একজস্ট পাইপটা কোথায় গেলো?






আমার একজস্ট পাইপ— বেঁকিয়ে গোল করা!
এখান থেকে কেটে পড়ি!


জলের পিপের এই লোহার বেড়টা দিয়ে খাসা চাকা চালানো যাবে।
রাস্কেলটা গেলো কোথায়?


ব্যস খুলতে পেরেছি
উঁও।


হাতে পেলে হতচ্ছাড়ার কান আমি এটা দিয়ে টাইট করে দেবো।


এবার চমৎকার চাকা পেয়েছি! এতেই সুন্দরে কাজ চলে যাবে।


আআকগ্হ্!




পয়েলেবার ওয়ারণিং দিয়েছিলম। ইবারে ফাটকে যেতে হোবে।
ডন্টার সঙ্গে রেস দেবার জন্যে এবারে সবচেয়ে সেরা চাকা পেয়েছি — বাবার টায়ার!



রাজকুমার মৈত্র

॥ এক ॥

এ বছর কি লিখব ভাবছি এমন সময় ছোটমামার একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে আমাকে আচ্ছা করে গালমন্দ দিয়ে লিখছে, হাবু, আমার নামে যদি আজে বাজে কিছু লিখিস তবে সত্যি করে বলছি আমি তোর নামে কেস ঠুকে দেব। যদি প্রাণে ভয় থাকে তবে খবরদার কিছু লিখবি না। আর যদি মনে করে থাকিস আমি ইয়ারকি করছি তবে যত পারিস লেখ পরে টের পাবি মজা। আমায় পা ধরে কান্নাকাটি করলেও ছাড়ব না।······

চিঠিটা পড়ে যুদ্ধে নেমে পড়লাম। অর্থাৎ ছোটমামাকে লিখলাম, ছোটমামা, এবারকার মত ক্ষমা করিস। বানিয়ে বানিয়ে তোর নামে আর একটা গল্প লিখে ফেলেছি। ঠিক আছে কথা দিচ্ছি আর কখনো লিখব না। বগলামামাকে তোর মনে আছে নিশ্চয়। সেই বগলামামাকে তুই কি করে জব্দ করেছিলি সেটাই লিখেছি—

যদি এদিক ওদিক হয়ে থাকে তবে জানবি ওটা লেখার গুণে হয়েছে। আসল কথাটা হচ্ছে আমি তোকে খুব ভালবাসি।—আর ভালবাসি বলেই তোকে অমর করে

রাখতে চাইছি।—আমাকে ভুল বুঝে যেন কেস্ করিস না। তাহলে কিন্তু তোর নাতিরা অর্থাৎ আমার ছেলেরা একেবারে পথে বসবে। প্রণাম রইল—

চিঠি লেখা শেষ করে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলাম। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা ··

আমরা সেণ্ট পলস্ স্কুলে পড়তাম। থাকতাম বোর্ডিং-এ।

ছুটি হলে লোকাল গার্জেন না এলে আমাদের স্কুলের গণ্ডির বাইরে যাবার হুকুম ছিল না।

সেইজন্যে ছুটি হবার অন্ততঃ এক মাস আগে থেকে আমরা সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিতাম শ্রীরামপুরে মামার বাড়িতে। যাতে ঠিক ছুটির তারিখে চার মামার কেউ একজন এসে আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে যান।

তারপর আমরা যেখানেই যাই না কেন স্কুল কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব থাকবে না।

এমনি এক ছুটির মুখে স্বয়ং ছোটমামা আমাদের শ্রীরামপুরে নিয়ে যাবার জন্যে এসে হাজির।

ছোটমামা প্রায় আমাদেরই সমবয়সী। প্রায় কথাটা ব্যবহার করলাম এই কারণে যে ছোটমামা আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়। লম্বায় আমার সমান হলেও চওড়ায় আমার চেয়ে অনেক কম। ওকে দেখে নেহাত ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। সুতরাং, এ হেন ছোটমামাকে দেখে আমাদের মনে নানান আশঙ্কা।

স্কুল কর্তৃপক্ষ ছোটমামাকে দেখে আমাদের ছুটি দেবেন কিনা যথেস্ট সন্দেহ।

যদি হেমবাবু ছোটমামাকে দেখে নাক সিঁটকোয় তাহলে নির্ঘাত আর একটা রাত আমাদের বোর্ডিং-এ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।

অন্যান্যরা সবাই চলে যাবে।

অতবড় বোর্ডিং-এ কেবল আমরা দুইভাই প্রহর গুনবো। সে এক যন্ত্রণা। যাই হোক ছোটমামার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে বললে,—কিরে, তোদের বাক্স বেডিং বাঁধাছাদা হয়ে গেছে। যাবি তো চল। আমি তোদের নিতে এসেছি। হুঃ, এই তোদের ইস্কুল। চারদিকে শুধু মাঠ। তোরা কি মাঠে গরু চড়াস নাকি রে—

ছোটমামার কথায়.কোনকালেই আগল নেই।

যা মুখে আসে বলে যায়।

দাদা অর্থাৎ কেবু বললে,—তুই কেন। বড় মামা কিংবা মেজমামা এলেন না কেন? তোর সঙ্গে কি হেমবাবু আমাদের ছাড়বেন?

ছোটমামা মেজাজী কণ্ঠে বললে,

—কেন, ছাড়বে না কেন। আমি কি তোদের মামা নই। ছাড়বে না আবার। ইয়ারকি নাকি—আমি হলাম গিয়ে—

আমি বললাম,

—থাম থাম আর কপচাসনি। তুই হচ্ছিস ছেলেমানুষ। তুই আবার গার্জেন হলি কবে।

আতে ঘা লাগল ছোটমামার।

—কি বললি আমি ছেলেমানুষ। ঠিক আছে ডাক তোদের হেডমাস্টারকে। দেখি কি করে না ছাড়ে। আরে আমি অত বোকা নই—পকেটে বড়দার চিঠি নিয়ে এসেছি। না ছাড়লে তুরুম ঠুকে দেবো। আমার নাম শ্রীদুলালচন্দ্র গোস্বামী। বুঝলি, আজকাল আমি ব্যায়াম সমিতিতে রেগুলার ডাম্বেল ঘোরাচ্ছি।

আমি হেসে ফেললাম।

—এই তোর ডাম্বেল ঘোরান চেহারা। ল্যাকপেকে তালপাতার সেপাই—

—আরে রাখ, এই ল্যাকপেকে চেহারায় ভেলকী খেলাতে পারি তা জানিস।

কেবু কোন কালেই তর্ক ভালবাসে না। ছোটমামাকে থামিযে দিয়ে বললে, থাক খুব হয়েছে। দয়া করে আগে আমাদের ছুটির ব্যবস্থাটা কর দিকি। হেমবাবু এখনও টিচার্স রুমে আছেন, যা তার সঙ্গে দেখা করে আয।

ছোটমামা বললে,—ঠিক আছে। তোরা বাক্স বেডিং নিয়ে আয় আমি এক্ষুণি ছুটির ব্যবস্থা করে আসছি—

আমি বললাম,—না আগে তুই ছুটির ব্যবস্থা কর, তারপর বাক্স বেডিং ডর্মিটি থেকে নামাবো।

ওস্তাদি হাসি হেসে ছোটমামা টিচার্স রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

কেবু বললে, হাবু তুই সঙ্গে যা। ছোটমামা আজে বাজে কিছু বললেই হয়ে গেল—

অগত্যা আমি হাত দশেক তফাতে থেকে ছোটমামাকে অনুসরণ করলাম।

ছোটমামা প্রথমটা বুক ফুলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু টিচার্স রুমের কাছে গিয়ে কেমন যেন চুপসে গেল।

হেমবাবুর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে বোধহয় হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল ছোটমামার।

লক্ষ্য করলাম ছোটমামা অনেকটা ভিজে বেড়ালের মত কুঁকড়ে দাঁড়াল টিচার্স রুমের সামনে।

—কে?

হেমবাবুর কণ্ঠস্বর কানে এল।

—আমি স্যার, ছোটমামা—

ছোটমামা নিজের নামটা বলতে ভুলে গেল।

সর্বনাশ। আমি মনে মনে প্রমাদ গণি। হেমবাবুর কণ্ঠস্বর আবার কানে এল।

—কি বললে, ছোটমামা? কার ছোটমামা তুমি?

—কার আবার, হাবু কেবুর ছোটমামা—

—হাবু কেবুর ছোটমামা? কে হাবু কেবু। কোথায় থাকে তারা—

—কেন আপনাদের ইস্কুলে পড়ে, বোর্ডিং-এ থাকে।

—আমি হাবু কেবুকে চিনি না বাপু। যাও এখানে ঝামেলা বাড়িও না—

আমি তখন দশ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়াচ্ছি। ছোটমামা একটা গণ্ডগোল করবে জানতাম কিন্তু এভাবে আলফাল বকে যাবে আশা করতে পারিনি। তাই আর দেরি না করে টিচার্সরুমের সামনে ছোটমামার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখি হেমবাবু রেজিস্ট্রিখাতা নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে হেমবাবু ভ্রূকুটি করলেন।

—কি চাই? তোমাদের গার্জেন এসেছেন নাকি?

সাহস পেয়ে বললাম,—হ্যাঁ স্যার। বড়মামার চিঠি নিয়ে ছোটমামা এসেছে।

—কি বললে তোমাদের ছোটমামা?

—হ্যাঁ স্যার। এ আমাদের ছোটমামা—

ছোটমামাকে দেখিয়ে দিতে হেমবাবু বিরক্ত হয়ে ছোটমামাকে বললেন,

—তুমি অমল বিমলের ছোটমামা?

—হ্যাঁ।

—তবে হাবুকেবু হাবুকেবু করছিলে কেন?

—ওদের ডাক নাম হাবু আর কেবু। অমল বিমল নাম কস্মিন কালেও শুনিনি—

—তার মানে ?

হেমবাবু ভ্রূকুটি করলেন।

আমি প্রমাদ গনলাম। হায় হায় ছোটমামা একি বলছে। ভাগ্নেদের পোশাকী নাম যে জানে না তার সঙ্গে কি হেমবাবু ছাড়বেন।

তাড়াতাড়ি বললাম,

—স্যার ছোটমামা আমাদের ইস্কুলের নাম মনে রাখতে পারে না। আমার ডাক-নাম হাবু আর বিমলের ডাকনাম কেবু। দেখুন না, ছোটমামা নিজের নামটাও মাঝে মাঝে ভুলে যায়।

ছোটমামা আপত্তি জানাল,

—কে বলেছে রে আমি নিজের নাম ভুলে যাই। আমার নাম দুলালচন্দ্র।

আমি বললাম,—ওটা তো তোর ডাক নাম। ভাল নামটা বল—

ছোটমামা বিগড়ে গেল।

হেমবাবুর সামনেই রুখে উঠে বললে,—মুখ সামলে কথা বলবি হাবু। খবরদার, আমাকে নিশীথকুমার বলে ডাকবি না। তাহলে থাবড়া মেরে মুখ বেঁকিয়ে দিয়ে চলে যাব।

আমাকে শাসন করে ছোটমামা হেমবাবুর দিকে ফিরে বললে,—ওর কথা বিশ্বাস করবেন না দাদা। আমার বাবা ভুল করে আমাকে একবার নিশীথকুমার বলে ডেকেছিলেন। সেই থেকে এই সব ডেঁপো ছোকরারা আমাকে ক্ষেপায়। তা আপনিই বলুন দাদা, আমার এই চেহারায় কি নিশীথকুমার নামটা মানায়।

হেমবাবু গুম। ওঁকে যে কেউ বিশেষ করে ছোটমামার মত ছোকরা ইস্কুলের গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাদা সম্বোধন করবে তা তিনি কেন আমরাও কল্পনা করতে পারি না।

হেমবাবুর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি।

মাথার চুল শণের মত সাদা ধবধবে। ছোটমামার প্রশ্নে তিনি বারকয়েক ঢোক গিলে বললেন,—ঠিক আছে ঠিক আছে, কৈ দেখি কি চিঠি এনেছ ?

ছোটমামা পকেট হাতড়ে বড়মামার চিঠিটা বের করে হেমবাবুর হাতে দিতে আমার বুক ধড়ফড়ানি কিছুটা কমলো।

হেমবাবু চিঠি পড়ে আমার দিকে মুখ তুলে বললেন,—যাও তোমাদের বাক্স বেডিং নিয়ে এসো। আর সাধুকে একটা ট্যাক্সী ডেকে নিয়ে আসতে বল।

আর আমাদের পায় কে।

ছোটমামাকে নিয়ে চলে এলাম ডর্মিট্রিতে। হেমবাবুর সামনে ওকে রেখে আসতে ভরসা হল না। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে সব কঁ্যাচাইন হয়ে যাবে।

ডর্মিট্রি দেখে ছোটমামা মন্তব্য না করে পারল না।

—এ কিরে? এ যে হাসপাতাল। পরপর লোহার খাট, বড বড় জানলা—হুঁঃ, এখানে তোরা থাকিস কি করে। তোদের ভূতের ভয় করে না—

ছোটমামার মন্তব্যে কান দেবার সময় ছিল না তখন।

লাইব্রেরীর বই, ক্রিকেট ব্যাট, হকিস্টিক ইত্যাদি যা আমরা সাধারণতঃ ছুটির মুখে লুকিয়ে ছাপিয়ে রেখেছিলাম বাড়ি নিয়ে যাব বলে, সেগুলো তখন বেডিং-এ বন্দী করতে ব্যস্ত।

একসময় সেগুলোর ওপর নজর পড়তে ছোটমামা বললে,

—কিরে এগুলো কি গ্যাঁড়া মেরেছিস নাকি?

আমি ধমকে উঠলাম,

—আঃ ছোটমামা কি হচ্ছে কি। আস্তে কথা বল। কেউ শুনে ফেললে বিপদে পড়ে যাব।

আমার কথা শুনে ছোটমামা গম্ভীর হয়ে বললে,

—তোদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইস্কুলের সম্পত্তি গ্যাঁড়া মারা মহাপাপ। লেখাপড়া কিস্স্যু হবে না। বছর বছর ডিগবাজি মেরে ঘাড়ে কালসিটে পড়ে যাবে বলে দিলাম—

বললাম, কালসিটে পড়ে আমার পড়বে তোর তাতে কি?

ছোটমামা চুপ করে রইল।

বাক্স বেডিং বেঁধে আমরা তিনজনে ধরাধরি করে নীচে নিয়ে এলাম।

কেবু সাধুকে একটা ট্যাক্সী ডেকে দিতে বলল।

যতক্ষণ না ট্যাক্সী এল ততক্ষণ আমি ছোটমামাকে আগলে বসেছিলাম। কে জানে প্রভুকে বিশ্বাস নেই। আগ বাড়িয়ে কাকে বেফাঁস কিছু বলে দিলেই মাঠে মারা পড়বো।

ট্যাক্সী এল। আমরা চটপট মালপত্তর তুলে ফেললাম।

ছোটমামা বললে, যাবার সময় হেমবাবুর সঙ্গে দেখা করবি তো?

আমি বললাম, আমরা দেখা করবো, তোকে দেখা করতে হবে না। তুই ট্যাক্সী নিয়ে ইস্কুলের বাইরে অপেক্ষা করবি।

ছোটমামা কিছুতেই রাজী হল না।

বললে, ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না। আমি বাইরে অপেক্ষা করবো আর তোরা আমাকে বুলু দেখাবি। তা হচ্ছে না। আমার পকেট গড়ের মাঠ। ট্যাক্সী ভাড়া চাইলে দিতে পারব না।

আমি হেসে ফেললাম।

কেবু বললে, ঠিক আছে তুই আমাদের সঙ্গেই থাক। কিন্তু খবরদার বেফাঁস কিছু বলে ফেলিস না—

যাই হোক, সেযাত্রায় ছোটমামা আমাদের মুখ রেখেছিল। যাবার সময় সে ট্যাক্সী থেকে মুখ বাড়িয়ে হেমবাবুকে বললে,—তাহলে চলি দাদা—

হেমবাবু জবাব দেননি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন।

ইস্কুলের বাইরে এসে আমরা দুভায়ে মিলে ছোটমামাকে আচ্ছা করে বকাঝকা করলাম।

—হেমবাবু তোর চেয়ে বয়সে কত বড়। তাঁকে তুই কোন্ আক্কেলে দাদা বলতে গেলি। উনি কি ভাবলেন বল তো।

বকাঝকা করলে মানুষ চুপ করে যায়।

কিন্তু ছোটমামার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাচ্ছিল্যের সুরে বললে,

—য্যা, য্যা, কি আর ভাববে। আমি ঠাকুর দেবতাকেও দাদা বলে ডাকি।

আমরা বেকুব।

—তুই ঠাকুর দেবতাকে দাদা বলে ডাকিস?

আমি অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করতে ছোটমামা বললে,

—আলবৎ ডাকি। কালীদি, দুর্গাদি, শিবুদা—সব দাদা আর দিদি।

—ছোটমামা ঠাকুর দেবতা নিয়ে ফাজলামি ভাল নয়—

—ফাজলামি কেন করবো। তোরা যাকে মা বলিস তাকে আমি কোন্ আক্কেলে মা বলে ডাকব। আমি না তোদের মামা হই। তোদের মা আমার দিদি হয়—

যুক্তি শুনে আমরা দু ভাই একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ছোটমামা বললে, দাঁড়া হরবর করে টিকিট কাটিস না। একটু ভাবতে দে।

ছোটমামা পোজ করে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ভেবে নিয়ে মিটমিট করে হাসতে হাসতে আমাকে বললে,—হ্যাঁ হয়েছে। শোন তিনটে টিকিট কাটতে হবে না। কেবুর জন্যে মাত্র একটা টিকিট কাট। তুই আর আমি ডাব্লু-টিতে যাব—

—ডাব্লু-টি মানে?

—উইদাউট টিকিট—ছ-আনা ছ-আনা বারোয়ানা পয়সা বাঁচিয়ে সিনেমা দেখা যাবে। অর্থাৎ আমাদের রথ দেখাও হবে কলা বেচাও হবে—

কেবু কিছুতেই রাজী হবে না। গজগজ করতে করতে বললে,

—ইস্কুলে গিয়ে খুব তো সারমন শোনাচ্ছিলি। চুরি করা পাপ। মুখ্যু হয়ে থাকবি। আর এখানে এসে অন্যরূপ। তুই বড় সুবিধেবাদী ছোটমামা—

ছোটমামা হাসতে হাসতে বললে,

—আরে ভাগ্নে, এই বয়স থেকে পয়সা বাঁচাতে না শিখলে কবে শিখব। লেখাপড়া শিখলাম না বলে কি এগুলোও শিখব না।

ছোটমামা কিছুতেই একটার বেশী টিকিট কাটতে দিল না।

কেবু রেগে গিয়ে বললে, ঠিক আছে তোদের যা খুশী করগে।

আমি বাক্স বেডিং নিয়ে অন্য কম্পার্টমেণ্টে উঠবো। তোদের সংস্রবে থাকব না।

কেবু সত্যিই রাগ করে বাক্স বেডিং নিয়ে চলে গেল।

আমরা দুজনে বিনা টিকিটে উঠে বসলাম বেশ একটা বড়সড় তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়।

ছোটমামা আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করল, শোন চেকার উঠলে একেবারে ঘাবড়াবি না। রোয়াব নিয়ে বলবি—মান্থলি। দেখবি চেকার আর টিকিট চাইবে না—। কিন্তু যদি ঘাবড়ে গিয়ে মিউ মিউ করিস তবে গলায় পা দিয়ে টিকিট আদায় করবে। বুঝলি তো—

আমি বললাম,

—আচ্ছা, তুই এর আগে কখন বিনা টিকিটে কলকাতায় গেছিস?

—গেছিস মানে প্রায়ই যাতায়াত করি।

—ছোটমামা রোজ রোজ রিস্‌ক্ নিস না যদি ধরা পড়ে যাস—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ছোটমামা বললে, আরে য্যা—য্যা আমারে ধরিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। থুড়ি,—আমাকে ধরনেওয়ালা পার্টি এখনও পয়দা হয়নি বুঝলি, আমার নাম দুলালচন্দ্র।

ছোটমামা যখন বুক ঠুকে বড়াই করে নিজের নাম বলে তখন আমার ভীষণ অবাক্ লাগত। ভাবতাম, ঐ তো তালপাতার সেপাইদের মত চেহারা, ওই চেহারা নিয়ে বড়াই করে কোন্ সাহসে।

যাই হোক, সেদিন মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। সব সময় মনে হতো, ঐ বুঝি চেকার এলো। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। কি হবে যদি ধরা পড়ি। জেলে পাঠিয়ে দেবে না তো—

লিলুয়া, বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া, তারপর শ্রীরামপুর। প্রায় পঞ্চান্ন মিনিট ধরে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। প্রত্যেক স্টেশনে কেবল উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে হচ্ছে চেকার আসছে নাকি। অশান্তির একশেষ।

তাই বিরক্ত হয়ে একসময় বলেছিলাম,—দুত্তেরি, এর চেয়ে টিকিট কাটা অনেক ভাল ছিল। কেমন আরামে আসা যেত।

ছোটমামা ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না।

আমার কথা শুনে বললে,—আরাম হারাম হ্যায়। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না ধন আমার। বারো আনা পয়সা বাঁচিয়ে যখন সিনেমা দেখবি তখন কত আরাম হবে বলদিকি।

ছোটমামার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সে যেটা ভাল মনে করবে তার থেকে এক চুল নাড়ানো যাবে না। সুতরাং আমি হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

আমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম রিষড়ে পর্যন্ত। রিষড়ে থেকে ট্রেন ছাড়তে ছোট-মামা বললে, চল এবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। গাড়ি থামলেই আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে টুক করে শ্রীরামপুর টকীজের সামনের পাঁচিল টপকে নেবে পড়বো। কেউ বুঝতেই পারবে না। কেবু বাক্স বেডিং নিয়ে বাড়ি যাক, তুই আর আমি সিনেমা দেখে রাত নটায় ফিরব।

বলতে বলতে ছোটমামা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অগত্যা আমাকেও অনুসরণ করতে হল।

● রাজকুমার মৈত্র

কিছুক্ষণ পরেই শ্রীরামপুর। ছোটমামা দরজা দিয়ে ঝুঁকে বার বার কি দেখছিল কে জানে। হঠাৎ একসময় লক্ষ্য করলাম ওর মুখ মৃতের মত বিবর্ণ।

গাড়ির গতিও সেই সময় কমতে লাগল। ছোটমামা শেষবারের মত দরজা দিয়ে ঝুঁকে ইঞ্জিনের দিকে কি যেন দেখে চাপাস্বরে ককিয়ে উঠল,

—সর্বনাশ। স্টেশনে মামাতে মামাতে মামাক্কার—

—তার মানে। মামাতে মামাতে মামাক্কার আবার কি—

—বুঝলি না। মামা মানে চেকার। শ্রীরামপুর স্টেশনে টিকিট চেকার থই থই করছে।

—য়্যাঁ—

—আজ বোধহয় ফ্লাইং চেকিং আছে রে—

—সর্বনাশ তাহলে কি হবে—

আমারও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তো আর কোন উপায় ছিল না একমাত্র ছোটমামার মুণ্ডুপাত করা ছাড়া।

আমার পাশে একজন চানাচুরওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল। ছোটমামার কথাগুলো বোধহয় তার কানে গিয়েছিল। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে সে বললে,

—কি ভাই, টিকিট কাটনি বুঝি?

আমি বললাম, সময় পাইনি। কি করা যায়—শুনছি আজ ফ্লাইং চেকিং আছে।

চানাচুরওয়ালা চকিতে আমাদের পরিণামের কথা ভেবে নিয়ে বললে, দু'টো টাকা দিয়ে আমার একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে চানাচুরওয়ালা হয়ে কেটে পড়।

কি লজ্জা—

যাত্রীরা যাচ্ছে আমাদের দেখতে দেখতে। কেউ কেউ মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছে—বিনা টিকিটে যাওয়ার ফল।

লজ্জায় অপমানে আমার তখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

ছোটমামার কোন লম্ফঝম্প নেই।

সে তখন চানাচুরওয়ালার মুণ্ডুপাত করছে।

—শালা চানাচুরওয়ালাকে একবার পেলে হয়। মেরে মাটিতে পুঁতে দেব। তুই লোকটাকে আবার দুটো টাকা দিতে গেলি কেন। ওই দু-টাকায় আমাদের সিনেমা দেখা হোটেলে খাওয়া হয়ে যেত।

আমি ধমকে থামিয়ে দিলাম,
—চুপ কর। সিনেমা আর দেখতে হবে না। ভাড়া দিতে না পারলে আমাদের জেল খাটতে হবে সে খেয়াল আছে।

ছোটমামা গুম হয়ে গেল। থানা পুলিস জেলকে ওর ভীষণ ভয়।

গাড়ি চলে যেতে চেকার দুজন আমাদের কাছে এসে বললে, কৈ হে তোমাদের বন্ধু টিকিট নিয়ে এল।

ছোটমামা হঠাৎ হাউমাউ করে মড়া কান্না কেঁদে উঠল।

আমি একেবারে বেকুব। এ কি, এমন করে কান্নার কি আছে। চেকার দুজনও হতভম্ব।



ছোটমামা হাউমাউ করে মড়া কান্না কেঁদে উঠল

ছোটমামা বললে,—আমরা টিকিট কাটার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। চানাচুরওয়ালা বললে, ট্রেন এসে গেছে তোমরা গাড়িতে গিয়ে বসো আমি তোমাদের টিকিট নিয়ে যাচ্ছি। কালীদির দিব্যি দুর্গাদির দিব্যি—চানাচুরওয়ালা আমাদের ঠকিয়েছে—এ—এ। ওরে বাবারে—এ—এ—আমাদের কি হবে রে—এ—এ

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মে ভিড় জমতে আরম্ভ করল।

একজন চেকার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোত্থেকে উঠেছ—?

ছোটমামা বললে,—রিষড়ে থেকে—এ—এ

—তবে যে বললে তোমরা শ্রীরামপুর থেকে উঠেছ—

—ভয়ে বলেছিলাম গো—ও—ও। ওরে বাবারে—এ—এ

—চুপ কর, চুপ কর—

রাজকুমার মৈত্র

—কেমন করে চুপ করবো—ও—ও। টিকিট না দিয়ে আমরা কি করে ছাড়া পাব গো—ও—ও। আমাদের যে জেল খাটতে হবে গো—ও—ও।

ছোটমামার কান্না দেখে সকলেই সমবেদনা জানাতে লাগল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বললে, ছেলেমানুষ। বোকার মত কাজ করে ফেলেছে। এবারের মত ওদের ছেড়ে দিন দাদা—

টিকিট চেকার দুজন কেন জানি না দয়াপরবশ হয়ে উঠলেন।

ছোটমামাকে সস্নেহে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা চুপ কর। আমরা তোমাদের কিছু বলব না। যাও আর কখনও বোকার মত কাউকে টিকিট কাটতে দিও না; নিজেরা টিকিট কাটবে। যাও—

ছাড়া পেয়ে কোন রকমে মাথা নীচু করে স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম ছোটমামা মিটমিট করে হাসছে।

—ছোটমামা তুই হাসতে পারছিস। একটু আগেই তো মড়াকান্না কাঁদছিলি—

ছোটমামা বললে,—অল ফলস্। স্রেফ অ্যাকটিং করে গেছি। আরে সিনেমা দেখে দেখে এখন আমি পোক্ত। হুট করে কাঁদতে পারি, হাসতে পারি। দেখবি কাকে অট্টহাসি বলে—

বলেই ছোটমামা হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

এমন বেমক্কা হাসল যে রাস্তার ষাঁড়টা ঘাবড়ে গিয়ে ফোঁস-ফোস শব্দ তুলে শিঙ বাগিয়ে তেড়ে এল।

—ওরে হাবু পালা ভোলাবাবা ক্ষেপেছে—

ছোটমামা ভোঁ দৌড় দিল। আমি কোনরকমে পাশের একটা উঁচু রোয়াকে লাফিয়ে উঠে প্রাণ বাঁচালাম।

সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

ছোটমামা দৌড়চ্ছে, ষাড় দৌড়চ্ছে।

ষাঁড় তাড়া করছে, ছোটমামা পালাচ্ছে—

পথের লোকজন হইচই করতে করতে ষাঁড়ের পিছনে ছুটতে লাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছুটলাম। যতটা রাগ তার দ্বিগুণ ভয় হতে লাগল। ষাঁড়ে যদি ছোটমামার নাগাল পায় তবে আর রক্ষে রাখবে না। গুঁতিয়ে গড়াগোড় চুরচুর করে দেবে।

ছুটতে ছুটতে প্রায় আধমাইলটাক দূরে ঝাউতলায় পৌঁছুতে দেখি ছোটমামা একটা ডাব গাছের মাঝবরাবর উঠে গুঁড়ি আঁকড়ে ঝুলছে আর ষাঁড়টা প্রচণ্ড আক্রোশে গাছটাকে গুতোচ্ছে। পঞ্চাশ ষাটজন লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে আর হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করছে—

আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। আমাকে দেখে ছোটমামা চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

—হাবু রে, ষাঁড়টাকে বোঝা আমি ওকে দেখে হাসিনি। কালীদির দিব্যি, দুর্গাদির দিব্যি। ও শিবুদা তোমাকে একশো আট বেলপাতা দেব গো—তোমার বাহনকে সরাও। আমি আর কতক্ষণ ঝুলবো। ওরে হাবু রে আমাকে বাঁচা রে—

কি করি। ষাঁড়টাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে লাগলাম।

তাতে ফল আরও খারাপ হল।

ষাঁড়টা ক্ষেপে গিয়ে ডাব গাছে আরও জোরে গোঁত্তা মারতে লাগল।

গোঁত্তা খেয়ে গাছটা কাঁপতে লাগল। গাছ যত কাঁপে ছোটমামা সড়াৎ সড়াৎ করে তত নেমে আসে।

তখন বাধ্য হয়ে ঢিল ছোড়া বন্ধ করে চেঁচিয়ে বললাম,—ছোটমামা আরও ওপরে উঠে যা। তুই নেমে যাচ্ছিস—

ছোটমামার অবস্থা তখন কাহিল।

বেচারা চেষ্টা করেও আর ওপরে উঠতে পারে না। বরং গোঁত্তা খেয়ে সড়াৎ সড়াৎ করে নীচে নামতে লাগল।

ছোটমামা যত নামে আমি তত চেঁচাই—ছোটমামা ওপরে উঠে যা। আর নামিস না।

আমার দেখাদেখি দর্শকও চেঁচাতে লাগল, ছোটমামা নামিস না……

ওঃ সেকি কাণ্ড। সেকি গেড়ো।

অট্টহাসির কি পরিণতি।

ছোটমামা ক্রমশঃ নেমে আসতে লাগল। আর মাত্র কয়েক গজ বাকী। ভয়ে আমরা কাঠ হয়ে গেলাম।

ছোটমামা নির্ঘাত মারা পড়বে। কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল অদ্ভুত একটা নীরবতা নেমে এসেছে।

দর্শক চুপ।

● রাজকুমার মৈত্র

ছোটমামাও চুপ।

কেবল ষণ্ড মহারাজ এক নাগাড়ে গোঁত্তা মেরে যাচ্ছেন।

আর মাত্র এক ফুট যখন বাকী ছোটমামা সহসা একটা কাণ্ড করে বসল। এক ফুট ওপর থেকে এক লাফ মেরে ষাঁড়ের পিঠে আছড়ে পড়ল।

এমন একটা আক্রমণের জন্যে ষাঁড়টা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভয় পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে ল্যাজ তুলে দৌড় মারল।

আর ছোটমামা আছড়ে পড়ল নরম মাটিতে।

উপস্থিত দর্শকেরা মজা পেয়ে ছুটতে লাগল ষাড়ের পিছনে। আর আমি ছুটে গেলাম ছোটমামার কাছে।

দেখি ছোটমামা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে মাটিতে।

আমার ডাকাডাকিতে চোখ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

বললাম, ছোটমামা উঠে পড়—

মিউমিউ করে ছোটমামা বললে, আমি কোথায়?

ভেংচি কেটে বললাম, ধরণীতলে। খুব কায়দা দেখিয়েছিস, এবার দয়া করে উঠে আমায় কৃতার্থ কর—

ছোটমামার হাত ধরে টেনে তুলে ওকে দাঁড় করিয়ে দিতে সে মিটমিট করে সেই হাড়জ্বালানে হাসিটা হাসছে।

রাগে তখন আমার ব্রহ্মতালু গরম হয়ে গেছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দিই। কিন্তু কোথায় মারব? ওর গালে কি মাংস আছে। সবটাই হাড়—

সুতরাং হাত না চালিয়ে বললাম,

—হাসতে তোর লজ্জা করছে না—

ছোটমামা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললে,—আমি তো আর খুকি নই যে কথায় কথায় লজ্জা করবে।

ছোটমামা নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বললে,

—দেখলি তো শিবুদার বাহনকে কিরকম টাইট দিলাম। এতবড় আস্পর্ধা গুঁতিয়ে গাছ কাঁপিয়ে আমাকে নামিয়ে নিয়ে এল। দেখবি, আমার বুকের কতখানি নুনছাল উঠে গেছে। ব্যাটা গেঁজেলের বাহন কোথাকার—

—ছোটমামা দোহাই তোর। এসব আমার আর ভাল লাগছে না। কি কুক্ষণে তোর সঙ্গে এসেছিলাম। কেবুর কথামত চললে এ দুর্গতি ভোগ করতে হত না।

সত্যি বলছি তখন আমার মাথা খারাপ হবার উপক্রম।

রেগুলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। সেই সেণ্ট পলস্ স্কুল থেকে ছোটমামা খেল্ দেখাতে শুরু করেছে। আর সহ্য হয়।

যাই হোক, আমার খেদোক্তি শুনে ছোটমামা তখনকার মত চুপ করে রইল।

বাড়ি ফিরে ছোটমাসীমাকে সব কথা খুলে বলতে তিনি তো ছোটমামাকে তেড়ে মারতে গেলেন।

—মুখপোড়া আসুক সেজদা, আজ তোর হাড়মাস এক করবো।

ছোটমামা একটুও ঘাবড়াল না।

হাসতে হাসতে বললে, তুই মিছিমিছি রাগ করছিস ভবানী। মানুষ কি আর ইচ্ছে করে বিপদে পড়ে। এসব হচ্ছে কপালের গেড়ো। এত কাল টিকিট কেটে যাতায়াত করছি, কোন দিন একটা চেকারের টিকিও দেখতে পাইনি। টিকিট কেটে শুধু পয়সার ছেরাদ্দ হয়েছে। আর যেই আজ বিনা টিকিটে চড়েছি অমনি রেল কোম্পানির সমস্ত টিকিট চেকার শ্রীরামপুর ইস্টিশানে ভিড় করে এল। আজকের দিনটা না এলেই কি ওদের চলত না।

॥ দুই ॥

এ হেন ছোটমামাকে ছেড়ে থাকতেও পারতাম না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফিরে রাত না আসা পর্যন্ত অষ্টপ্রহর ছোটমামার সঙ্গে ঘুরতাম।

সব কাজে ছোটমামাকে চাই। সে না হলে যেন আমাদের ভাত হজম হতো না।

সেদিন ভোর থাকতে, ছোটমামার চিৎকার দাপাদাপিতে ঘুম ভেঙে গেল।

কি ব্যাপার। ছোটমামা চেঁচাচ্ছে কেন?

বাড়িশুদ্ধ লোক তখনও বিছানায়।

শুনতে পেলাম দাদুও চেঁচাচ্ছেন।

ছুটে ছাদে গিয়ে দেখি ছোটমামা বুক চাপড়ে মড়াকান্না কাঁদছে।

আর গোটা ছাদে পায়রার পালক ছড়াছড়ি।

বুঝতে পারলাম, বেড়ালে ছোটমামার পেয়ারের দুশো পায়রার মধ্যে দুচারটেকে সাবড়ে দিয়েছে।

তবু ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে, এত পালক কেন—

ছোটমামা কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওরে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে। আমি কি করে বেঁচে থাকব রে। মুখ্‌খি বিহনে কি করে দিন চলবে রে—

কেবু ধমকে উঠল,—চুপ কর চুপ কর—মড়া কান্না কেঁদে কি হবে। কি হয়েছে ঠিক করে বল। মুখ্‌খি আবার কে—

ছোটমামা বুক চাপড়ে বললে,—মেরে জান, মেরে কলিজা। বাবার আধলা গেঁড়িয়ে ওকে জানবাজার থেকে কিনে এনেছিলাম। ব্যায়াম সমিতির ছোলা গেঁড়িয়ে রোজ ওকে খাইয়ে নাদুসনুদুস করেছিলাম। সেই মুখ্‌খিটাকে লেঙুয়ার হুলোটা সাবড়ে দিয়েছে। ওই দেখ, মৃতদেহ পড়ে আছে—

ছাদের অপর প্রান্তে লক্ষ্য করতে দেখলাম একটা সাদা পায়রার অর্ধভুক্ত দেহ পড়ে আছে।

ছোটমামাকে অন্যমনস্ক করার জন্যে বললাম,—কি করে বেড়ালে খেল। পায়রার ঘর ঠিকমত বন্ধ করিসনি বোধহয়—।

ছোটমামা বললে,—রোজই আমি নিজের হাতে বন্ধ করি, শুধু কাল করিনি। ভুলে গেছি—

—ব্যাস হয়ে গেল। কাল বন্ধ করিসনি কেন। দোষটা তোর—

ছোটমামা কান্না ভুলে ক্ষেপে গেল,

—কি করে আমার দোষ হলো। তোরা এসে অব্দি আমি তোদের সঙ্গে টইটই করে বেড়াচ্ছি। বিকেলে সিনেমা দেখতে গেছি। ফিরেছি রাত্রির ন'টায়। তারপর আর মনে থাকে—

এই কথার মাঝে দাদু এসে হাজির।

—সিনেমা দেখাই তোর কাল হয়েছে। দিনরাত কেবল সিনেমা সিনেমা আর সিনেমা। সিনেমা দেখে দেখে গোল্লায় যেতে বসেছিস। পায়রা পোষার শখ ষোল আনা অথচ তাদের দেখাশোনা করার ধৈর্য নেই। এই তোকে শেষবার বলে দিচ্ছি

দুলাল—যদি পায়রা পুষতে চাও তবে সিনেমা দেখা ছাড়। নইলে আর একবার যদি বেড়ালে পায়রা খায় তবে পায়রাগুলোকেও বিদেয় করব তোকেও দূর করে দেব। তোর মত হতচ্ছাড়ার মুখ দেখব না।

মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে দাদু নীচে নেমে গেলেন।

ছোটমামা রাগে ফুঁসতে লাগল,

—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ নিতে হবে। এই নিয়ে তিন কিস্তি মুখনাড়া খেলুম। আর নয়। হয় লেণ্ডুয়ার হুলো মরবে নয় আমি মরবো। এক আকাশে যেমন চন্দ-সূয্যি ওঠে না তেমনি আমরাও উঠবো, থুড়ি, থাকবো না। এখুণি একটা গুলতি চাই—একটা গুলতি আর পঞ্চাশটা চুন্নিগুলি। ব্যস লেণ্ডুয়ার হুলো খতম—

আমি হাসি চেপে বললাম,

—লেণ্ডুয়ার হুলো-ই যে তোর মুখ্খিকে সাবড়েছে তার প্রমাণ।

—প্রমাণের দরকার নেই। লেণ্ডুয়ার হুলো ছাড়া আর কোন বেড়ালের সাধ্যি নেই পাযরা ধরে। এর আগেও খেয়েছে আজও খেলো।—

কেবু বললে,

—কিন্তু ছোটমামা, বেড়াল মারতে নেই। ষষ্ঠী ঠাকুরের বাহন ওরা—

—ওসব যুক্তি ফুক্তি আর শুনবো না। ষষ্ঠীদির বাহনই হোক আর যেই হোক। আমি ওকে যমালয়ে পাঠাবই—

ছোটমামাকে ঠেকান গেল না।

বাসী মুখেই গুলতি তৈরি করতে বসল। বাজারে গেল না, জলখাবার খেল না, প্রেসেও গেল না। একনিষ্ঠভাবে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা জুতসই গুলতি তৈরি করে লাফাতে লাফাতে এসে বললে,

—মারণাস্ত্র তৈরী হয়ে গেল। এবার চাই পঞ্চাশটা বাণ—

আমি বললাম.—বাণ? তুই গুলতি দিয়ে বাণ মারবি—

ছোটমামা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে,—লেখাপড়া শিখে তুই দিনকে দিন গাধা হয়ে যাচ্ছিস। কামানে গোলা ছোড়া হয়, বন্দুক দিয়ে বুলেট ফায়ার করা হয়। ধনুকে বাণ আর গুলতিতে চুন্নিগুলি—বুঝলি হাঁদারাম।

ছোটমাসীমা আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

তাঁর সামনে ছোটমামা আমাকে একবার গাধা আর একবার হাঁদারাম বলতে তিনি ক্ষেপে গিয়ে বললেন,

—দুলাল তোর সাহস খুব বেড়ে যাচ্ছে। আমার সামনে তুই হাবুকে খবরদার হাঁদারাম বলবি না। তুই কিরে—

—আমি মুখ্যু, গবেট, তালপাতার সেপাই, সিনেমার হিরো—

দাদু স্নান করছিলেন। সিনেমার নাম শুনে গামছা পরনেই ছুটে এলেন ঘটি হাতে করে,

—আবার সিনেমায় যাচ্ছিস। আজ তোকে আমি খুন করে ফেলব হতভাগা।

দাদু তেড়ে আসতেই ছোটমামা তুড়িলাফ মেরে চুন্নিগুলির মত ছটকে পালিয়ে গেল বাড়ির বাইরে।

* * * *

খাওয়া দাওয়ার পর দাদু প্রেসে চলে যেতে আমরা দুইভাই ছোটমামার খোজে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

কাছেই একটা বস্তিতে লেণ্ডুয়া থাকে। বস্তিতে যাবার মুখে একটা পুকুর আছে। ছোটমামাকে দেখলাম পুকুরপাড়ে গুলতি হাতে ঘুরঘুর করছে।

আমাদের দেখে ছোটমামা উত্তেজিত হয়ে বললে,—তোরা এলি কি করতে।

আমি বললাম,—দেখতে।

ছোটমামা বললে,—দেখতে যদি চাস তবে দ্বিজেদার বাগানের পাঁচিলে ঘাপটি মেরে বসে থাকগে। হুলোটা ভিড় দেখলে আসবে না—

কেবু বললে—ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু পুকুর পাড়ে একটু সামলে গুলতি চালাস। যদি টিপ ফসকে যায় তবে কেলেঙ্কারী হবে—

ছোটমামা ঠিক আগের মত তাচ্ছিল্য করে বললে,

—য্যা য্যা। আমার নাম দুলালচন্দ্র—অর্জুনদার ভায়রাভাই—

আমি বললাম,—কি বললি, তুই অর্জুনের ভায়রাভাই?

বুক ঠুকে ছোটমামা বললে,—আলবত—

—ভায়রাভাই মানে জানিস—

আমার প্রশ্নের উত্তরে ছোটমামা কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললে,—ভবানী আমাকে মুখ্যু বলে। কিন্তু সত্যি আমি মুখ্যু নই—ভায়েরাভাই মানে হচ্ছে ভায়ের পর ভাই,

তারপর যে ভাই—সেই ভয়ের পরের জন হচ্ছি আমি। কি বুঝলি। অনেক দূরের সম্পর্ক হয়ে গেল, তাই না। হোকগে তবু আমি অর্জুনদার ভায়রা। লক্ষ্যভেদ করবই—

কি বলব। বলার কিছু ছিল না। কেবল হাসি চেপে আমরা পাঁচিলে উঠে বসলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো সেই চরম মুহূর্ত।

হুলো বেড়ালটা বস্তি থেকে বেরিয়ে পুকুর পাড়ের কাছাকাছি আসতে ছোটমামা গুলতি বাগিয়ে উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল।

হঠাৎ দেখি বস্তিপাড়ার সবচেয়ে ঝগড়াটি বুড়ীটা মাটির কলসীতে জল নিয়ে ফিরছে।

অবশ্য বেড়াল আর বুড়ীটার মাঝে অনেকখানি দূরত্ব। তবু কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল ছোটমামা বোধহয় আর একটা কেলেঙ্কারী করতে যাচ্ছে।

তাই আমি ওকে একটু ঠুকে দিলাম।

—ছোটমামা সাবধান, ঝগড়াটি বুড়ী কলসী নিয়ে আসছে।

আমার কথা কানে যেতে ছোটমামা বুড়ীটার দিকে একবার তাকিয়ে হুলোটাকে লক্ষ্য করে গুলতি চালাল।

ব্যাস ঠিক যা ভয় করেছিলাম তাই হল।

গুলতি থেকে চুন্নিগুলিটা ছটকে বেরিয়ে হুলোর দিকে না গিয়ে একেবারে সোজা ঝগড়াটি বুড়ীর কলসীতে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ফটাস--জলভরা মাটির কলসী চুরমার—

তারপরই শুরু হল তুলকালাম কাণ্ড।

আমরা দুই ভাই বেকুব।

ছোটমামা নিমেষে হাওয়া।

ঝগড়াটি বুড়ী পাড়া মাথায় করে চেঁচামেচি শুরু করল। হরামামা, দ্বিজেমামা, সেজমামা, কানাই মামা, বলাই মামা—মানে এককথায় গোসাঁই বাড়ির সকলেই ছুটে এলেন,

—কি হল, কি হল—কে তোমার কলসী ফাটাল—

বুড়ী আমাদের দুই ভাইকে দেখিয়ে বললে,—ওরা জানে, ওদের সুধাও। আমি যাচ্ছিলুম, কোনদিকে গেরাহ্যি ছিল না। হঠাৎ কে যেন ঢিল ছুড়ে মারল—যেই মারুক,

সে নির্বংশ হবে। দিন না ঘুরতে তাকে যমে টেনে নেবে। আমি তার গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসব। মরুক মরুক, নির্বংশ হোক—

বুড়ী শাপমন্যি করতে লাগল।

হরামামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যারে তোরা দেখেছিস কে ঢিল ছুড়েছে—

সরাসরি মিথ্যে জবাব দিলাম, না।

সেজমামা বললে, দুলাল কোথায়?

বললাম,—ছোটমামা গুলি কিনতে গেছে।

—কোথায় গুলি কিনতে গেছে?

—তা তো জানি না।

—কতক্ষণ আগে গেছে?

—অনেকক্ষণ—

—তোরা এখানে বসে আছিস কেন?

—এমনি—

ছোটমামা সে যাত্রায় বেঁচে গেল। সেজমামা ঝগড়াটি বুড়ীকে আট আনা পয়সা দিলেন নতুন একটা কলসী কেনার জন্যে। পয়সা পেয়ে বুড়ী মুখ বন্ধ করে খুশী হয়ে বিদায় নিল।

পরিবেশ শান্ত হতে নজর পড়ল হুলো বেড়ালটা গদাইলশকরী চালে আমাদের সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছে।

ইচ্ছে হল একটা আধলা ইঁট ছুড়ে মারি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল ষষ্ঠীর বাহন আমার কোন ক্ষতি করেনি। ও বেচারাকে আমি কেন মারব।

তাছাড়া ঐ হুলোটাই যে ছোটমামার মুখ্‌খিকে খেয়েছে তার প্রমাণ নেই। খামকা ওকে কেন মারব।

কিন্তু ছোটমামা চক্ষের নিমেষে উধাও হল কেমন করে।

কোন্‌ পথে পালাল।

ভাবতে ভাবতে আমরা গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় গেলাম। না সেখানেও তার দেখা পেলাম না।

গেল কোথায় সে।

কেবু বলল, চল গঙ্গার ধারে জেটিতে একবার দেখে আসি। আমার মনে হয় ছোটমামা সরকারদের গলি দিয়ে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে পালিয়েছে।

যুক্তিটা মন্দ লাগল না।

আমরা দুই ভাই গুটি গুটি জেটিতে গিয়ে হাজির হলাম।

কেবুর সন্দেহ মিথ্যে হল না।

দেখি ছোটমামা জেটিতে চুপচাপ বসে আছে।

—ছোটমামা!

ছোটমামা চমকে তাকাল। তারপর বললে,

—বোস!

আমরা ওর পাশে বসে পড়লাম।

ছোটমামা বললে,—কিরকম পালালাম বল তো।

কেবু বললে,—সেজমামা ঠিক সন্দেহ করেছিল। শুধু হাবু ডাহা মিথ্যে বলে তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে আজ তোর কপালে দুঃখ ছিল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম,—আচ্ছা ছোটমামা, তুই যে অর্জুনের ভায়রাভাই বলে বড়াই করলি, এই তোর টিপ। হুলো মারতে গিয়ে বুড়ীর কলসী ফাটালি।

ছোটমামা গম্ভীর হয়ে বললে, ওটা তোর জন্যে হল।

—আমার জন্যে?

—আলবত তোর জন্যে। তুই কেন টুকতে গেলি। না টুকলে বুড়ীটা কলসী নিয়ে হুলোটার গা ঘেঁষে গেলেও কিছু হতো না। ঠিক হুলোটাকে মারতাম। কিন্তু তুই আমার নজরটা ঘুরিয়ে দিলি বুড়ীর দিকে। ব্যাস কলসী ফেটে গেল।

—ও, তাহলে সব দোষটাই আমার—

—নিশ্চয়। তবে কি জানিস—আমি ভেবে দেখলাম, হুলোটাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। কারণ, ভগবানদা যাকে পরমায়ু দিয়েছে সে বেঁচে থাকবেই আমি তাকে মারার হাজার চেষ্টা করলেও সে মরবে না। মাঝখান থেকে ঝগড়াটি বুড়ীর কলসীটা গেল। এরকম হয়তো আরও অনেকের ক্ষতি করে বসব। তার চেয়ে হুলোকে ক্ষমা করে আর একটা মুখ্‌খি পায়রা কিনে নেওয়া অনেক ভাল।

কেবু বললে,—তার মানে দাদুর জমানো আধলা পয়সাগুলো আবার চুরি করবি। আবার ব্যায়াম সমিতি থেকে ছোলাগুড় গ্যাঁড়া মেরে আনবি। এই তো—

—নারে না। এবার আর ওসব করবো না ভাবছি। এবার ব্যবসা শুরু করবো—

আমরা আঁৎকে উঠেছিলাম ব্যবসার নাম শুনে,

—তুই করবি ব্যবসা। পয়সা কোথায় পাবি—

—পয়সা লাগবে না।

—পয়সা ছাড়া ব্যবসা হয় নাকি—

—হয় হয়। মাথায় বুদ্ধি থাকলে বিনি পয়সায় ব্যবসা করা যায়। শোন তবে,— সকালে একটা ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বো। পথে ঘাটে কত লোহার টুকরো পড়ে আছে, রেল লাইনের ধারে নাট বল্টু পড়ে আছে। সেগুলো কুড়িয়ে এনে একদিন বেচে দিলেই পয়সা। তোরা দেখিস নি, আমহার্স্ট স্ট্রীটেই তো লোহা-লক্কড়ের দোকান আছে।

কেবু রীতিমত রেগে গিয়ে বললে,

—ছোটমামা খবরদার এসব করতে যাস না। তুই মারা পড়বি। ছোটলোকদের মত ঝোলা কাঁধে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে তোকে গোসাঁই বাড়িতে আর পাত পেতে খেতে হবে না। দাদু তোকে সত্যি ত্যাজ্য পুত্র করবেন—

আমি বললাম,

—তার চেয়ে তুই একটা তেলেভাজার দোকান কর ছোটমামা। আমি তোকে টাকা দেব।

কেবু আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে,

—কি বললি, ছোটমামা মেনো ময়রার মত দোকানে তেলেভাজা বিক্রি করবে?

বললাম—তা কেন? লোক রেখে বিক্রি করাবে। কেউ জানবে না। একটা উনুন একটা কড়াই, দু'চার সের সরষের তেল, কাঠ, কয়লা আর একটা লোক। দোকান ভাড়া করতে হবে না। হয় স্টেশনের ধারে কিংবা কোর্টের আশেপাশে কারও দাওয়ায় বসে লোকটা ভাজবে আর বিক্রি করবে। সন্দেহ হলে ছোটমামা লোকটার কাছ থেকে লাভের টাকা বুঝে নেবে—

ছোটমামা লাফিয়ে উঠল,

—হুররে। হাবু তুই ঠিক বলেছিস। বল, কবে টাকা দিবি। আমাকে উনুন কয়লা কাঠ কিনতে হবে না। লোকও আছে। স্রেফ, তেল আলু বেগুন আর কড়াই খুন্তি—ব্যাস। বল, কত টাকা দিতে পারবি।

বললাম,—প্রথম কুড়ি টাকা নিয়ে শুরু কর।

ছোটমামা দারুণ খুশী।

তখনই সে কাজে নেমে পড়তে চায়। কিছুতেই ওকে আটকানো গেল না।

বেনারসী নামে একটা বেঁটে হিন্দুস্থানীকে বস্তি থেকে টেনে নিয়ে এসে আমাকে বললে,

—এই দেখ হাবু, এই বেনারসী তেলেভাজা ভাজতে রাজী আছে।

—ও জানে তো ?

—খুব জানে। কিরে বেনারসী, তুই তেলেভাজা ভাজতে পারবি না।

—হ্যাঁ, কেনো পারবো না। হামি আগে তো তেলেভুজার দোকান করিয়েছিলাম। লেকিন কি করবো বাবু, কোলেজের ছেলেরা এতো ধার মাংতে লাগল যে হামাকে ডুকান তুলে দিতে হল। এক একদিন হামি পন্‌রো টাকার তেলেভুজা বিক্রি করথম হাঁ।

—ব্যাস ব্যাস ওতেই হবে। দে দে হাবু টাকা দে। কাল সকাল থেকেই শুরু করে দেব।

—কোথায় দোকান করবি ?

—কেন বাজারে। শা-দের বাড়ির সামনে রোয়াকে বসে ভাজবে। কেউ কিছু বলবে না। মারদিস্ কেল্লা—

ছোটমামা তুড়ি মেরে আনন্দ প্রকাশ করল।

আমি কুড়িটা টাকা ওর হাতে তুলে দিলাম। ছোটমামা বেনারসীকে নিয়ে চলে গেল।

কেবু মোটেই সন্তুষ্ট নয়। বললে, মনে থাকে যেন কারগালি যাবার সময় ট্রেনে খাবার পয়সা পাবে না। তোমার ভাগের কুড়ি টাকা খতম—

বললাম,—খতম কেন হবে। আজ না হয় কাল টাকা ফেরত পেয়ে যাব। তুই কি বলতে চাস, তেলেভাজার মত মুখরোচক খাবার বিক্রি হবে না।

কেবু বিরক্ত হয়ে বললে,

—ডুচার পয়সা বিক্রি হবে, বাকীটা হয় ফেলা যাবে নয় ছোটমামার বন্ধুদের পেটে যাবে। কেউ পয়সা দেবে না। ছোটমামাকে আজও তুই চিনলি না। ও চালাবে তেলেভাজার দোকান। তবেই হয়েছে—

ছোটমামার চরিত্র আমার অজানা নয় তবু কেন জানি না ওকে কোন বিষয়ে নিরাশ করতে মন চাইত না। ওর মন ছিল সহজ সরল। যা কিছু করত সহজ মনের বিচারে করে যেত। বয়সের তুলনায় মন গড়ে ওঠেনি। নইলে প্রথম থেকেই ওকে এড়িয়ে চলতে পারতাম। যেমন চলতেন মামার বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা। সকলের ধারণা ছিল দুলালের দ্বারায় কোন কাজ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ওর ব্যক্তিত্বের ওপর কারও এক ফোঁটা শ্রদ্ধা ছিল না।

দাদু আর মামারা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছিলেন যে দুলাল জীবনে কিছুই করতে পারবে না। ও একটা বোঝা স্বরূপ। তাই ছোট থেকেই ওকে সবাই হেনস্থা করত। অথচ আজ—ছোটমামার জন্যে কাউকেই চিন্তা ভাবনা করতে হয় না। বরং ছোটমামাই সকলের জন্যে চিন্তা করে, ভাবে। প্রয়োজন পড়লে ছোটমামার কাছে এখন অনেককেই হাত পাততে হয়।

যাক গে, আজকের কথা নাই বা বললাম। অতীতের ঘটনাতেই ফিরে আসা যাক—

হ্যাঁ যা বলছিলাম, সেদিন ছোটমামার তেলেভাজার দোকান বিকেলের দিকে আরম্ভ হল।

কি উত্তেজনা। শা-দের বাড়ির লাগোয়া রোয়াক-টা বেনারসী ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা তোলা উনুনে তেলেভাজা ভাজতে আরম্ভ করেছে।

মাটির একটা পাত্রে বেসন গুলে পেঁয়াজ কুচিয়ে মেখেছে। কোথা থেকে একটা কড়াই এসেছে খুন্তি এসেছে। কোন কিছুর অভাব নেই।

আমি কেবু একবার ঘুরে এলাম। ছোটমামাকে দেখলাম শা'দের বাড়ির বিপরীত দিকের বাড়ির উঁচু ধাপিতে উপু হয়ে বসে আছে। ওর পাশে রয়েছে একটা মোটাসোটা লাঠি—

ওকে বললাম,—তুই এখানে বসে আছিস কেন। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবি—। নইলে লোকে সন্দেহ করবে—

ছোটমামা বললে,

—আমার যাবার উপায় নেই। গেলেই লস্—

—লস্—?

—হ্যাঁ হ্যাঁ লস্, মানে ক্ষতি—

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কেন ক্ষতি হবে কেন—

—ছাগলের জন্যে—

—তার মানে ?

—তার মানে শা-দের রোয়াকটায় ছাগল থাকত। ছাগলগুলোকে তাড়িয়ে ঝুড়ি নাদি পরিষ্কার করে বেনারসীকে বসিয়েছি। কিন্তু তবু কি রেহাই আছে। বার বার ছাগোলগুলো আসছে। বেনারসী একা পেরে উঠছে না। একটু আগে একটা রামছাগল এসে রোয়াকে আবার নাদি ছেড়ে গিয়েছিল। বেনারসী যেই ছাগলটাকে তাড়াতে গেছে অমনি এক ঢুঁ। বেনারসীও চিৎপাত। ঐ দেখ না, নীচে নালিতে কত পেঁয়াজ বেগুন পড়ে গেছে।

—তাই তো রে—তাহলে কি করবি ?

—কি আবার করবো। লাঠি নিয়ে বসে আছি। ছাগলটা এলেই রাম ধোলাই—

কেবু বললে,—তোর সব ব্যাপারেই দেখছি একটা না একটা বিপদ লেগেই আছে। বেড়ালে পায়রা খাচ্ছে, ছাগলে তেলেভাজার দোকান তুলে দিচ্ছে—

ছোটমামা বিজ্ঞের মত বললে,

—এসব হচ্ছে ভগবানদার পরীক্ষা। বুঝলি, শুধু ইস্কুলের পরীক্ষায় পাস করলে হবে না। ভগবানদার পরীক্ষাতেও পাস করতে হবে। সবে তেলেভাজা দিয়ে এষ্টার্ট—এর পরে দেখবি গামছার দোকান, তারপর কাপড়, তারপর ওষুধ, সবার শেষে দেখবি আমি হোল-সেল ডীলার।

কথা বলতে বলতে আমরা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। তখন বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। জুট মিলের ছুটি হলে শয়ে শয়ে লোকের ভিড় হবে। তেলেভাজা সেই সময়েই বিক্রি হবে সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু তার আগে ঘটে গেল আর এক বিপদ। বোধহয় দু তিনশো ছাগল নিয়ে এসে পড়ল দু চারজন রাখাল। ওরা রোজই সকালে ছাগল চরাতে যায় মাঠে আর বেলা পাঁচটায় ফেরে। ওদের আস্তানা হচ্ছে শা-দের বাড়ির ভেতরের উঠোনে। শুধু তাই নয়। শা-দের রোয়াকেও থাকত দশ পনের কিংবা বিশটা ছাগল। শা-দের বাড়িটা যে বর্তমানে বেওয়ারিস সম্পত্তি, বাড়িটা যে উটকো লোকে বেমালুম দখল করে ছাগলের গোডাউন করেছে সে খবর ছোটমামার জানা ছিল না। তাই অঘটন ঘটে গেল।

আমরা অন্যমনস্ক হয়ে গল্প করছি হঠাৎ বেনারসীর চিৎকারে পিছন ফিরে দেখি শয়ে শয়ে ছাগল।

হেই হেই করে ছোটমামা লাঠি হাতে করে ছুটলো বেনারসীকে সাহায্য করতে। কিন্তু অতগুলো ছাগলকে টপকে যাওয়াও দুরূহ ব্যাপার। তার আগেই বেনারসী কুপোকাত—

ছোটমামার তাড়া খেয়ে ছাগলগুলো এলেমেলো ভাবে ছোটাছুটি করতে লাগল।

উনুন উলটে গেছে। পিয়াজ বেগুন নর্দমায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। তেলের শিশি চুরমার, যেগুলো ভাজা হয়েছিল সেগুলো উধাও। যেগুলো তখনও ভাজা হয়নি সেগুলো চার পাঁচটা ছাগলে খেতে শুরু করেছে—ইত্যাদি—

সে এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার।

চক্ষের নিমেষে এতগুলো কাণ্ড ঘটে গেল।

ছোটমামা রাগে দিশেহারা।

হাতের কাছে একটা বাচ্চা ছাগলকে পেয়ে সজোরে তার পিঠে লাঠি বসিয়ে দিল।

ব্যাস, ছাগলটা বেমক্কা মার খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

আর যায় কোথায়, যারা ছাগল চরাতে গিয়েছিল, অর্থাৎ চার পাঁচটা তাগড়াই মুসলমান ছুটে এসে ঘিরে ফেলল ছোটমামাকে।

—তুম্ কাহে মার ডালা বোলো।

ছোটমামা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, মারেগা নেই। আমার দোকান তোমাদের ছাগল লণ্ডভণ্ড কিযা হ্যায়। আমার ব্যবসা লোপাট করা হ্যায়। উসকা দাম কে দেবে হ্যায়।

ওরা লাঠি বাগিয়ে বললে,

—কাহে তুম্ ইধর দুকান লাগায়া থা। ইয়ে জাগা হামলোগোঁকো হ্যায়। তুম কাঁহে আয়া বোলো। হামলোগ নেহি ছোড়েঙ্গে। ছাগলকা দাম দো। নেহিতো তুমকো হাড্ডি নিকাল লেগা—

লোকগুলো লাঠি তুলে ছোটমামাকে মারতে গেল।

ব্যাস ছোটমামাও সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না নামক অস্ত্রটি প্রয়োগ করে বসল।

এমন কান্না মুসলমান রাখালগুলো বোধহয় জীবনে শোনেনি।

—ওরে বাবা রে—এ আমাকে এরা মেরে ফেল্লে রে, তোরা কে কোথায় আছিস রে আমাকে বাঁচা রে—এ—এ—এ—

এক সঙ্গে দশটা মাইক যদি দশ রকম আওয়াজ করে এক সাথে বেজে ওঠে

তাহলে যেরকম শোনাবে অনেকটা সেই রকমের আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল ছোটমামার গলা থেকে।

মুসলমান রাখালগুলো হতবাক্। ওদের হাতের লাঠি আর উঠল না। দেখতে দেখতে আশেপাশের দোকানদার, জুট-মিলের লোকেরা এসে জড় হল।

—কি হল কি হল—

ছোটমামা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

—আমার সর্বনাশ করে এখন চারজনে মিলে আমাকে ঠ্যাঙ্গাতে এসেছে। ওরে বাবা রে —এ—এ—তোমরা সবাই বিচার কর গো—ও—ও



মুসলমান রাখালগুলো হতবাক্। ওদের হাতের লাঠি আর উঠল না।

অতগুলো লোক ঘিরে ধরতে রাখাল লোকগুলোর ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

ওরা তাড়াতাড়ি ছোটমামার পিঠ চাপড়ে বললে,—ঠিক আছে বাবু, তুমাকে দুঃখ কোরতে হোবে না। হামাদের কসুর হয়ে গেছে। হামরা তুমাকে একটা ভাল ছাগল দিচ্ছে তুমি লিয়ে যাও।

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র ছোটমামা চুপ করে গেল। যারা ভিড় করেছিল তারা ছোটমামাকে খেসারত দেওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

অর্থাৎ কিনা দপ্ করে যে আগুনটা জ্বলে উঠেছিল সেটা সহসা নিভে গেল।

নইলে সেদিন বোধহয় রায়েট বেধে যেত।

যাই হোক, ওরা একটা নাদুসনুদুস ছাগলের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে এসে ছোট-মামাকে উপহার দিয়ে বিদেয় করল।

রাজকুমার মৈত্র

ছোটমামা মহাখুশী। বেনারসীর হাতে কড়া খুন্তিটা দিয়ে ছোটমামা বললে,— বেনারসী এ দুটো ভাল করে মেজে আমাদের বাড়িতে দিয়ে আসবি। খবরদার যেন মা কিংবা ভবানী টের না পায়। ওগুলো পূজার বাসন।

আমরা আঁতকে উঠলাম।

ছোটমামা বলে কি পূজোর বাসন লুকিয়ে নিয়ে এসে তেলেভাজা ভাজতে বসেছিল। সর্বনাশ, দিদিমা কিংবা ছোটমাসীমা জানতে পারলে যে রক্ষে রাখবে না।

কিন্তু ছোটমামার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

পথে যেতে যেতে সে নিজের মনে আনন্দে গেয়ে উঠল,

তেলেভাজার বদলে ছাগল পেলাম তাক্ ডুমাডুম্ ডুম—

* * * *

—ব্যা—

বাড়ির উঠোনে ছাগল ডেকে উঠতে দাদু এবং তিন মামা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

বাড়িতে ছাগলের ডাক শোনা গেল কেন। কার ছাগল এল। কি করে এল।

সকলে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছোটমামাকে উঠোনে ছাগল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক্।

ছোটমামা খুশীতে ডগমগ।

বললে,—বাবা, মা এই দেখ ভর সন্ধ্যেবেলা আমি একটা ছাগল রোজগার করে নিয়ে এলাম। এই ছাগলটা আমি পুষবো। ছাগলওয়ালারা বলেছে—ওদের পালের সেরা ছাগল। রোজ দু সের করে দুধ দেবে। জানো ছাগলের দুধ খেলে কখনও টি. বি. হয় না। শ্রীরামপুর শহরটা তো টি. বি.র আড়ৎ।

ছোটমামার কথা শুনে দাদু রাগে কাঁপতে লাগল।

আমরা দু ভাই তখন ভয়ে জড়সড়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, ছোটমামা যেন তেলেভাজার দোকানের কথাটা বলে না বসে।

সেজমামা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—তা তো বুঝলাম ছাগল পুষবি। কিন্তু ছাগলটা পেলি কোত্থেকে। চুরি ফুরি করেছিস নাকি—

ছোটমামা হাসতে হাসতে বললে,—এত বড় গোসাঁই বংশের ছেলে হয়ে চুরি করতে যাব কেন।

বলেই সে তুড়ি মেরে গেয়ে উঠল, তেলেভাজার বদলে ছাগল পেলাম তাক ডুমাডুম ডুম—

ছোটমামার কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। দেখলাম কেবু কপাল চাপড়াচ্ছে। অর্থাৎ কিনা, সে বলতে চায়, এত করে শেখালাম তবু ছোটমামা ফাঁস করে দিল।

ছোটমামার গান শুনে উপস্থিত সকলে অবাক্।

দাদু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন,

—তেলেভাজার বদলে ছাগল পেলি কিরকম--?

—শুনবে? শোনো তবে—

ছোটমামা বলতে লাগল,—বাজারে আমি একটা তেলেভাজার দোকান খুলেছিলাম।

—কি বললি—?

আতকে উঠলো সবাই, তুই তেলেভাজার দোকান করেছিলি?

—হ্যাঁ গো। শোন না সবটা। হাবুর কাছ থেকে কুড়ি টাকা নিয়ে মালমসলা কিনে আমি বেনারসীকে শা-য়েদের রোয়াকে বসিয়েছিলাম। কিন্তু—

ছোটমামার বলা হল না দাদুর বিদ্যাসাগরের চটি এসে লাগল ছোটমামার বুকে। তারপরই শুনতে পেলাম দাদুর হুংকার—

—বেরো, বেরো, এক্ষুণি আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যা নইলে আমি তোকে খুন করে ফেলব। গোসাঁই বাড়ির ছেলে হয়ে তুই কিনা শা-দের রোয়াকে বসে তেলেভাজা বিক্রি করেছিস—ছি-ছি—আমাদের মান সম্মান সব গেল—

ঠিক সেই সময় বেনারসী কড়াখুন্তি নিয়ে এসে হাজির।

ওকে বলা হয়েছিল লুকিয়ে আনতে তা সেটা ভুলে গিয়ে সে একেবারে সকলের সামনে এনে হাজির করল।

কড়া খুন্তি দেখে দিদিমার চোখ কপালে উঠে গেল।

—য়্যাঁ, একি করেছিস দুলাল? তুই ঠাকুর দেবতার ভোগ রাঁধবার কড়াই নিয়ে গিয়েছিলি তেলেভাজা ভাজতে। গেল গেল আমার সব গেল।

ওঃ, সে-রাত্রের কথা ভাবলে আজও আমার বুক কেঁপে ওঠে। ছোটমামাকে যেন সপ্তরথীতে ঘিরে ধরেছিল বধ করার জন্যে। ভাগ্যিস সেই সময় আমার বাবা এসে পড়েছিলেন তাই রক্ষে। নইলে ছোটমামার হাড় কখানা আর আস্ত থাকত না।

● রাজকুমার মৈত্র

সমস্ত ঘটনা শুনে বাবা হাসতে হাসতে বললেন,—তা ভালই হয়েছে। ছাগলের দুধ বিক্রি করে যদি শ্রীরামপুর শহর থেকে টি. বি. রোগ তাড়াতে পারে তাহলে ওকে আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী করে দেব। কি বল দুলালবাবু—

ছোটমামা লজ্জিত হল।

দিদিমা বললেন,—গেরস্থর বাড়িতে ছাগল পুষতে নেই, সংসারের অকল্যাণ হবে। তার চেয়ে ও আপদকে বেনারসী নিয়ে যাক। দুধ বিক্রি করতে হয় বেনারসী করুকগে।

ছোটমাসীমা বললেন,—মাগো কি ঘেন্না। ছাগলের দুধ খেলে শুনেছি নাকি গা দিয়ে ছাগলের গন্ধ বেরোয়।

বেনারসী এতক্ষণ চুপ করে উঠোনে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছিল। ছাগলের দুধের কথা শুনে সে বললে,

—এ মা, ছাগলের দুধ কাঁহা সে মিলেগা। এটা তো ছাগল নয়, পাঁঠা আছে।

—য়্যাঁ পাঁঠা—?

আবার একটা চমক। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

যাক এতক্ষণে ফাঁড়া কাটলো।

॥ তিন ॥

দাদু বাবাকে বললেন,

—তুমি কদিন দুলালকে কারগালিতে নিয়ে যাও বাবাজী। আমরা একটু শান্তিতে থাকতে চাই। ওর জন্যে আমাদের পাড়ায় থাকা দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

দাদুর মন্তব্য শুনে আমরা দুঃখিত হযেছিলাম সত্যি, কিন্তু ছোটমামা আমাদের সঙ্গে কারগালি যাবে জেনে দুঃখ ভুলতেও সময় লাগেনি।

কিন্তু ছোটমামা গুম।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বেচারা কাঁদতে লাগল।

আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ছোটমামা তুই কাঁদছিস কেন? কারগালিতে গিয়ে আমরা কত মজা করবো। তোকে আমাদের নবরত্ন সভার মেম্বার করে দেব।

বগলামামার সঙ্গে পরিচয় হলে তুই আর কখনও কারগালি ছেড়ে আসতে চাইবি না। চুপ কর, চুপ কর। কাঁদিস না—

ছোটমামা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে,

—কাঁদছি কি আর সাধ করে। আমি চলে গেলে পায়রাগুলোর কি হবে। কে ওদের জন্যে ব্যায়াম সমিতি থেকে ছোলা গ্যাঁড়া মেরে আনবে বল।

—গ্যাঁড়া মারতে হবে কেন। মনুকে দশটা টাকা দিয়ে গেলেই হবে। মনু পায়রাগুলোকে ছোলা দেবে—

—মনু কি পারবে?

—কেন পারবে না। আলবত পারবে। ঠিক আছে কাল সকালে মনুকে আমি বলব।

—টাকা কোত্থেকে দেব—

—টাকার জন্যে ভাবিস না। কেবুর কাছে এখনও কুড়ি টাকা আছে। আমরা দু ভাই থাকতে তোর ভাবনা কিসের—

ছোটমামা চুপ করল। পরের দিন সকালে আমরা মনুর কাছে গেলাম। মনু হচ্ছে ছোটমামার খুড়তুতো ভাই। সুতরাং সে আমাদের অনুরোধ ফেলতে পারল না। এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

তারপর থেকে ছোটমামা মহা খুশী। তার মনে আর কোন দুঃখ রইল না।

রাত্রে দুন এক্সপ্রেসে আমরা রওনা হলাম কারগালির পথে। পরের দিন সকালে বাড়ি পৌঁছে ঘণ্টা দুয়েক পরে বাবা আফিসে যেতেই ছোটমামাকে নিয়ে গেলাম বগলামামার কোয়ার্টারে—

ত্রিদিব, ফণি, নাড়ু, সাধন, অরুণ, ঝাণ্টু আর ধনুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল।

ওরা ছোটমামাকে দেখে খুশী হয়ে বললে,—তাহলে আজ থেকে আমরাও তোমাকে ছোটমামা বলে ডাকব। হাবু কেবুর মামা আমাদের মামা।

ত্রিদিব বললে,—কাম সারছে। একই বোর্ডে দুইড্যা স্ট্রাইকার—। হালায় বগলামামুরে লইয়া আমাগো প্রাণ ওষ্ঠাগত তার উপর ছোটমামা আয়া জুটল। হালায় কোলিয়ারী লাট খাইবো দেখত্যাছি—

আমরা হেসে উঠলাম।

ছোটমামার দিকে আড়চোখে তাকাতে দেখলাম সেও হাসছে।

● রাজকুমার মৈত্র

অর্থাৎ আমার বন্ধুদের ওর ভাল লেগেছে।

বাঁচা গেল।

* * * *

বগলামামা কোয়ার্টারে ছিলেন না। সুতরাং আমরা পাঁচিল টপকে কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকলাম। আমাদের ক্লাবঘর দেখে ছোটমামার চক্ষুস্থির।

আমাকে লক্ষ্য করে বললে,—হ্যাঁরে হাবু, তোদের ক্লাবের সবই কি গাঁড়া মারা।

বললাম,—হ্যাঁ।

নাড়ু বললে,—নইলে এতগুলো খেলার সাজসরঞ্জাম আমরা কোথায় পাব। কে দেবে আমাদের।

অরুণ ততক্ষণে রান্নাঘরে খুটখুট করছে।

অর্থাৎ আমরা বগলামামার কোয়ার্টারে গিয়ে প্রত্যেকবার যেমন গরম গরম পরটা আর চা নিজেরাই তৈরি করে খাই এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। অরুণ চটপট সেগুলোর ব্যবস্থা করতে লাগল।

তাস, ক্যারাম নিয়ে আমাদের আড্ডা যখন বেশ জমে উঠেছে ঠিক সেই সময় বগলামামাও আমাদের মত পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকলেন।

আমরা অবাক্।

—একি বগলামামা আপনি পাঁচিল টপকে কেন। দরজার তালা খুলে এলেই তো হতো। খামাকা কষ্ট করতে গেলেন কেন?

বগলামামা জুলজুল করে আমাদের প্রত্যেককে দেখলেন। তারপর ধীরে সুস্থে তরিয়ে তরিয়ে বললেন,

—দূর থেকে দেখলাম আমার কোয়ার্টার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তখনই বুঝেছি তোরা পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছিস।

ত্রিদিব বললে,—তা আপনে পাঁচিল টপকাইলেন ক্যান। এত বড় ভুঁড়ি লইয়া যদি অ্যাকসিডেন্ট করতেন—

—ত্রিদিব—

বগলামামা সুর টেনে ত্রিদিবের দিকে তাকাতে সে ঢোঁক গিলে ছোটমামার দিকে একবার তাকিয়ে বললে,

—বুঝেছি।

বগলামামা ভারিক্কী চালে খাটিয়ার ওপর বসতে বসতে বললেন,—আজ থেকে আমি আর কখনো দরজায় তালা লাগাব না। চাবিটা ফেলে দিয়েছি—

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

বগলামামা কি বলতে চাইছেন। হঠাৎ চাবি ফেলে দিতে গেলেন কেন।

আমরা যখন বেকুফের মত তাকিয়ে আছি তখন ছোটমামা বলে,

—কিরে তোরা ভদ্রলোকের কথা বুঝতে পারছিস না। উনি বলতে চাইছেন, দরজায় তালা দেওয়া সত্ত্বেও তোরা যদি পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে চা-পরটা সাঁটিয়ে আড্ডা দিতে পারছিস তখন তালা দেওয়ার কোন মানে হয় না—

এতক্ষণে বগলামামার নজর পড়ল ছোটমামার ওপর।

তিনি ভ্রুকুটি করে প্রশ্ন করলেন,

—হাবু, এই মহাপুরুষটি কে, কোত্থেকে আগমন করেছেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম,

—ও হচ্ছে আমার ছোটমামা। শ্রীরামপুর থেকে আজই আমাদের সঙ্গে এসেছে।

—হুম্, তোর ছোটমামা। মানে আমাদের পূজ্যপাদ বীরেশ্বরদার শ্যালক।

ত্রিদিব ফুট কাটল,

—আরও সহজ কইর‍্যা কমু। ছোটমামা হইত্যাছে ওর বাপের ছোট ছাওয়াল।

—ত্রিদিব, আবার ফচকেমো করছিস—

নাড়ু বললে,

—ঠিক কথা। ত্রিদিব যেন দিনকে দিন বড় ফচকে হয়ে যাচ্ছে। গুরুজন-টুরুজন মানামানি নেই—

ফণি হাসতে হাসতে নাড়ুকে বললে,

গুরুজন মানে বুঝলাম, কিন্তু টুরুজন-টা কি বাবা?

ছোটমামা ফস করে বললে,

—কিছু না। ওসব ছোটলোক-টোটোলোকে বলে—

সবাই হেসে উঠল।

ছোটমামা বেকুফ। বগলামামা উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে ছোটমামার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন,

—ব্রেভো ব্রেভো ব্রাদার। তুমি আমার উপযুক্ত ছোট ভাই হতে পারবে। এস্না

সব ছোটলোক-টোটোলোকের সঙ্গে মিশে গুরুজন-টুরুজনকে আর মানছে না। যাকগে, ব্রাদার তোমার সম্মানে কাল আমরা দামোদর নদীর ধারে মিনিয়েচার ফর্মে একটা পিকনিক করবো। কিরে তোরা রাজী—

আমাদের প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

এইটেই তো আমরা চাই। বছরের বেশির ভাগ সময় ইস্কুলে বোর্ডিং-এ থেকে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠতাম।

ছুটি হলেই তাই বাড়িতে এসে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত অনাবিল আনন্দের মধ্যে হইচই করে কাটিয়ে দিতে চাইতুম।

যাই হোক, বগলামামার কথায় আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম সবাই।

—যাব যাব যাব চলেই যাব।

বগলামামা বললেন,

—বেশ তবে আজই তোরা দু টাকা করে চাঁদা দে—

—চাঁদা— ?

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

ধন্টু বললে, সেটা আবার কি জিনিস—

বগলামামা মুচকে হেসে ছোটমামাকে বললেন,—ব্রাদার শোন কথা। বলে চাঁদা কি জিনিস জানে না। তুমি একটু কিলিযার করে দাও—

ছোটমামা বেশ গম্ভীর হয়ে বললে,—চাঁদার মানে চাঁদা। আরও সহজ মানে হলো পাঁচজনের পকেট থেকে টাকা এক জায়গায় জমিয়ে খরচ করা।

অরুণ বললে,—আমাদের বন্দে মাতরম্ ক্লাবেই তো টাকা আছে। গত ছুটিতে আমরা দু টাকা করে চাঁদা দিয়েছিলাম সেগুলো তো খরচ হয়নি।

বগলামামা সঙ্গে সঙ্গে টুল চাপড়ে বললেন,

—আলবত খরচ হয়েছে। এই যে তোরা রোজ পরটা আর চা সাঁটাচ্ছিস এগুলো জুটছে কেমন করে। সব ক্লাবের পয়সা—

ত্রিদিব চোখ পাকিয়ে বললে,

—কি কইছেন মামু, এসব আমাগো ক্লাবের পয়সা ?

—আজ্ঞে। নইলে কি আমি গ্যাঁট থেকে দেব।

—বুঝছি। হাবু, আমাগো বগলামামা আইজকাল আর মামু নাই, বিজনেস ম্যান হইয়া গেসে—

ফণি বললে,

—একি একি বগলামামা, এ ভারী অন্যায়। আপনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যমণি। আপনি যদি আমাদের চা-পরটার জন্যে টাকা নেন তবে আমরা অনাথ হয়ে যাব। না খেয়ে রোগা হয়ে যাব—

বগলামামার ওষ্ঠে সগর্ব হাসি ফুটে উঠল। বললেন,

—ঠিক আছে ঠিক আছে, তোদের যখন এতই আপত্তি তখন না হয় ক্লাবের টাকাতেই এবার পিকনিক করা যাবে। কিন্তু—

নাড়ু বললে,

—আবার কিন্তু—

সাধন বললে,

—নো কিন্তু—

বগলামামা থামিয়ে দিলেন,

—চুপ কর চুপ কর। একটা কিন্তু এখনও আছে। আর সেটা হচ্ছে এ সপ্তাহে তোদের ফুটবল ম্যাচ আছে—

—ম্যাচ। কার সঙ্গে, কোন্ টিম।

ত্রিদিব বললে,

—ইস্টবেঙ্গল নাকি—

বগলামামা বললেন,—ত্রিদিব ফক্কুড়ি করিস না। ইস্টবেঙ্গল আবার কবে খেলা শিখল।

ত্রিদিব রুখে ওঠে,

—কি কইলেন ইস্টবেঙ্গল খেলতে জানে না?

—না জানে না। ১৯২৬ সালে আমি যখন মোহনবাগানের হয়ে খেলেছিলাম—

নাড়ু কেশে উঠল।

বগলামামা চুপ করে গেলেন।

—কে কাশল, নিশ্চয় নাড়ু—

নাড়ু তাড়াতাড়ি বললে,—কিছু মনে করবেন না বগলামামা গলায় থুতু আটকে গিয়েছিল।

বগলামামা শান্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন,—হ্যাঁ যা বলছিলাম, মোহনবাগানের সঙ্গে খেলতে নেবে আমি বাঁ পায়ে স্যুট্ করে ইস্টবেঙ্গলকে দু-দুটো গোল দিয়েছিলাম।

ছোটমামা খুকখুক করে হেসে উঠল।

আমি ওকে চিমটি কেটে থামাতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলাম।

ছোটমামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল,

—কিরে চিমটি কাটছিস কেন ?

—হাসছিস কেন ?

—হাসব না। এই বেঁটে লোকটা বলে কি। ইস্টবেঙ্গলকে দু-গোল দিয়েছে। বগলাদা, আপনি তো দেখছি দারুণ গুলবাজ।

সর্বনাশ। ছোটমামা বলে কি। এরপর বগলামামা ওকে যে দল থেকে ছাঁটাই করে দেবেন।

আমি তাড়াতাড়ি ছোটমামাকে ধমকে উঠলাম,

—ছোটমামা চুপ কর। কার সামনে কি বলছিস। বগলামামা জীবনে কখনো গুল মারেননি।

ছোটমামা দমে যাবার পাত্র নয়। বললে,

—কে বললে। এই তো মারলেন। উনি মোহনবাগানের হয়ে ফুটবল খেলেছেন ?

—হ্যাঁ খেলেছেন। একশোবার খেলেছেন।

বগলামামার মুখখানা থমথম করছিল।

আমি তেড়ে উঠতে উনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

—তোর ছোটমামার নাম কিরে ?

—দুলালচন্দ্র গোস্বামী—

—হুম্। ব্যাস বুঝে নিয়েছি আর বলতে হবে না।

—কি বুঝেছেন ?

—গো-স্বামী। অর্থাৎ গো মানে গরু আর স্বামী মানে স্বামী। তার মানে এক কথায় ষাঁড়।

ছোটমামা গেল ক্ষেপে।

—কি ? কি বললেন আমি ষাঁড়। মানে, মানে, আমি শিবুদার বাহন।

—ছোটমামা ছোটমামা প্লিজ রাগ করিস না। বগলামামা তোর সঙ্গে মস্করা করছেন। তুই ষাঁড় হতে যাবি কোন্ দুঃখে—

ছোটমামা ঝপ্ করে নিভে গেল যেন।

—ও মস্করা হচ্ছে। তাহলে ঠিক আছে। বলুন তারপর—

বগলামামা বললেন,

—দেখ দুলাল ব্রাদার, তুমি যা জান না তা নিয়ে ফটফট করবে না। তুমি কেন বললে আমি গুল মারছি—

ছোটমামা বললে,

—বেশ বাবা ঘাট মানছি। আপনি গুল মারেননি।

আমি ওদের ঝগড়া থামিয়ে দেবার জন্যে বললাম,—বগলামামা, ফুটবল ম্যাচের কথা পরে হবে, এখন বলুন কালকের পিকনিকে কি কি মেনু হবে—

বগলামামা চুপ করে রইলেন।

ছোটমামা ঘাট মানতে তিনি মনে মনে আরও চটে গেলেন বোঝা গেল।

ত্রিদিব বললে,—কি আবার হবে। মুরগী আর ভাত—

ঝাণ্টু বললে,

—মুরগী হলে খরচা নেই।

—কেন ?

ডাঃ তাহের হোসেন থাকতে—

কথাটা বগলামামার কানে যেতে তাঁর চোখ দুটো জ্যোতিষ্কের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখ বন্ধ করে তিনি শুধু বললেন,

—সাধু—সাধু—সাধু—আহা কি নাম শোনালি!

বগলামামার রাগ জল হয়ে গেল।

ত্রিদিব বললে,—বগলামামু আপনে ভট্টাচার্যির পোলা হইয়া মুরগী খাইবেন।

—না বাবা ত্রিদিব খাব না। তোরা খাবি আমি দেখবো। ওরে ঝাণ্টু, তুই যেন বাবা ডাঃ হোসেনের মুরগী-টুরগীর ওপর লোভ দিস না বাবা। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।

ছোটমামা কেন জানি না আনন্দে তুড়িলাফ মেরে বললে,

—চুরি করা মহাবিদ্যা, যদি না পড় ধরা। ধরা পড়লেই মরা—আহা, হাবু তুই আমায় কোন্ দেশে নিয়ে এলি রে। এ দেখছি আমার মত সবাই—

* * * *

দামোদরের ধারে পিকনিক। সারারাত ঘুম নেই চোখে। ঝাণ্টু ভোরবেলা আসবে। ডাঃ হোসেনের কোয়ার্টারে গিয়ে চার চারটে মুরগী না বলে নিয়ে আসতে হবে।

এক একটা মুরগীর ওজন দেড় দুসের। কেবু বললে,—দেখ হাবু, ছোটমামাকে খবরদার সঙ্গে নিয়ে যাস না। মুরগী চুরি করতে গিয়ে শেষে কেলেঙ্কারী বাধিয়ে না বসে।

কিন্তু ছোটমামাকে ঠেকানো গেল না। ভোরবেলা সে আমাদের সঙ্গে চলল।

রাত তখন চারটে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডাঃ হোসেনের কোয়ার্টারটার সামনে আবার একটা লাইটপোস্ট রয়েছে। আলোর জন্যে আমাদের নানান অসুবিধে দেখা দিল।

মুরগীর ঘরটা সামনেই।

যদি কেউ জেগে ওঠে তাহলেই সর্বনাশ। চিনে ফেলবে।

সুতরাং—

ছোটমামা বললে,—হাবু লাইটটা নেভানো যায় না?

ঝাণ্টু বললে,—ঠিক বলেছ, ছোটমামা নেভালে ভাল হতো।

—কিন্তু কি করে নেভাই।

আমরা ভাবতে শুরু করলাম। কি করে নেভানো যায়।

ছোটমামা বললে,

—অত ভয় করতে গেলে চলে না। দে আমাকে একটা জুতসই ইট দে। এক্ষুণি লক্ষ্যভেদ করে দিচ্ছি—

—ছোটমামা খবরদার বলছি। তোর লক্ষ্যভেদের বহর আমার জানা আছে। বেড়াল মারতে গিয়ে তুই ঝগড়াটি বুড়ীর কলসী ফাটিয়েছিলি মনে আছে।

—য্যা য্যা—একবার ফসকে গেছে বলে কি বারবার ফসকাবে। এইবার আমি প্রমাণ করে দেব যে আমি হচ্ছি অর্জুনদার ভায়েরাভাই।

বলতে বলতে ছোটমামা একটা বড় ইট তুলে নিয়ে আমি নিষেধ করার আগেই বালব্ লক্ষ্য করে পাঁই করে ছুড়ে দিল।

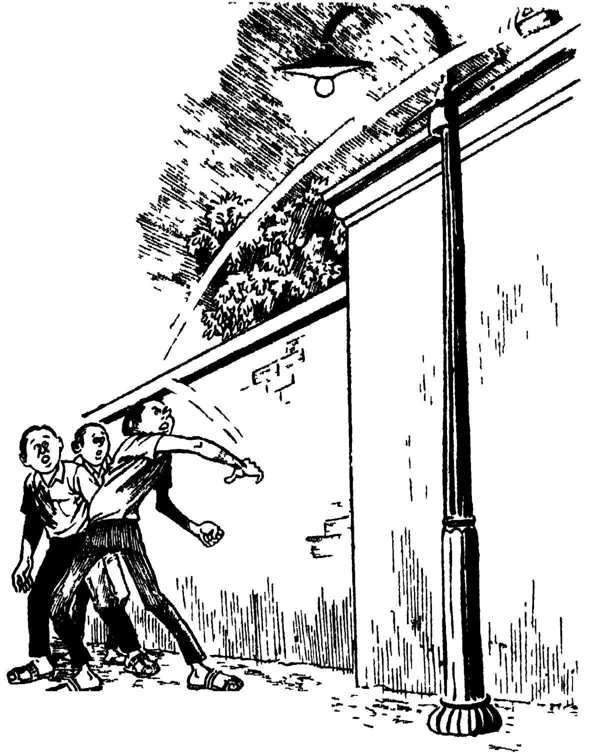
ব্যাস হয়ে গেল।

ইট-টা লাইট পোস্টের পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল ডাঃ হোসেনের কোয়ার্টারের মধ্যে বাথ-রুমের মাথায় টিনের চালের ওপর।

নিশুতি রাতে শব্দটাও হল প্রচণ্ড জোরে। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ হোসেনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম,

—কে—কে—কোন্ শালারে—

আমরা ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ করেছি ঊর্ধ্বশ্বাসে। ছুটতে ছুটতেই আমি ছোটমামার মুণ্ডুপাত করতে লাগলাম।



বালব লক্ষ্য করে পাঁই করে ছুড়ে দিল।

—কে তোকে কায়দা করে লক্ষ্যভেদ করতে বলেছিল। কালকের পিকনিকটা মাঠে মারা গেল। কি জবাব দেব বগলামামার কাছে। যাও, এখন গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে মুরগী কেন। সত্যি ছোটমামা, তোর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—

ছোটমামা চুপ।

আমরা ছুটতে ছুটতে বগলামামার কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হলাম।

বগলামামা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখে দারুণ খুশী।

—কিরে এনেছিস—

হাঁপাতে হাঁপাতে ছোটমামা বললে,

—না দাদা, একটুর জন্যে ক্যাচাইন হয়ে গেল। বালব্ ফাটাতে গিয়ে মুরগী ফসকে গেল।

—য়্যাঁ—

বগলামামা হতাশ হয়ে বসে পড়লেন।

—এ কি শোনালি বাবা। মুরগী না হলে পিকনিকে গিয়ে কি লাভ। হ্যাঁরে দুলালচন্দ্র কে তোকে লক্ষ্যভেদ করতে বলেছিল ব্রাদার। ওসব কি তোর দ্বারায় হয়।

● রাজকুমার মৈত্র

হ্যাঁ লক্ষ্যভেদ করেছিলাম আমি। একশো পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে একবার আফ্রিকার জঙ্গলে একটা উটপাখির চোখে বর্শা ছুড়ে মেরেছিলাম—যাকগে সে সব তোকে শুনিয়ে লাভ নেই। হয়তো ভাববি আমি গুল মারছি। যা হবার তা হয়েই গেছে।

ঝাণ্টু বললে,—মুরগীর বদলে পিকনিকে কি করবে তাই বল। ভোর ছ-টার মধ্যে ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে কখন যাব আমরা।

বগলামামা বললেন,—কৈ পরোয়া নেই। মুরগীর বদলে পায়রা চালাব। বেওয়ারিশ গোলা পায়রা থাকতে ভাবনার কি আছে।

পায়রাতে ছোটমামার ভীষণ আপত্তি। পায়রার নাম শুনে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে,

—হাবু আমার কান্না পাচ্ছে রে?

—কেন কেন—

—শ্রীরামপুরে আমার পায়রাগুলোর কি হাল হচ্ছে কে জানে। মনু যদি ঠিক-মত খেতে না দেয় তবে সব কটা পটল তুলবে। ওরে হাবু রে, আমি যে কান্না চাপতে পারছি না রে। তোরা শীগগির আমাকে হাসাবার চেষ্টা কর—

বলতে বলতে ছোটমামা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল,

—ওরে তোরা পায়রা মেরে খাস না রে—এ—এ। আমি তোদের টাকা দেব রে—এ—এ। তোরা পাঁঠার মাংস খা—রে—এ—এ

বগলামামা বেকুফ।

হাঁ করে ছোটমামার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাকে বললেন,

—বাবা হাবু, এ যন্তর কোত্থেকে আমদানী করলি বাবা। এর গলা দিয়ে দশ বার 'রকমের আওয়াজ বেরোচ্ছে। কোলিয়ারী সুদ্ধু লোক ছুটে এলো বলে। শীগগির ওকে থামা।

কি করি তাড়াতাড়ি ছোটমামার মুখ চেপে ধরে বললাম,

—পায়রা খাব না। হয়েছে—

ছোটমামা চুপ করল। বললে,—হ্যাঁ হয়েছে। খবরদার পায়রা খাস না। শুনেছি পায়রা খেলে কুষ্ঠ হয়।

ইতিমধ্যে কেবু, ফণি, নাড়ু, অরুণ, ধনু আর ত্রিদিব এসে পড়েছিল।

যে যার বাড়ি থেকে চাল আলু পিঁয়াজ মসলা নিয়ে এসেছে।

শুধু ছোটমামার লক্ষ্যভেদ ব্যর্থ হওয়ার দরুন আমরা ডাঃ হোসেনের মুরগী চুরি করতে পারিনি শুনে কেবু বললে,

—আমি জানতাম, দলে যখন ছোটমামা আছে তখন একটা গণ্ডগোল হবেই।

ত্রিদিব বললে,

—তখন আমরা খাইবোটা কি। ফড়িং ধইর‍্যা খাইতে হইবো নাকি?

বগলমামা বললেন,

—এবার আমাদের নিরামিষ পিকনিক হোক। তাছাড়া কোন উপায় নেই। এই ভোরবেলায় কোথায় মাংস পাব। ভেবেছিলাম মুরগীর বদলে পাযরা চালাব কিন্তু ব্রাদার দুলালচন্দ্র এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে পাযরার নাম ইহজন্মে করছি না। আমি জীবনে সব পারি কেবল দুলালের মত কাঁদতে পারবো না।

ছোটমামার দিকে তাকাতে দেখলাম সে মিটমিট করে হাসছে। বললে,—শুধু কান্নাটাই দেখেছেন, আমার মত অট্টহাসি হাসতেও কস্মিনকালেও পারবেন না। তবে শুনুন অট্টহাসি—

বলেই ছোটমামা বিকট শব্দ তুলে অট্টহাসি হেসে উঠল। আচমকা সেই বিকট পৈশাচিক অট্টহাসি শুনে পাড়ার আটদশটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে বগলমামার কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ছোটমামা এ ধরনের কোন আক্রমণ হতে পারে মনে করে চট্ করে বগলামামার শোবার ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিল।

আমরা থ।

একসময় লক্ষ্য করলাম বগলামামা দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন।

কাকে প্রণাম করছেন বুঝতে না পেরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম,

—কি হল বগলামামা, কাকে প্রণাম করছেন?

বগলামামা বললেন,

—দুলালচন্দ্রকে। সত্যি বলছি হাবু, আমি স্বীকার করছি দুনিয়ায় হরেকরকম মানুষ দেখেছি কিন্তু তোর ছোটমামাটির মত দ্বিতীযটি দেখিনি। ও একটি ক্ষণজন্মা পুরুষ। ওকে নিয়ে পিকনিকে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তবে দয়া করে এবারকার মত পিকনিক বন্ধ করে দে—

* * * *

এ হেন ছোটমামা আজ চাকরি করছে কোলিয়ারীতে। তার চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে। কান্না অস্ত্রটি সে আর প্রয়োগ করে না। এখন সে অনেক গম্ভীর।

● রাজকুমার মৈত্র

কোলিয়ারীর সবাই তাকে ভালবাসে। সবাই ছোটমামা বলে ডাকে। তার প্রশংসা সবার মুখে মুখে—

সবাই বলে ছোটমামা যদি সর্দারসীপ পরীক্ষাটা কোনরকম ভাবে পাস করে তবে ছোটমামার উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কথাটা শুনে আমি আমার খুড়তুতো ভাইকে বলেছিলাম,—হ্যাঁরে স্বপন ছোট-মামাকে সর্দারসীপ পরীক্ষাটা দিতে বলিস না কেন। তাহলে তো উন্নতি হয়—

স্বপন বললে,—ছোটমামা তো পরীক্ষা দিয়েছিল। তবে রেজাল্ট এখনও পাইনি।

—কেন ?

—এখনও বেরোয়নি।

—পাস করবে তো—

—কে জানে। তবে না করার চান্সটাই বেশী। কারণ ছোটমামা আল-ফাল উত্তর দিয়েছে—

—কি রকম।

স্বপন যা বলল তার সারমর্ম এই রকম, পরীক্ষকের সামনে গিয়ে ছোটমামা দাঁড়াল।

পরীক্ষক প্রশ্ন করলেন,

—আচ্ছা মিঃ গোস্বামী, ধরুন আপনি যখন খাদানে ডিউটিতে আছেন সেই সময় হঠাৎ আগুন লেগে গেছে। আপনি কি করবেন ?

—কেন স্যার ওভারসিয়ারকে খবর দেবো।

—তিনি যদি তখন না থাকেন ?

—তাহলে আণ্ডার ম্যানেজারকে খবর দেব।

—ধরুন, তিনিও সেই সময় নেই। ছুটি নিয়েছেন—

—তাহলে ম্যানেজারকে খবর দেব।

—ধরুন তিনিও ছুটি নিয়েছেন—

—তাহলে ডি. এম. ও. সি. কে খবর দেব।

—ধরুন তিনিও ছুটি নিয়েছেন—

এবার ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললে,—সবাই যদি ছুটি নেয় তাহলে আর কি করবো। আমিও ছুটি নেব—

উত্তর শুনে পরীক্ষক কি বলেছিলেন জানি না। তবে আমি খুব খানিকটা হেসে মনে মনে বলি, ছোটমামা জিন্দাবাদ—

———

শার্লক হেবো ফিরে এলেন



নারায়ণ সান্যাল

সপ্তর্ষির চক্রাবর্তন !

শার্লক হেবোকে তোমরা চেন না। সে দোষ তোমাদের নয়, আমার। আমি একসময় শার্লক হেবোর কীর্তি-কাহিনী লিখে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখতাম—ডক্টর ওয়াটসন যেমন হয়েছিলেন আসল শার্লক হোমস্-এর গল্প লিখে। তোমাদের দাদা দিদিরা যখন তোমাদের বয়সী তখন কিশোর শার্লক হেবোর কিছু কিছু কাণ্ড-কারখানার কথা শুকতারায় লিখেছিলাম। তারপর নানান ধান্দায় তার কথা ভুলেই বসে আছি। হেবো তখন হায়ার সেকেণ্ডারীর ছাত্র, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করার আগে আর গোয়েন্দাগিরিতে সে হাত দেবে না। তা সে প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে; রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাস করে এখন সে প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।

হেবো আমার ভাইপো। সে জানত, তার কীর্তি-কাহিনী নিয়ে আমি গল্প লিখতে চাই, কিন্তু তার মতিগতি দেখেই গোয়েন্দা-গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান? হেবোর মাথায় গোয়েন্দাগিরির ভূত চেপেছিল। পড়াশুনা সে

কিছুই করত না—দিবারাত্র মাপবার ফিতে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বাইনাকুলার নিয়ে সে চোর-ডাকাত ধরে বেড়াত। তার অবস্থা দেখে আমার ভয় হত—শেষে যাদের জন্য গোয়েন্দাগল্প লিখব তারাও না হেবোর মত লেখাপড়া চাঙে তুলে ঐ নিয়ে মাতে! সম্প্রতি সে ভুলটা আমার ভেঙে দিয়েছে হেবো। সে এখন আর বাচ্ছা নয়, রীতিমত কলেজে পড়া ছেলে। গুরুগম্ভীর আলোচনা করে আজকাল আমার সঙ্গে। একদিন আমাকে এসে বললে, ছোটকাকু, আপনার ধারণাটা ভুল। বাজে গোয়েন্দা-গল্প পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বটে। কিন্তু সত্যিকারের ভালো ডিটেকটিভ গল্পে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে, দৃষ্টি গভীরতর হয়, বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে। গোয়েন্দা-গল্প মানে শুধু খুন জখম নয়, গোয়েন্দা-গল্প মানে একটা বড় জাতের ধাঁধা। গোয়েন্দা তার সমাধান দেবার আগে পাঠককে সমাধানে পৌছাতে হবে। সমাধানটা থাকবে পাঠকের চোখের সামনে, অথচ তার নজর পড়বে না!

আমি বলি, কী রকম? একটা উদাহরণ দাও দেখি।

হেবো বলে, আপনি হিচ্‌ককের 'রিয়ার উইণ্ডো' ফিল্‌মটা দেখেছেন। ধরুন আমার অবস্থাও ঐরকম। একটা অত্যন্ত রহস্যজনক জিনিস ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি। আচ্ছা খুলেই বলি আপনাকে। দেখুন, যদি কোন সমাধান বাৎলাতে পারেন:

একটা অত্যন্ত কালো মোটা বেঁটে লোক সামনের ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটায় থাকে। একমুখ চাপ দাড়ি—দিবারাত্র গগল্‌স্ পরে থাকে—দেখলেই মনে হয় লোকটা ক্রিমিনাল। ফ্ল্যাট বাড়িটা প্রকাণ্ড; নয় তলা উঁচু। লোকটা থাকে আট তলায়। দু'-দুটো অটোমেটিক লিফ্‌ট আছে। সন্দেহজনক লোকটাকে আমি আমার ঘর থেকে দিবারাত্র নজরে নজরে রেখেছি, আমার জোরালো বাইনোকুলারটার সাহায্যে। যতদূর শুনেছি লোকটা কোন কারখানায় কাজ করে—কখনও দিনের বেলা তার ডিউটি থাকে, কখনও রাত্রে। দিনের বেলা দেখি লোকটা লিফ্‌ট দিয়ে নেমে যায়, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। কখনও দুপুরে, কখনও রাত্রে ফিরে আসে। হাতে সব সময়েই একটা ফোলিও ব্যাগ। চুপচাপ লিফ্‌টে করে উঠে আসে আট তলায়। লিফ্‌ট-এর পাশেই ওর ঘর। চাবি খুলে ঢুকে যায় ঘরে। কিন্তু যেদিন ওর রাত্রের ডিউটি থাকে সেদিন ফিরতে ওর রাত দু'টো বেজে যায়। সেদিন কিন্তু সে সোজা আট তলায় উঠে আসে না। ওঠে ছয় তলা পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে আট তলায় উঠে আসে। আমি আরও লক্ষ্য করেছি ছয় তলা থেকে সাত তলায় উঠে সে দাঁড়ায়। সন্দেহজনকভাবে এদিক

ওদিক তাকাতে থাকে। আমাকে দেখতে পেলে তাড়াতাড়ি আবার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকে। কেমন যেন ধরা পড়ার চেহারা হয় তখন।

মাস তিনেক ধরে ক্রমাগত লক্ষ্য করছি ব্যাপারটা। এ তিন মাসে সে একশ সতের বার নেমেছে এবং দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাত্রে সাকুল্যে পঁচাশি বার উঠেছে। প্রতিবারই আদ্যন্ত লিফ্‌ট বেয়ে। আর বাকী বত্রিশ বার সে ফিরেছে গভীর রাত্রে এবং সেই বত্রিশ বারই সে ছয় তলা পর্যন্ত লিফ্‌টে উঠে বাকীটা হেঁটে উঠেছে। এর কারণটা কী হতে পারে বলুন তো?

আমি বলি, ছয় বা সাত তলার কোন ফ্ল্যাটের দিকে হয় তো ওর নজর আছে। গভীর রাত্রে সে হয় তো কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছয় তলায় লিফ্‌টটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাইনোকুলার-চোখে তোমাকে এ বাড়িতে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে আট তলায় উঠে যায়। লোকটা দিবারাত্র গগল্‌স্‌ পরে কেন?...হাতের ব্যাগে কি নিয়ে ঘোরে?

হেবো বললে, এই দেখুন, আপনার মনের মধ্যে পাপ আছে। এটা একটা নিটোল ভাল জাতের গোয়েন্দা গল্প! সমাধান আপনার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে অথচ আপনি সন্দিগ্ধমনা হয়ে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন।

আমি বলি, কি রকম? আর কোন্‌ সমাধান হতে পারে? কেন লোকটা গভীর রাত্রে বত্রিশ বারই শেষ দু'তলা হেঁটে উঠল, অথচ দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাত্রে পঁচাশি বার বরাবর লিফ্‌টে করে উঠল?

ঃ তাইতো বলছি, ছোটকাকু। আমি প্রথমেই বলেছি দুটি লিফ্‌টই অটোমেটিক। আর লোকটা অত্যন্ত বেঁটে। আসলে বেচারি ছয়-নম্বর বোতাম পর্যন্ত হাত পায়। মাঝরাত্রে অটোমেটিক লিফ্‌ট-এ বেচারি একা একা ওঠে। কাকে আর বলবে বলুন —'আট নম্বরের উপরের বোতামটা যদি কাইণ্ডলি—'

আমি হো হো করে হেসে উঠেছিলাম।

ওর এই গল্প শোনার পরেই মনস্থির করলাম। হেবোর বাকী কীর্তি-কাহিনীও তোমাদের জানানো উচিত। তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে না, লাভই হবে।

তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পারি—আমাকে তাতিয়ে তোলার জন্যই ঐ অদ্ভুত গল্পটা হেবো আমাকে শুনিয়েছিল!

* * * *

● নারায়ণ সান্যাল

হেবোর গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। গল্পের আসরে অনেকবার ঐ গল্প শুনিয়ে শ্রোতাদের ঠকিয়েছি। লক্ষ্য করে দেখেছি—ঐ 'অত্যন্ত বেঁটে' আর 'অটোমেটিক লিফ্‌ট' শব্দ দুটি কেউ খেয়াল করে না। লোকটার গগল্‌স, ফোলিও ব্যাগ, সন্দিগ্ধ চলাফেরায় সকলেই বোকা হয়। একদিন অফিসে আমার সহকর্মীদের এই গল্পটি শোনাবার পর সুধীরবাবু বললেন, আচ্ছা! শার্লক হেবো তাহলে আপনার ভাইপো?

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, আপনি শার্লক হেবোকে চেনেন?

ঃ চাক্ষুষ চিনি না, তবে তার কিছু কীর্তিকাহিনী এক সময় শুকতারা পত্রিকায় পড়েছিলাম। একদিন আপনাদের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে আসব।

আমি বলি, সে তো আমার সৌভাগ্য। শুধু আমার নয়, হেবোরও।

সুধীরচন্দ্র বলেন, না, নরেনবাবু—এ প্রস্তাবের পিছনে একটি বিশেষ কারণ আছে। একটা বিরাট রহস্য আমার জীবনে আছে—তার সমাধান হয়নি। আজ দু'বছর ধরে চিন্তা করছি; কোনও কূলকিনারা করতে পারিনি। পারলে, এ চাকরি ছেড়ে দিযে রাজার হালে জীবন কাটাতে পারতাম।

আমি হেসে বলি, কী ব্যাপার? কোনও গুপ্তধনের সংকেত খুঁজছেন? সেই—'পাযে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা?'

সুধীরবাবু একটুও হাসলেন না। চোখ দুটি তাঁর ধ্বক করে জ্বলে উঠল। কাছে সরে এসে বললেন, এক্‌জ্যাক্টলি নরেনবাবু! আমি এক গুপ্তধনের মালিক কিন্তু কিছুতেই তার সন্ধান পাচ্ছি না।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। এ-যুগে আবার অমন গুপ্তধনের সন্ধান কেউ পায় নাকি? কিন্তু সুধীরবাবুর তো মাথায় ছিট নেই—দিব্যি গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী মানুষ; তিনি এমন রসিকতা করবেন কেন?

প্রশ্ন করি, কী ব্যাপার বলুন তো?

সুধীরবাবু বলেন, এখানে নয়। শনিবার অফিস ছুটির পর একসঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আপনার ভাইপোকে বাড়িতে থাকতে বলবেন। একটি অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলও আপনাদের দেখাব। আমার প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্রের একটি বিচিত্র দিনপঞ্জিকা।

শনিবার অফিস ছুটির পর সুধীরবাবুকে নিয়ে এলাম আমাদের বাড়ি। হেবোকে বলাই ছিল। সে কলেজ থেকে ম্যাটিনী শোতে যায়নি। সোজাই বাড়ি চলে এসেছে।

হেবোর সঙ্গে সুধীরবাবুর পরিচয় করিয়ে দেবার পর সুধীরচন্দ্র বললেন, হেবো, তোমার সঙ্গেই আমি বিশেষ করে আজ দেখা করতে এসেছি। তুমি যে নরেনবাবুর ভাইপো তা জানা থাকলে আরও আগেই আসতাম। তোমার কিছু কিছু কাণ্ড-কারখানা আমি অনেক অনেকদিন আগে শুকতারা পত্রিকায় পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছে হয়তো তুমি এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে—

ঃ সমস্যাটা কি জাতের ? খুনের কিনারা ?

ঃ না বাবা হেবো। গুপ্তধনের চাবিকাঠি খুঁজে বার করা।

ঃ গুপ্তধন ! কার গুপ্তধন ?—ঘনিয়ে আসে হেবো।

সুধীরচন্দ্র বলেন, আইনত তার মালিক আমি—যদি অবশ্য খুঁজে পাই।

হেবো উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, বলুন সব কথা খুলে। খুঁটিয়ে বলবেন। কোনও তথ্যই অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দেবেন না।

সুধীরচন্দ্র যে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বিবৃত করলেন তা এইঃ

সুধীরচন্দ্র পূর্ববঙ্গে এক বর্ধিষ্ণু জমিদারবংশের শেষ বংশধর। তার প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বিচিত্র ঘটনাচক্রে এক গুপ্তধন আবিষ্কার করে বসেন। দুর্লভচন্দ্র রায় ছিলেন ইংরেজ সৈন্যদলে একজন সুবেদার। পূর্ববঙ্গের একজন হিন্দু জমিদার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইংরেজ সৈন্য তাঁর জমিদারি আক্রমণ করে। সে যদ্ধে ঐ জমিদার হত হন, বস্তুতঃ নির্বংশ হন। ইংরেজ সৈন্য বহু আয়াসেও কিন্তু রাজার অতুল সম্পত্তির হদিস পায় না। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন একজন দুর্লভ-প্রতিভার মানুষ। যেমন ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল কূটবুদ্ধি। তিনি ঐ পরাজিত রাজার প্রাসাদে তাঁর একটি দিনপঞ্জিকা আবিষ্কার করেন, এবং সেই সূত্রেই রাজার অতুল সম্পদের সন্ধান পান। ক্রমে দুর্লভচন্দ্র নিজেই হয়ে পড়েন জমিদার। তাঁকে খেতাব দেওয়া হল "রায়চৌধুরী" উপাধি। সুধীরচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই এসব কিংবদন্তী কাহিনী শুনেছেন। তিনি কলকাতাতেই বরাবর মানুষ। দেশ বিভাগের আগেই চলে এসেছিলেন। দেশে ছিলেন ওঁর পিতামহ বৃন্দাবনচন্দ্র রায়চৌধুরী। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল তখন ওঁদের দেশ হল পাকিস্তান। বৃন্দাবনচন্দ্র কিন্তু দেশত্যাগ করেননি। বরাবর ও দেশেই ছিলেন। তিনি ছিলেন কৃপণ স্বভাবের মানুষ। লোকে বলত তিনি অনেক টাকার মালিক; কিন্তু পাকিস্তানীরা তাঁর সম্পদের হদিস পায়নি। মাত্র বছর তিনেক আগে যখন ওদেশে জঙ্গী খানদের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের লড়াই কাজিয়া বাধল তখন

বৃন্দাবনচন্দ্র ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। পথেই তিনি মারা যান। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সুধীরচন্দ্র স্বদেশে গিয়েছিলেন। ওঁদের পৈত্রিক সাবেকী বাড়িটা তিনি তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন—কিন্তু গুপ্তধনের কোন হদিস পাননি। অথচ স্থানীয় লোকের বিশ্বাস বৃন্দাবন অনেক অনেক টাকা এ বাড়িতে পুঁতে রেখে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর হয়তো আশা ছিল লড়াই মিটে গেলে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে আসবেন।

সুধীরচন্দ্র বললেন, আমাদের সাবেক বাড়িটা শহরে নয়, গ্রামে। প্রায় বিশ বিঘা জমির উপর প্রকাণ্ড বাড়ি,—পুকুর, বাগান, মন্দির। তার কোন্ প্রান্তে তিনি টাকাটা পুঁতে রেখেছেন তা কেউ জানে না। স্থানীয় লোকেরা সারা বাগানটাই কুপিয়েছে। মোহর পায়নি, পেয়েছে, শুধু আলু!

ঃ আলু! মানে?—অবাক্ হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

সুধীর বলেন, মাটিটা যখন কোপানোই হল তখন আর সেটা ফেলে রেখে লাভ কি? বেওয়ারিশ জমিতে গ্রামের লোক আলুর চাষ করেছিল।

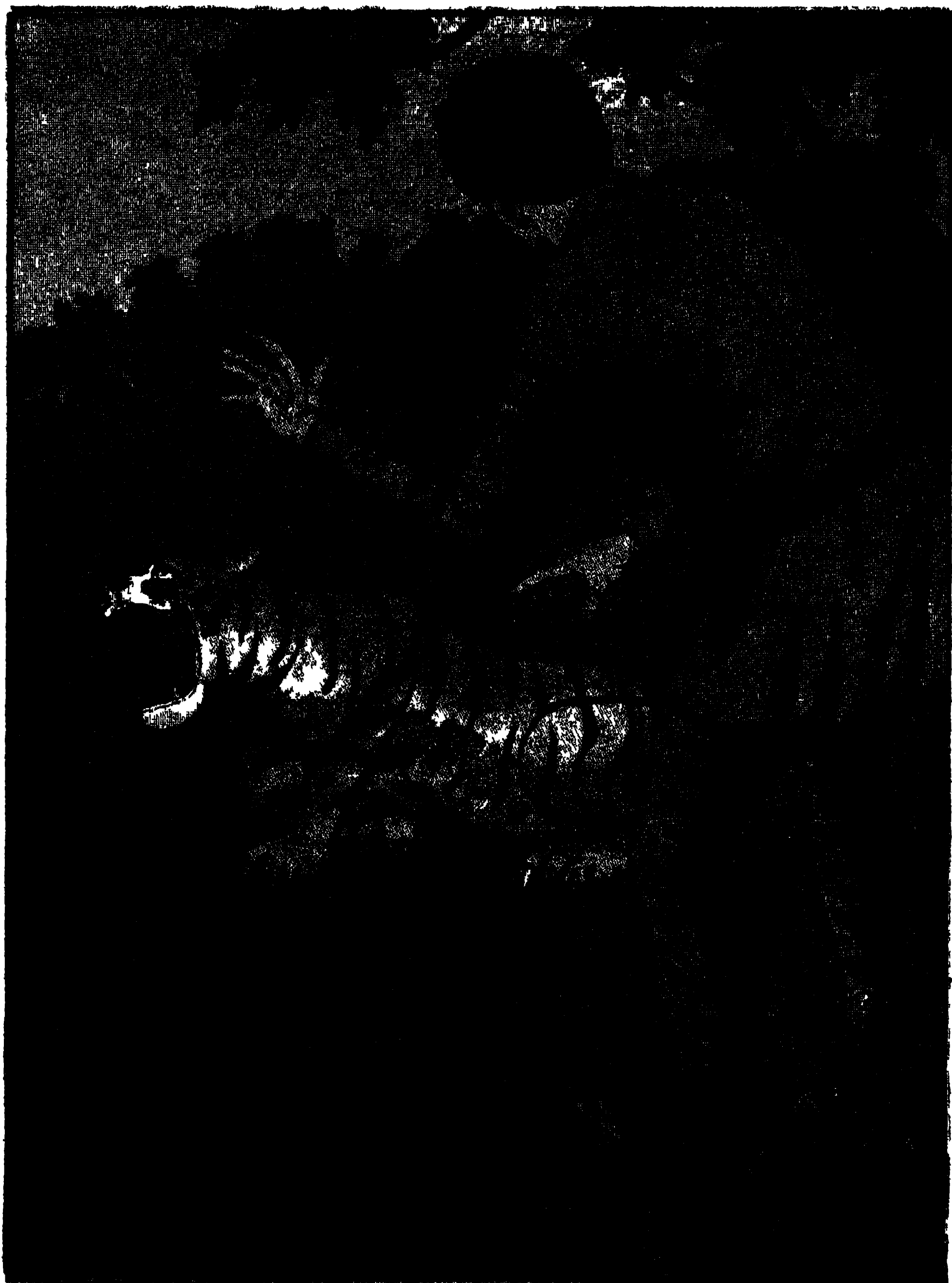
হেবো সব শুনে বললে, দূর থেকে এ রোগীর চিকিৎসা সম্ভবপর নয়। সরেজমিনে ব্যাপারটা তদন্ত না করলে—

সুধীরচন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, বটেই তো। চল, এবার পূজার ছুটিতে আমাদের দেশে তোমাকে নিয়ে যাব।

হেবো বললে, চোর-ডাকাত ইতিপূর্বে কিছু ধরেছি; কিন্তু গুপ্তধন আবিষ্কারের কোন অভিজ্ঞতা নেই—এক ঐ রবীন্দ্রনাথের 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা' গল্পটা ছাড়া। আরও কিছু কিছু গল্প—

সুধীরবাবু বলেন, তোমাকে আমি কিছুটা সাহায্য করতে পারি হেবো। এবার বাংলাদেশে গিয়ে আমি একটি দুর্লভ জিনিস খুঁজে পেয়েছি। আমার প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্রের সেই অতি প্রাচীন দিনপঞ্জিকাখানি। সেটা আমি নিয়ে এসেছি। তোমাকে পড়তে দিচ্ছি। সেটা পড়লে বুঝতে পারবে রাজা কিভাবে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিলেন, এবং আমার বুড়ো-ঠাকুর্দা কীভাবে সেটা উদ্ধার করেন। শুধু তাই নয় আমার বুড়ো-ঠাকুর্দাও তাঁর সম্পদ গুপ্তধন করে রেখে গিয়েছিলেন। জানি না আমার ঠাকুর্দা কেমন করে সেটা খুঁজে পেয়েছিলেন।

ঃ সেটা কি রকম? আপনার প্রপিতামহও যে তাঁর সম্পত্তি ঐভাবে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন তা আপনি কেমন করে জানলেন?



কেম্বর্ল সিং বাঘের বেশে উপুড় হয়ে পেটে হাত চেপে··· [পৃঃ ৫৯

: ডায়েরিটা পড়লেই জানতে পারবে। ওর শেষ পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্র একটা দুর্বোধ্য ধাঁধা লিখে রেখে গিয়েছেন আজ থেকে একশ বছর আগে। ৫ই মে আঠারো শ একাত্তর সালে —তার অর্থ আমি আজও জানি না।

: তাই নাকি! কই দেখি?

সুধীরবাবু তাঁর ঝোলা থেকে দিনপঞ্জিকা বার করে দেন। হাতে তৈরী কাগজ, মানে হ্যাণ্ড-মেড-পেপারে পুঁথির আকারে বইটা লেখা। দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স একশ বছর। পাতাগুলো বাধানো নয়, পুথির মত সাজানো, পৃষ্ঠা-সংখ্যাও দেওয়া নেই, কিন্তু প্রতিটি পৃষ্ঠার মাথায় দুর্লভচন্দ্র তারিখ বসিয়েছেন। ফলে পৃষ্ঠা-সংখ্যা সাজানোতে কোনও অসুবিধা নেই। কালো কালিতে অত্যন্ত সুন্দর হস্তলিপিতে খাগের-কলমে লেখা সেই দুর্লভ পুস্তিকাখানি হেবো সযত্নে গ্রহণ করল। বলল, ঠিক আছে এটা আমি পড়ে দেখি। ইতিমধ্যে আপনি পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করুন। সরেজমিনে জায়গাটা না দেখলে কিছু বোঝা যাবে না।



সুধীরবাবু তাঁর ঝোলা থেকে দিনপঞ্জিকাটা বার করে দেন

পরদিন রবিবার। ছুটির দিন। হেবো সকাল থেকে সেই পুঁথি নিয়ে পড়েছে নাওয়া খাওয়া ভুলে। দিনপঞ্জিকার শুরু হয়েছে ৩।৭।১৮৫২ থেকে; আর শেষ হয়েছে ৫।৫।১৮৭১এ। শেষ তিনখানি পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্র বলেছেন, তিনি কীভাবে ঐ অতুল সম্পদ লাভ করেন এবং কীভাবে নিজের বংশধরদের জন্য তিনি সে সম্পদ গুপ্তধনের আকারে রেখে যান। তোমরা যাতে নিজেরাই এ সমস্যার সমাধান করতে পার তাই সেই দিনপঞ্জিকার শেষ তিনটি পৃষ্ঠা হুবহু নকল করে দিলাম:

[প্রথম পৃষ্ঠা] **বৃহস্পতিবার, ৩রা জুন, ১৮৭১**

অতঃপর একদা দুর্গের পতন হইল। পরিখা অতিক্রম করতঃ ইংরাজসৈন্য পিপীলিকাশ্রেণীবৎ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা সবংশে নিহত হইলেন। মেজর ম্যাকফার্লং তৎপরে দুর্গাধীপের পদ গ্রহণ করতঃ আদেশজারী করিলেন সিপাহীগণ দুর্গের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ, প্রতিটি প্রত্যন্তদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুক। আদেশ পালিত হইল, কিন্তু রাজার অতুল সম্পদের—হীরা-মুক্তা-রত্নরাজির সন্ধান কেহই পাইল না। অবশেষে দুর্গাধীপ বৃথা অন্বেষণে কালক্ষেপে বিরত হইলেন। পরন্তু আমার হৃদয় ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অর্ণবের ন্যায় অশান্তই রহিয়া গেল। আমি নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকি: ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এত অল্প সময়ে রাজা ঐ রত্নরাজি কেমনে লুক্কাইত করিলেন? ঐ সময়ে আমার লক্ষ্য হইল রাজার দিনপঞ্জিকাটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কেহই তাহা যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়া দেখে নাই। দুর্গমধ্যে সর্ব্বচক্ষুর সম্মুখে তাহা অনাদৃত অবস্থায় বিরাজমান। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—হয়তো রাজা ঐ দিনলিপিতে এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। আমি সেটি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। দিনপঞ্জিকার আদ্যন্ত সহজ সরল ও অর্থবহ; শুধুমাত্র শেষ পৃষ্ঠাটির শেষ অনুচ্ছেদটুকু আমার নিকট অর্থবহরূপে প্রতীয়মান হইল না।

উক্ত শেষ পৃষ্ঠার প্রথমেই রাজা-সাহেব তাঁহার ইষ্টদেবী ৺বিমলার প্রতি একটি প্রার্থনাবাণীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তৎপরেও কিছুটা বোঝা যায়; কিন্তু শেষ অংশ একেবারে দুর্ব্বোধ্য। অতঃপর রাজা-সাহেবের দিনপঞ্জিকার শেষ পৃষ্ঠাটি আমি হুবহু নকল করিয়া দিতেছি:

৺বিমলাদেব্যৈঃ নমঃ

নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা বিমলে প্রদা
তস্যাদর্শন মাত্রেণ বিদ্যাবান্ জায়তে নরঃ॥ (কপিল সংহিতা)

অদ্য আমার অতি ঘোর দুর্দ্দিন। প্রাতে সভারম্ভে সভাকবি পণ্ডিতজী অদ্য কালিদাসের কুমার সম্ভবপাঠের প্রস্তাব করিলেন।

সবেমাত্র প্রথম শ্লোকের প্রথম চরণটি পাঠ করিযাছেন—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালযঃ নাম নগাধিরাজঃ' অমনই ভগ্নদূত আসিয়া সংবাদ দিল সেনাপতি বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন—ইংরাজসৈন্য পার্ব্বতীপুরের দুর্গ বিচূর্ণ করিয়া অতঃপর এই দিকেই আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ হইল। আত্মরক্ষায় যত্নবান

হইলাম। আমি মা ৺বিমলার ভক্ত। মরিতে ভয় পাই না। পরন্তু স্ত্রীপুত্র পরিজনদিগের কী ব্যবস্থা করিব? একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সন্নিকটস্থ 'বিভাপন' গ্রামে আমার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিলাম। ঈশ্বর দয়া করিলে উহারা রক্ষা পাইবে। পরন্তু আমার অমূল্য রত্নরাজির কি ব্যবস্থা করিব? তাহাও তৎক্ষণাৎ অপসারিত করিলাম। কোথায় তাহা রাখিলাম তাহা জানি শুধু আমি, আমার একান্ত সহচর লক্ষ্মণদেব, এবং মা ৺বিমলা। পরন্তু অদ্যকার যুদ্ধে আমি এবং লক্ষ্মণদেব নিহত হইতে পারি, তাই আমার ভবিষ্যৎ-বংশীযদিগের উদ্দেশ্যে এই সাবধানবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। অবধান করঃ

> "শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদলের প্রথম সারির প্রথম চারিটি সৈন্যের শিরশ্ছেদ করিবে এবং কবন্ধগুলি ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিপথগামী করিবে। দ্বিতীয় সারির সৈন্যদলের প্রথম চারিটি সৈন্যকে অতিক্রম করিযা পঞ্চম সৈন্যকে আক্রমণ কর। পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সৈনিকদ্বয়কেও সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।"

রাজা-সাহেবের দিনপঞ্জিকার ঐ শেষ উপদেশটি লইয়া আমি নিরন্তর চিন্তামগ্ন থাকিতাম। সৈনিকদের শিরশ্ছেদ করার পর কবন্ধ ত্যাগ করিয়া কিরূপে তাহাদের বিপথগামী করা যায়? তাহা ভিন্ন ঐ সৈন্যদের কাটাকাটি করিয়া কী প্রকারে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে তাহা

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা] **শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ১৮৭১.**

আমার বোধগম্য হইল না। দীর্ঘদিন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে একদিবস বিদ্যুতচমকের ন্যায় আমার নিকট ঐ গূঢ় সঙ্কেতের অর্থ প্রতীযমান হইল। রাজা-সাহেব আদৌ প্রলাপোক্তি করেন নাই। অতি সুকৌশলে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্-বংশীয়দিগের হিত্যার্থে গুপ্তধনের নির্দ্দেশ ঐভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। এস্থলে প্রথমসারির সৈন্য বলিতে রাজা-সাহেব সর্ব্বপ্রথমে লিখিত ঐ ৺বিমলাদেবীর প্রসঙ্গে শ্লোকটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহার প্রথম চারিটি সৈনিক—অর্থাৎ প্রথম চারিটি শব্দ হইতেছে 'নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা'। তাহাদের শিরশ্ছেদ করতঃ, অর্থাৎ প্রথম চারিটি অক্ষর গ্রহণ করিয়া কবন্ধ ত্যাগ করিলে পাই 'ন-প-ভা-বি'। এক্ষণে ঐ চারিটি অক্ষরকে বিপথগামী করিলে, অর্থাৎ উল্টা করিয়া সাজাইলে পাইতেছি 'বিভাপন'। সেটি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম—রাজা-সাহেবের শ্বশুরালয়। তৎপরে দ্বিতীয় সারির সৈন্যদল

অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্লোকটির—'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয় নাম নগাধিরাজ' প্রথম চারিটি শব্দকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম শব্দটিকে আক্রমণ করিলে পাই—'নগাধিরাজ'। আশ্চর্য্য! ঐ বিভাপন গ্রামে একটি শিবমন্দির বিরাজমান, যাহার বিগ্রহের নাম—নগাধিরাজ। কূটচক্র ভেদ করিয়া আমি মেজর ম্যাকফার্লং সাহেবের নিকট দ্বিবসত্রয়ের অবকাশ গ্রহণ করতঃ ঐ বিভাপন গ্রামে গমন করিলাম। নগাধিরাজ-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দুই-দিবস নিরন্তর বৃথা অনুসন্ধান করিলাম। কোনও সঙ্কেত দৃষ্টিগোচর হইল না। অকস্মাৎ আমার স্মরণ হইল রাজা-সাহেব ইঙ্গিত দিয়াছিলেন—'পরন্তু' প্রথম ও দ্বিতীয় সৈনিকদ্বয়কেও সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না। সেই দুইটি শব্দ 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি'—অর্থাৎ 'উত্তর দিকে আছে'। এ কথা স্মরণমাত্র আমার রোমাঞ্চ হইল। আমি ঐ মন্দির হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিলাম। লক্ষ্য হইল, ঘন অরণ্যের অভ্যন্তরে সম্প্রতি মনুষ্যগমন ঘটিয়াছে। দুই পার্শ্বের উদ্ভিদ ও লতাগুল্ম বিচ্ছিন্ন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে ঘনপত্রগুল্ম-সন্নিবিষ্ট অরণ্যাভ্যন্তরে একটি উন্মুক্ত স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। প্রায় চারি-হস্তবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র। সেই স্থলে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ভূতলে কেহ একটি গর্ত্ত সম্প্রতি মৃত্তিকাদ্বারা বন্ধ করিয়াছে। বুঝিলাম—গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছি। দিবাভাগে খনন করিতে সাহসী হইলাম না। আমি অরণ্য হইতে নির্গত হইলাম। রাত্রি একপ্রহরে শিবাকুলের সঙ্কেত পাইয়া নগাধিরাজ-মন্দিরে প্রণামপূর্ব্বক আমি খনিত্রসহ ঐস্থানে পুনরাগমন করিলাম। তিনদণ্ডকাল নিরন্তর কায়িক পরিশ্রমে মনুষ্যদেহ পরিমাণ গর্ত্ত খনন করিলাম। তদনন্তর কোন কঠিন ধাতব বস্তুতে খনিত্র প্রতিহত হইল। আমি সেটি উপরে উঠাইলাম। একটি পেঁটেরা পাইলাম। তাহা উন্মোচন করিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে ভিতরের রত্নরাজি ঝলমল করিয়া উঠিল। আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম!……

আমি অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। এখন আমার সমস্যা এই অতুল ঐশ্বয্য লইয়া কী প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব? কী-প্রকারে ঐ হীরা-মুক্তারাজি তঙ্কায় রূপান্তরিত করিব। যদ্যপি তাহা সঙ্গোপনে করিতে পারি তাহা হইলে শুধু আমি নহি আমার অধঃস্তন চারিপুরুষ একশত বৎসর কাল

[তৃতীয় পৃষ্ঠা] **শনিবার, ৫ই জুন, ১৭৭১.**

বিনা-আয়াসে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। রাজা-সাহেব আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি বিস্মৃত হইব না। আমিও চৌর-তস্করাদি পরস্বাপহারীর

নিকট হইতে একই উপায়ে আমার সম্পদ লুক্কায়িত করিয়া যাইব। আমার বৃদ্ধ বয়সে একই কৌশলে আমার সম্পদ গুপ্তধনের মত রাখিয়া যাইব। এই দিনপঞ্জিকাতেই রাখিব আমার নির্দেশ। কূট-সমস্যা সমাকীর্ণ। আমার মৃত্যুর পরে এই দিনপঞ্জিকাও সর্বসমক্ষে বিরাজমান থাকিবে, যেমন ছিল রাজা-সাহেবের দিনলিপি। কেহ দৃষ্টিপাত করিবে না। পরন্তু যদি কেহ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা লইয়া বিচার করে, যদি তাহার পাণ্ডিত্যে যথেষ্ট গভীরতা থাকে তাহা হইলে সে এই বজ্রকীট-সমস্যা সমাধান করিয়া অতুল বিত্তের অধিকারী হইবে। আমিও আমার ভবিষ্যৎ-বংশীদের জন্য এই সূত্র রাখিতেছি। অবধান কর ঃ

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল।
গ্রহাচার্য আমার করকোষ্ঠী বিচার করিতে আসিলেন।
তখন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানিলাম শতভিষা
নক্ষত্রের অবস্থানহেতু আমার ভাগ্যাকাশে এই দুর্যোগ
ঘনাইয়াছে। গ্রহাচার্য আমার হস্ত-রেখা বিচারান্তে
অবশেষে আরও বলিলেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে আমার
এই বিপদ কাটিয়া যাইবে। তখন নূতন বন্দোবস্ত
হইবে। ইংরেজ-সরকার হয়তো তখন নতুন হারে
কর গ্রহন করিয়া আমার সহিত নূতন চুক্তি করিবে।

কূট-চক্র ভেদের কুঞ্চিকাঃ

বেদব্যাসের কূপ-গবাক্ষ—এক যোজন
ধ্রুব-নক্ষত্র তীব্র শলাকায় বিদ্ধ করিবে।

তুলাদণ্ডঃ এক যোজন—একসেমি।

খ-গোলে নক্ষত্র-লোকের দূরত্বঃ—

ধ্রুব-ক্রতু = ৪ যোজন ;	ক্রতু-পুলহ—৩ যোজন।
ক্রতু-অত্রি = ৪ ঐ ;	পুলহ-অত্রি=৪·৫ ঐ।
পুলস্ত্য-ক্রতু= ৪ ঐ ;	পুলহ-পুলস্ত্য=২·৮ ঐ।
ধ্রুব-অঙ্গিরা ৭·৮ ঐ ,	অত্রি-অঙ্গিরা=২ ঐ।
অঙ্গিরা-বশিষ্ঠ্য=২.৫ ঐ ;	ধ্রুব-বশিষ্ঠ্য =৯·৫ ঐ।
অঙ্গিরা-মরীচি= ৫ ঐ ;	বশিষ্ঠ্য-মরীচি ৩·২ ঐ।

বৎস! এ কথা ভুলিও না যে, বজ্র-শলাকাবিদ্ধ ঐ ধ্রুব-নক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন। সেই চক্রাবর্তনের ছন্দেই তুমি অতুল বিত্তের অধিকারী হইবে।"

* * * *

হেবো বলে, ঐ শেষ ধাঁধাটা বুঝতে পারেন?

আমি বলি, মাথা আর মুণ্ডু; সাপ আর ব্যাঙ। শুধু এইটুকু বোঝা যায় শেষদিকে দুর্লভচন্দ্রের ভীমরথী ধরেছিল। তিনি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

হেবো বলে, ছোটকাকু, একটা জিনিস আপনার নজর এড়িয়েছে। এই দিনপঞ্জিকার শেষ দিনের তারিখটায় একটা ছোট্ট অথচ মারাত্মক ভুল হয়নি কি? লেখক 'আট'-এর জায়গায় 'নয়' লিখে একশ' বছর ভুল করেছেন। ১৮৭১ না লিখে উনি ১৯৭১ লিখে একটা মারাত্মক ভুল করেননি?

স্বীকার করলাম প্রথমটায় ওটা আমার নজরে পড়েনি। বললাম, তাই তো দেখছি! ওটা ভুলই। 'আট' লিখতে উনি ভুলে 'নয়' লিখেছেন—

হেবো বললে, না ছোটকাকু, ভুল কিছু লেখা হয়নি। ওটা ১৯৭১-ই হবে। ঐ শেষ পৃষ্ঠাটা দুর্লভচন্দ্র আদৌ এক শ বছর আগে লেখেন নি। ওটা লিখেছেন সুধীরবাবুর দাদু, মাত্র তিনবছর আগে।

আমি হেসে উড়িয়ে দিই। বলি, কী পাগলামী করছ হেবো। 'আট' এর বদলে 'নয়' লেখা আছে বলে তুমি এটা কেমন করে বলছ? দেখছ না—কাগজ এক, হাতের লেখা এক, কালি এক, এমনকি পূর্বপৃষ্ঠা থেকে পারম্পর্যটুকুও ঠিক একই রকম আছে।

হেবো বললে, সবই সুধীরবাবুর দাদুর কীর্তি। তিনি একই রকম কাগজ যোগাড়

করেছেন, একই কালিতে, একই হাতের লেখা নকল করে এমন ভাবে সেটা ঐ প্রাচীন দিনপঞ্জিকায় সাজিয়ে রেখে গেছেন যাতে আপাতদৃষ্টিতে কারচুপিটা বোঝা না যায়।

আমি বলি, সেটা কেমন করে বুঝছ? এ তো তোমার নিছক অনুমান!

ঃ না কাকু। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য করে দেখন—প্রথম দুটি পৃষ্ঠার সঙ্গে শেষ পৃষ্ঠার হস্তাক্ষর হুবহু এক হলেও বানানে তফাৎ আছে। প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় বানান আছে 'আশ্চর্য্য, সর্ব্বসাধারণ, কর্ম্মচারী' ইত্যাদি। শেষ পৃষ্ঠায় লেখক রেফ-এর পর দ্বিত্ব-বর্জন করেছেন। এটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শতাব্দীতে প্রবর্তিত আইন। ১৮৭১ সালের লেখক কেমন করে এই বানানে লিখলেন—'নির্দেশ, সর্বসমক্ষে, গ্রহাচার্য, বর্তমান, চক্রাবর্তন'?

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে তুমি বলতে চাইছ—

ঃ হ্যাঁ ছোটকাকু। তাই বলতে চাইছি। অর্থাৎ আমাকে বোধহয় সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে না। ঐ শেষপৃষ্ঠার ধাঁধাটার সমাধান করতে পারলে এখানে বসেই বলে দেওয়া সম্ভব ৫ই জুন, ১৯৭১ তারিখে দেশত্যাগের আগে বৃন্দাবনচন্দ্র কোথায় তাঁর গুপ্তধন রেখে গিয়েছিলেন।

আমরা দুজনে আবার ঐ ধাঁধাটা পড়তে থাকি।

হেবো বললে, লক্ষ্য করে দেখুন—কূটচক্র ভেদসূত্রে যে নামগুলো আছে তা সবই নক্ষত্রের—

আমি বলি, শুধু নক্ষত্রের নয়—সপ্তর্ষি-মণ্ডলের। আমরা ঐ তালিকায় আটটা নাম পাচ্ছি—ধ্রুব, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ্য আর মরীচি। তুমি জান নিশ্চয় এরা হচ্ছে ভারতীয় মতে সপ্তর্ষি-মণ্ডল, ইংরেজি মতে গ্রেট বিয়ার।

হেবো বলে, নক্ষত্রগুলির অবস্থান কেমন বলুন তো?

ঃ গোটা সপ্তর্ষি-মণ্ডল ধ্রুব-নক্ষত্রের চারদিকে পাক খাচ্ছে। ধ্রুব-ক্রতু আর পুলহ একই সরল-রেখায় আছে। আর ঐ সাত-ঋষি আকাশে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের আকারে আছে।

হেবো দার্শনিকের মত বললে, জিজ্ঞাসার চিহ্ন তো বটেই! চিরন্তন জিজ্ঞাসা!

আমি প্রশ্ন করি, কিন্তু আকাশের নক্ষত্র দেখে কেমন করে বলে দেওয়া যাবে বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁর গ্রামের কোন্ প্রান্তে গুপ্তধন রেখে গেছেন?

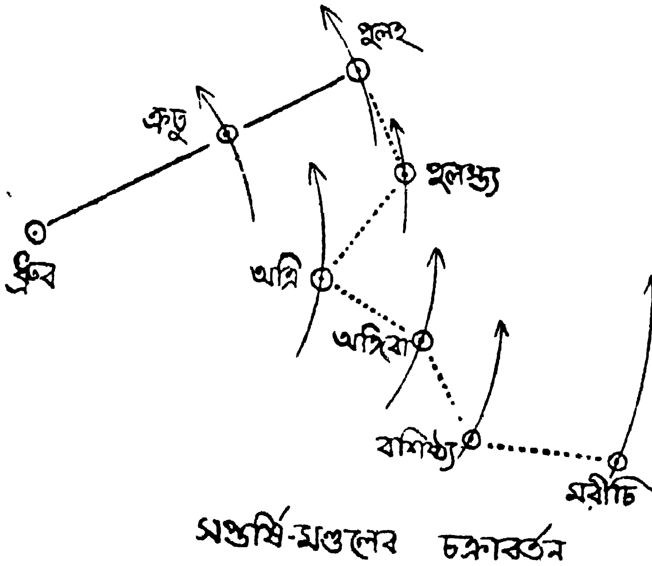
হেবো বললে, ঠিক যেমন করে রাজা সাহেবের মুণ্ডকাটা সৈন্যরা বলেছিল!

ঃ কিন্তু ঐসব শব্দের অর্থ কি? ঐ যে বেদব্যাসের কূপগবাক্ষ, 'তুলাদণ্ডঃ এক যোজন=এক সেমি'—এসব নির্দেশের কী অর্থ? 'সেমি' মানে কি?

হেবো বললে, বেদব্যাসের কূপগবাক্ষ, জিনিসটা যে কী তা এখনও বুঝিনি। পরবর্তী নির্দেশটা কিন্তু বোঝা যায়। তুলাদণ্ড ইংরাজি করলে হয় 'স্কেল'। এর অর্থ—স্কেলঃ এক যোজন=এক সেন্টিমিটার! আর কিছু এখন বুঝতে পারছি না।

আমি বলি, দাঁড়াও দাঁড়াও। স্কেল যদি হয় এক যোজন=এক সেন্টিমিটার তাহলে ঐ দূরত্বগুলি সেন্টিমিটারে বলা হয়েছে। নক্ষত্রলোকের দূরত্ব থেকে পাচ্ছি ধ্রুব থেকে ক্রতু=৪ সেন্টিমিটার; পুলহ থেকে ক্রতু=৩ সেন্টিমিটার। ক্রতু থেকে অত্রি=৪ সে. মিঃ ইত্যাদি। তাই নয়? কিন্তু তাতে হলটা কি?

আবার দুজনে ভাবতে থাকি। শেষে হেবো বলে, আপনি নিজের মত ভাবুন, আমি আমার ঘরে গিয়ে ভাবি। ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স নিয়ে ভাবতে হবে। মনে হচ্ছে জ্যামিতির মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানো যাবে। বৃন্দাবনচন্দ্র যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, আগে দেখি সেইভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আদৌ আঁকা যায় কি না। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন!



সপ্তর্ষি-মণ্ডলের চক্রাবর্তন

আমি তো হেবোর মত পাগল নই! তাই নিজের নথীপত্র নিয়ে লিখতে বসি।

একটু পরেই হেবো ফিরে এসে বললে, ছোট-কাকু, আকাশে এখন সপ্তর্ষি আছে? চিনিয়ে দিতে পারবেন?

বললাম, এখন তো সন্ধ্যাবেলাতেই উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিকে দেখতে পাওয়ার কথা। চল দেখা যাক।

আমরা দুজনে ছাদে চলে আসি। হেবোকে চিনিয়ে দিলাম সপ্তর্ষি-মণ্ডল। ও অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তারাগুলোর দিকে। আমি নেমে আসি ছাদ থেকে।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ঘড়িতে দেখি রাত দুটো। ব্যাপার কি? দরজা খুলে দিতেই দেখি—শ্রীমান হেবো।

ঃ কী রে? কি হয়েছে?

ঃ কূটচক্রের ভেদসূত্রের কুঞ্চিকা হচ্ছে নিছক জ্যামিতি! এই দেখুন ঐ সূত্র অনুসারে সপ্তর্ষি আর ধ্রুব-নক্ষত্রকে কেমন করে আঁকা যায়।

ভীষণ রাগ হল আমার। বললাম, ফের যদি মাঝ রাতে এমন বিরক্ত কর তাহলে তোমার বাবাকে বলে দেব কিন্তু।

হেবো ম্লান হয়ে যায়। আমতা আমতা করে ফিরে যায়। আমি শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না কিন্তু। বেচারিকে অমন ধমক না দিলেই ভাল হত।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই হেবোর কাছে গেলাম। হতভাগা অঘোরে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। বিছানায় ছড়ানো রয়েছে স্কেল, কম্পাস, খাতা-পেনসিল। মায়া হল; কী জানি—কত রাত পর্যন্ত জেগেছে বেচারি।

বেলা নটা নাগাদ হেবো উঠল। বললাম, কিরে? কাল রাতে বকেছি বলে রাগ করেছিস নাকি?

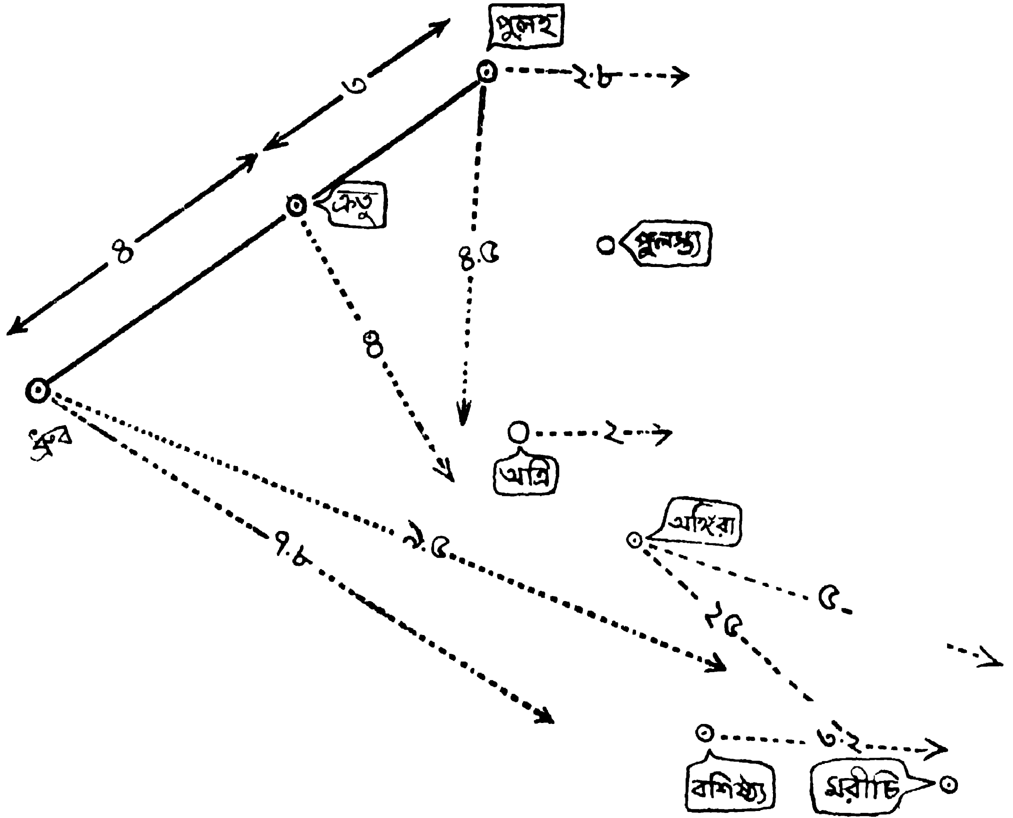
হেবো একগাল হেসে বললে, না ছোটকাকু। তবে সমাধান করে ফেলেছি। আপনার বন্ধুকে বলুন, পাসপোর্ট-ভিসা আর করাতে হবে না। এখান থেকেই আমি বলে দিতে পারছি কোথায় আছে বৃন্দাবনচন্দ্রের গুপ্তধন।

আমি তো স্তম্ভিত। বলি, কী বকছিস্ পাগলের মত? কাল রাত্রে কী জানতে পেরেছিস? কেমন করে জানলি?

ঃ জ্যামিতির অঙ্ক কষে। রাত চারটে নাগাদ বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা, কিন্তু আপনাকে ডাকতে সাহস হল না আর।

আমি কৌতূহলী হয়ে বলি, বল দেখি বুঝিয়ে—কী বুঝেছিস?

হেবো বললে, এই দেখুন আগে কি করে কূটচক্র ভেদসূত্র অনুযায়ী সপ্তর্ষির ছবিটা আঁকা যায়ঃ আপনি বলেছেন—ধ্রুব, ক্রতু আর পুলহ একই সরল রেখায় অবস্থিত।



সূত্র অনুযায়ী দূরত্ব মেপে প্রথমেই এক সরল রেখায় তিনটি বিন্দু পেলাম। এবার যেহেতু অত্রি থেকে ক্রতু আর পুলহের দূরত্ব জানা আছে তাই ক্রতু আর পুলহকে কেন্দ্র করে দুটি বৃত্ত-চাপ আঁকলে তার সংযোগ-স্থলে পাব অত্রিকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে জ্যামিতির হিসাব মত আমরা আটটি নক্ষত্রকেই আঁকতে পারব। স্কেল যদি এক যোজন=১ সেন্টিমিটার হয় তাহলে আমরা একটি নির্দিষ্ট মাপের ছবি পাব! কেমন তো?

ঃ ধর পেলাম। তাতে কী লাভ হল?

ঃ তারপর আর একটা কূটচক্র ভেদ করতে হবে। ঐ "বেদব্যাস-এর কূপগবাক্ষ"। এখানে 'বেদব্যাস' কোনও ঋষির নাম নয়, ব্যাসের বেদ, অর্থাৎ ডায়ামেটারের পরিমাণ।

প্রতিটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আধসেন্টিমিটার ব্যাসার্ধে একটা করে বৃত্ত আঁকতে হবে—

ঃ ধর তাও আঁকলাম। তাতে কী হল?

ঃ এখনও হয়নি। তবে প্রায় হয়ে এল। এবার 'কূপ' খনন করতে হবে।

ঃ তার মানে? কুয়ো খুঁড়ব কি রে? কোথায়?

ঃ তার মানে ঐ বৃত্তগুলি বরাবর কাগজ কেটে ফেলে গর্ত করতে হবে। তাহলে আমরা সাতটা গবাক্ষ পাব কাগজে! কেমন তো?

ঃ নিশ্চয় পাব। কিন্তু তাতেই বা কি?

ঃ এবার ঐ শেষ নির্দেশটা দেখুন।—"ভুলিও না ধ্রুবনক্ষত্রের চতুর্দিকে ঐ সপ্তর্ষি ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন।" এখন আপনি ঐ ছবিটাকে ঐ গ্রহাচার্যের লেখাটার উপর এমন ভাবে বসান যাতে ধ্রুব নক্ষত্রের উপর ধ্রুব নক্ষত্র বসে। এবার তীক্ষাগ্র শলাকায়, অর্থাৎ আলপিন দিয়ে ধ্রুব নক্ষত্রকে চেপে ধরে চক্রাবর্তনের পথে সপ্তর্ষিকে ঘোরাতে হবে। একসময় দেখবেন সমাধান পেয়ে গেছেন—সমাধানটা হচ্ছে "মন্দির-উত্তরে-শত-হস্ত-দূর-খনন-কর।"

আমার ভারী অদ্ভুত লাগল। তৎক্ষণাৎ কাঁটা-কম্পাস নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে বসলাম। আশ্চর্য! হেবো যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। কলকাতাতে বসেই বলে দেওয়া গেল, বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের ঠিক উত্তর-দিকে এক শ' হাত দূরে মাটির নীচে রাখা আছে ঐ গুপ্তধন।

বিশ্বাস না হয় তোমরাও চেষ্টা করে দেখতে পার। নেহাত যদি জ্যামিতি একেবারেই জানা না থাকে তবে দাদা-দিদি মামা-মাসী কাউকে পাকড়াও কর। তাঁকে দিয়ে আঁকিও না—তাঁর সাহায্য নিয়ে নিজেই ঐ সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে এঁকে ফেল। তারপর কোদাল নয়, কাঁচি দিয়ে কূপ খনন করতে হবে, অর্থাৎ কূপগবাক্ষ বানাতে হবে। এবার বৃন্দাবনচন্দ্রের হাতের লেখার উপর ঐ গবাক্ষ-ওয়ালা সপ্তর্ষিমণ্ডলকে এমনভাবে বসাও যাতে ধ্রুব নক্ষত্রের উপর ধ্রুব নক্ষত্র পড়ে। ধ্রুব নক্ষত্রকে তীক্ষ্ণ শলাকায় ভেদ করার কথা। তা, তীক্ষ্ণ শলাকা কোথায় পাবে? একটা আলপিন দিয়ে ঐ ধ্রুব নক্ষত্রকে বিদ্ধ কর। বাকী কাজ হচ্ছে ঘোরানো—ধ্রুব নক্ষত্রের চারদিকে সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে পাক খাওয়াও!

● নারায়ণ সান্যাল

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল।
গ্রহাচার্য আমার করকোষ্ঠী বিচার করিতে আসিলেন।
তখন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানিলাম শতভিষা
নক্ষত্রের অবস্থানহেতু আমার-ভাগ্যাকাশে এই দুর্যোগ
ঘনাইয়াছে। গ্রহাচার্য আমার হস্ত-রেখা বিচারান্তে
অবশেষে আরও বলিলেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে আমার
এই বিপদ কাটিয়া যাইবে। তখন নূতন বন্দোবস্ত
হইবে। ইংরেজ-সরকার হয়তো তখন নতুন হারে
কর গ্রহণ করিয়া আমার সহিত নূতন চুক্তি করিবে।

★ গহনরস্য

—"শার্লক হেবো ফিরে এলেন" সমস্যার সমাধান।

কেউ কেউ হয়তো তবু ব্যাপারটা বুঝলে না। তাদের জন্য ১৪০ পৃষ্ঠায় সমাধানটা আমি এঁকে দিয়েছি। কিন্তু আগেই সেটা তোমরা দেখ না যেন, শার্লক হেবোর দোহাই—গোয়েন্দা গল্প তো অনেকক্ষণ হল, এবার একটু জ্যামিতির খেলাই হ'ক না! পূজার ছুটি তো আছে। হাতেও আছে অফুরন্ত সময়!

হাতীমার্কা বরাত



শিবরাম চক্রবর্তী

এই হাতীমার্কা দেহ নিয়ে জন্মাইনি ঠিকই, এই কলেবর আমার স্বোপার্জিত—দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে বানানো, কিন্তু বরাতটা আমার হাতীমার্কাই—সেই গোড়ার থেকেই।

কিছুদিন ধরেই এমন টানাটানি চলছিল যে কহতব্য না। কিছু ধারের মতলবে এধারে ওধারে ঘেঁষছিলাম। অবশেষে আমার পুরনো বন্ধু কালীকৃষ্ণর কাছে গেলাম। ব্যবসাদার মানুষ, অঢেল টাকা তার।

কাছে গিয়ে ধারের কথা পাড়তেই সে বলল, বাপু হে! ধার দিয়ে কি কখনো কাউকে দাঁড় করানো যায়? ঐ মতলবে যদি কেউ আসে তো তার ধার ঘেঁষো না। কদাচ নয়। কদাপি না। কেননা, তার মতলব হাসিল হলে, টাকা হাতাতে পারলে সে আর ফিরে তোমার ধার ঘেঁষছে না, কোনো দিনও আর ফেরৎ পাবে না সেই টাকা। তার চেয়ে আগে ভাগেই তাকে ভাগাও।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। ইস্কুলে এক বেঞ্চে শুধু পাশাপাশি বসা নয়, এক সঙ্গে দাঁড়ানোর দোহাই পাড়লাম। এমনকি পরস্পর কান-মলামলির আর এগজামিনের দিনের টোকাটুকিই নয় কেবল, খেলার মাঠের ঠোকাঠুকির কথাও বাদ দিলাম না।

পুরনো দিনের সেই সব স্মৃতি চিত্তে জাগরূক হতে যে যেন উথলে উঠলো। বললো, না ধার নয়, তোমাকে আমি একেবারে উদ্ধার করব।

কী করে? সভয়ে আমি শুধাই: গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে?

না না। আমার এই অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসা আজকেই এমন ফলাও দেখছো, কিন্তু একদিন আমার কপালেও ভারী কষ্ট গেছে ভাই! বাজার মন্দা যায়, যায়ই মাঝে মাঝে; আর তাহলেই ব্যবসায়ীর কপাল মন্দ। খদ্দের নাস্তি। বেচাকেনা একদম্ নেইকো। আমদানি বন্ধ—কোনোদিকেই টাকার টিকিও দেখা যায় না। ব্যবসাদারির দফা রফা।

কী করে কাটলো তোমার সেই দুরবস্থা? কৌতূহলী হই।

বিক্রমপুর গিয়ে। সেখানে আমার মামার বাড়ি। পাওনাদারদের হাত এড়াতে পালিয়ে গেলাম সেখানে। এক অজ পাড়াগাঁয় থাকেন মামারা। সেখানে এক সাধুর দর্শন পেলাম। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করতে হলে তার গোড়ায় সাধুতার দরকার—কে যেন বলেছিল না?...সেই প্রথম আমার জীবনে সাধুতা দেখা গেল।

কি রকম?

রীতিমতন সাধুতা। আমি সাধুজীর পা টিপতে লাগলাম। সব কিছুই গোড়ার থেকে শুরু করতে হয়, আমারও তাই সাধুর ঐ গোড়ালির থেকে শুরু করা।

..বেশ বেশ। তার কথায় সায় দিতে হল আমায়।—রাষ্ট্রভাষাতেও শ্রীচরণকে ঐ গোড়ই বলেছে। আমি বলি।

ভেবে দেখলাম, এমনকি স্বয়ং খোদাও, যত বড় মাতব্বরই হোন না, প্রথমেই কিছু নিজের মাথা খাটাতে পারেননি। খোদকারির গোড়ায় পায়াভারী জীব দিয়েই তাঁর কারবারের সূত্রপাত, পায়চারি দিয়েই তাঁর শুরু হয়েছিলো প্রথম। চারপেয়েদের নিয়েই গোড়ায়।

গোদা গোদা পাওয়ালা হাতী আর তত্তুল্য হাতীমার্কা অতিকায় জানোয়ারদের দিয়েই তাঁর খোদাইকর্মের হাতেখড়ি আরম্ভ। তখনো তাঁর মাথা খোলেনি, ভালো মাথাওয়ালা কোনো জীবের খোলতাই হয়নি তাঁর হাতে। অবশ্যি, চলে ফিরে বেড়াতে আর খেটে



গোড়ার থেকেই দাবাই, গোড়ালির দিয়েই শুরু করা আমার। [পৃঃ ১৪২

খুঁটে খাবার জন্যে সব জন্তুর ধড়ের ওপরেই একটা করে মুণ্ডু বসানো থাকত বটে কিন্তু তাদের ঠিক মাথা--মাথা বলতে যা বোঝায়—বলা যায় না।

গজ হলেই তো আর মগজ হয় না? এমন কি দিগ্‌গজ হলেও নয়।

চারপায়াদের নিয়ে বহুৎ পায়চারি করার পর তাঁর মাথা খুলল। জানোয়ারদের কারো অবশ্যি তিনি মুণ্ডপাত করলেন না তা ঠিক, কিন্তু বিস্তর মাথা খাটিয়ে বার করা তাঁর সৃষ্ট শেষ জীবটির ঘাড়ে সেই মাথা খাটিয়ে দিলেন।

একসঙ্গে তাঁর আর আমাদের মাথা খেলল—শেষটায়। আর, খেলতে লাগলো তারপর থেকেই—যুগপৎ! স্রষ্টার শেষটার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব—এই মানুষ—আমরাই।

মানুষই তাঁর প্রথম মাথাওয়ালা জীব। তারপর থেকে সেই জীবই তাঁর হয়ে দিন-দুনিয়ার জন্য মাথা খাটাচ্ছে। সেই মগজওয়ালা মানুষই ত্রিভুবন জুড়ে দিগ্বিজয় করে বেড়াচ্ছে আজ—সে দিগ্‌গজ। ভেবে দেখি আমি শেষ পর্যন্ত।

সাধুজীর পায়ের গোড়ায় মাথা লুটিয়ে আমি বললাম। শুরু করল কালীকেষ্ট: গোড় লাগি বাবা। বলে তাঁর গোড়ালিতে হাত লাগালাম আমার। পা টিপতে শুরু করে দিলাম—গোড়াগুড়িই সব কাজ শুরু করতে হয় জানো তো?

তার পর?

শুধু পা টিপেই হয়নি ভাই। গাঁজাও টিপতে হয়েছে দেদার। গা আর গাঁজা টিপে টিপে অনেক করে তাঁকে ভজাতে পারা গেল।

এত টিপ ফসকালো না তোমার? আমার টিপ্পনি: তিনি বধ হলেন অবশেষে?

সাধুবাবার কাছে আমার দুঃখের কথা সব নিবেদন করলাম। সমস্ত শুনে বুঝি তাঁর কৃপা হল আমার ওপর। হাতছানি দিয়ে আকাশ থেকে একটা ডিবে আমদানি করলেন। নস্যির ডিবে। সেইটে আমার হাতে দিয়ে বললেন—ধর্ বেটা। এই নে, এই নস্যির ডিবিযাটা তোকে দিলাম, কাছে রাখ। কখনো হাতছাড়া করিসনি। এই নাস নাকে দিয়ে তুই যা চাস, যা চাইবি তাই হবে। এক এক টিপ টেনে তুই যে চীজ যাকে খুসি যে কোনো দামে বেচতে পারবি। এই নাস কাছে থাকলে কেনা-বেচার কারবারে কোনোদিন তোর সব্বোনাস হবে না। যা বেটা, নিয়ে যা এটা।

তারপর?

তারপর আর কী? সব জলের মতন সহজ। নস্যির ডিবে ট্যাঁকে গুঁজে কলকাতায় ফিরতেই, নাকে না দিয়েই, কী আশ্চয্যি ভাই, কপাল ফিরে গেল আমার। লক্ষ্মীলাভ হোলো সঙ্গে সঙ্গে। গৃহলক্ষ্মীলাভ। আর কন্যাদানের কিছুকাল পরেই আমার শ্বশুর মশাই অক্কালাভ করলেন—কন্যারত্নের সাথে তাঁর কাজ কারবার সব আমার হাতে তুলে দিয়ে—

পাণি গ্রহণের সাথে সাথে হাতে হাতে লাভ দেখছি—আমি কই—কিন্তু কারবারটা কিসের?

অর্ডার সাপ্লায়ের—চাহিদা মত মাল কিনে তার যোগান দেওযা, বিনা পুঁজির ব্যবসা। অর্ডার মাফিক মাল তুমি পাইকিরি বাজারে পাবে, ধারেই পাবে, নগদ দাম দিতে লাগে না। সেই মাল বেচে তার পরে আবার কেনার সময লক্ষ্মীছেলের মতন আগের দামটা মিটিয়ে দেবে। কোনো ঝুঁকি নেই ঝক্যি নেই।

বটে?

এই কারবারেই তো আমি ফেঁপে গেলাম ভাই! আঙুল ফুলে কলাগাছ বললে কমিযে বলা হবে খুব, বরং কলাবাগান হয়েছে আমার বলা যায়। সবই মা কালীর দয়া। বলল কালীকেষ্ট।—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী বলেছে না? তার একটি অক্ষরও মিথ্যে নয়।

তাতো বুঝলুম। আমি বলি—কিন্তু বোধ হচ্ছে আমার দ্বারা এ হবার নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছুই আমি বুঝি না যে।

বাণিজ্য বোঝো না, বাণী তো বোঝো? সে কয়ঃ বাণী মানে কথা। কাগজের পিঠে গল্পের ছলে লেখো কী? কথাই তো? কথার হেরফের, কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া কী আর? কথা বেচেই খাও তো ভাই; সেই কথারই কারবার এখানেও—সেই কথা বেচেই খাওয়া। যতো কেনারামদের পটিয়ে পাটিযে, বেচারাম হওয়া আর কি! বুঝলে?

তবুও আমি গাঁইগুঁই করি, ওর' কথায় তেমন উৎসাহ পাই না।

আচ্ছা, তুমি আমার এই নস্যির ডিবেটা নিয়ে যাও না হয। অনেক দিন ওটা আর আমার কাজে লাগে না। আজকাল আর নাকে নস্যি গলাতে হয় না আমাকে, সোজাসুজি নাক গলাই, কেনাবেচার ব্যবসা করিনে তো, বড় বড় কণ্ট্রাক্ট ধরি। মোটা মোটা মুনাফা। নিয়ে যাও তুমি ডিবেটা। নাকে নস্যি দিলেই তোমার মাথা খুলবে আর কথাও খুলবে সেই মতন। তারপর আর কী! সেই কথা ব্যাচো আর পযসা খ্যাঁচো। নস্যিতে নাক বোঝাই করে চোখ খোলা রেখে চলো। কেনবার জিনিস আর বেচবার লোক আপনার থেকেই তোমার নজরে পড়বে। বলে সে তক্তপোষের পাশে দলিল দস্তাবেজের আড়াল থেকে নস্যির ডিবেটা বার করে আমায় দিলো।—তোমার কাজে লাগাও এটা এখন, বলল সেঃ পরে যদি কখনো তেমন দরকার পড়ে আমার, দিয়ো আমাকে, কেমন?

বাঃ, সে কি! তোমার জিনিস তোমায় দেব না—এ কেমন কথা! বলে নাকে নস্যি গুঁজে সুযোগ খুঁজতে বেরুলাম।

যেতে যেতে এক রাস্তার কোণে কতকগুলো অদ্ভুত চেহারার কাঠের খেলনা আমার চোখে পড়ল।

এগুলো কী হে? শুধোতে লোকটা বললঃ মাংস থোরার যন্তর। মাংস থুরে থুরে কিমা বানাতে হয জানেন না?

না তো। ও সব তো মা-কাকিমাদের কাজ। আচ্ছা, দাও তুমি ওই গোটাকতক।

তারপর ঐ মাংস থোরাই-এর যন্তর নিয়ে গোঁসাই পাড়ার দিকে পা বাড়ালাম।

সটান প্রভুপাদ অতুল গোস্বামীর সামনে—তাঁর ললিতাকুঞ্জে। একটিপ নাকে না দিয়ে নিবেদন করেছি—এই নিন্, আপনার মাংস থোরার যন্ত্র। বলিছি গিয়ে।

শুনেই না গোঁসাইঠাকুর নাক সিঁটকালেন—'বৈষ্ণব মানুষ, আমরা তো মাংস ছুঁইনে। মাংস থোরার যন্তর দিয়ে আমাদের থোরাই কারবার! ও নিয়ে কী করব আমরা?'

'মাংস না খান, থোর তো খান? গাছ পাঁঠা তো চলে?' আমি বলি: 'থোরকেও যদি যন্ত্রের সাহায্যে থুরে নেন তো অতি উপাদেয় হয়। কখনো কি থোরা থোর চেখে দেখেছেন প্রভু? থোরা চাখলেই টের পেয়ে যাবেন।'

'সত্যি বলতে থোরানো থোর থোরাই খেয়েছি!' স্বীকার যান প্রভুপাদ।—'কিন্তু ধরা যাক, থোরা গেল না হয় থোর, তারপর? ততঃকিম্?' তিনি শুধান।

'ততঃকিম্?' আমি কই: 'ততঃ কিমা। তারপরই কিমা। তারপরেই না। কাকিমাকে বলবেন বানিয়ে দেবেন তিনি। খেয়ে তাঁহা তাঁহা করতে হবে তখন।' আমার কথায় তাঁকে মৌনভাবে ভাবিত দেখে নিমরাজি হয়েছেন ভেবে হেঁকে দিয়েছি—এই নিন্ এক ডজন।

কালীকেষ্ট বলেছিল মিথ্যে না। নাকে নস্যি দিয়েই নাকি যা খুশি যাকে খুশি গছানো যায়। ঠিক তাই. কোথ্থেকে যে আমার এত কথা যোগায় ভেবে পাই না। আমি নিজেই তাজ্জব বনে যাই।

'একখানা তো হাত, দশখানা নয়। এক ডজন নিয়ে কী করবো হে? একটাই যথেষ্ট।'

'একখানায় কি কুলোয় গোঁসাইজী? থোর থেকেই বহুৎ। থোরা বহুৎ। গাছপাঠাকেও থুরে খান না—দেখবেন কী খাসা! কেমন চমৎকার। গাছ পাঁঠা কি আসল পাঁঠা যাই হোক না, থোরাই করে পাট করে তাকে খেয়ে দেখুন, থোরার পরে দেখবেন তার পাঠ্যাবস্থা দূর হয়েছে। একেবারে পরিপাটি। প্রবেশিকা পাস ছাত্রের মত মানুষ হয়ে ভদ্রলোকের, এমনকি খাঁটি বৈষ্ণবের পাতে পড়ার যোগ্য সে তখন।'

'থুরে থুরে বুড়ো মানুষের মতন থুরথুরে করে দিলাম না হয়, কিন্তু তারপর? ততঃ কিম্?' পুনরপি তাঁর সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

'তারপরেই কিমা—বললাম না? সেই কিমা দিয়ে চপ কাটলেট যা ইচ্ছে বানান। এঁচোড়ের দোঁপেয়াজী, মোরগ মোসল্লাম—না না, মুর্গি না, ঐ এঁচোড়েরই নানান খানা বানান না। এঁচোড়ের দোপেঁয়াজী করুন—কিম্বা সামী কাবাব খান—যা আপনার প্রাণ চায়। যা খুসি।'

'সামী কাবাব? এঁচোড়ের?' সামী কাবাবের কথায় গোঁসাই ঠাকুর, একটুখানি টলেন যেন, কিন্তু আমি গোস্বামী-কাবাব বানাতে পারি না এত করেও। এমন সাধন ভজন করেও ডজন খানেক গছানো গেল না তাঁকে।

তিনি বললেন—'একটাই অঢেল। দুটোমাত্র হাত আমার, দু ডজন নয়। বারোটা যন্তর নিয়ে করবোটা কী? ক হাতে চালাবো? আর, বারোটা হাত হলেই বা কী হোতো? নিজের সঙ্গে সেটা কি এক হাতাহাতি হয়ে উঠত না? আপনি বলছেন আজ এটায় কাল ওটায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থুরতে? দিনের পর দিন অদলবদল করে সবকটাকেই কাজে লাগা'তে। কিন্তু পালা করে যদি ওই বারোটার পাল্লাতেই পড়তে যাই সেটা কিছু কম মেহনত হবে না। বিশেষ করে এই বয়েসে। তাছাড়া, নিজের হাতের সঙ্গে এত হাতাহাতি করা কি পোষায়? তাতে যে নিজের হাতেই হতাহত হতে হবে মশাই?'

সামী কাবাবের এত কীর্তন গেয়েও গোস্বামী ঠাকুরের কাবাব বানাতে পারলাম না। একখানার বেশি তাঁকে গছানো গেল না কিছুতেই।

শেষমেষ তিনি বলেই দিলেন—আমার এই যৎ কিঞ্চিৎ দুহাতে যদি বারোটা যন্তর এক সাথে চালাতে যাই সেটা কি একটু বাড়াবাড়ি হবে না? আমার এই সামান্য দুটি বাহুর পক্ষে নিতান্তই বাহুল্য হবে বলে বোধ করি।

যাক্ গে, কী করা যাবে আর? এক টিপ নস্যি টেনে বেরুলাম সেখান থেকে।

রাস্তার মোড়ে একজন শিল নোড়া নিয়ে বেচতে বসেছিল। তার শিলগুলো সস্তায় কিনলাম।

নোড়াগুলো নিলেন না বাবু? শুধোলো লোকটা।

নেব এসে পরের ক্ষেপে—বললাম তাকে: দেখি যদি ডেন্‌টিস্‌টদের কাছে গছানো যায় ওগুলো। ভজানো যায় তাদের। এগুলোর তো গতি করি আগে।

চলে গেলাম ময়দানের যতো ফুটবল ক্লাবে। এক নির্ভরশীল মুটের ঝাঁকায় ওগুলো চাপিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হানা দিতে লাগলাম। ছোট বড় মাঝারি এমনকি খুদে খুদে ফুটবলারের কাছে যেতেও কোনো কসুর করলাম না।

শিল নিয়ে কী করবো আমরা? আমার প্রস্তাবে তারা হাঁ হয়ে যায়। ওই খুদেরাও।

কেন, ম্যাচ খেলবে গো। আমি কই।

শিল নিয়ে খেলব কি! আমরা ফুটবল নিয়ে খেলি যে! তারা বলে, শিল নিয়ে ফুটবল খেলার মতন পায়ের জোর অত কি আছে আমাদের!

একজন ত বলেই দিলে—শিল দিয়ে স্যুট করতে গেলে গোল করা দূরে থাক নিজেরাই পা ভেঙে তালগোল পাকিয়ে মাঠে পড়ব শেষটায়!

যাচ্চলে! শিলকে স্যুট করতে যাবে কেন হে? শিলডম্যাচ হয় না? সেই ম্যাচের শিলড হবে এগুলো।

সে—ই শিলড! তাদের চোখগুলো মুখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁ করে এবার—শিল আর শিলড কি এক হোলো নাকি?

এদের পিঠে একটা করে ড বসিয়ে দিলেই তো হয়। হবে না? চক দিয়ে লিখে এদের ডকারান্ত করে? তাই করে নাও না? আমি বাতলাই। সুশীল বালকদের তারপর আর শিল কেনার কোনো বাধা থাকে না।

শেষমেষ পড়ে রইলো খান পাঁচেক।

সেগুলো নিয়ে চলে গেলাম এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে। বর্মা মুলুকের থেকে সবে আমাদের বাংলাদেশে এসে কলকাতার বুকে এক বিহার ফেদে বসেছিলেন তিনি।

গেলাম তাঁর কাছে।

প্রভু! আপনাদের বৌদ্ধ ধর্মে পঞ্চশীলের বহুৎ প্রশস্তি শুনেছি। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম, এই নিন সেই পঞ্চশীল।

বলতেই তিনি দ্বিরুক্তি না করে প্রসন্নমুখে শিল পাঁচখানা নিলেন।

সেখান হতে এগিয়ে এক বাংলো প্যাটার্নের বাড়িওয়ালার কাছ থেকে মোটা টাকার এক বায়না আদায় করে বসলাম।

বায়নাটা তাঁদের ছাদের জন্যে একটা সিঁড়ি বানাবার। বাংলোওলার বৌ অবশ্যি আপত্তি তুলেছিল, বলেছিল, আমাদের তো বাপু ঢালু ছাদ। ঢালু ছাদের সিঁড়ির কী দরকার? সেখানে উঠবে কে? সেথায় কি বেড়ানো যায়? বেড়ায় কেউ নাকি?

নাকে নস্যি টিপে আমি জবাব দিয়েছি—শুধু বেড়ানো কেন, আরামে গড়ান না দিদি! না না, আমি গড়িয়ে পড়ার কথা বলছিনে, শুয়ে গড়াবার কথাই বলেছি। ছাদের চারধারে মজবুত বারান্দা লাগিয়ে দেব—এমন কিছু বেশি পড়বে না—আরামে গড়াতে পারবেন, গড়াতে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে না। ঐ বারান্দাতেই আটকে যাবেন। সিঁড়ি রইলো ওঠার নামার। শীতের দিনে ছাদে উঠে আরাম করে রোদ পোহান না—চমৎকার!

সাদা বাংলার মতই কথাটা আমার বুঝে নিলেন ওই বাংলোওয়ালা। সিঁড়ি সহ বারান্দার মোটা একটা চেক বাগিয়ে এনেছি তারপর আগাম।

সেখান থেকে খানিক আগিয়ে যেতেই দেখি, রোয়াকে বসে খড়ি পেতে কী গুণছেন এক গণকঠাকুর।

খড়ি চাই আপনার? কাছে গিয়ে নিবেদন করি।

তা, একটুখানি পেলে মন্দ হয় না। তিনি কনঃ এটা তো প্রায় ফুরিয়েই এসেছে।

তাঁর মুখের কথা খসতেই না—আমি খসেছি।

ছুটেছি একজনের গুদামে, সেখানে মনচারেক চকখড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছিল। ঠেলায় চাপিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছি তৎক্ষণাৎ।



'এই নিন আপনার পঙ্কশীল!' [পৃঃ ১৪৮

এত খড়ি? এত খড়ি আমার কী হবে গো? গুণতে আমার কট্টুকুন খড়ি লাগে আর! গণক ঠাকুর অতো নেহাত নগণ্য করেন।

সে কী কথা! আমি বলি—আপনি রাজজ্যোতিষী না? এখনো যদি রাজজ্যোতিষী না হয়ে থাকেন, যুবরাজ জ্যোতিষী তো বটেই। গুণতে গুণতে অগোণে আপনার রাজত্ব কেঁপে উঠবে। সম্রাট-জ্যোতিষী হবেন! চার মণ না নিন, একমণ তো লাগবেই।

এক মণ! এক মণের কী দরকার! একটু হলেই তো হয়ে যায়। অত খড়ি দেখে তিনি যেন আতঙ্কিত হন।

আপনি গণক, আপনাকে বেশি কী বলব আর? গোণা-গাঁথা কি সোজা কাজ মশাই? একমন না হলে কি গোণা যায় কখনো? আপনিই বলুন না!

গণক ঠাকুর গুণী লোক। না বলতে পারেন না। তাঁকে মানতে হয়। মুখে এবং মনে সায় দিতে হয় তাঁকে।

তাঁকে ধরাশায়ী করার পর বাকি তিন মণ নিয়ে আমি চলে যাই ময়দানে। সেখানে এক সার্কাসের দল এসে তাঁবু গেড়েছিল। এক গাড়ি খড়ি নিয়ে আমি সেখানে গিয়ে হাজির!

সার্কাসের ম্যানেজার ঘাড় নেড়েছেন, না মশাই না, খড়ির আমাদের কোনো দরকার নেই। চক দিয়ে কী করবো আমরা?

তাঁবুর চেহারা ফেরান না! বাতলেছি আমি—চক লাগান তাঁবুতে। তাঁবু চকচকে হবে। চটের গায়ে খড়ি মাখালেও চটক বাড়ে, তা জানেন? আপনার তাঁবুর চাকচিক্য বাড়লে চমক লাগবে সবার। টনক নড়বে, নজর টানবে লোকের। আর নজর টানার মানেই তো পয়সা আনা। যার নাম কিনা নজরানা।

তারপর আর খড়ি বেচতে একটুও বেগ পেতে হয়নি আমাকে।

তা, সারাদিনের কারবার নেহাত মন্দ হয়নি ভাবলে। এক ইলেকট্রিকের কারখানায় শ পাঁচেক লণ্ঠন বেচেছি। জুতোর দোকানে খড়ম বেচে এসেছি। গোরুর খাটালওয়ালাকে গছিয়ে এসেছি ঘোড়ার লাগাম—এক-আধটা নয়, ডজন ডজন।

কিন্তু তাঁবুর। থেকে এক চক্কর না আসতেই টক্কর খেলাম এক বালকের কাছে।

স্যাম্পল দেখাবার জন্যে পকেটে রাখা ছটাক খানেক চক পায়ে পায়ে বাধা দিচ্ছিল আমায়। লাগছিল আমার গায় গায়।

একটা ছেলেকে দেখে ডেকে বললাম, চক্‌খড়ি আছে, নেবে? বেশি দাম নয়। সামান্যই।

চক নিয়ে কী করবো মশাই? আমার কি আর হাতে খড়ির বয়েস আছে নাকি?

আহা, শিক্ষার বয়স কি কোনোদিন যায়? সারা জীবন ধরেই শিখতে হয়! যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি—পরমহংস দেব বলে গেছেন না? তেমনি যতই শিখি ততই লিখি—বুঝেছ? হাতে লেখার অভ্যেসও ঐ সারা জীবনের···

কিন্তু সে বাধা দিয়ে বলে—হাত আমার পেকে গেছে মশাই! এখন কি নতুন করে আবার হাতের লেখা মক্‌সো করবো নাকি? জানেন, আমি ক্লাস টেন্‌-এ পড়ি?

বলে সে টেনে দৌড় মারল—দাঁড়ালো না আর।

দেখলাম, শুধু হাতেই নয়, আগাপাশতলা পাকা ছেলে—আপাদমস্তক পক্ক।

ধাক্কা খেলাম আমি। এই প্রথম। চালের আড়তদারকে কাঁকরের বদলে কাঁকুড়ের বস্তা গছিয়ে এসেছি, দর্জির কাছে দর্জা, ঘড়ি মেরামতির দোকানে হাতুড়ি, ছ্যাকরা গাড়ির

কচুয়ানের কাছে, না, কচু নয়, ঘোড়ার বদলে পেতলের ঘড়া বেচে এলাম। রেশনের দোকানে অপারেশনের যন্ত্রপাতি চালাতেও কোনো বেগ পাইনি। বাধা পেলাম এই প্রথম।

ছেলেটার কথায় ধাক্কা লাগলো বেজায়।

লাগতেই পকেটে হাত পুরেছি নস্যির জন্যে—নিতে গিয়ে দেখি, একি! নস্যির ডিবে তো নেই। গেল কোথায়? অ্যাঁ?

কোথায় হারালাম ডিবেটা? হন্যে হয়ে মাথা ঘামাই। সারাদিনে কোথায় কোথায় গেছি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসি।

সার্কাসের ম্যানেজারের টেবিলেই ফেলে আসিনি তো ভুলে? দৌড়লাম তক্ষুণি।

সেখানে ফিরে গিয়ে অবাক হতে হোলা।

সার্কাসের মালিক আমাকে হাঁচির তালিকা দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। খুব সম্ভব, আমার নস্যি নাকে নিয়েই এমন নাকাল হয়েছেন। কিন্তু বিস্ময় সেজন্য নয়, হাঁ হয়ে গেলাম এই দেখে যে সেই খড়ি তাঁবুতে না লাগিয়ে জলে গুলে একটা হাতীর গায়ে মাখাচ্ছেন তিনি।

'এ কী! একী করছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হাতীটা বুড়ো হয়ে গেছে কিনা! কোনো কাজে লাগে না আর।' তিনি জানান: 'তাই চেহারা ফেরাচ্ছি এটার। দেখি, কিছু এর কিনারা করা যায় যদি।'

'খড়ি মাখিয়ে কী গতি করবেন শুনি এর?'

'ভাবছি—এটাকে বেচে দেব এবার।' জানান ম্যানেজার।

'বুড়ো হাতী কিনবে কে? দাঁত আছে এর?'

বাইরে তো কোনো হাতীকা দাঁত প্রকাশ পায়নি, ভেতরে যদি তার ছিটেফোঁটা থেকে থাকে কিছু! তাই আমার এই খোঁজ খবর।

'হাঁ কর তো। হাঁ করো।' হাতীকে অনুরোধ করল ম্যানেজার—'তোমার দাঁত দেখাও। গজদন্ত বার করো দেখি তোমার।' গজ গজ করলেন তিনি।

হাঁ করে হাতী দাঁত দেখালো। একটাও দাঁত ছিল না।

'ফোকলা দিগম্বর! কেউ কিনবে না মশাই!' আমি কই। 'এই শহরে এমন বোকা কেউ নেই!'

'তা বটে। গোড়ায় তাই ভেবেছিলাম বেচবার আগে দাঁত বাঁধিয়ে দেব বেচারার। কিন্তু বাঁধাইওয়ালা পাইনি। হাতীর দাঁত বাঁধাতে পারে এমন কিস্মত কোথাও কারো

নেই। তারপর আপনার এই খড়িটা পেতেই সব ঠিক হয়ে গেল। এতেই চলে যাবে মনে হয়।'

'চলে যাবে তার মানে?'

'মানে, এটাকে শ্বেতহস্তী বলে চালানো যাবে এবার। সাদা হাতীর জেয়াদা দাম, জানেন তা? খুব দুর্লভ বস্তু কিনা।'

'বটে বটে? কেমন দাম একেকটা শ্বেতহস্তীর?'

'তা লাখ খানেক তো বটেই। তবে হাজার বিশেক পেলেই বেচে দেব এটাকে। বড় লোকের আস্তাবলে হাতী বাঁধা থাকে। যার দোরে এ বাঁধা থাকবে সে-ই বড়লোক। শুধু বড়লোক নয়, বড়লোকের বাবা। শ্বেতহস্তী কিনা—বুঝেচেন?'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমার তো অতো টাকা নেই, সারা দিনের কারবারে কেমন পেয়েছি খতিয়ে দেখি···।' পকেট হাতড়ে হিসেব করে দেখলাম, বড় নোটে মেজ নোটে ছোট-নোটে খুচরোয় রেজকিতে সব মিলিয়ে ঐ হাজার বিশেকই হয়েছে মোটমাট।

তথাপি আমি কিন্তু কিন্তু—'খড়ি-গোলা এই ভ্যাজাল হাতী কিনবে এমন গোলা লোক কেউ আছে নাকি এখানে? তাছাড়া যাই বলুন আপনার হাতীটার হাতে খড়িও হয়নি ঠিক।'

'হাতে খড়ি?' তারমানে? হাত কোথায় ওর?'

'সামনের হাত দুটোয়। হাত বা পা যাই বলুন! হাতীকে চতুষ্পদ বা চতুর্ভুজ দুইই বলা যায়।'

'হাতীর রঙ সাফ করতে শুধু খড়িতেই কুলোয় না মশাই, ট্যালকম পাউডার চাই। কয়েক বোরা এনে দিন না তাই।'

'বোরা বোরা ট্যালকম লাগে না। কয়েকপট বোরোলিন হলেই হয়ে যায়।' আমি বলি।

'এখন তো হাতী নিন, নিয়ে যান, তারপর বাড়ি গিয়ে যতখুসি বোরোলিন লাগান।'

'যা বলেন তা বলেন। এই নিন আমার বিশ হাজার। হাতীটা নিয়ে আমি চললাম।'

সার্কাস থেকে বেরুতে গেটের লোকটা আমায় শুধোলো—কী মশাই! পেলেন আপনার জিনিস—যা খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?

'না পাইনি—তবে এইটা পেয়েছি, একটা দুর্লভ জিনিস। এই সাদা হাতীটা।'

সারাদিনের আমদানি বিশ হাজার দিয়ে—বিষে বিষক্ষয় করে—ফোকলা দিগম্বরকে নিয়ে দোকলা হয়ে ফিরলাম।

———



বংশীলাল

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আমি বললাম, বোস—

লোকটা কিন্তু বসে না। দাঁড়িয়েই রইল। গায়ের লম্বা ঝুল গলাবন্ধ কোটটা কতকালের যে পুরাতন ও জীর্ণ সেটার দিকে তাকালে সেটা বোঝবার উপায় নেই—তার উপর কাদা মাটি লেগেছে, ও আরো কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে।

কপালের ডান দিকটায় অনেকখানি কেটে গিয়েছে, তখনো রক্ত চুইয়ে পড়ছে। ডান দিকের ভ্রূর উপর একটা মারবেলের আকারে ফুলে উঠেছে।

মুখ ভরতি কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথার চুলও কাঁচাপাকা—বিস্রস্ত—ধুলো বালিতে এখানে ওখানে জট পাকিয়েছে।

লোকটা মধ্যে মধ্যে বন্ধ দরজার দিকে কেমন যেন অসহায় ভীত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। বাড়ির সামনে বাইরে জনতার চেঁচামেচি তখনো শোনা যাচ্ছে।

কে একজন বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বললে, ওকে ছেড়ে দিন ডাক্তারবাবু—ওকে পুলিসে দেবো আমরা—

তুমি ঐ চেয়ারটায় বোস, আমি দেখচি—আমি কথাটা বলে দরজা খুলে জনতার দিকে তাকালাম।

একজন এগিয়ে এসে বললে, ডাক্তারবাবু, ওকে ছেড়ে দিন—

শোন, লোকটা আমার চেনা।

যে ছেড়ে দিতে বলছিল সে বললে, আপনার চেনা?

হ্যাঁ—অনেক দিনের চেনা—এ পাড়ায় এসেছিল ও আমারই খোঁজে—

আপনি জানেন না ডাক্তারবাবু, সীতুকে—হিমাংশুবাবুর ছেলে, জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল—আমরা না এসে পড়লে, বাধা দিলে—

না, না—ও কাউকে ধরে নিয়ে যেতো না। বলচি ত ও আমার চেনা—চোর ছ্যাঁচোড় বদমাশ বা ছেলেধরা ও নয়—

অনেক কষ্টে পাড়ার ছেলেদের শান্ত করে বিদায় দিলাম। ওরা চলে গেল বটে তবে মনে হলো ওরা সন্তুষ্ট হয়নি। ভিতরে ঢুকে আবার ঘরের দরজায় খিল তুলে দিলাম।

লোকটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে—

বোস—ওরা চলে গেছে। আর তোমার কোন ভয় নেই।

কিন্তু আমার কুশল—

কুশল! কে সে?

আমার—আমার ছেলে। অনেক দিন—অনেক দিন ধরে খুঁজতে খুঁজতে আজ আমি কুশলকে পেয়েছিলাম—

•• বুঝলাম কোথায়ও একটা কিছু ভুল হয়েছে।

কি নাম তোমার?

আমার নাম!

হ্যাঁ, কি নাম তোমার?

বংশীলাল মিশ্র!

বাড়ি কোথায়?

উত্তর প্রদেশে—

ইউ. পির লোক তুমি? কিন্তু বেশ ত তুমি ভাল বাংলা বলতে জান। এত ভাল বাংলা শিখলে কি করে?

● বংশীলাল

আমি ছয় বছর কলকাতার কলেজে পড়েছি—

কলেজে পড়েছো! একটা যেন ধাক্কা খেলাম আমি। মানুষটা কলেজে পড়েচে এই কলকাতা শহরেই।

হ্যাঁ—কেমন যেন উদাস অন্যমনস্ক গলায় বললে বংশীলাল। যেন মনে হলো কি ভাবচে।

কত দূর পড়েছো?

এম. এ. পর্যন্ত পড়েছিলাম। কিন্তু দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন—অনেক খুঁজে কুশলকে পেয়েছিলাম। সে আবার হারিয়ে যাবে—কুশলের অন্ধ মা যে আজ তারই জন্য দিন গুনছে।

হারাবে না। ভয় নেই তোমার—কুশলকে আমি খুঁজে দেবো।

খুঁজে দেবেন। সত্যি বলচেন।

হ্যাঁ—

না। আপনি বুঝতে পারচি আমাকে মিথ্যা আশা দিচ্ছেন। অনেকে যেমন আগেও দিয়েছে—আচ্ছা ওরা সবাই আপনাকে ডাক্তারবাবু বলছিল—আপনি কি ডাক্তার।

হ্যাঁ—

আচ্ছা ডাক্তারবাবু—

বল।

কুশলের মা পার্বতী, যদি আবার তার ছেলেকে ফিরে পায়—নিশ্চয়ই তার চোখের দৃষ্টিও ফিরে পাবে—

জানি না, কুশলের জননী পার্বতী কেন অন্ধ হয়েছে—কি করে অন্ধ হয়েছে—আর তার চোখের দৃষ্টি কোন দিন ফিরে পাবে কিনা তাও জানি না, তবু যেন ঐ মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, নিশ্চয়ই। ফিরে পাবে বৈকি—

আমিও তাই বিশ্বাস করি। ডাক্তাররা যাই বলুক—ছেড়ে দিন ডাক্তারবাবু আমাকে। —হঠাৎ যেন আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে বংশীলাল—ও আবার হয়ত এমন জায়গায় পালিয়ে যাবে আর ওর দেখাই পাবো না—বড় দুষ্টু যে কুশল।

বুঝতে তখন আর আমার বাকী ছিল না, ঐ হতভাগ্য লোকটার জীবনে কোথায় যেন একটা দুঃখের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে।

বংশীলাল—

জী—

তুমি ঠিক জান, ঐ ছেলেটিই তোমার সেই হারান ছেলে কুশল—

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, ভুল আমার হয়নি। আমি তার বাপ—আমি কি ভুল করতে পারি। কোন বাপ কি তার ছেলেকে চিনতে ভুল করে। না করতে পারে।

আমি কি জবাব দেবো বুঝতে পারি না, এত বড় বিশ্বাসকে কেমন করে উড়িয়ে দেবো সত্যিই বুঝতে পারি না, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে ভবেশ ছেলেটি যা বললো সেই বা অবিশ্বাস করি কি করে—ছেলেটি এ পাড়ারই উকিলবাবু হিমাংশু চক্রবর্তীর ছেলে সীতাংশু চক্রবর্তী।

বংশীলাল আবার বললে, ভুল আমার হয়নি। দেখবেন, এই দেখুন—বলতে বলতে গায়ের সেই জীর্ণ মলিন ঝুল কোটের ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে মলিন একটা খাম টেনে বের করল। তারপর বললে, দেখুন এই খামের মধ্যে আমার ছেলে কুশলের ফটো আছে। মিলিয়ে দেখুন, আমি মিথ্যা বলেছি কিনা।

কেমন যেন একটা কৌতূহল অনুভব করি, খামটার ভিতর থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করলাম। আশ্চর্য—ওর জামাকাপড় ও চেহারার মধ্যে যতই মালিন্য ও জীর্ণতা থাক না কেন—ফটোটা একটু লালচে হয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু কোন মালিন্য নেই—একটি ১২।১৩ বছর কিশোরের ফটোগ্রাফ।

মাথা ভরতি কোঁকড়া চুল—প্রশস্ত ললাট—দুচোখের দৃষ্টিতে যেন বিশ্বের মায়া জড়িয়ে আছে। গলার বোতাম খোলা একটা হাফশার্ট গায়ে—

''কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য—ঐ ফটোর কিশোরটির মুখের সঙ্গে আমাদের পাড়ার হিমাংশু চক্রবর্তীর ছেলে সীতাংশু চক্রবর্তীর যেন অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য আছে। হঠাৎ দেখলে সত্যিই ভুল হতে পারে—

দেখলেন ডাক্তারবাবু, দেখলেন! আমি ভুল করেছি এখনও আপনি বলবেন! —বংশীলাল বললে।

না—

ভুল করিনি আমি তাই না! প্রত্যাশার আনন্দে বংশীলালের চোখের তারা দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।'

আ—আমি যাই ডাক্তারবাবু—

● বংশীলাল

বসুন—আপনি বসুন। হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে আমার 'আপনি' সম্বোধনটা বের হয়ে এলো।

ও যখন এ পাড়াতেই আছে—আমি সব ব্যবস্থা করবো।

করবেন—সত্যি বলচেন ব্যবস্থা করবেন ডাক্তারবাবু।

হ্যাঁ—

কিন্তু দেরি করলে ও পালিয়ে যাবে আবার—

না। যাবে না। আপনি ওর মানে ঐ কুশলের সব কথা আগে বলুন ত শুনি—কবে—কত দিন আগে পালিয়েছিল আপনার ছেলে বাড়ি থেকে—

এটা—এটা কোন্ সাল ডাক্তারবাবু?

কেন বলুন ত। ১৯৬৪ সন—আজ দশই ডিসেম্বর—

সেও—সেও ছিল ডিসেম্বর মাস।

ডিসেম্বর মাস!

হ্যাঁ—আর সে সালটা বোধহয় ছিল—ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে বংশীলাল। যেন মনের পাতা হাতড়াতে থাকে একটা অতীত দিনের খোঁজে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে বললে, হ্যাঁ মনে পড়েছে—সেটা ছিল ১৯৫৯ সাল—

নাইনটিন ফিফ্‌টি নাইন।

হ্যাঁ—নাইনটিন ফিফ্‌টি নাইন—নাইনটিন ফিফ্‌টি সেভেনেই ত আমি প্রতাপগড় স্কুলের হেডমাস্টার হই—হ্যাঁ—হ্যাঁ তার ঠিক দু'বছর পরে—

বুঝলাম কোথায়ও একটা গোলমাল আছে—তবু প্রশ্ন করলাম, ঐ ফটোটা আপনার ছেলের কবে তোলা।

যেবারে ও হারিয়ে গেল সেই বছরই গোড়ার দিকে—স্টেশনের কাছে প্রতিবছর মেলা বসত—সেই মেলা দেখতে গিয়ে ও তুলেছিল ফটোটা।

মনে মনে হিসাব করি—তাই যদি হয়ত সেও আজ পাঁচ বছরের ব্যাপার।

বললাম, তখন তার বয়স কত ছিল?

কত বয়স ছিল? ঠিক বার—

হিমাংশু চক্রবর্তীর ছেলের বয়স বছর চোদ্দ হবে। এবং বংশীলালের কথা যদি সত্যিই হয় ত—ইতিমধ্যে আরো পাঁচটা বছর গড়িয়ে গিয়েছে—কুশলের বয়স এখন তাহলে সত্য হিসাব মত হয় সতের—এক তরুণ যুবক।

কিন্তু এত বড় ভুলটা হচ্ছে কেন বংশীলালের।

২

সময়ের হিসাব কি বংশীলালের সব গুলিয়ে গিয়েছে। আর আমি নিজে একজন ডাক্তার বলেই মনে হলো সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বংশীলাল পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ নয়।

বংশীলাল,—

জী ডাক্তার সাব্—

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন আপনার খাওয়া হয়নি—ক্ষিধে পায়নি আপনার।

না, না—এখন আমার খাবার সময় নেই--কুশলকে খুঁজে পেযেছি—ওর মা গ্রামের বাড়িতে অন্ধ একা—আমার ফেরার পথের দিকে চেয়ে আছে—আপনি আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। ওর সন্ধান যখন পেযেছি—আজই কলকাতা থেকে রাতের এক্সপ্রেস ধরব। বংশীলাল অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু আমি ওকে আবার হাত ধরে চেয়ারটার উপরে বসিয়ে দিই।

বলি, বসুন, ব্যস্ত হবেন না আপনি। আমি সব ব্যবস্থা করবো—তাছাড়া বুঝতেই ত পারচেন—পাড়ার ছেলেরা জানতে পারলে কুশলকে কিছুতেই আপনাকে নিয়ে যেতে দেবে না।

হ্যাঁ—ঠিক বলেছেন—এখন আমি কি করি বলুন ত?

আমি সব ব্যবস্থা করবো—

করবেন।

হ্যাঁ! আপনি আপনার ছেলের সব কথা আমাকে বলুন!

•• জানেন ডাক্তারবাবু, ছেলে আমার খুব ভাল ছিল—লেখায় পড়ায় একেবারে হীরের টুকরো। কিন্তু কি যে হলো—বিগড়ে গেল কুশল—পাড়ার কতকগুলো মস্তান বয়াটে ছোকরা ওর মাথাটা বিগড়ে দিল—অমন ছেলে আমার কুশল—সে কিনা—আর যেন বলতে পারে না বংশীলাল। তার গলার স্বরটা রুদ্ধ হয়ে আসে। দু'ফোঁটা অশ্রু চোখের কোল বেয়ে মুখের দাড়ির উপর উপচে গড়িয়ে পড়ে।

বংশীলাল আবার বলতে লাগল, যে ছেলে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই ছেলে একদিন রাত্রে স্কুল ফাণ্ডের ক্যাশ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবার আগের দিন রাত্রে বাড়িতে এনে রাখতাম—পরের দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিয়ে দিতাম সেই সব টাকা—আড়াই হাজার টাকা—কি বলবো ডাক্তারবাবু—সেই টাকা চুরি

● বংশীলাল

করে সে পালাল। তা করুক চুরি—ছেলেমানুষ একটা ভুল করে ফেলেছে—স্কুলের ফাণ্ডের সে টাকা আমি পরের দিন শোধ করে দিয়েছি—নিজের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে—

অতঃপর একটু একটু করে আমি বংশীলালের সমস্ত ইতিহাসটা জেনে নিলাম।

বংশীলাল মিশ্র—বি. এ. বি. টি.।

গরিব চাষার ছেলে বংশীলাল কিন্তু মনে তার উচ্চাশা ছিল—এবং সেই উচ্চাশাই তাকে ইউ. পির এক গ্রাম থেকে একদা কলকাতা শহরে টেনে এনেছিল হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে।

মেধাবী না হলেও প্রচণ্ড পরিশ্রমী ছিল বংশীলাল। দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সন্ধ্যার পর গ্রামেরই এক চেনা ব্যবসায়ীর বিরাট মুদীখানা দোকানের হিসাব-পত্রের খাতা লিখে কলকাতার যাবতীয় খরচ চালাতো।

ইচ্ছা করলে লক্ষ্ণৌ বা বেনারসের কোন কলেজে বংশীলাল পড়াশুনো করতে পারত, কিন্তু সে বরাবর শুনে এসেছে, কলকাতা শহরের কলেজ ও কলকাতা ইউনিভারসিটি নাকি ভারতের মধ্যে সবার সেরা।

তাই সে কলকাতারই চলে এসেছিল।

অধ্যবসায়ে কি না হয়—বংশীলালও শেষ পযন্ত বি. এ. বি. টি. পাস করে দেশে ফিরে গেল এবং অনেক কষ্টে এবং হাঁটাহাঁটি করে প্রতাপগড় জিলা স্কুলে একটা চাকরি পেয়ে গেল।

প্রমোশন পেয়ে পেয়ে চোদ্দ বছর পর সে ঐ স্কুলেরই হেডমাস্টার হয়।

চাষের কাজ তার মনকে আকর্ষণ করতে পারেনি—ফলে তার পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশীলালকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে যান।

বংশীলালের অবিশ্যি সে কারণে কোন দুঃখ ছিল না, স্কুলের মাইনাতেই সে সন্তুষ্ট ছিল—পার্বতীকে বিয়ে করেছিল সে—স্কুলের সেক্রেটারী শান্তিপ্রসাদবাবুর বাপ মা মরা ভাগ্নী এবং সেও বাপের অমতেই।

সুখের আনন্দের সংসার ছিল সত্যিই বংশীলালের—ছেলে হলো—নাম রাখল তার কুশল।

শিক্ষক বংশীলাল তার সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে ছেলেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল—

বংশীলাল নিজে স্কুলে যাওয়ার সময় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতো এবং সঙ্গে করেই নিয়ে আসতো। স্বামী ও স্ত্রীর দুজনারই স্বপ্ন ছিল ঐ ছেলে একদিন বড় হবে—লেখাপড়ায় হীরের টুকরো হবে—সবাই কুশলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে, দেখা—বংশীলাল কো বেটা—

কিন্তু তা হলো না।

মানুষ যা চায় সব সময় কি তা হয়। হয় না—বংশীলালের ও পার্বতীর স্বপ্ন সফল হলো না। কুশল স্কুলে কুসঙ্গে পড়ে গেল।

স্থানীয় একজন ধনী মহাজনের ছেলে বদরীনারায়ণ—তার সঙ্গে মিশে কুশল একেবারে বদলে গেল—পড়াশুনায় ফাঁকি—স্কুলের ক্লাস পালায়।

কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় বদরীনারায়ণের সঙ্গে—বংশীলাল ও তার স্ত্রী প্রথমটায় জানতে পারেনি, যখন জানতে পারল তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

কুশল বদসঙ্গে পড়ে একেবারে গোল্লায় গিয়েছে।

যে ছেলে স্কুলে সব সাবজেক্টে পরীক্ষায় প্রথম হতো—বার্ষিক পরীক্ষায় সে তিনটে বিষয়ে ফেল করল।

বংশীলাল ত তাজ্জব—

এবং সেই দিনই জানতে পারল বংশীলাল ছেলের কতখানি অবনতি ঘটেছে। বাড়িতে ফিরে এলো বংশীলাল, পার্বতীকে শুধাল, কুশল কোথায়।

ও ত এখনো খেলার মাঠ থেকে ফেরেনি। কিন্তু কেন?

বংশীলাল সব কথা তখন স্ত্রীকে খুলে বলল।

পার্বতীও অবাক্।

ইতিমধ্যে ঐ দিনই সন্ধ্যার কিছু পরে—অন্য পাড়ার একজন ব্রাহ্মণ বংশীলালের কাছে নালিশ করল, তার দুটো বকরী—বংশীলালের ছেলে ও অন্য কয়েক জনে মিলে মাঠ থেকে ধরে বিক্রি করে দিয়েছে—

বংশীলালের মাথায় যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

লোকটিকে টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করে বংশীলাল ছেলের অপেক্ষায় বসে রইল। রাত দশটা নাগাদ কুশল ফিরলো।

কুশল—বংশীলাল ডাকল।

কেয়া বাপুজী!

ইধার আও—



এক ফুট উপর থেকে...ষাঁড়ের পিঠে আছড়ে পড়ল।

— ক্যাটমামা জিন্দাবাদ—পৃঃ ৯৪

কুশল সামনে এসে দাঁড়ায়—তার সারা গা থেকে সিগ্রেটের গন্ধ বেরুচ্ছে।

তুম্ সিগ্রেট পিয়া ?

নেহি ত—

সাচ্ বাতাও—

হাম সাচ্ বোলতে হে—

ঠাস্ করে কুশলের গালে একটা চড় কষিয়ে দিল বংশীলাল।

কুশল চিৎকার করে বললে, তুমি ঝুট-মুট আমাকে মারছো কেন ?

বংশীলালের মাথায় তখন খুন চেপেছে, সে এলোপাতাড়ি মারতে লাগল ছেলেকে, ক্যায়া তুম্ চোরি কিয়া—

পার্বতী বাধা দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বংশীলালকে থামাতে পারল না। বংশীলাল ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল স্ত্রীকে—পার্বতী সে ধাক্কা না সামলাতে পেরে দরজার উপরে গিয়া আছড়ে পড়ল।

মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেই ফাঁকে কুশল সরে পড়ল।

স্ত্রীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়েও যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো না—বংশীলাল একজন ডাক্তারকে ডেকে আনলো।

ডাক্তার বললে, মাথার শির ছিঁড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

সারা রাত জ্ঞান ফিরলো না পার্বতীর। বংশীলাল স্ত্রীর শিয়রে বসে। পরের দিন যখন পার্বতীর জ্ঞান ফিরল, সে বললে, চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

বংশীলাল আবার ডাক্তারের কাছে ছুটলো।

ডাক্তার এলেন—পরীক্ষা করলেন—বললেন, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান মিশ্রজী—

স্কুল ফাণ্ডের টাকা আগের দিন বিকালে নিয়ে এসেছিল বংশীলাল—পরের দিন সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার কথা।

বংশীলাল স্থির করে শহরে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে তাকে হাসপাতালের ডাক্তারকেও দেখাবে এবং ঐ সঙ্গে ব্যাঙ্কেও টাকাটা জমা দিয়ে আসবে।

একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে এলো।

বেরুবার আগে শোবার ঘরে বাক্স থেকে টাকাটা আনতে গিয়ে বংশীলাল দেখে বাক্সের তালা খোলা—সে তালার সঙ্গে চাবিটা ঝুলছে।



ঠাস্ করে কুশলের গালে একটা চড় কষিয়ে দিল বংশীলাল। [পৃঃ ১৬১

ধক করে ওঠে বংশীলালের বুকের ভিতরটা একটা অজানিত আশঙ্কায়।

ডালাটা খুলে ফেলল বাক্সর—টাকার থলি বাক্সের মধ্যে নেই।

এক আধটা টাকা নয়—আড়াই হাজার টাকা, আর টাকাটা স্কুল ফাণ্ডের। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বংশীলাল।

টাকা—টাকার থলি কোথায় গেল?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে বংশীলালের—কুশল! কুশল টাকাটা নেয়নি ত?

চিৎকার করে ডাকে, কুশল—কোন সাড়া নেই।

গত রাত থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে কুশলের কথা একবারও মনে পড়েনি।

বাড়ির মধ্যে তিনটে ঘর—কোন ঘরে কুশল নেই—

ওদিকে গাড়োয়ান তাগিদ দিচ্ছে—

বাড়িতে তালা না দিয়েই পাশের বাড়ির বৈদ্যনাথবাবুকে সব বলে স্ত্রীকে নিয়ে বের হয়ে পড়লো শহরের উদ্দেশে বংশীলাল।

হাসপাতালের ডাক্তার পার্বতীকে পরীক্ষা করে কোন আশা দিলেন না। বললেন, পার্বতীর ব্লাড্প্রেসার ছিল—আচমকা আঘাতে পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে চোট লেগেছে ও রেটিন্যাল হিমারেজ হয়ে দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়েছে। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

রাত দশটা নাগাদ অন্ধ স্ত্রীকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলো বংশীলাল।

এসেই পার্বতী ডাকল, কুশল—

কিন্তু কোথায় কুশল—কুশল ফেরেনি। বৈদ্যনাথবাবুও বললেন, কুশলকে সারা দিনে তিনি দেখেননি—

কুশল। কুশলকে ডাকো না গো।

পার্বতী অনুনয় করে স্বামীর কাছে।

কি জবাব দেবে বংশীলাল, চুপ করে থাকে।

আমি বললাম, তারপর, উসকো বাদ কেয়া হুয়া বংশীলালজী।

বংশীলাল বলতে লাগলো, নানাভাবে মিথ্যা স্তোক দিয়ে দিয়ে পার্বতীকে ভোলাবার চেষ্টা করে বংশীলাল, আর সর্বত্র পাগলের মত ছেলেকে খুঁজে বেড়ায়।

কিন্তু কুশলের সংবাদ কোথাও পায় না।

এদিকে স্কুল ফাণ্ডের টাকা তছরুপের দায়ে বংশীলালের স্কুলের চাকরিটাও গেল।

কত আর মিথ্যা বলা যায় পার্বতীকে।

পার্বতী দিবারাত্র কুশল কুশল করে আর বংশীলাল এটা ওটা মিথ্যা বলে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

একদিন পার্বতী একেবারে ভেঙে পড়লো। বললে, তুমি সত্যি কথা বলো। বলো কি হয়েছে কুশলের! কোথায় সে, এত দিনেও আসছে না কেন?

পার্বতী—

বল, বল—

সে ছেলে আর আমাদের হয়ত কোন দিনই আসবে না।

এ তুমি কি বলছো।

ঠিকই বলছি—সে স্কুল ফাণ্ডের যে টাকা আমার বাক্সে ছিল সেই টাকা চুরি করে পালিয়েছে—

না, না—না—কুশল চুরি করতে পারে না। তুমি সেদিন অমন করে ওকে মার-ধোর করেছো বলেই অভিমানে সে কোথায়ও চলে গিয়েছে—দোহাই তোমার দুটি পায়ে পড়ি—কুশলকে আমার ফিরিয়ে এনে দাও—

সে চোর—সে গোল্লায় গিয়েছে—সে জাহান্নামে গিয়েছে, অমন ছেলের কথা আমাদের ভুলে যাওয়াই ভাল—মনে করো আমাদের কোন দিন কোন ছেলে ছিল না।

পার্বতী—বেচারী অন্ধ পার্বতী—চিৎকার করে কাঁদতে থাকে আর কেবলই বলতে থাকে, না, না—তাকে ফিরিয়ে আনো। সে নিশ্চয়ই অভিমান করে কোথাও বসে আছে—তাকে আবার আমি ভাল করে তুলবো—সে আমার কথা ঠিক শুনবে।

৩

কিন্তু কোথায় কুশল?

কাগজে কাগজে কত বিজ্ঞাপন দিল বংশীলাল।

কত খুঁজলো—কিন্তু কুশলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কুশল যেন চিরদিনের মত হারিয়ে গিয়েছে।

বছর খানেক ঐ ভাবে কাটল—

তারপর একদিন সকাল বেলা উঠে বংশীলাল দেখলে তার স্ত্রী পার্বতী ঘরে নেই।

পার্বতী—অন্ধ পার্বতী কোথায় গেল!

পার্বতী—

চিৎকার করে পার্বতীর নাম ধরে ডেকে ডেকে সর্বত্র একটা দিন ও একটা রাত ঘুরে বেড়াল বংশীলাল।

কিন্তু কোথায় পার্বতী?

জনে জনে শুধাল বংশীলাল, তোমরা দেখেচো কেউ আমার স্ত্রী পার্বতীকে। কেউ কিছু জানে না। কেউ দেখেনি পার্বতীকে।

বংশীলালের এতদিনকার সুখের আর আনন্দের সংসার ভেঙে গেল। কুশল নেই—পার্বতী নেই, শূন্য ঘর যেন হা হা করছে।

এখানে ওখানে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

বংশীলাল যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে বলতে থাকে, তাই—তাই ত আমি কুশলকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—কুশলকে যদি খুঁজে পাই ত পার্বতীকেও খুঁজে পাব।

বুঝতে আর বাকী রইলো না আমার, পাঁচ বছর ধরে ঐ হতভাগ্য বংশীলাল তার ঘর-পালানো ছেলে কুশলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং বেড়াতে বেড়াতে কখন এক সময় তার মস্তিষ্কের ভারসাম্যও হারিয়ে বসে আছে।

তাতেই ওর খেয়াল নেই যে ইতিমধ্যে কখন পাঁচ পাঁচটা বছর চলে গিয়েছে—

অথচ আজো ওর মনের মধ্যে সেই পাঁচ বছর আগেকারই কুশল রয়ে গিয়েছে। ওর মনের পাতায় কুশলের বয়স বাড়েনি।

সেখানে কুশল আজো সে কিশোর বালকটিই রয়ে গিয়েছে। আর সেই কিশোর বালকটিকেই বংশীলাল আজো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিশোর বালক সীতাংশুর চেহারার খানিকটা মিল আছে বুঝলাম কুশলের পাঁচ বছর আগেকার তোলা ফটোর সঙ্গে—তাইতেই বংশীলাল হিমাংশুবাবুর ছেলে সীতাংশুকে এ পাড়ায় দেখে তার হাত চেপে ধরেছিল।

বংশীলাল তার কাহিনী বলে কেমন যেন ঝিম দিয়ে বসেছিল।

বেচারীর জন্য আমার সত্যিই দুঃখ হয়।

ডাক্তার সাহেব।

বলুন মিশ্রজী।

আমাকে একটু সাহায্য করবেন। কুশলকে আমি নিয়ে যাবো প্রতাপগড়ে।

নিশ্চয়ই সাহায্য করব—আগে আপনি খান দান বিশ্রাম করুন।

কিন্তু আমার ত ভুখ নেই—

তা হোক—কিন্তু আপনি খান—আপনি বসুন আমি আসচি—

আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে কিছু খাবার দিতে বললাম বংশীলালকে।

আমার স্ত্রী একটা প্লেটে করে খাবার নিয়ে এলেন।

কিন্তু বংশীলাল কেবলই না, না করতে লাগল। সে কিছু খাবে না।

অনেক পীড়াপীড়ির পর সে প্লেটটা হাতে নিল।

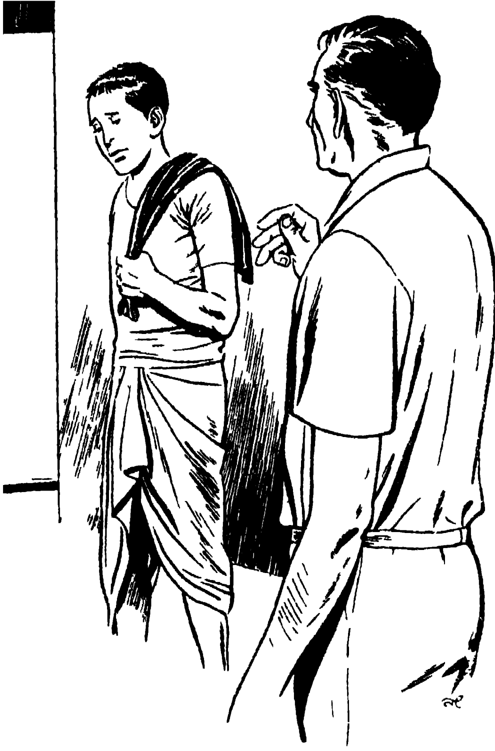
বুঝলাম লোকটার ক্ষুধা রীতিমত ছিল কিন্তু বহুকাল হতে অমন করে কেউ তার সামনে আহার্য সাজিয়ে দেয়নি—এলোমেলো ভাবে গোগ্রাসে 'খেতে লাগল, এবং নিমেষে প্লেট নিঃশেষ করে ফেলল।

বললাম, আর কিছু দোব—

নেহি—নেহি—বহুত খা লিয়া—থোরা সে পানী—

এক গ্লাস জল এগিয়ে দেওয়া হলো সামনে, ঢকঢক করে গ্লাসের সবটুকু জল শেষ করে দিল।

চলুন ডাঃ সাহেব—কুশলকে আমার ধরতে হবে,—নচেৎ সে পালিয়ে যাবে—অতঃপর বললে বংশীলাল।



আমি বৈজুর মুখের দিকে তাকালাম।

আমি ভাবছিলাম কি করে সমস্যাটার সমাধান হবে, কেমন করে বংশীলাল মিশ্রকে বুঝিয়ে দেবো সীতাংশু যাকে সে তার কুশল ভাবছে সে কুশল নয়। কুশল আজ পাঁচ বছর পরে যদি বেঁচেও থাকে ত সে আর কিশোর বালকটি নেই—এক তরুণ যুবক সে।

কিন্তু তখনো বুঝিনি ঐ দিনকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক চরম বিস্ময় আমারই বাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছে এবং বিধাতার বিচিত্র বিধানে ঘটনার সমাপ্তি কোথায়।

হঠাৎ স্ত্রী ভিতর থেকে এসে আমাকে ডাকল, শুনে যাও একটা কথা।

কি কথা? শুধালাম।

এসো না ভিতরে—

বংশীলালের দিকে চেয়ে দেখি চেয়ারে বসে বসে বংশীলাল তখন ঝিমুচ্ছে। বহুকাল পরে বোধহয় পেটে পর্যাপ্ত আহার্যবস্তু পড়ায় চোখ ভরে তার ঘুম এসেছে। আমি নিঃশব্দে উঠে ভিতরে গেলাম।

ভিতরের বারান্দায় দেখি, আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আর তার সামনে আমার গৃহ-ভৃত্য বৈজু।

বৈজু আজ প্রায় বছর দুই হবে আমার গৃহে চাকরের কাজ করছে। বছর সতেরর বলিষ্ঠ তরুণ যুবা।

বৈজুর দু'চোখে জল। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে এক পাশে।

কি ব্যাপার?

ঐ যে পাগল লোকটা, যাকে তুমি পাড়ার ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়েছো—সে কে জান?

কে?

এই বৈজুর বাপ—

বল কি? সত্যি বলচো।

হ্যাঁ—ঐ বৈজুই ত বলচে—পাড়ায় যখন মারধোর করছিল সবাই ওকে, বৈজুই কোন মতে ওকে তোমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য—

আমি বৈজুর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম, ঠিক চিনেছিস ত ঐ তোর বাপ!

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু—

তবে যে কাজে ঢোকবার সময় বলেছিলি সংসারে তোর কেউ নেই—মা বাপ ভাই বোন—

ঝুটা বলেছি ডাক্তারবাবু, লজ্জায় নিজের সত্যি পরিচয় আমি দিতে পারিনি। আমরা ব্রাহ্মণ—ঐ আমার বাপুজী, বংশীলাল মিশ্র, বি. এ. বি. টি.—

আমি জানি—

জানেন—আপনি জানেন?

হ্যাঁ—জানি, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে চাকরের কাজ করতে গেলি কেন?

উপায় ছিল না ডাক্তারবাবু—আ—আমি চোর—বাপুজীর স্কুল ফাণ্ডের আড়াই হাজার টাকা চুরি করে পাঁচ বছর আগে পালাই—

আর তোর নিরপরাধ বাপ তোর সেই চুরির দায়ে চাকরি খুইয়ে—

বুঝতে পেরেছিলাম, ঐ চেহারায় বাপুজীকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম কোথায়ও একটা গোলমাল হয়েছে—আপনি আমাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিন ডাক্তার সাহেব। আমি চোর—

তোর মার কোন খবর তুই জানিস না—তোর চলে আসার পর অন্ধ হয়ে সেও তোর খোঁজে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে—

মা—মা নিরুদ্দেশ—

হ্যাঁ—হয়ত বেঁচেই আর নেই।

বৈজু তখন তার ইতিহাস বললে—বদ্রীনারায়ণের সঙ্গে সে পালায়—পালিয়ে প্রথমে বেনারস আসে—সেখানে একদিন বদ্রীনারায়ণ তার সব টাকা এক রাত্রে নিয়ে সরে পড়ে। কুশল অথই জলে পড়ে, কি করবে বুঝে পায় না। বাড়িতে ফেরারও আর উপায় নেই তখন। ক্রমশঃ তার জ্ঞান হয়, কি সে করেছে।

জীবনধারণের জন্য তারপর সে কি না করেছে—হোটেলের বয়—পাণ্ডাদের শাগরেদি—টাঙ্গা চালান ইত্যাদি। অবশেষে বছর দুই আগে আমরা বেনারস বেড়াতে গেলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়, তখন সে আমার স্ত্রীর কাছে চাকরি পায়—আমাদের সঙ্গে কলকাতায় আসে—সেই থেকেই কলকাতায়।

আমি বললাম, চল তোর বাপুর কাছে—

নেহি—নেহি—বাপুজীর ভীষণ গোঁসা—আমাকে মেরে ফেলবে।—কুশল বললে।

কিছু হবে না চল—আয়—

বংশীলাল ঘুমচ্ছিল চেয়ারটার উপরে বসে তখনো।

ডাকলাম, মিশ্রজী—

কে? চোখ মেলে তাকাল বংশীলাল।

দেখুন ত একে চিনতে পারেন।

রক্তাভ চোখ মেলে তাকায় বংশীলাল কুশলের দিকে, কে এ?

দেখুন না ভাল করে চিনতে পারেন কিনা? পাঁচ বছর পরে দেখচেন একে, ভাল করে চেয়ে দেখুন—

লেকেন এ কে ডাক্তার সাহেব।

এই আপনার কুশল—পাঁচ বছর ত কম সময় নয়—সে কিশোর বালকও আর নেই কুশল, বড় হয়েছে—

নেহি—নেহি—চিৎকার করে উঠলো বংশীলাল, এ কভি নেহি হো সেকতা—এ হামারা লেড়কা কুশল নেহি হ্যায়—

সত্যি এই আপনার কুশল। ভাল করে চেয়ে দেখুন—

কুশলও ডাকে, বাপুজী—আমিই তোমার কুশল—বেটা—

নেহি—নেহি—এ ঝুট হ্যায়—ঝুট—চালাকি পেয়েছো তোমরা—আমি আমার লেড়কাকে—আমার কুশলকে চিনতে পারব না।—বলতে বলতে ঝড়ের মতই যেন সহসা কুশলকে ধাক্কা দিয়ে বংশীলাল ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পাঁচ বছরের ব্যবধান তার কাছে আজ মিথ্যা!

পাঁচ বছর আগেকার ছবিটিই আবছা তার মনে সত্য হয়ে আছে—

কুশলও তার বাপের পিছনে পিছনে ছুটে যায়,—বাপুজী, শুনিয়ে শুনিয়ে—

ঐ দিন সন্ধ্যা নাগাদ বৈজু—কুশল একাকী ফিরে এলো।

কি হলো কুশল তোর বাপুজী কৈ?

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল—আর দেখতে পেলাম না।

কুশল কাঁদতে লাগল।



কেশী ভালো

আশাপূর্ণা দেবী

পৈতে হবার কথা ওঠা পর্যন্ত নন্তু খুবই মনমরা মনমরা হয়ে ছিল। পৈতে মানেই তো ন্যাড়া হওয়ার প্রশ্ন। হলেও গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম দিকেই দিন, তবু ছুটির মাস দেড়েকের মধ্যে গড়ের মাঠে আর কত ঘাস গজাবে? সেই বুরুশ ছাঁট নিয়েই তো স্কুলে যেতে হবে, ক্লাসে ঢুকতে হবে?

অবিশ্যি স্কুলে কি আর এরকম ঘটনা ঘটে না? ক্লাস এইট নাইন থেকেই তো শুরু হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই দু' একজন ন্যাড়া মাথা আর কানে ফুটো নিয়ে ক্লাসে এসে ঢোকে। কিন্তু তখন তো নন্তুরা তাকে ক্ষ্যাপাতে ছাড়ে না? দল বেঁধে একজনকে ক্ষ্যাপাতে লাগলে কত পদ্ধতিই আবিষ্কার হয়ে যায়।

এই তো কিছুদিন আগেই তপন মুখার্জিকে নিয়ে কী একখানা ছড়া বাঁধা হয়েছিলো! টিফিনের সময় বই চাপড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যখন সমবেত সংগীতের রোল উঠতো, 'ন্যাড়া ওল, গণ্ডগোল, ঢালো ঘোল বাজাও ঢোল, বলহরি হরিবোল হরিবোল হরিবোল,' তখন বেচারা তপনের চোখ দিয়ে প্রায় জল পড়ো পড়ো হতো।

নন্তুকে নিয়েও তো হবে এসব?

না হইয়ে ছাড়বে নাকি কেউ?

কেনই বা ছাড়বে? নন্তু কি কাউকে ছেড়ে দেয়? এখন মনে পড়ছে সে সব।

তাই পৈতের নানাবিধ আকর্ষণ সত্ত্বেও মরা মন নিয়ে কাটাচ্ছিলো নন্তু, কিন্তু সে মন বেঁচে উঠে তড়াক করে লাফিয়ে বোঁ বোঁ করে একপাক নেচে নিলো মেজমামার উপহারে।

উপহার দেখে আহ্লাদে নন্তু চোখে পারিজাত ফুল দেখলো।

সত্যি বলতে মেজমামাকে নন্তু আগে তেমন পছন্দ করতো না। মেজমামার যেন পেশাই ছিলো নন্তুকে ক্ষ্যাপানো! এই যে অখাদ্য এই 'নন্তু' নামটা, সেও তো ওই মেজমামার অবদান। ভগবান জানেন কী সূত্রে মেজমামা তার ভাগ্নের চেহারার সঙ্গে নৈনিতাল আলুর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলো, তাই তার নামকরণ করে বসেছিলো 'নৈনিতাল আলু'।

কালক্রমে অপভ্রংশ হতে হতে সকলের মুখে মুখে দাঁড়িয়ে গেল নন্তু।

অমন যে একখানা বাহারি নাম হয়েছিল নন্তুর 'পলাশকুমার', সেটা একেবারে লোপাট্টা হয়ে গেল যেন। নেহাত নাকি স্কুলের খাতায় একটা পোশাকী নাম থাকা দরকার, তাই সেখানে আছে।

শুধুই কি নাম?

নন্তুর সাজসজ্জা চলনবলন সব কিছুতেই মেজমামা যেন হাসির খোরাক পেতো।

নন্তু মামার বাড়ি গেলে, অথবা মেজমামা এ বাড়ি এলেই মেজমামা হেসে হেসে হাঁক পাড়বে, এই যে নন্তুবাবু। কী খবর?

শুনলেই রাগ এসে যেতো নন্তুর।

কিন্তু সেসব অবশ্য অনেক দিন আগের কথা, তখন নন্তু ক্লাস ফাইভের ছাত্র। তারপরই তো মেজমামা ক্যানাডা চলে গেছলো পড়াশুনো করতে। এই ক'দিন হলো মাত্র ফিরেছে।

সদ্য সমুদ্রপার (আকাশে উড়েই অবশ্য) হয়ে এতোদিন পরে দেশে ফিরেছে মেজমামা। এখন মেজাজ আকাশের মত উদার, এসেই যেই শুনলো নন্তুর পৈতে হচ্ছে, দিয়ে বসলো একখানা মারকাটারি রিস্টওয়াচ্। একেবারে সেরা নামী আর দারুণ দামী— 'রোলেক্স ঘড়ি'।

অভাবনীয়! অপ্রত্যাশিত! অপূর্ব, অদ্ভুত! মানে 'অ' দিয়ে যত কথা হতে পারে, তার প্রায় সবই।

অবিশ্যি নন্তুর ভিক্ষের ঝুলিতে দিদিমা জেঠিমা পিসী মাসীদের অবদানগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। যে 'পেনসেট্'-এর জন্যে একদা নন্তু কতো আকুলতা করেছে, সেই সেট্ই পেয়ে গেলো নন্তু গোটা চার পাঁচ। তা'ছাড়া বই, আংটি, টাকা ফাকা কতো কী!

তবু মেজমামার উপহারের সঙ্গে?

তুলনাই হয় না।

এহেন একটি পরম বস্তুর পরিবর্তে হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে ঝোলা যায়, তা সামান্য কটা চুলের শোক! নন্তুকে যদি বলা হতো পৈতের সময় তিনবার মাথা মুড়োতে হয়, তাই মুড়োতো।

এখন নন্তুর মেজমামাকে স্বর্গের দেবতা বলে মনে হচ্ছে। অবিশ্যি মেজমামারও এখন আর সেই ভাগ্নে ক্ষ্যাপানো বাতিক নেই। বরং হেসে হেসে বলেছে, 'উঃ তোকে কী জ্বালাতনই করতাম রে তখন নন্তু, ভাবলে হাসি পায়।'

এদিকে মেজমামার এই উপহার নিয়ে বাড়িতে কথার স্রোত!

মা বলেন, 'তোরও যেমন কাণ্ড সুনীল, ক্লাস টেন-এর ছেলে, কলেজে উঠতে এখনো কতো বাকী, ওকে এতো দামী একটা ঘড়ি দেওয়া।'

বাবা হেসে হেসে বলেন, 'আমি তো শালাবাবু, বিয়ের সময়ও শ্বশুরবাড়ি থেকে এমন একখানি মাল পাইনি।'

নন্তুর কাকা আবার রেগে রেগে বলেন, 'মানে হয় না, কোনো মানে হয় না, ওইটুকু ছেলেকে এতো দামী জিনিস দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এতে শুধু বাবুয়ানার ঝোঁক করিয়ে দিয়ে ছেলের পরকাল ঝরঝরে করা।'

পিসী অবশ্য বললো, 'বকিসনে ছোড়দা, কেউ একটা শৌখিন উপহার দিয়েছে বলেই অমনি বাবুয়ানার চাষ বোনা হয়ে গেল? বিদেশ ফেরত মামা, সুন্দর আর দামী একটা জিনিস দিয়েছে, লোককে দেখাবে, আহ্লাদ করবে, হয়ে গেল। তা নয় তুই ভবিষ্যৎ ভাবতে বসলি।'

বাকী সকলেই, মানে যারা সব পৈতে উপলক্ষে নেমন্তন্ন এসেছিল, সকলেই নন্তুর মেজমামার উঁচু নজরের কথা তুলে 'ধন্যি ধন্যি' করলো।

নন্তু দণ্ডী ঘরে বসে পুলকিত হতে থাকলো।

●°আশাপূর্ণা দেবী

উঃ তিন তিনটে দিন এই ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা একটা দুর্দান্ত যন্ত্রণা। তিন দিন তো নয়, যেন তিন বছর।

নন্তু মাকে বলেছিল উপহারের জিনিসগুলো সব তার ওই দণ্ডীঘরে রাখতে, মা কথাটা আমলই দিলেন না। মা বললেন, 'ওঘরে আবার কোথায় রাখবি? আলমারি নেই, দেরাজ নেই, এমনকি খাট বিছানা পর্যন্ত নেই, ওইতো মাটিতে কম্বল শয্যে। দেখা তো হলো সব, আবার কী করবি?'

নন্তু আর কী করবে?

নন্তু অগত্যা দণ্ডী ভাসিয়ে রাজবেশ পরার অপেক্ষায় মিনিট গোনে।

অবশেষে অবশ্য সে দিন আসে। নন্তু জরিপাড় ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবিতে সেজে ন্যাড়া মাথায় একটা খদ্দরের টুপি চাপিয়ে তিন আঙুলে তিনটে আংটি আর কবজিতে ঘড়ি বেঁধে রাজবেশ করে বসলো জাঁকিয়ে। সেই দিনই আসল ভোজ, লোকে লোকারণ্য। মা একসময় বললেন, 'নন্তু অনেকক্ষণ তো হলো, এবার ঘড়ি আংটিগুলো দে, তুলে রাখি। কতোদিকে কতো রকম লোক আসছে—'

নন্তু আংটিগুলো ঝটপট খুলে দিলেও ঘড়িটা দিতে চায় না, বলে এটা তো আর হাত থেকে খুলে পড়ে যাবে না?'

মা ব্যস্ত হয়ে কী কাজ করতে যাচ্ছিলেন বলেন, 'যাবে না কি বলা যায়? অভ্যেস তো নেই? দে দে।'

নিয়ে চলে যান, তুলে রাখেন গিয়ে।

•সব কিছু তুলে রাখা মার একটা রোগ! নন্তু যখন ছোট ছিলো, কোনো ভালো খেলনা-টেনলা নিয়ে খেলতে পায়নি নন্তু। নেহাত বাজে মার্কাগুলো বাদে, মা সব নন্তুর হাত থেকে বাগিয়ে নিয়ে কাচের আলমারিতে তুলে ফেলতেন।

বলতেন, 'আহাহা এই সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো খেলে নষ্ট করবি? নিয়ে খেলা করলেই তো ভেঙেচুরে যাবে।'

এখনো মার কাচের আলমারিতে নন্তুর সেই সব কলের মোটর, দম দেওয়া এরোপ্লেন, শব্দ হওয়া ইঞ্জিন, নৌকো বাস রেলগাড়ি, আরো বহুবিধ সব খেলনাপাতি শোভা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে মা সগর্বে বলেন, 'দেখছিস তো; তুলে রেখেছিলাম, তাই এখনো আছে। তখন খেলতে দিলে চিহ্নমাত্র থাকতো?'

নন্তু ভাবে, সংসারে ইহকালে অতীতকালে যতো খাবার জিনিস এসেছে, তার কোনো চিহ্ন আছে? খাবার জিনিস যদি খেয়ে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করলে দোষ হয় না, খেলার জিনিস খেলে খেলে নিশ্চিহ্ন করলেই যতো দোষ?

কিন্তু মাকে ওসব বোঝায় কে?



'যাবে না কি বলা যায়? অভ্যেস তো নেই? দে দে।' [পৃঃ ১৭২

নন্তুর কথা মা কান দিয়ে শোনেন না কি? এখন নন্তু বড়ো হয়ে গেছে, তবু হঠাৎ হঠাৎ কোনোদিন ওই খেলনাগুলো দেখে মনটা কেমন দুঃখু দুঃখু হয়ে যায় নন্তুর, মনে পড়ে যায় মা কোনোদিন আলমারিটা খুললে কী ইচ্ছেই করতো একটু বার করে নিতে।

ও বাবা, হাত দিতে গেলেই মা ফট্ করে চাবি বন্ধ করে ফেলতেন।

ঘড়িটাকে নন্তু মোটেই সে রকম তুলে রাখতে দেবে না, পরে পরে বেড়াবে, ইস্কুলে যাবে, নিজে হাতে দম দেবে।

রাজবেশের পরদিন নন্তু সকাল বেলাই বলে ওঠে, 'মা ঘড়িটা?'

গতদিনে লোকজন খেয়েছে। মা বেড়েযাওয়া পান্তুয়ার গামলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, অবাক্ হয়ে বলেন, 'ঘড়িটা মানে?'

'কই বার করে দাও?'

মা বলেন, 'বলেছিস বটে বেশ সময়ে, আমার বলে এখন মরবার সময় নেই।'



'ওরে সর্বনাশ! ওসব চাবি-টাবি কোথায় আছে, জানিই না।'

হয়ে গেল।

সেদিন, তারপর দিন, তার পরের দিন, মার আর 'মরবার সময়' হয় না।

অথচ আলমারি খুলছেন কতো শতবার। 'লকার'টা খুলতেই যতো কষ্ট! আশ্চর্য!

নন্তু বাবাকে ধরে, 'বাবা, মার কিছুতেই সময় হচ্ছে না, তুমি বার করে দাও ঘড়িটা—'

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'ওরে সর্বনাশ! ওসব চাবি-টাবি কোথায় আছে, কোথায় থাকে, জানিই না।'

* * * *

বাবা জানেন না, মার সময় হয় না! নন্তুর এতো রাগ হয়!

নন্তু অবশেষে দস্তুরমত জেদই ধরে।

'—মাঁ আঁ আঁ—ঘঁড়িটা কী আমি পঁরবো না, না কী?'

মা তাড়া দিয়ে বলেন, 'তুমি পরবে না তো কি আমি পরবো? তা এখন নিয়ে কী করবে শুনি? ওই ঘড়ি পরে কি তুমি মাঠে বল খেলতে যাবে? রাস্তায় ডাংগুলি খেলতে যাবে? ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে যাবে?'

নন্তু বলে, 'বাঃ সব সময় বুঝি খেলি আমি? বেড়াতে যাবার সময় পরতে পারি না?'

মা অবলীলায় বলেন, 'বেড়াতেই বা তুমি কোন্ রাজসভায় যাবে শুনি? সেই তো গোরাদের বাড়িতে ক্যারম পিটতে যাবে, নয়তো অলকদের বাড়িতে যাবে গজালি করতে, বড়ো জোর পার্কে ঘুরে বেড়াতে যাবে, এই তো? আর ওই হাফ্‌প্যাণ্টের সঙ্গে বিয়ের বরের মতো দামী একখানা ঘড়ি হাতে বেঁধে বেড়ালে লোকে হাসবে না?'

কাকা শুনতে পেয়ে বলেন, 'লোকে হাসবে আর নিজেদের কাঁদতে হবে, বুঝলে হে নন্তুবাবু? রাস্তায় বেরোতে যা দেরি। সঙ্গে সঙ্গে ছিনতাই!'

নন্তু গোঁজ গোঁজ করে বলে, 'হ্যাঁ অমনি সঙ্গে সঙ্গে ছিনতাই! পৃথিবীতে আর যেন কারুর ঘড়ি নেই! তারা যেন পরে না!'

কাকা মিটিমিটি হেসে বলেন, 'পরবে না কেন, পরে। আস্ত মানুষরা পরে, বালখিল্যরা, মানে তোমার বয়েসের ছেলেরা, হাতে কী ঘড়ি বাঁধে জানো? প্লাস্টিকের ঘড়ি। বুঝলে? হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাঁটা ঘোরানো যায়, সেই রকম ঘড়ি। কাজেই তোমার মত ছেলের হাতে একখানা 'রোলেক্স ঘড়ি' দেখলে মাটি ফুঁড়ে পিলপিলিয়ে উঠে আসবে গুণ্ডা পকেটমারেরা। তারপর আর কী? হয় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরা, নয় লটকাতে লটকাতে হাসপাতালে যাওয়া।'

মা 'দুর্গা দুর্গা' বলে ওঠেন।

মা'র যদি বা মনটা একটু নরম হয়ে আসছিলো, হাসপাতাল শুনেই একেবারে পাথর হয়ে যায়।

গম্ভীরভাবে বলেন, 'বাহারের জন্যে প্রাণটা খোওয়াবার দরকার নেই বাবা।'

নন্তুর মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

নন্তু কি তা'হলে স্কুলেও যাবে না ঘড়ি পরে?

বন্ধুদের কাছে পৈতে বাবদ শুধু ন্যাড়া মাথাটাই দেখাবে?

● আশাপূর্ণা দেবী

তা'হলে ও ঘড়ি গঙ্গায় ফেলে দিলেই বা কী?

নন্তু সতেজে ঘোষণা করে, 'ইস্কুল খোলার প্রথম দিন অন্ততঃ ঘড়িটা পরে যাবোই যাবো আমি—'

নন্তুর মা অম্লান মুখে বলেন, 'যাবি তো যাবি। আজই তো ইস্কুল খুলছে না?'

কথাটা সত্যি, আজই খুলছে না।

এখনো বেশ কয়েকদিন ছুটি বাকী আছে।

অন্য অন্য বারে নন্তুর মনে হয় গ্রীষ্মের ছুটিটা যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল। দেড় মাসের ওপর ছুটি ভোগ করেছে বিশ্বাসই হয় না, কিন্তু এবারে যেন ছুটিটা জগদ্দল পাথরের মত অনড় হয়ে বসে আছে, কমছে না, সরছে না, ক্ষইছে না।

ঘড়িটা যে কেমন দেখতে, সেটা পাছে ভুলে যায় বলে, মাঝে মাঝেই মাকে উৎখাত করে নন্তু আলমারি থেকে বার করে দেখাতে, তা মা কোনোদিন হয়তো একবারটি বার করে দেখান, নন্তুর হাতে সম্পূর্ণটা ছেড়ে দিতে চান না, নিজের হাতে ধরে থাকেন। আর কোনো কোনোদিন ছেলের আবেদন নস্যাৎ করে বলে ওঠেন, 'নিত্যি নিত্যি আবার কী দেখবি রে? আলমারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে কি কি রোজ রোজ ওর রং গড়ন বদলাচ্ছে।'

এর মধ্যে একদিন আবার মেজমামা এলো।

হইচই গাল-গল্পের মাঝখানে একবার জিগ্যেস করে ওঠে, 'কী হে নন্তুবাবু, আঁপনার ঘড়িটা বেশ কারেক্ট সময় দিচ্ছে তো?'

নন্তু কিছু বলার আগে মা তাড়াতাড়ি একগাল হেসে বলে ওঠেন, 'ওমা তা আবার দিচ্ছে না? কী জিনিস একখানা।'

মেজমামা নন্তুকে বলে, 'একটা কথা জেনে রাখিস নন্তু, ঘড়ির দম দেওয়াটা নির্দিষ্ট একটা টাইমে দেওয়া দরকার। আজ এক সময় কাল অন্য সময় হলে চলবে না। যদি সকাল ছটায় তো রোজ সকাল ছটায়, যদি রাত নটায় তো রোজ রাত নটায় বুঝলি? কখন দম দিস তুই?'

নন্তু তার ঘড়িতে কখন দম দেয়?

একথার উত্তর দেবার ক্ষমতা নন্তুর হয় না, কারণ নন্তুর তখন নিজের দম ফুরিয়ে গেছে। নন্তুর গলা বুজে এসেছে, চোখে জল এসে যাচ্ছে।

মা একনজর ছেলের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, 'দম টম তোর জামাই-বাবুই দিয়ে দেন, নিজেরটাও দেন তো! ওই রাত্তিরে শুতে যাবার আগে দশটা টশটার সময়।'

মেজমামা বলে ওঠে, 'না না, ওই টশটাটি ঠিক নয়, দশটা মানে দশটা। তুমি ওকে ঠিক নিয়মে খেতে দেবে, ও তোমায় ঠিক নিয়মে কাজ দেবে, এই হচ্ছে কথা।'

নন্তু কিছু বলতে যাচ্ছিলো গলা টলা ঝেড়ে, কিন্তু ঠিক তক্ষুণি চা জলখাবার এসে পড়লো, কলকাতার সিঙাড়া আর হিঙের কচুরীর জন্যে কী পরিমাণ মন কেমন করতো মেজমামার, সেই কথা উঠলো, হাসির স্রোত বইলো। নন্তুর কথা ভেসেই গেলো।

মেজমামা চলে গেলে বেশ রোষভরেই কথাটা তুললো নন্তু, কিন্তু মা সে রোষ গায়েই মাখলে না, 'অমৃতং বালভাষিতং' এই ভাবে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'রাখ্ বাবা তোর মেজমামার কথা। ওটা হচ্ছে চিরকেলে বাউণ্ডুলে। ছেলেবেলা থেকেই! সিল্কের জামা হলো তো, সেটাই রোজ পরা চাই, ভালো জুতো হলো তো সেটাই রোজ পায়ে দেওয়া চাই। ভালোর মর্ম বোঝে না। ও আর বলবে না তোকে ঘড়ি দম দিতে! তোর বাবাই বলে কতো সাবধানে, বিছানায় বসে তবে হাতে নেয়।'

অতএব হয়ে গেল।

নন্তুর ঘড়িতে নন্তুর দম দেওয়ার প্রশ্নই রইলো না।

কিন্তু স্কুল খোলার দিন কে নন্তুকে রুখতে পারে দেখা যাক।

নন্তু কল্পনায় সেই ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পায়। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে এসে হুমড়ে পড়েছে নন্তুর ঘড়ির উপর, আর নন্তু তাদের বোঝাচ্ছে একেবারে খোদ বিদেশ থেকে আনা খাঁটী বিদেশী জিনিস, সকাল ছটার সময় যদি দম দেওয়া অভ্যাস করো তো ছটা বেজে এক মিনিট হলে চলবে না।

আর শ্রীযুক্ত শুভেন্দুবাবু?

মানে তাদের ক্লাসের শুভেন্দু সরকার?

যে নাকি বকো মধ্যে হংসের মত, সারা ক্লাসের মধ্যে একা হাতে একটা ঘড়ি

বেঁধে বেড়ায়, আর সেই অহংকারে নাককে মনুমেণ্টের আগায় তুলে রাখে, সে নন্তুর এই ঘড়ি দেখে কেমন চুপসে যাবে?

ভেবে খুব মজা লাগে নন্তুর।

শুভেন্দুর ঘড়িটা তো নেহাতই সস্তামার্কা, সবাই জানে, কিন্তু একা ওরই আছে, অন্য আর কারুর নেই বলেই না বাবুর অতো অহংকার!

নন্তু কিন্তু মোটেই অহংকার করবে না, নন্তু শুধু শুভেন্দুর শুকিয়ে যাওয়া মুখটা দেখে মনে মনে মজা পাবে।

কিন্তু এবারের গ্রীষ্মের ছুটিটা কী লম্বা!

তবু একদিন সেই লম্বার শেষ হলো। নন্তু আগের রাতটা তো প্রায় না ঘুমিয়েই কাটালো, কারণ আগের দিন সন্ধ্যায় নন্তু যখন কাঠকবুল প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল ঘড়ি না দিলে সে স্কুলেই যাবে না, তখন বাবা বলেছিলেন 'আচ্ছা আচ্ছা যাস বাবা!'… নন্তুর মাকে বলেছিলেন বাবা, 'এক দিনের জন্যে না হয় দিও ঘড়িটা হাতে বাঁধতে। সাবধানে যাবে আসবে।'

মা বলেছিলেন, 'আচ্ছা।'

কিন্তু সকালবেলা মেজাজ ঘুরে গেলো মার। সকালবেলা বাড়ির চাকরটা দুধের বোতল নিয়ে আসতে আসতে দরজার সামনে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে নিজে তো কষ্ট পেলোই, তিন তিনটে দুধের বোতল ভেঙে গুঁড়ো করলো, দুধগুলোও গেলো।

দেখেশুনে মা সার্কুলার জারি করে দিলেন, 'যা দেখছি, আজ হচ্ছে লোকসানের দিন, আজ বাপু তোর ঘড়িটা পরে গিয়ে কাজ নেই। কি জানি বাবা যদি তুইই হঠাৎ আছাড় খাস? কাল অতো 'পাগল' করলি বলেই তোর বাবা 'হ্যাঁ' করলেন, কিন্তু ভেবে দেখ, ইস্কুলে নিয়ে গেলে ও কি আর আস্ত ফিরবে? সবাই মিলে টানাটানি করে ঘড়ির বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

আশ্চয্যি, সঙ্গে সঙ্গে বাবাও কেমন সুর পালটে ফেলে বলেন, 'তোমার মা যা বলছেন নন্তু, খুব ভুল নয়। জিনিসটার যে কতো দাম, সে সম্বন্ধে তোমার বা তোমার বন্ধুদের কোনো আইডিয়া আছে? গেলে গেলই। তোমার বাবাকে বেচলেও ওরকম আর একখানি মিলবে না বাবা তা মনে রেখো।'

হায়! মেজমামা যদি একটা খুব বাজে ঘড়ি দিতো নন্তুকে!

নন্তু রাগের গলায় বলে, 'ভেঙেই বা যাবে কেন? কেউ কি মাটিতে আছড়াবে?'

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বড্ডো পাকা পাকা কথা শিখেছো নন্তু! মনে জেনো যা বলা হয়, তোমার ভালোর জন্যেই বলা হয়।'

ব্যস হয়ে গেল।

নন্তুর আশা আকাঙ্ক্ষা খতম।

নন্তু তা সত্ত্বেও জেদ করলে মা রেগে উঠে বললেন, তবে যা, দিচ্ছি বার করে, নিয়ে খোয়াগে যা! রাস্তায় যেতে যেতে, কেউ যদি তোর গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে কেড়ে নিয়ে ভেগে যায়, তুই কিছু করতে পারবি? এমন করছিস তুই, যেন কে নিয়ে নিচ্ছে না খেয়ে ফেলছে! তোর জিনিস তোরই আছে বাবা, তোরই থাকবে, সময়মত পরবি। আরো তো কত জিনিস হয়েছে তোর, সে সব নিয়ে গিয়ে দেখাগে বন্ধুদের।'

নন্তুর চোখ দিয়ে একবার জল ঝরলো, একবার আগুন ঝরলো। নন্তু কঠিন মুখ নিয়ে চলে গেল।

স্কুলে নন্তু কিছুই নিয়ে গেল না।

পৈতে বাবদ শুধু ন্যাড়া মাথাই দেখালো বন্ধুদের।

ওর যে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রঞ্জন, সে বললো, কী পেলি না পেলি আনলি না কেন? দেখতাম একটু।'

নন্তু সকলকে শুনিয়ে অবহেলার গলায় বললো, 'হুঁঃ! আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই বোঁচকা বয়ে স্কুলে আসবো! এতো গাদা গাদা জিনিস জমেছে, আমারই দেখবার সময় হয়ে ওঠেনি।'

সুশীল বললো, 'ও ববাবা! এতো!'

একজন এগিয়ে এসে বললো, 'এই তুই নাকি একটা 'রোলেক্স ঘড়ি' পেয়েছিস? তোর কোন্ মামা বিলেত না আমেরিকা কোথা থেকে এনে দিয়েছে?'

নন্তু তাচ্ছীল্যের গলায় বললো, 'কে দিচ্ছে এসব গুলতাপ্পি?'

'বাঃ, গোরা যে বললো, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে শুনে এসেছে—।'

'গোরার কথা বিশ্বাস করেছিস? গোরা তো সব সময় গুল মারে।'

মনে হলো, ছেলেগুলো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। গোরার কথাটা শুনে পর্যন্ত অন্যরকম নিশ্বাস পড়ছিল তো প্রায় সকলেরই।

দিন যায়, দিনের পরে দিন যায়।

নন্তু আর মার কাছে ঘড়ি ঘড়ি করে না।

'একবার দেখি না—' বলে আবদারও করে না।

নন্তু যেন ভুলেই গেছে তার একজন মেজমামা আছে, এবং সেই মামা একটা সুন্দর ঘড়ি দিয়েছে নন্তুকে।

ভুলেই যখন গিয়েছে, তখন আর দেখতে চাইবে কী?

কিন্তু না চাইলেও, মাঝে মাঝে যে দেখতে পায় না, তা নয়। ভালো জায়গায় কোথাও নেমন্তন্নটন্ন হলে নন্তুর কাকা বলে, 'নন্তের ঘড়িটা পরে গেলে মন্দ হতো না—'

'মন্দ হতো না' মানেই ভালো হতো।

তা ভালোটা হওয়াতেই হয়।

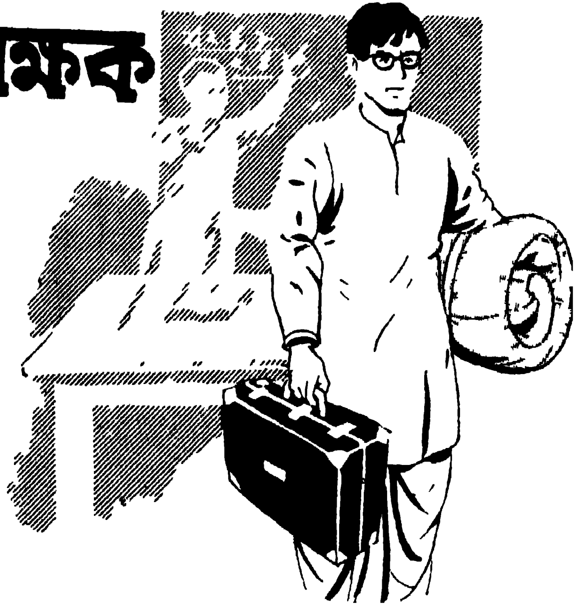
কাকা তো আর ছেলেমানুষ নয় যে রাস্তায় কেউ গালে ঠাশ করে চড় বসিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে?

তবে প্রার্থনার জোরে কী হয় না হয় কে বলতে পারে? নন্তু তো ঈশ্বরের কাছে প্রাণপণে প্রার্থনা জানায়, 'হে ঈশ্বর, ঘড়িটা যেন আজ আর বাড়ি না ফেরে। যেন রাস্তায় ছিনতাই হয়ে যায়।'

মালিক না শালিক



ভূতপূর্ব শিক্ষক



শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পূজার ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাওয়া বাঙালীর এখন স্বভাবে দাঁড়িয়াছে। যার যেমন সংগতি তার তত দৌড়—কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত মানচিত্র অবারিত। কোন কারণে যে ব্যক্তি যেতে পারে না নিজেকে হতভাগ্য মনে করে, সামাজিক লজ্জা তো আছেই। আমি একজন দক্ষিণ কলকাতার ভদ্রলোককে জানি মুদ্রা দোষের (মুদ্রার অভাব) ফলে যাঁর একবার বাইরে যাওয়া হল না। তিনি পূজার ছুটির কয়েক দিন বরানগরে গা ঢাকা দিয়ে থেকে বন্ধুদের বললেন, এলাম শ্রীনগর ঘুরে। সচিত্র টুরিস্ট বইগুলোর কল্যাণে তাঁর শ্রীনগরের বর্ণনা বাস্তবকে অর্থাৎ রেল মাসুল যুগিয়ে শ্রীনগর যাবার কাহিনীকে ছাড়িয়ে গেল। সবাই বলল, দেখেছেন বটে আপনি, আমরা জানতাম না যে এত দেখবার আছে। অপরের কথা যাক। নিজের কথা বলি। আমার চিরন্তন মুদ্রা-দোষ। টাকার থলির দৌড় সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগে যা নাকি ছিল ডিসপেপসিয়া ও ডিটেকটিভ ভীতিগ্রস্ত বাঙ্গালীর ভূ-স্বর্গ। বিশেষ ও জায়গাগুলো আমার অজানা নয়। স্থির করলাম, ছোটনাগপুরের

ছোট একটি শহরে যাবো। বছর ষাটেক আগে নিতান্ত বাল্যকালে ওখানে অনেকদিন ছিলাম—এতদিনে নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে ; কাজেই নূতন জায়গা বলে ধরে নেওয়া উচিত। কিন্তু মুশকিল হল, পরিবার তার সাথে যেতে চায়। বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হল না, বিপদে মধুসূদন রক্ষার্থ এগিয়ে গেলেন। আমার পত্নীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশন এই সময়টায় পড়লো। এ হেন সুযোগ ছেড়ে দিয়ে কোন্ নারী স্বামীর সঙ্গে ছোটনাগপুরে যায়।

তারপরে যথাসময়ে যথাকালে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের ৪।৫ ঘণ্টা পরে অভীষ্ট শহরের স্টেশনে এসে নামলাম এবং সেখানে গিয়ে দেখলাম বৃন্দাবন হয়েছে শহর। তবে এক বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয়নি। এসব অঞ্চলের শহরে হোটেল বলে কিছু নেই। তবে ছোটখাটো বাড়ি অনায়াসলব্ধ, ভাড়াও যৎসামান্য।

স্টেশনমাস্টার বাবুকে শুধালাম, ছোটখাটো একটা বাড়ি পাওয়া যাবে?

মাস্টারবাবু বাঙালী, বললেন এখানে কখনো এসেছেন?

বয়সটা চাপা দেওয়ার আশায় বললাম, হ্যাঁ বছর ত্রিশেক আগে একবার এসে-ছিলাম বটে।

তবেই হয়েছে—বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, তবেই হয়েছে। সেদিন আর নেই মশায়, তামার কারখানা হওয়ায় যে কয়টি ছোটখাটো ভাঙাচোরা বাড়ি ছিল কারখানার বাবুরা স্থায়িভাবে ভাড়া নিয়েছেন।

কেন কারখানা থেকে কোয়ার্টার দেয় না?

দেয় বইকি, তবে কুলোয় না, এঁরা উপচে পড়া।

এখন উপায়?

উপায় আর কি? ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।

হট্টমন্দিরই বা পাই কোথায়?

এখানে একটা হাই স্কুল আছে, এখন ছুটির সময়ে খালি আছে, সেক্রেটারিকে গিয়ে ধরুন, একটা গতি হতে পারে।

এই বলে তিনি একজন খালাসীকে বললেন, বাবুকে সেক্রেটারি বাবুর বাড়ি পৌঁছে দে।

সেক্রেটারি বাবুর বাড়ির দিকে চলতে মনে পড়লো, হ্যাঁ পরিবর্তন হয়েছে বইকি জায়গাটার। মনে পড়লো ছোট একটা মাইনর স্কুল ছিল, একটি মাত্র পাকাঘর, বাকী

● ভূতপূর্ব শিক্ষক

সব খড়ের। কিছুদিন এখানে পড়েছিলামও বটে। কালের নিয়মে সেই ক্ষুদ্র চারা গাছ আজ বনস্পতি হয়ে আকাশে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে আর সেই সব শাখায় যারা বিচরণ করছে—যাক অবান্তর কথায় কি কাজ।

সেক্রেটারিবাবু অতিশয় সজ্জন। আমাকে সমাদর করে বসালেন, চা পান করালেন, তারপরে আমাদের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হল।

এখানে ছোট বড় কোন বাড়িই এখন পাওয়া যায় না, তামার কারখানার বাবুরা সব স্থায়ী ভাড়াটে।

এ খবর স্টেশনেই পেয়েছি। আপনাদের স্কুলটা তো এখন বন্ধ, একটা ঘরে থাকতে পাওযা যায না।

বাধা কি। তবে কি জানেন—তিনি মনে মনে হিসাব করতে লাগলেন। পততি পত্রতে অবস্থায় আমি চুপ করে থাকলাম।

হ্যাঁ তবে কি জানেন, ঘর অবশ্য অনেকগুলো, তবে প্রায় সবগুলোতেই টেবিল বেঞ্চি গাদা করা। একটা আফিস ঘর, সেটায় সুবিধা হবে না, আর হেডমাস্টারমশায় নিজের ঘর বন্ধ করে চাবি নিয়ে চলে গিয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁর কি মনে পড়লো, বলে উঠলেন, ঠিক হয়েছে, একটা ছোট পুরানো ঘর আছে—এক সময়ে মাইনর স্কুল ছিল তারই শেষ চিহ্ন। সেটা খালি আছে বটে, খালিই থাকে। কিন্তু সেখানে থাকতে পারবেন কি?

আমিও যে সেই মাইনর স্কুলের শেষ চিহ্ন, এ কথাটা মুখে এনেও প্রকাশ করলাম না। অল্প জলের নদী, কোথায় কোন্ চড়ায় নৌকা ঠেকে যায় ঠিক কি।

আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলাম, অবশ্যই পারবো।

অনেকদিন বন্ধ আছে কিনা?

একটু ঝাড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিন।

ঘরটা বড্ড ছোট।

তা হোক, একটা তক্তপোশ ধরলেই যথেষ্ট। আর জানলা খুলে দিলেই আলো বাতাস আসবে।

কতদিন থাকবেন ইচ্ছা।

আপনাদের অসুবিধা না হলে কুড়ি পঁচিশ দিন।

আমাদের অসুবিধার কথা ভাবছিনে, আপনার—

আমি তো অসুবিধা হবে জেনেই বেরিয়েছি।

তারপরে বললাম, বিদ্যালয় সাধারণের সম্পত্তি, কিছু ভাড়া নেওয়া উচিত।

আবার ভাড়া? দেখুন যতদিন থাকতে পারেন।

হ্যাঁ যেরকম ছোট ঘুপ্সি ঘর বললেন, বেশিদিন শখ করে থাকতে কার ইচ্ছা করে। তবে কি জানেন, সারাটা দিন মাঠেঘাটেই তো কাটবে।

তবু সারাটা রাত ঐ ঘরে তো কাটাতে হবে।

তারপরে তিনি মাহাতো বলে ডাক দিতেই কালো বলিষ্ঠ কাঁচাপাকা চুল এক ব্যক্তি এসে দাঁড়ালো।

যা বাবুর জিনিসপত্র ইস্কুলবাড়িতে নিয়ে যা। আর ইস্কুলের চৌকিদারকে এখনি একবার পাঠিয়ে দিস।

লোকটা বিদায় হয়ে গেলে শুধালাম, আবার চৌকিদার কেন, চোর ছ্যাঁচোড়ের ভয় আছে নাকি?

আরে না, না, খাবেন কোথায়? ঐ লোকটা দুবেলা আপনাকে রেঁধে দেবে—ফাইফরমাস খাটবে, যাওয়ার সময়ে ওকে কিছু দিয়ে যাবেন।

নিশ্চয়, সে আর বলতে।

ঘরটা সম্বন্ধে সেক্রেটারি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি। নিতান্ত ছোট, ১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট চওড়া হবে, দেয়াল মেঝে সবই জীর্ণ, ছাদটা টালির, জল পড়ে কিনা বৃষ্টি না হলে বোঝা যাবে না। আর একদিকের সঙ্গে শক্ত করে আঁটা একটা ব্ল্যাকবোর্ড। অথচ সমস্ত বাড়িটা প্রকাণ্ড, নূতন বোঝা যায়। স্বয়ং সরস্বতী মাঝে মাঝে আসাযাওয়া করেন।

মাহাতো আমার বিছানা বাক্স নামিয়ে একপাশে একখানা তক্তপোশ পেতে ঝাঁট-ঝুট দিয়ে বলল, বাবু সন্ধ্যাবেলা একটা হেরিকেন লণ্ঠন দিয়ে যাবো।

দেখলাম যে অন্য ঘরগুলোয় বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। তারপরে চৌকিদারকে ডেকে আমার রান্নার বন্দোবস্ত করতে বলল। চৌকিদার পয়সা নিয়ে বাজারে চলে গেল। আমি ঘুরতে বের হলাম। পরে একদিন সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলাম যে এই ঘরটা মাইনর স্কুলের চিহ্ন হিসাবে রক্ষা করা হয়েছে।

ষাট বছর পরে কোন পুরাতন জায়গায় গেলে মনের কি অবস্থা হয় বেশ বুঝলাম। চেনা মানুষ একজনও চোখে পড়লো না, অনেক চেনা শালগাছ চৌকি তক্তপোশ দরজা

জানালা হয়ে লোপ পেয়েছে। রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়েছে—তাও প্রায় সব পূবে নিরিখ ধরে। পশ্চিম দিকটা জুড়ে তামার কারখানার ধোঁয়া আর হড়হড় ঘড়ঘড় শব্দ। যে হরীতকী গাছগুলোর তলায় বাল্যকালে খেলা করতাম সমূলে লোপ পেয়েছে, হরীতকী গাছে কি আসবাব হয় জানি না। তবে পুরাতন একেবারে কিছু নেই এমন নয়, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলো আর নদীটা তেমনি আছে। তাদেরই একমাত্র বন্ধু বলে মনে হল।

দুপুরবেলা আহারান্তে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে বিকালে আবার বেড়াতে বের হলাম। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাহাতো কথা রেখেছে, এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, আর ঘরের জানলা দুটোও খুলে দিয়েছে। চৌকিদার ভাত নিয়ে এলো, খেয়ে উঠে মুখ ধোবার পরে চোখে পড়লো ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে ল. সা. গু. অঙ্কের খানিকটা লেখা। বুঝলাম ঘরটা লক্ষ্মীছাড়া হলেও সরস্বতী ছাড়া হয়নি। নীচের দিকের কোন ক্লাস বসে, তারই চিহ্ন ঐ অসমাপ্ত ল. সা. গু অঙ্কটা।



চোখে পড়ল ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে ল সা গু. অঙ্কের খানিকটা লেখা।

সারাদিনের পরিশ্রমে ঘুম আসতে বিলম্ব হল না। সকালবেলায় চৌকিদার যখন চা নিয়ে এল, প্রথমেই চোখে পড়লো ব্ল্যাকবোর্ডখানা—অসমাপ্ত ল সা গু.টা সমাপ্ত। বুঝলাম রাতের ঘোরে সবটা চোখে পড়েনি।

সকালে বেড়াতে বের হয়ে একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হল, কারখানার

● শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কেরানী। আলাপের প্রসঙ্গে আমাকে নবাগত বুঝে শুধালো, উঠলেন কোথায়?

আমার উত্তর শুনে গম্ভীর হয়ে গেল, শুধু বলল—ও।

কতদিন থাকবেন?

দশ পনেরো দিন।

আবার সেই ও।

বুঝলাম লোকটা ঐ একটি বাংলা শব্দই জানে।

বিকালবেলায় সেক্রেটারিবাবুর, সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি সমাদর করে বসিয়ে চা পান করালেন। তারপরে শুধালেন, রাতে ঘুম হয়েছিল?

ওঃ, অঘোরে ঘুমিয়েছি।

আমি ভাবলাম—এই পর্যন্ত বলে তিনি কথার মোড় যেন ঘুরিয়ে নিলেন, বললেন, আপনি তো আগেও এখানে এসেছেন।

এসেছি তবে ৫০।৬০ বছর আগে, আর এখানকার মাইনর স্কুলেই আমার হাতে খড়ি।

বিস্মিত হয়ে বললেন, বলেন কি। কিছু চিনতে পারলেন কি?

বললাম, এত পরিবর্তন হয়েছে চিনবার উপায় কিছু রেখেছেন কি? তবে যে ঘরটায় থাকতে দিয়েছেন জীর্ণতা দেখে ওটাকে সেই আমলের বলে মনে হয়। ওটা রেখেছেন কেন?

ওটাই আদিপত্তন কিনা, তাই সবাই বলল ওটাকে আর ভাঙবেন না।

বেশ করেছেন, হয়তো ঐ ঘরটাতেই বাল্যকালে পড়েছি।

তারপরে সেক্রেটারি যা বললেন, তার সঙ্গে পূর্ব প্রসঙ্গের যোগ নেই, শুধালেন, সঙ্গে Torch আছে কি?

কেন চোর ছ্যাঁচোড়ের ভয় আছে নাকি?

সে বিষয়ে নির্ভয় থাকুন, এখানকার লোক এমনি কুঁড়ে যে খোলা বাড়ি পেলেও রাতে যাওয়ার শক্তি রাখে না। তবে কিনা নূতন জায়গা, রাতে লণ্ঠন নিবে গেলে টর্চ থাকা ভালো।

বললাম, Torch ছাড়া আমি নড়িনে, যেখানেই যাই না কেন, বালিশের তলায় সর্বদা থাকে, এমন কি বাড়িতেও।

এ অভ্যাসটা আপনার ভালো।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকে দেখি যে ব্ল্যাকবোর্ডে সেই সমাপ্ত ল. সা. গু. অঙ্কটার পাশে অর্ধসমাপ্ত একটা গ. সা. গু. অঙ্ক। প্রথম কৌতূহল কাটতেই মনে পড়লো এ ঐ চৌকিদারটার ছেলেটার কাজ যে দুবেলা আমাকে চা দিয়ে যায়। ঘরটা খোলা থাকে, গ. সা. গু. অঙ্ক দূরের কথা ঘোড়দৌড়ের ছবি আঁকলেই বা বাধা দেয় কে! শিক্ষা অভ্যাসের এই গোপন নীতি মন্দ লাগলো না।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে দেখি লণ্ঠনটা নিভে গিয়েছে, আর ব্ল্যাকবোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে লিখবার মতো খসখস আওয়াজ কানে আসছে। ছেলেটা কি তবে রাতের বেলাতেও আসে নাকি! তাই বা কি করে হবে, দরজা বন্ধ। বলে উঠলাম, কে রে?

এমন সময় ব্ল্যাকবোর্ডের কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, শরতা, ফের কথা বলছিস, আজ অঙ্কটা শেষ না হলে তোর হাড় গুঁড়িয়ে দেব। স্বরটা দূরশ্রুত অথচ বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া আমার বহুকালের বিস্মৃত ঐ ভাবে নামটাই বা জানালো কে? তাড়াতাড়ি টর্চ নিয়ে আলোর ছটা ফেললাম—ঘর শূন্য। কেউ কোথাও নেই। আর গ. সা. গু. তেমনি অসমাপ্ত। ভয়ে গা ভিজে গিয়েছে, উঠে বসলাম, ঐ ঘরে থাকতে আর ভরসা হল না, বাইরে একখানা বেঞ্চি ছিল এসে বসলাম। তখন মনে হল বৃথা ভয় পেয়েছি, স্বপ্ন দেখে থাকবো। ভোর হতে বিলম্ব ছিল না। ভোরের আলো ঘরে ঢুকবামাত্র ঘরে এসে টর্চটা বালিশের তলায় রাখতে গিয়ে দেখি বালিশের পাশে একখণ্ড খড়ি পড়ে আছে। তবে স্বপ্ন নয়।

সেই খড়িটা হাতে করে সেক্রেটারির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আজ এত আগে এলেন, চা এখনো তৈরী হয়নি?

চা থাকুক, আগে সব শুনুন—বলে আদ্যন্ত ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন স্বপ্ন দেখে থাকবেন।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় আমার বহুকালের বিস্মৃত ডাকনাম শরতা সম্বোধন, ও নামে আজ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেউ ডাকেনি। আর তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়—তবে এই দেখুন বলে খড়িটা পকেট থেকে বের করে তাঁর টেবিলের উপরে রাখলাম।

সব দেখে শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর সেই কেরানীবাবুর ও শব্দের প্রসঙ্গটা বললাম।

তখন তিনি স্বীকার করলেন আমার অভিজ্ঞতা সত্য, স্বপ্ন নয়।

● শ্রীপ্রমথনাথ বিশী



খড়িটা পকেট থেকে বের করে তাঁর টেবিলের উপরে রাখলাম। [পৃঃ ১৮৭

তবে কেন জেনেশুনে এমন ঘরে আমাকে থাকতে দিলেন।

প্রথম কারণ আপনি নিরাশ্রয়, দ্বিতীয় কারণ ও ভদ্রলোক কারো অপকার করেন না।

আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, রাতের বেলায় খড়ি ছুড়ে মারে, তাকে আবার ভদ্রলোক বলছেন।

সবটা শুনলে আপনিও বলবেন— আগে চা আসুক।

চা পান করতে করতে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ বলছি।

এই ভদ্রলোকটির নাম সোমনাথ-বাবু, কৌলিক পদবী ভুলে গিয়েছি। ভিক্ষে করে চেয়ে চিন্তে এখানে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করলেন, সব খোড়ো ঘর—ঐ ঘরটাই পাকা। এদিকে তখন আদৌ স্কুল ছিল না, ছাত্রের অভাব হল না। অবিবাহিত এই লোকটির এই স্কুলটি ছিল প্রাণ জ্ঞান ধ্যান, স্ত্রী পুত্র পরিবার। এ প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা। তারপর বছর কুড়ি আগে সরকারের টনক নড়লো, হাই স্কুল করতে হবে। মাইনর স্কুল হাই স্কুলে পরিণত হলে এম-এ, বি-এ, বি-টি মাস্টার এসে জুটলো। সোমনাথবাবু গুরু ট্রেনিং পাস, বোধকরি তাও নন, তাঁর চাকরি হল না।

বলেন কি, লোকে আপত্তি করলো না।

খুব করেছিল, কিন্তু সরকার তো হৃদয়হীন একটা যন্ত্রমাত্র, তাঁরা চূড়ান্তভাবে 'না' বলে দিলেন।

তখন ?

সোমনাথবাবু অদম্য ব্যক্তি। তিনি পাশেই একটা খড়ো ঘর ভাড়া করে পাঠশালা

খুললেন। কিন্তু সেখানে ছাত্র যাবে কেন? তারা যদি বা যেতে চায় বাপ মারা নাচার, সরকারী স্কুলে পড়লে সদ্য সদ্য চাকরি জোটে। যে কয়টি ছাত্র সোমনাথবাবুর পাঠশালায় জুটেছিল তারা একে একে নূতন অট্টালিকার মোহে বিদায় নিল। শেষে এমন হল যে সোমনাথবাবুর অন্ন চলে না। তখন তামার কারখানা স্থাপিত হয়েছে, কয়েকজন গুণগ্রাহী মিলে তাঁর জন্যে একটি কেরানীগিরি যোগাড় করলো। শুনে সোমনাথবাবু বললেন, সারাজীবন শিক্ষকতা করে অবশেষে কেরানীগিরি, না তা আমার দ্বারা হবে না।

সোমনাথবাবু বললেন, দেখা যাক।

শেষ পর্যন্ত দেখাই গেল। ১০।১২ দিন সোমনাথবাবুর দেখা না পেয়ে বন্ধুরা তার ঘরে গেল—সেই পাঠশালায়। দরজা বন্ধ। সামান্য একটু ধাক্কা দিতেই দেখা গেল জীর্ণ তক্তপোশের উপরে জীর্ণতর শয্যায় অস্থিসার সোমনাথবাবুর মৃতদেহ। অর্ধাহারে অনাহারে তাঁর শিক্ষক জীবনের অসহনীয় পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর দেহ তুলতেই হাত থেকে একখণ্ড খড়ি পড়লো, বোধহয় অনাহারের ঘোরেও ছাত্রদের অঙ্ক কষাচ্ছিলেন।

টেবিলের উপর থেকে খড়িটা তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে পকেটে পুরলাম—বললাম, এটা আপনি পাবেন না, আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম, এ আমার গুরুর আশীর্বাদ।

হ্যাঁ ওটা আপনারই প্রাপ্য নিয়ে যান।

সেক্রেটারিবাবু, ঐ ঘরে থাকতে দেওয়ায় আপনার উপরে বিরক্ত হয়েছিলাম—এখন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সেই দিনই কলকাতায় ফিরে এলাম।

পূজার ছুটির অন্তে দিগ্বিজয়ী বন্ধুগণ প্রত্যাগত হলে কে কোথায় গিয়ে কি দেখল অর্থাৎ কার উপরে কার জিত হল তার কাহিনী বর্ণনা চলল।

আমার পালা এলে শুধালো, তুমি কি দেখে এলে?

আমি বললাম, সোমনাথ।

কেউ ততদূর যায়নি, কাজেই সকলে একবাক্যে স্বীকার করলো জিত আমার।

আমি আপত্তি করলাম না।

———

বাস কিল্লুয়া



শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

স্বর্গে একবার গানের আসর বসেছিল। দেবতারা মশগুল হোয়ে সংগীত সুধা পান করছেন। বরুণদেব খুব মিহিসুরে এসরাজ বাজিয়ে চলেছেন, ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ সেই মজলিসে যমরাজ এসে হাজির। সভায় এসে একটু চুপ করে বসা উচিত, তা নয়, তিনি একটা তবলা নিয়ে নির্দয়ভাবে এমন বেঢক্কা চাঁটাতে লাগলেন যে, গান-বাজনা কোথায় গেল গুলিয়ে। দেবতারা একেবারে হতভম্ব! চারিধারে হইহই ব্যাপার! ইন্দ্রদেবের খাস চাপরাসী এই রকম আচমকা দমাদ্দম আওয়াজ শুনে এমন চিৎকার কোরে উঠলো যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পর্যন্ত পিলে কুঁচকে গেল। মহাদেব এই রকম কাণ্ড দেখে চটে গিয়ে, যমকে অভিশাপ দিলেন যে, তিনি সাতাশি বছর মর্ত্যভূমে মানুষ হয়ে বাস করবেন এবং দুর্গাপুরের সেকেণ্ড পণ্ডিত হোয়ে সেইখানে ছেলেদের মাথা বাজিয়ে তবলার বোল শিখবেন।

এই গল্পটি আমরা আমাদের ক্লাসে পঞ্চার কাছে শুনেছিলুম। পঞ্চা ছিল ক্লাসের মধ্যে মানিকের টুকরো। অর্থাৎ লেখাপড়ায় যে পরিমাণে কিচ্ছু নয়—দুষ্টুমিতে সেই রকম, কিংবা তার চেয়ে বেশী রকমের পাকা। তা ছাড়া, আজগুবি গল্প ফাঁদতে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কখনও দেখিনি! থার্ড ক্লাসে হরিহর পণ্ডিতমশাই পড়াতেন কিন্তু ইস্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেরা পর্যন্ত তাঁকে যমের মত ভয় করতো। পণ্ডিত-মশায়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখলে মনে হয় ষাট সত্তর হয়েছে। ছোট ছোট চুল, নাকে রুপোর চশমা, তার আবার ডাল দুটোই ভাঙা, সুতো দিয়ে মাথার সঙ্গে বাঁধা। গায়ে একটা ময়লা চাদর, নাক দিয়ে আলকাতরার মত নস্যি অবিরতই নির্গত হচ্ছে। শুকনো চেহারাটি, কিন্তু গায়ে জোর অসাধারণ। পঞ্চাকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। আর পঞ্চা ক্লাসের মধ্যে পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে এমন দুষ্টুমি করতো যে, বলবার কথা নয়। মার খেয়ে খেয়ে তার সর্বাঙ্গে কালশিরে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চা সে সব দিকে ভ্রূক্ষেপও করতো না।

একদিন পণ্ডিতমশায় তাকে কি একটা পড়া জিজ্ঞাসা করলেন, পঞ্চা কখনো বোকার মত বসে থাকতো না, সে চট্ কোরে একটা যা-তা উত্তর দিয়ে বসতো। পণ্ডিতমশাই টুল ছেড়ে উঠে পঞ্চাকে ঠাস্-ঠাস্ কোরে চড়াতে লাগলেন। পঞ্চা মার-টার খেয়ে পিঠে গালে এমন ভাবে হাত বুলোতে লাগলো যেন ঘাম মুছছে। পণ্ডিতমশাই একটু থেমে বললেন—'কেমন হয়েছে, অর্বাচীন বানর!'

পঞ্চা তার উত্তরে নাক মুখ সিঁটকে বলে উঠল, "স্যার মারুন ক্ষতি নেই, কিন্তু বেত দিয়ে একটু দূর থেকে মারবেন, আপনার চাদরে বড় বিচ্ছিরি গন্ধ!—উঃ!"

এই কথা শোনা, আর যায় কোথা! পণ্ডিতমশাই তড়াং কোরে আবার টুল ছেড়ে গিয়ে, পঞ্চার ঘাড় ধরে, সেই চাদরটা তার নাকে টিপে ধরলেন। আমরা তখন হাসি চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলুম। সকলের মনে হোতে লাগলো, যেন পেটের মধ্যে কতকগুলি কাঁকড়া ঢুকে, তাদের বড় বড় দাঁড়া দিয়ে আমাদের কাতুকুতু দিতে শুরু করেছে। আবার হাসলেও বিপদ। এদিকে সকলের পেটকে যেন পাম্প করে ফোলাতে আরম্ভ করলে।

পঞ্চা খানিকক্ষণ চাদরের মধ্যে দিয়ে চাপা সুরে বলতে লাগলো—"আপনি বরং আমায় মারুন, কিন্তু স্যার, চাদরের গন্ধ আর সহ্য হচ্ছে না—উঃ থুঃ, থুঃ!"

পণ্ডিতমশাই ভাবলেন, এইবার বাছাধনের শাস্তির ঠিক ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি চাদরটি

● শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

নাকের ওপর থেকে কিছুতেই সরালেন না। কিছুক্ষণ পরেই পঞ্চা ওয়াক ওয়াক কোরে বমি করতে শুরু কোরে দিলে। সমস্ত চাদরটি একেবারে নষ্ট। তাড়াতাড়ি পণ্ডিতমশাই তখন হাত ছেড়ে দিয়ে চাদরটা টানতে গেলেন, কিন্তু পঞ্চা তখন খপ্ কোরে নিজেই চাদরটা ধরে ফেললে। পাছে আবার হাতে বমি লাগে—পণ্ডিতমশাইকে বাধ্য হোয়ে চাদরটির মায়া পরিত্যাগ করতে হোলো।

সে দিন আর ক্লাস হল না। হেডমাস্টারমশাই ছুটে এলেন এবং পণ্ডিতমশায়ের গায়ের চাদরে যে কি কোরে এই সব লাগলো, তা ভেবে পেলেন না। পণ্ডিতমশাইও জবাব যে কি দেবেন তাও ঠিক কোরে উঠতে পারলেন না। শুধু গজগজ করতে লাগলেন।

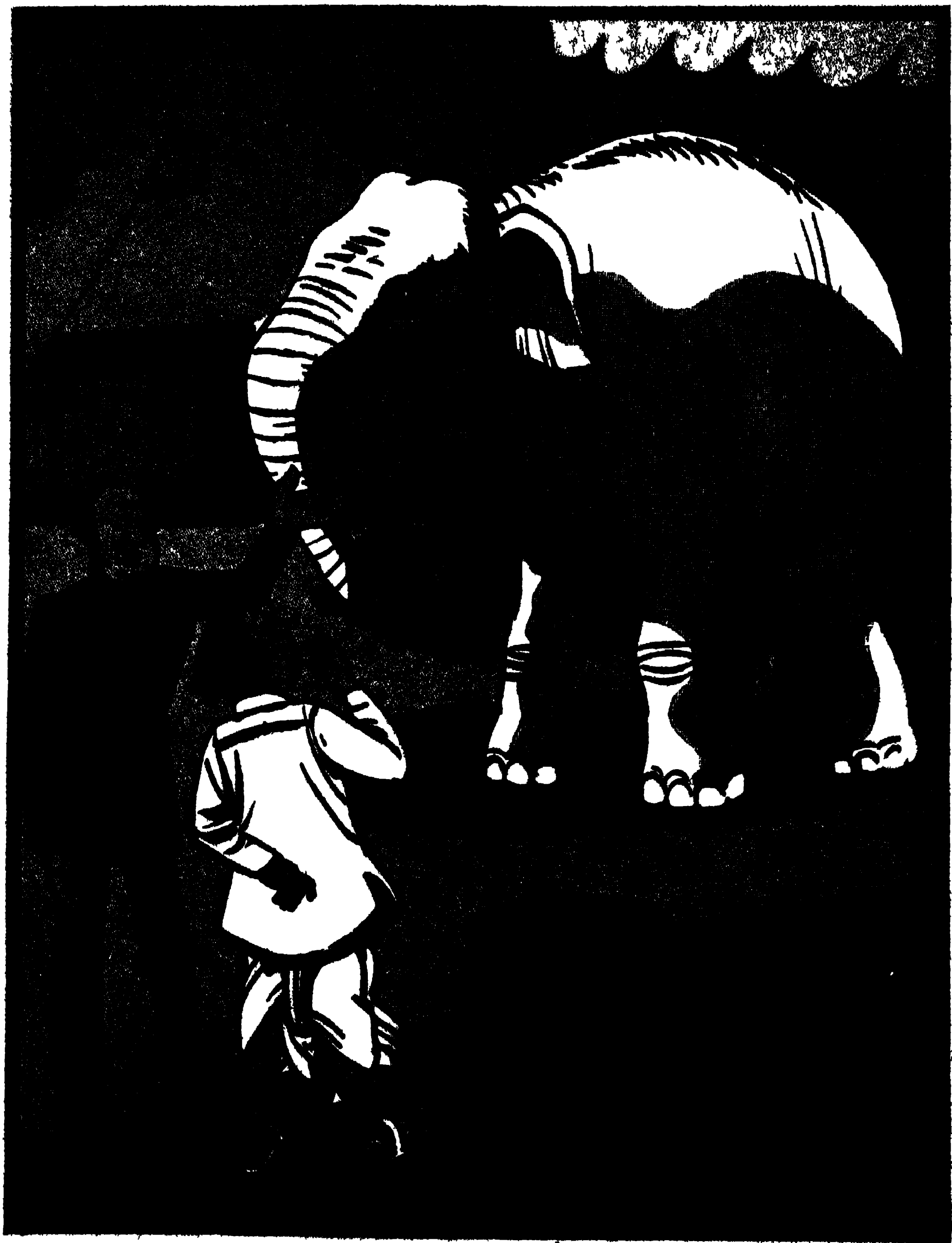
বাইরে গিয়ে পঞ্চা হাসতে হাসতে বললে—দেখলি কি রকম মজাটা। আমি তো ইচ্ছে কোরেই ঐ রকম করলুম! আর স্যারকে কিছু বলতে হচ্ছে না।

পণ্ডিতমশাই যে পঞ্চার কাছে এইভাবে মাঝে মাঝে জব্দ হন, তাতে আমাদেরও খুব আহ্লাদ হোতো। কারণ এক ঘণ্টা পড়ার মধ্যে পঞ্চান্ন মিনিট চলতো মার, আর পাঁচ মিনিট পড়া এবং কারুরই তাঁর হাত থেকে নিস্তার মোটেই ছিল না কিনা। আমরা পঞ্চার তখন সুখ্যাতি করতে লাগলুম।

পঞ্চা বিজয়গর্বে বাড়ি যাবার সময় বলে গেল যে, ও চাদরটা স্বর্গ থেকে আসবার সময় পণ্ডিতমশাই নিয়ে এসেছিলেন, এবং আবার স্বর্গে গলায় দিয়ে ওটিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মাত্র পঞ্চার কৌশলেই ওটিকে মর্ত্যভূমে ছেড়ে যেতে হোলো। পঞ্চা এমন ভণিতা কোরে কথাগুলো বললে যে, আমরা সবাই হো-হো কোরে হেসে উঠলুম।

॥ ২ ॥

আসল কথাটা এখনও বলিনি। ক্লাসের মধ্যে পণ্ডিতমশাই তিন রকম শাস্তি দিতেন। লক্ষ্মণ চিমটি, সীতে রদ্দা আর রাম কিলুয়া। যাদের একদিন পড়া ভুল হোতো—তাদের লক্ষ্মণ চিমটির ব্যবস্থা। লক্ষ্মণ চিমটি মানে হচ্ছে, কানের দু'পাশের রগের কাছে জুলপি ধরে ভীষণ টান। ছেলেবয়সেই নাপিতের কাছে গিয়ে আমরা তাই অনেকে জুলপি কামিয়ে ফেলতুম। পণ্ডিতমশাই তাতে আরও চটতেন আর আমাদের কান দুটো পাকড়ে ধরে সোজা বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতেন। দুদিন যাদের পড়া



ফোকলা দিগম্বর। কেউ কিনবে না মশাই। [পৃঃ ১৫১

হোতো না, কিংবা ক্লাসের মধ্যে ফিক কোরে হেসে ফেললে, তাদের শাস্তি সীতে মদ্দা, অর্থাৎ চুলের ঝুঁটি ধরে ঘাড়ে জোরসে ঘুষো! সেও ভীষণ, কিন্তু সকলের চেয়ে কঠিন শাস্তি হোলো রাম কিলুয়া! যাদের ওপর পণ্ডিতমশায়ের বেশী রাগ—তাদের ওপর ঘন ঘন এই শাস্তিটির প্রয়োগ হোতো। ডবল বেঞ্চির ভেতর মাথাটা গলিয়ে ঠিক বলিদানের পাঁঠার মত-দাঁড়াতে হোতো, আর অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তিন থেকে পনেরোটা পর্যন্ত কিল শিরদাঁড়ার ওপর এসে পড়তো। পঞ্চার ওপর মাত্র একদিন এই শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চা চালাকি কোরে, পিঠটা হঠাৎ একসময় এমন নীচু কোরে ফেললে যে, পণ্ডিতমশায়ের পরাক্রান্ত ঘুষি দমাস্ কোরে গিয়ে পড়লো বেঞ্চির ওপরে। হাতটাত ফুলে একেক্কার! পঞ্চাকে মারা তখন দূরে থাক, হাতের যন্ত্রণায় পণ্ডিতমশায় ছটফট কোরতে লাগলেন। সেই সময় পাশের ক্লাসের আর একজন মাস্টারমশাই পণ্ডিতমশাইকে কি একটা কথা বলতে এলেন। এসে দেখেন, পণ্ডিতমশাই প্রবল ভাবে হাত নাড়ছেন, আর তাঁর চোখেমুখে একটা কাতরতা ফুটে উঠেছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোলো মশাই? পণ্ডিতমশাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—আর কি হোলো, যত হতচ্ছাড়া ছেলে, আমাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে! গর্দভের এরূপ আচরণ—উঃ!

সে মাস্টারমশাই আমাদের পণ্ডিতমশায়ের মেজাজ জানতেন। বুঝতে পারলেন যে, ভদ্রলোক নিজের দোষেই কষ্ট পাচ্ছেন, আর বেশী কিছু না বলেই চলে গেলেন।

ঠিক এমনি সময় আমাদের ক্লাসের বেঁটে গণশার বাইরে যাবার বড্ড দরকার হোলো। সে বেচারা বোধহয় অনেকক্ষণ চুপচাপ পেটটি চেপে ধৈর্য ধরে বসেছিল, শেষে আর থাকতে না পেরে কাঁপতে-কাঁপতে পণ্ডিতমশায়ের টেবিলের কাছে গিয়ে করুণভাবে বলে উঠলো—স্যার বড্ড—একবার বাইরে যাব।

পণ্ডিতমশায়ের মেজাজ তখন তিরিক্ষি হোয়ে আছে। বাঘের মত গাঁক কোরে বলে উঠলেন—উল্লুক?—কথাটা সম্পূর্ণ হোতে না হোতেই বেঁটে গণশা ভেবড়ে সেখানে এমন কাণ্ড কোরে বসলো, যে জন্য তৎক্ষণাৎ আমাদের ছুটি হোয়ে গেল। ক্লাস পরিষ্কার করার জন্যে জমাদারকে ডাকতে হল।

হেডমাস্টারমশাই দু চারটি ছেলেকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে, তোদের ক্লাসে রোজই একটা-না-একটা কাণ্ড হয় কেন বলতে পারিস্, কি হয়েছে তোদের?

হেডমাস্টারমশাইযের কথা শুনে মিটমিটে মুকুন্দ দাঁত বার করে একটু টেনে টেনে কথা বলতে লাগল,—পণ্ডিতমশাই রাম কিলুযা দেন কিনা তাই—

মুকুন্দর কথা শেষ হবার পূর্বেই হেডমাস্টারমশাই ভুরু কুঁচকে বিস্মিতভাবে বলে উঠলেন—রাম কিলুযা? সে আবার কি।

মিচকে মুকুন্দ আবার বিনিযে-বিনিযে বলতে শুরু করলে—সে স্যার বড্ড লাগে, লক্ষ্মণ চিম্‌টি, সীতে রদ্দা, তার চেযেও সেটা বড়। রাম বড় ছেলে কিনা!—

হেডমাস্টারমাশাই মুখ গম্ভীর কোরে বলে উঠলেন—আচ্ছা এখন সব যা!—

বোধহয পণ্ডিতমশাইকে হেডমাস্টারমশাই আড়ালে কিছু বলে দিযেছিলেন—তাই কিছুদিন ক্লাসে মার একদম বন্ধ রইলো। কিন্তু অভ্যেস যাবে কোথা? দু-তিন দিন পরেই আবার নূতন ধরনের শাস্তির পন্থা আবিষ্কৃত হোলো। হাতের মধ্যে পেনসিল ঢুকিয়ে আঙুলে চেপে-ধরা, মাথায় ঠকাস্‌ কোরে খোট্টাই গাঁট্টা। উঃ, সে গাঁট্টা খেলে মাথাটা মনে হয় যেন ছ্যাদা হোয়ে গেল।

একদিন ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এলেন স্কুল দেখতে। পণ্ডিতমশাই ক্লাসের ভাল ছেলেদের পেছনের বেঞ্চিতে বসিযে পঞ্চা এবং তার দলভুক্ত কতকগুলি ছেলেকে সামনের বেঞ্চিতে বসবার হুকুম দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বোধহয পেছনের বেঞ্চিতে যত খারাপ ছেলে আছে ভেবে ঐ ধার থেকেই জিজ্ঞেস-পড়া করবেন। কিন্তু ও হরি। তিনি ক্লাসে ঢুকে একেবারে ফার্স্ট বেঞ্চির গোড়া থেকে ধরলেন। তিনি জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলেন সংস্কৃত চাণক্য শ্লোক। প্রথম ছেলেটি চুপ কোরে রইল, দ্বিতীযটি কুঁক্‌ কুঁক্‌ কোরে কি বলবার চেষ্টা করলে, তৃতীযটি একলাইন বোলে কড়ি কাঠের দিকে হাঁ কোরে চাইতে লাগলো যেন সেইখান থেকে গপাৎ কোরে তার গলার মধ্যে শ্লোকগুলো পড়ে যাবে।

পণ্ডিতমশাই তখন ঘামতে আরম্ভ কোরে দিয়েছেন। আজকে তাঁর আরও ভয় পঞ্চা সামনে বোসে। কিছু একটা ঝট্‌ কোরে যা-তা বলে না দেয়।

পঞ্চার বিদ্যে তো আমাদের জানা আছে, তার ওপর সে আগের বছর সরস্বতী পূজোর আগে মনের সাধে টেঁপারি আর টোপাকুল কিনে খেয়েছিল। আমাদেরও মনে হোলো, এই পঞ্চাকে মা সরস্বতী বুঝি ব্যাটপেটা কোরে ছেড়ে দেন। পঞ্চার আগে একটি হিন্দুস্থানী ছেলে বোসেছিল, পঞ্চা তার কানে চুপিচাপি বোলে দিলে,

● রাম কিলুয়া

দেখো মাতৃবৎ পরদারেষু পর-দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ ই-শ্লোক মাৎ বোলো, তাহোলে সাহেব ভয়ানক চোটে মোটে যায়ে গা।'

পঞ্চার হোলো এইটেই বোকামী। হিন্দুস্থানী ছেলেটি ভয়েময়ে ঠিক ঐ শ্লোকটিই বোলে উঠলো। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তাকে বেশ গড়গড় কোরে বোলে যেতে দেখে খুব খুশী হোয়েই বোলে উঠলেন 'good'. তারপরেই পঞ্চার পালা। পঞ্চা দেখলে মহা বিপদ, এ তো ভারী মুশকিলে ফেলে দিলে তাকে। কিন্তু দমে পড়বার ছেলে নয়। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে মাথামুণ্ডু কি একটা বলে গেল—'বিদ্যাং দদাতি লাথিং লাথিং' যা শুনে পণ্ডিত মশাই হাঁ হাঁ কোরে উঠলেন। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সংস্কৃত বুঝতেন না তাই, বিরক্ত ভাবে তাঁর দিকে একবার চাইতেই পণ্ডিতমশাই চুপ করে গেলেন। পঞ্চা সংস্কৃত শ্লোকে ফার্স্ট হোয়ে গেল।



—রাম কিলুয়া? সে আবার কি! [পৃঃ ১৯৪

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই পণ্ডিতমশাই পঞ্চার দিকে তেড়ে এগিয়ে গেলেন মারতে।

পঞ্চা গম্ভীরভাবে বললে, 'স্যার মারবেন না বলছি—তা হোলে এমন চেঁচাবো যে ও ঘর থেকে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ছুটে আসবেন। পণ্ডিত মশাই রাম কিলুয়া লাগাবার বন্দোবস্ত কোরে তুলছিলেন, কিন্তু পঞ্চার অসাধ্য কিছু নেই ভেবে তাঁর হাতের কিল হাতেই রোয়ে গেল।

হেডমাস্টারমশাই পণ্ডিতমশাইকে পরের দিন যাবার সময় তিরস্কারের স্বরে বলে উঠলেন যে, 'কি মশাই, আপনার ছেলেরা একেবারে এক বর্ণও সংস্কৃত শেখেনি, কি করলেন সারা বছর ধরে! ভাগ্যিস সাহেব সংস্কৃত বোঝেনি—তাহলে আজ কেলেঙ্কারি হ'ত। পণ্ডিতমশাই তিরস্কৃত হয়ে গুম্ হয়ে রইলেন।

● শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র



পঞ্চা হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের দিকে ছুটে গেল।

পণ্ডিতমশাই হেডমাস্টার মশায়ের ওপরই সেদিন ভয়ানক চটে গেলেন, কিন্তু চাকরি কোরে খেতে হলে সবই সহ্য করতে হয়। কিছুদিন চুপচাপ; আবার বেদম ঠ্যাঙানো শুরু হোলো। পঞ্চা একদিন তাঁর নস্যির ডিবেটা কোথায় সরালে। পণ্ডিতমশাই রেগে অগ্নিশর্মা। তিনি চিৎকার কোরে পঞ্চাকে মারতে ছুটলেন। পঞ্চা বেগতিক দেখে একেবারে ক্লাস থেকে ছুট্।

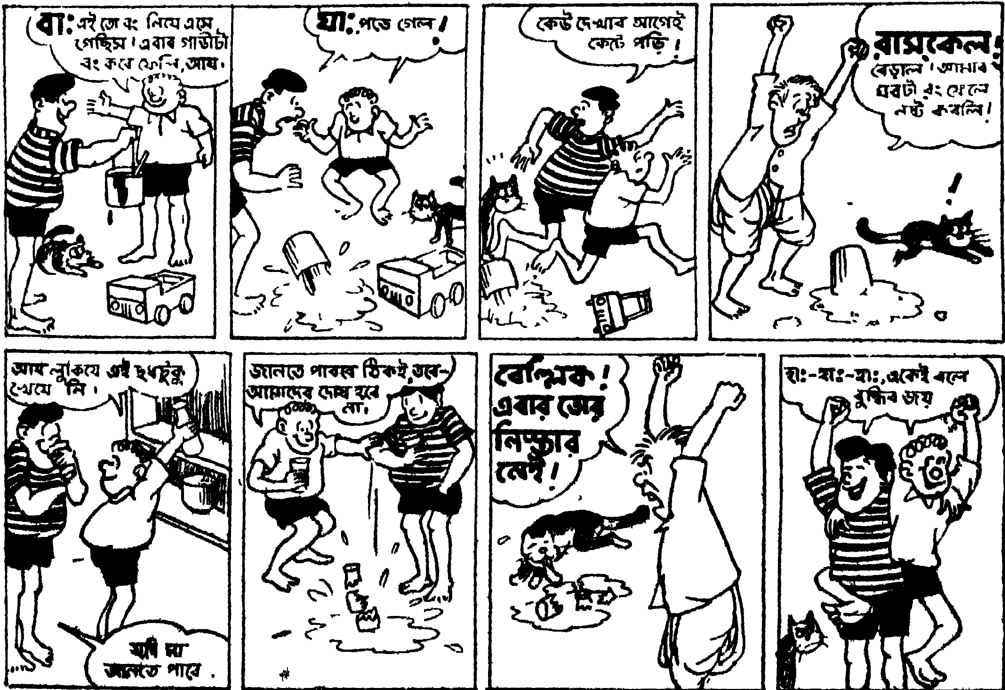
পণ্ডিতমশাই দেখলেন, পঞ্চা হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের দিকে ছুটে গেল। তিনিও সেই দিকেই ছুটলেন। রাগে তাঁর শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে!

এদিকে হয়েছে কি, পঞ্চা অপর দিক দিয়ে ততক্ষণ সরে পড়েছে, পণ্ডিতমশাই

অতটা খেয়াল করেন নি। হেডমাস্টারমশায়ের ঘরের মধ্যে তিনি ঝড়ের মত ঢুকে পড়লেন। হেডমাস্টার মশায়ের টেবিলের তলায় কি একটা কাগজ পড়ে যাওয়াতে তখন তিনি মাথাটা গলিয়ে কাগজটা কুড়ুচ্ছিলেন। ঘরটা বেশ অন্ধকার মত। পণ্ডিত-মশাই তখন রাগে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। ভাবলেন পঞ্চা টেবিলের তলায় লুকোবার চেষ্টা করছে, এই ভেবে তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর পিঠের ওপরই প্রাণপণ জোরে গড্ডাম্ কোরে একটি রাম কিলুয়া বসিয়ে দিলেন। 'বাপ্' বোলে হেডমাস্টার মহাশয় চিৎকার কোরে উঠলেন। পণ্ডিতমশায়ের তখন চমক ভাঙলো, আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না কোরে তিনি কোথায় যে সরে পড়লেন আজ অবধি তাঁর খোঁজ আমরা পাই নি।

বহুদিন হয়ে গেছে পণ্ডিতমশায়ের রাম কিলুয়ার স্মৃতি আমরা তো ভুলিই নি, আমাদের হেডমাস্টার মশাইও এখনও ভুলতে পেরেছেন কিনা তা বলতে পারি না।

চালাক ও চালু





অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাস উপাধিটা যেন বিদ্রূপ করছে বিশ্বাস দম্পতিকে। মিস্টার রমেন বিশ্বাস এবং মিসেস কমলা বিশ্বাস। দুজনের রূপ আছে, বিদ্যা আছে—গুণ—? মানুষকে অবিশ্বাস সেইটাই সমস্ত গুণকে ঢেকে দিয়েছে, পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করেন না নিঃসন্তান বিশ্বাসদম্পতি। এর জন্যে তাঁরা লজ্জিত নন, বরং গর্বিত। দুজনেই গভর্নমেণ্ট অফিসে কাজ করেন, ঘড়ির কাঁটায় জীবনটা বাঁধা, ভোর চারটের সময় ওঠেন মিসেস বিশ্বাস। ছাদে আধ ঘণ্টা পায়চারি করেন, সামনে আমগাছের কাকগুলো ডেকে ওঠে। মিসেস বিশ্বাস জানেন এখন চারটে পঁচিশ, নীচে নামেন। মিস্টার বিশ্বাস ততক্ষণে উঠে পড়েছেন—টুথব্রাশে পেস্টটা দেবার আগে ভালভাবে দেখে নিচ্ছেন—

এর আগে কেউ টিপেছে কিনা, মনে হচ্ছে যেন—কালকের চেয়ে পেস্টটা বেশী চ্যাপ্টা। 'কমলা—' ডাক দেন মিস্টার বিশ্বাস।

'কি ?' সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করেন কমলা বিশ্বাস।

রমেন বিশ্বাস ডিটেকটিভের মতন প্রশ্ন করেন—'তুমি কি আজ আগে মুখ ধুয়েছ ?'

—'না। রোজই তো তোমার সঙ্গে ধুই। কেন ?'

—'পেস্ট একটু কম লাগছে কেন ?'

—'দেখি দেখি !'

সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসে পেস্টটা একরকম কেড়েই নেন মিসেস বিশ্বাস। ডাক্তার যেমন করে হাতের পাল্‌স্‌ দেখেন তেমনি ভাবে টুথপেস্টের ফাইলটা হাতে নিয়ে ধরেন। তারপর সরু গলায় হাঁক দেন—'মধু মধু।'

চাকর মধু নীচের বাথরুম থেকে উত্তর দেয়—'যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি এসো'। আদেশের ভঙ্গীতে রমেন বিশ্বাস চিৎকার করেন।

বেহারি ভৃত্য মধু কাপড় সামলাতে সামলাতে এসে বলে—'চায়ের জল চাপিয়েছি।'

'তুমি মুখ ধুয়েছ ?' উকিলের মতন প্রশ্ন করেন মিসেস বিশ্বাস।

মধু ঘাড় নেড়ে বলে—'হ্যাঁ।'

—'কিসে ?' বিশ্বাস দম্পতি ডুয়েটে প্রশ্ন করেন।

—'ছাই দিয়ে।' সগুমাজা ঝকঝকে দাঁতগুলো বার করে বলে মধু।

—'হাঁ কর।' তর্জনী তুলে গর্জন করে মিস্টার বিশ্বাস।

হতবাক্ মধুর এমনিই মুখটা 'হাঁ' হয়ে গেছল। মিস্টার এবং মিসেস পর পর দুজনে মধুর মুখের কাছে নাসিকা এনে ঘ্রাণ নিয়ে পেস্টের সুগন্ধ খুঁজতে গিয়ে মিঠে বিড়ির দুর্গন্ধে যুগপৎ মিস্টার বিশ্বাসের কাশি এবং মিসেস বিশ্বাসের বমি এসে পড়ে।

'এত্তো বিড়ি খাও কেন ?' কাশতে কাশতে মিস্টার বিশ্বাস প্রশ্ন করেন।

মধু সলজ্জে উত্তর দেয়, 'ওভ্যেস হয়ে গেছে বাবু।'

'যাও'। মিসেস বিশ্বাস সরু গলাটাকে আরও তীক্ষ্ণ করে বলেন।

আজকের সকাল বেলাতেই রমেন বিশ্বাস আর কমলা বিশ্বাসের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কারণ পেস্টটা কে নিল, তার হদিস পাওয়া গেল না।

'বুঁচির মা নেয়নি তো ?' রমেন সন্দেহ করেন ওদের বুড়ী ঝিকে।

'বুঁচির মা তো ফোকলা।' কমলা জবাব দেন, 'ও পেস্ট নিয়ে কি করবে?'

রমেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'খাবে, বেশ পিপারমেণ্টের মতন মিষ্টি মিষ্টি।'

কমলা একটু ভাবেন, তারপর সমর্থন করে বলেন, 'তা হতে পারে, বুড়ীটা এমনি বড় লোভী, আর ঘোষবাবুরা বলছিলেন একটু হাতটানও আছে।'

'ও বাবা।' রমেন সভয়ে বলেন, 'ঘোষবাবু এরকম একটা ঝি দিলেন বা কেন?'

'ও সব সমান'। কমলা সান্ত্বনার স্বরে বলেন, 'তার চেয়ে বাথরুমে তাকটায় দরজা করো। অফিস যাবার সময় তালা দিয়ে যাব।'

'মন্দ বলনি'! রমেন খবরের কাগজের দিকে চেয়ে বলেন।

এরপর ওদের দিনের রুটিন আরম্ভ হয়ে গেল। কমলাদেবী রান্নাঘরে, মধুকে গুনে গুনে তিনটে আলু দেবেন। এই তিনটে আলু বাছতে একটু সময় নেন। কারণ দুটো আলু হবে বড়, আর একটা আলু হবে ছোট—যেটা মধুর ভাগে পড়বে। এই ছোট আলুটা তুলে ঘুরিয়ে তবে দেন। তারপর আধখানা ফুলকপি, আড়াইটে মাছের পিস। একটা রমেন, একটা কমলা—আধখানাটা মধুর। সেদ্ধ চালটা নিজেদের জন্যে মেপে দেন, মধুরও আতপ চাল আলাদা করে ছোট টিনের কৌটতে মাপেন।

'মধু বাইরে থেকে উনুনটা নিয়ে এসো।' কমলা কপি কুটতে কুটতে আদেশ করেন।

মধু রাস্তায় আঁচ দেওয়া উনুনটা আনতে যায়।

রমেনের ইতিমধ্যে দাড়ি কামানো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কামানো গালে হাত বোলান। দেখেন ভাল মোলায়েম করে কামানো হয়নি, খরখর করছে।

'এর মধ্যেই ব্লেডটা ভোঁতা হয়ে গেল।' স্বগতোক্তি করেন রমেন। ব্লেডের কভারটা তুলে তাঁর লেখা তারিখটা দেখেন। কবে প্রথম কামাতে শুরু করেছেন—৫ই জানুয়ারি। আজকে ১৫ তারিখ, মাত্র দশদিনেই অকেজো হয়ে গেল ব্লেডটা। পুরানো ব্লেডটা খুঁজে বার করেন, কভারের তারিখটা পড়েন—প্রথম কামানোর দিন—২০. ১২. ৭৩, শেষ কামানোর তারিখ—৪. ১, ৭৪, গত মাসটা ৩১ দিনে ছিল। মনে মনে হিসেব করেন রমেন—তার মানে ১৫ দিন চলল, আর এই ব্লেডটা ১০ দিনেই খতম। মনটা খারাপ হয়ে গেল রমেন বিশ্বাসের।

'মা কোয়লা আনতে হোবে'। উনুনটা রান্নাঘরে রাখতে রাখতে জানিয়ে দেয় মধু।

'এর মধ্যেই কয়লা ফুরিয়ে গেল কেন?' কমলা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

মধু বোঝাবার চেষ্টা করে—'সাত দিন তো হল মা।'

'আট থেকে দশ দিন আমার কয়লা যায়।' কমলা দেবী বঁটিটা নামিয়ে, কয়লার হিসেবের খাতা খোলেন।

ইতিমধ্যে পাড়ার কয়েকটি ছেলে সরস্বতী পূজোর চাঁদা চাইতে এসেছে।

'ও মেসোমশাই—'

ছেলেগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে।

রমেন আর একবার ভাল করে কামাবার জন্যে দু'গালে সবে সাবান লাগিয়েছেন। ছেলেগুলোর মেসোমশাই ডাক শুনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বারান্দা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন, পাড়ার আট দশটি বিভিন্ন বয়সের ছেলে দাঁড়িয়ে।

'সরস্বতী পূজোর চাঁদাটা'—ছেলেগুলো কোরাসে বলে ওঠে।

রমেন সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কমলার কাছে ছুটে চলে যান। যেন রমেন বিশ্বাসের শিবিরে শত্রু হানা দিয়েছে। কমলা তখন খাতা খুলে কয়লার হিসেব মেলাচ্ছিলেন। রমেন কাছে এসে ফিসফিস করে বলেন—'চাঁদা চাইতে এসেছে।'

—'কিসের?' কমলাদেবী খাতার দিকে চোখ রেখেই বলেন।

—'সরস্বতী পূজোর।'

—'দেখি।'

কমলা হিসেবের খাতায় কয়লার হিসেবটা ঠিক করে। শোবার ঘরে এসে, আলমারি খুলে একটা ফাইল বার করেন। ফাইলে বিভিন্ন পূজোর চাঁদার রসিদের কাউণ্টার পার্ট ক্লিপ করা আছে। কমলা ফাইলটা হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন, পেছনে সাবান মুখে রমেন।

—'তোমরা কোথায় পূজো করছ?' কমলা রাগতভাবে জিজ্ঞেস করেন।

ছেলেগুলোর পাণ্ডা কার্তিক বেশ ষণ্ডাগোছের চেহারা, সপ্রতিভ হয়ে বলে, 'কেন জানেন না? বোসপাড়ায় যুগের যাত্রীর পূজো। প্রত্যেকবারই তো চাঁদা দেন।'

কমলাদেবী গম্ভীর ভাবে, গত বছরের রসিদগুলো ওলটাতে ওলটাতে খুঁজে পান যুগের যাত্রীর রসিদ।

—'হ্যাঁ।' কমলাদেবী যেন আপন মনেই বলে ওঠেন, 'দিচ্ছি।'

—'কত?' কার্তিক সহাস্যে জিজ্ঞেস করে।

—'কেন গত বারে যা দিয়েছি—এক টাকা—'



সাবান-মাখা মুখে রমেন বিশ্বাস সত্যিই হতবাক্ হয়ে যায়।

—হা—হা—

সমস্বরে হেসে ওঠে ছেলেগুলো, রমেনবাবু সবিস্ময়ে তাকান। কমলা আড় চোখে চেয়ে বলেন,—'এতে হাসির কি হল?'

কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—'ঐ এক টাকা শুনে। এবারে চার টাকা দিতে হবে।'

অবাক্ করলে! সাবান-মাখা মুখে রমেন বিশ্বাস সত্যিই হতবাক্ হয়ে যায়।

ছেলেগুলির ভেতর ফটিক একটু ফক্কড়। রমেন বিশ্বাসের সাবান মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে রসিকতা করে—

'আপনার মুখের সাবানের জন্যে এক্সপ্রেশনটা ঠিক বুঝতে পারছি না দাদু।'

—'কী বললে?' রমেন অপমানিত বোধ করেন। কিন্তু কমলাদেবী খুব বুদ্ধিমতী, ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াতে দিলেন না। মনের রাগ জোয়ারের জলের মতন বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু ঠোঁট আর দাঁতের লক গেটে তাকে আটকে রেখে, ঘরের ভেতর গিয়ে দু'টাকা এনে কার্তিকের হাতে দিয়ে বলেন, 'এর বেশী আর দিতে পারব না।'

কার্তিক তবু শেষ চেষ্টা করে—'দেখুন মাসীমা, সব জিনিসের দাম চার গুণ। সুতরাং পূজোর খরচও—'

রমেন গুনগুন করে উত্তর দেয়—'আমাদের রোজগার কি চারগুণ বেড়েছে?'

শেষ পর্যন্ত 'যুগের যাত্রী' আড়াই টাকা চাঁদা নিয়ে রসিদ দিয়ে পাশের বাড়ি চলে গেল।

এবারে দেড় টাকা চাঁদা বেশী দেওয়ার জন্যে বিশ্বাস দম্পতি পরাজিত সৈন্যের মতন ঘরের ভেতর ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকেন। মধু সাবান-মাখা রমেনবাবুর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে বলে, 'বাবু, আপনাকে মহাবীরজীর মতন লাগছে—।'

মধুর কথা শুনে চমকে যান কমলা। 'মহাবীরজী' মনে মনে মানে করে নেন, 'বাবুকে হনুমান বলা হচ্ছে, রাস্কেল, যা এখান থেকে।' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে আদেশ করেন, 'তাড়াতাড়ি দাড়িটা কামিয়ে ফেল।'

দ্বিতীয় বার কামানো সবে শেষ হয়েছে, অমনি আবার 'মেসোমশাই' ডাক। ডাক তো নয় যেন বজ্রপাত।

কমলাদেবী আবার রসিদের ফাইল নিয়ে বারান্দায় যান। কিন্তু এখন যারা এসেছে, তারা আগে যুগের যাত্রীর সঙ্গে পূজো করত। এবারে তারা বোস পাড়ার পেছনে অমরের খাটালের সামনে খালি জায়গাটায় 'সবুজ সংঘ' নামে নতুন দল করে নবোদ্যমে সরস্বতী পূজোর আয়োজন করেছে।

—'আমরা গতবারে যাদের যাদের চাঁদা দিয়েছি, তাদেরই দোব।' বারান্দার গ্রিলে ফাইলটা ঠুকতে ঠুকতে জানিয়ে দেন কমলা বিশ্বাস।

—'সে কি বলছেন মাসীমা'? সবুজ সংঘের লিডার লাল্টু চিৎকার করে ওঠে।

—'না দেব না'। রমেন বিশ্বাস আর্তনাদ করে ওঠেন।

—'দেবেন না মানে'? একরোখা ব্যাচা বলে ওঠে। কথা কাটাকাটি থেকে কলহ। সামনের বাড়ির ঘোষবাবু বেরিয়ে আসেন, পাশের বাড়ির রবি চাটুজ্যে অফিসে যাচ্ছিলেন থেমে যান, বস্তির ছেলেগুলো নালির পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। শেষটায় সবুজ সংঘ অবুঝের মতন দুটো টাকা নিয়ে বিশ্বাস পরিবারকে যেন নিঃশেষ করে বীরদর্পে চলে যায়।

রমেন কমলা নীরবে ডাইনিং টেবিলে কোন রকমে দু'মুঠো ভাত গলাধঃকরণ করে শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘরে তালা দেন। রান্নাঘর থেকে মধুর খাবার বার করে সদরে তালা ঝুলিয়ে স্বামিস্ত্রী অফিসে বেরিয়ে পড়েন। রিকশা স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ান। রোজ দু'জনে ট্রাম ডিপো পর্যন্ত আট আনা ভাড়া দিয়ে রিকশায় যান। রমেন রিকশা ডাকতে

যাচ্ছিলেন, কমলা বাধা দেন, 'হেঁটে চল' বলে হাঁটতে আরম্ভ করেন। রমেন পিছু পিছু অনুসরণ করেন, 'হাঁ ঠিক বলেছ, চাঁদার দরুন দেড় টাকা আর দু'টাকা এবার একসট্রা সাড়ে তিন টাকা গচ্চা গেল'।

মর্মাহত রমেনের কথা থামিয়ে কমলা বিশ্বাস বুঝিয়ে দেন—'রিকশা ভাড়া আট আনা করে পার ট্রিপ, সাতটা ট্রিপ হাঁটলেই টাকাটা উঠে আসবে।'

খুব সহজ ভাবেই লোকসানের হিসেবটা মিলিয়ে দেন হিসেবী কমলা বিশ্বাস। কৃপণ রমেন বিশ্বাসও যেন হাঁটতে হাঁটতে অকূলে কূল দেখতে পান।

বিশ্বাস দম্পতি বাড়ির চারদিকে তালা লাগিয়ে মধুকে বন্দী করে চলে গেলে মধু নিজেকে প্রথম প্রথম কয়েদী বলে মনে করত। এই ছোট্ট বাড়িটার বাইরের লোহার গ্রীল দিয়ে ঘেরা বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে, চুপ করে বাইরের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে তার বেহারের গাঁয়ের কথা ভাবত। পূর্ণিয়া জেলার মনিয়ারপুরে গ্রামে তার বাড়ি। তার ঠাকুরদা খুব ভাল লোক ছিল, তাদের বিঘে পনেরো চাষের জমি ছিল, ভয়িস ছিল দুটো, গাই চারটে, বয়েল ছিল এক জোড়া। বাড়িতে অভাব ছিল না। বিশ্বাস মাইজী যখন গুনে গুনে আলু দেয়, পরবল দেয়, কবি দেয়, তখন মধু মনে মনে হাসে। তার মা কত আলু কত পরবল আঁজলা আঁজলা করে অপরকে এমনি খেতে দিয়েছে। গঙ্গায় তাদের চাষের জমি কেটে গেল বলেই সে এখানে কাজ করতে এসেছে। এরা এতো হিসাব করে কেন? শুনেছি বাবু মাইজী দুজনে অনেক টাকা কামায়। মধু সামনের নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে।

'কিরে মধু'—মধুর ভাবনা কেটে যায়। চমকে দেখে, ছেঁড়া হাফ প্যান্ট পরে, খালি গায়ে, নাড়ু দাঁড়িয়ে। মাথায় খোঁচা খোঁচা বহুদিন তেল-না-দেয়া রুক্ষ চুল। নাড়ুর বয়স কত বলা মুশকিল। দশও হতে পারে চোদ্দও হতে 'পারে। সামনের বস্তিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে এক একটা বাড়িতে কাজ করে। তারপর হয় তারা ছাড়িয়ে দেয়, কিংবা নাড়ু নিজেই ছেড়ে পালায়। এ ছাড়া নাড়ুর ছিঁচকে চোর বলে দুর্নাম আছে। 'এই মধু আইসক্রিম খাওয়াবি না।' নাড়ু লোভাতুর দৃষ্টিতে সামনের আইসক্রিমের হলদে গাড়িটা দেখায়। মধু হাসে। গরাদে থেকে হাত বাড়িয়ে আইসক্রিমওলাকে ডাকে, বটুয়া থেকে দশ নয়া পয়সা বার করে বলে, 'একঠো উসকো দেও—একঠো হামকো।'

● বিশ্বাস

নাড়ুর জিভে জল গড়িয়ে আসে। তাড়াতাড়ি গ্রিলের ফাঁক থেকে পয়সাটা নিয়ে আইস্‌ক্রিমওয়ালাকে দিয়ে দুটো আইস্‌ক্রিম নিয়ে, একটা মধুকে দিয়ে, নিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকে।

সন্ধ্যে বেলা কি করে এই আইস্‌ক্রিম খাওয়ার ব্যাপারটা কমলা বিশ্বাস জানতে পারেন। মধুকে ডেকে ধমকান, 'খবরদার, ঐ বস্তির চোর ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশবে না। আর আইস্‌ক্রিম কেনার এতো পয়সা পাও কোত্থেকে।'

মধু ঘাড় চুলকে উত্তর দেয়, 'আপনি যা মাহিনা দেন, তার থেকে পাঁচ টাকা রেখে, বাকীটা মাকে পাঠাই। দাদাবাবু জানেন।'

কমলা বাধা দিয়ে বলেন, 'আর সেই পাঁচ টাকার আইস্‌ক্রিম কিনে, ঐ চোর ছোঁড়াটাকে গেলাচ্ছ।'

সত্যিই বিস্মিত হন কমলাদেবী। 'যাও সামনের ঐ রামবাবুর দোকান থেকে একশো গ্রাম বিস্কুট নিয়ে এসো',—কমলাদেবী একটা টাকা মধুর হাতে দেন। রমেন বিশ্বাস বাথরুমে গেছলেন, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এসে দেখেন মধু বাইরে যাচ্ছে। রমেন কমলাকে জিজ্ঞেস করেন—'ওকে কোথায় পাঠালে?'

—'রামবাবুর দোকানে বিস্কুট আনতে—'

—'আমাকে বললেই পারতে নিয়ে আসতাম। ও ব্যাটা কি আনতে কি আনবে।'

মধু একটু পরে ভাল বিস্কুটই এনেছিল, কিন্তু কমলা এবং রমেন একসঙ্গে আঁতকে উঠলেন—'একশো গ্রাম বিস্কুটের দাম ৯৫ পয়সা! এইতো সেদিনেই আমি ৯০ পয়সায় কিনেছি'। রমেন বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন।'

'হয় তোমায় ঠকিয়েছে, কিংবা তুমি চুরি করেছ।'

কমলা বিশ্বাস ইন্ধন যোগায়। 'চল' রমেন বিশ্বাস মধুর হাত ধরে বিস্কুটের ঠোঙাটা আর এক হাতে নিয়ে সবেগে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু রামবাবুর দোকানে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যান রমেন বিশ্বাস। সত্যিই ৯৫ পয়সা দাম নিয়েছে বিস্কুটের।

মধুর মনটা কিন্তু বিষিয়ে যায়। কিছু বলে না, নীরবে বাড়িতে ফিরে আসে।

যেন কিছু হয়নি এইরকম একটা ভাব নিয়ে বিশ্বাস দম্পতি বিস্কুট দিয়ে চা

খেতে থাকেন। উদম ফুলদানিটার দিকে তাকিয়ে কমলাদেবী বলেন—'ফুলদানিটা বৃথাই কেনা হল, যা ফুলের দাম।'

'হু বলে সায় দিয়ে রমেন বিশ্বাস চায়ের সঙ্গে একটা ট্যাবলেট খান।'

—'আবার ট্যাবলেট খাচ্ছ কেন?' কমলাদেবী জিজ্ঞেস করেন।

রমেন উত্তর দেন—'পেটটা কামড়াচ্ছে।'

—'আম হয়েছে, থানকুনি পাতার ঝোল খাও।'

—'এ বাজারে পাওয়া যায় না।'

—'ও বাজারটায় দেখ।'

দরজার আড়াল থেকে মধু এদের কথাবার্তা শোনে। কমলা হঠাৎ লক্ষ্য করেন,—'কে রে?' চিৎকার করেন।

'হামি'। মধু সামনে এসে দাঁড়ায়।

'ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কি শুনছিস?' কমলা বিরক্ত হয়ে জেরা করেন।

—'কিছু না' মধু মাথা হেঁট করে। 'তবে?' রমেন সন্দেহ করে। মধু মোজায়েক করা মেজেতে বুড়ো আঙুলটা ঘষে। রমেনের দিকে সোজা চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে—'হামি কাম করব না।'

'কাজ করবে না। কেন?' কমলা দেবী অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করেন।

'হামার ভাল লাগছে না।' মধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 'হামি কাল মুলুক চলে যাব, হামার মাহিনা মিটিয়ে দেন।'

'ঠিক আছে।' কমলা বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

রমেন বিশ্বাস জিজ্ঞেস করেন, 'কাল কখন যাবে?'

—'আপনারা যখন অফিস যাবেন।' মধু শান্ত ভাবেই উত্তর দেয়।

ভোর বেলা কমলাদেবী দেখেন, মধু সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ঐ ছিঁচকে চোর নাড়ুর সঙ্গে ফিসফিস করে কি বলছে। রমেনও দাঁত মাজতে মাজতে পাশে এসে দেখেন। দু'জনেই সন্দেহের দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়।

'কি বলাবলি করছে, বল তো?' রমেনও ফিসফিস করে সভয়ে কমলাকে জিজ্ঞেস করেন।

'কি করে বলব।' কমলাদেবী আজকের সন্থ দেওয়া খবরের কাগজটা বারান্দার মেজে থেকে তুলে নেন।

—'জিজ্ঞেস করে দেখব?' রমেন বলে।

—'কি দরকার? একটু পরেই তো চলে যাবে।' কমলা বাধা দেয়।

সকাল নটা।

মধু খেয়েদেয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত। রমেন ও কমলা একটু আগে মধুর এক মাস নদিনের মাইনে তিরিশ টাকা হিসেবে উনচল্লিশ টাকা বুঝিয়ে দিয়েছেন। রমেন ও কমলাদেবীও অফিসে যাবার জন্যে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছিলেন। কমলাদেবীর আগেই খাওয়া হয়ে গেছল। বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসে রমেনকে বলেন— 'বাড়িতে তো একদম খুচরো টাকা নেই, মধুকে মাইনে দিতেই সব শেষ হয়ে গেল। তুমি এখনি একশোটা টাকা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এসো।'

রমেনের তখনও খাওয়া হয়নি, খেতে খেতে বলেন—'দাও।'

কমলাদেবী, শোবার ঘরে ঢুকে একশো টাকার একটা নোট এনে ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা গেলাস চাপা দিয়ে রেখে রান্নাঘরে গেলেন। মধুও পুঁটলি হাতে করে এসে দাঁড়াল। রান্নাঘর থেকে কমলাদেবী আবার তাড়া দেন—'তাড়াতাড়ি নোটটা ভাঙ্গিয়ে আনো, না হলে অফিসেতে দেরি হয়ে যাবে।'

রমেন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বাথরুমে মুখ ধুতে গেলেন।

কমলাদেবী রান্নাঘরে সব গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে এলেন।

রমেন বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে আস্তে আস্তে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে ডাইনিং রুমে এসে, টেবিলে দেখেন একশো টাকার নোটটা নেই। রমেন একটু বিস্মিত হন, জিজ্ঞেস করেন—'একশো টাকার নোটটা কোথায় রাখলে?'

'ঐ তো টেবিলে?' কমলা বিশ্বাস দেখাতে গিয়ে, চমকে যান, থমকে চান, ক্ষণকাল স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়ে থাকেন।

'পড়ে যায় নি তো?' রমেন হাঁটু গেড়ে টেবিলের তলাটা দেখেন। না। কিছু নেই।

'মধু কোথায়?' কমলা খোঁজ করেন।

—'এইতো এখানে দাঁড়িয়ে ছিল।'

রমেন হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের তলাটা তখনও খুঁজছেন।

'মধু—মধু' চিৎকার করেন কমলাদেবী। কিন্তু কোন সাড়া পান না।

—'তুমি ঠিক টাকাটা রেখেছিলে? রমেন আবার প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ', কমলা প্রায় কেঁদে কেঁদে বলেন, 'আমি নিজে গেলাস চাপা দিয়ে রাখলাম।'

—'হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে।' রমেনও স্বীকার করেন। তারপর অসহায় ডুবন্ত মানুষের মতন চিৎকার করে ওঠেন—'মধু মধু।'

মধুর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

'ও টাকা মধু নিয়ে পালিয়েছে!' কমলা আর্তনাদ করেন।

—'দেখ আর কি কি নিয়ে সরল।' রমেন শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

'পুলিসে খবর দাও।' কমলা কথাটা শেষ না করে, আবার ভাড়ার ঘরে যান। রমেন শোবার ঘর বাইরের ঘর দেখে বাইরের গ্রিল-দেওয়া ঘেরা বারান্দাটার চেয়ার গুলোর তলাটা কুঁজো হয়ে দেখেন।

—'ওখানে কি দেখছ?' কমলা রমেনের পেছনে এসে দাঁড়ান।

—'যদি নোটটা হাওয়ায় এসে উড়ে থাকে।'

—'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, বলছি, ওটা মধু নিয়ে পালিয়েছে।'

—'ঠিক কথা, না হলে ও ব্যাটা না বলে গেল কেন?'

—'তুমি একবার ছুটে গিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে দেখ না।'

—'হ্যাঁ, দেখি, না হলে ওদিক দিয়ে থানায় গিয়ে ডাইরি করে আসব।'

—'যাও থানায় ওর দেশের ঠিকানাটা দিয়ে দিও।'

—'আচ্ছা।'

চেয়ারের তলা থেকে রমেন মাথা তুলেই চমকে ওঠেন।

'ঐ যে মধু।'

কমলা মধুকে দেখে চিৎকার করেন—'মধু একশ টাকার একটা নোট খাবার টেবিলে রেখেছিলাম, দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' মধু বাধা দিয়ে বলে, 'হামি রেশন দোকানে ভাঙ্গাতে নিয়ে গেছলাম। এই লিজিয়ো'। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে একশ টাকার ভাঙ্গানি রমেনের হাতে দিয়ে বলে, গিনকে দেখিয়ে! তারপর কমলার হাতে তিনটে টাটকা টকটকে লাল গোলাপ ফুল



'সে আপনাকে দিতে হোবে না।'

আর এক গোছা থানকুনি শাক তুলে ধরে বলে—'এগুলো উ বাজার সে আনতে একটু দেরি হল মাইজী।'

কমলা যন্ত্রের মতন সেগুলো নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, 'এ গুলোর দাম?'

মধু বাধা দিয়ে বলে, 'সে আপনাকে দিতে হোবে না। চললাম মাইজী। চললাম বাবুজী'—ছোট্ট পুঁটলিটা কপালে ঠেকিয়ে মুক্তার মতন সাদা দাঁতে এক ঝলক সরল হাসি ছড়িয়ে চিরকালের মতন চলে গেল মধু।

রমেন বিশ্বাস ডান হাতে দশটা দশ টাকার নোট নিয়ে আর কমলা বিশ্বাস দু হাতে অঞ্জলির মতন থানকুনি পাতার গোছার সঙ্গে তিনটে টাটকা গোলাপ ফুল নিয়ে লোহার গ্রীল দিয়ে ঘেরা বারান্দায় দুটো দাগী চুরি করা আসামীর মতন ঘাড় হেঁট করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

———



(হাসির কবিতা)

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাদুস নুদুস মেয়ে তবু তার চাল কী!
ইংরিজী করলেই হ'ন যিনি "বাল্‌কি"!
বেরুলেই গাড়ি চাই
আমি তাড়াতাড়ি তাই
"নন্দী গেরাম" থেকে ডেকে আনি পাল্‌কি!

* * *

কুমড়ো পটাস্‌ মেয়ে তবু তার চাল কী!
পায়াটা বেজায় ভারী মাথাটাই হালকি!
সর্বদা এক পেট
খাওয়া চাই চকলেট
খেয়েই শোনানো চাই ওরে ব্বাস্‌ ঝাল কী!

* * *

হোঁতকা হুতুম মেয়ে   তব্ তার চাল কী!
পাঁউরুটি-বানরুটি   আহা তার গাল কী!
তবু তাতে "টোল" চাই
আমি এক ছুটে তাই
ঘোলে-দুধে মিশিয়েই   ও-গালে ভেজাল দি!

* * *

ধুম্বো ধুম্‌সি মেয়ে   তবু তার চাল কী!
"হট্ ডগ্" জুড়োলেই   খায় সে কাঁঠালটি!
সাথে "চিলি সস্" চাই
আমি তাড়াতাড়ি যাই
"লঙ্কা কাণ্ড" থেকে   এনে তা সামাল দি!

* * *

বেঢপ বেসুরো মেয়ে   তবু তার চাল কী!
(বেড়েছে চালের দাম   তাই আজকাল কী ?)

● পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

"ম্যাক্সি" ও "মিনি" চাই
যদি বা "মিনি"কে পাই
আসে না মগজে ছাই "ম্যাক্সি" বেড়াল কী?

* * *

বেলুন-অঙ্গী মেয়ে তবু তার চাল কী?
কালো চুলে জাল নয় বাঁধে জঞ্জাল কী?
পরচুলো পরে পরে
কখনো হলদে করে
(মাথার ব্যালেন্স নিয়ে আমিই নাকাল কী?)

* * *

গুজরাটি হাতি মেয়ে
তবু তার চাল কী?
উঠোন বাঁকাই তবু
পায়ে তার তাল কী!
"বল ডান্স" নাচা চাই
"স্টেপিং"টা বাছা চাই
আমি "ডান্স পার্টনার"
আমার কপাল কী!



* * *

থপথপে খুকু মেয়ে
তবু তার চাল কী?
হিন্দীতে বলি যত
"হাম নাজেহাল জী"!
তবু স্রেফ বাংলায়
পুরো ভাঁড় "ভাং" চায়
আমি শ্রীমা ভবানীকে ভাঁড়েতে মেশাল দি!!



একটি আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

সর্বনাশ !

আবার সেই সর্বনাশা রোগ !

রক্তাল্পতা—ক্রমশঃ রক্তের লোহিত কণিকাগুলো মরে যাচ্ছে। লোহিত কণিকা
শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়, আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে
কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে ফুসফুসের ভিতর দিয়ে শরীরের বাইরে বার করে দেয়।

লোহিত কণিকাগুলির অপমৃত্যু ঘটছে। কেন ঘটছে এতকাল কেউ বুঝতে
পারেনি, জানতে পারেনি। এই রোগের কো'ন চিকিৎসাও জানা নেই চিকিৎসক
সমাজের। অসহায় দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় রোগী রোগিণীর
অকালমৃত্যু। কিছুতেই মৃত্যুকে রোধ করা যায় না। দু বছর—বড় জোর তিন বছর
বাঁচে। তার মধ্যে লোহিত কণিকাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়, ফলে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের
সার্থকতা আর থাকে না। অক্সিজেনের অভাবে রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

—এভাবে হেরে যেতে আমি রাজী নই। মিনটু বললেন মারফিকে।

—যেভাবেই হোক এই রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে।

—কি করে বাঁচাবে? মারফি জবাব দিলেন—এই রোগকে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া কেন বলে? চিকিৎসা নেই বলেই বলে। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া—ভয়ংকর ধরনের অ্যানিমিয়া—সর্বনাশা অ্যানিমিয়া—বিপজ্জনক অ্যানিমিয়া। একবার এই ধরনের অ্যানিমিয়া হলে আর রক্ষে নেই।

—জানি—জানি, সব জানি। তবু আমি বাঁচাবার চেষ্টা করব। চিকিৎসাশাস্ত্রের কোথাও না কোথাও এর চিকিৎসার বিধান আছে। কিন্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ডিস্‌গ্রেস্‌ ফর্‌ আস্‌।

জর্জ আর মিনট্‌ উত্তেজিতভাবে তাঁর বন্ধু উইলিয়ম পি মারফির সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁরা দুজনেই হার্ভাড মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসকবিজ্ঞানী।

মাসের পর মাস তাঁরা সমস্ত রকমের জানা বিদ্যায় চিকিৎসা শুরু করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। যথাসময়ে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

একদিন একজন রোগী হাসপাতালে এলেন। মিনট্‌ তাঁর উপসর্গ শুনে রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন ভদ্রলোক পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া রোগে ভুগছেন।

—আমার কি হয়েছে?

ম্লান হেসে মিনট্‌ জবাব দিলেন—তেমন কিছু নয়।

তারপর যথাযথ প্রেসক্রিপশন করে বললেন—এইসব ওষুধ খাবেন অন্ততঃ পক্ষে তিন বছর। তারপর এসে বলবেন, কেমন থাকেন।

মিনট্‌ জানতেন তিন বছর পরে ভদ্রলোক আর এসে তাঁর উপসর্গের কথা বলতে পারবেন না। তার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। ভদ্রলোক সরলভাবে জবাব দিলেন। মিনট্‌ যা বলেছেন ভদ্রলোক সরলচিত্তে তাই বিশ্বাস করেছেন।

ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর মারফি বললেন—এভাবে মিথ্যে কথা বলা তোমার উচিত হয়নি।

—সত্যি কথা বলাটা খুব উচিত হত? অসহিষ্ণুকণ্ঠে মিনট্‌ জবাব দিলেন। —আমি জানি এক বছরের মধ্যে ভদ্রলোক নিশ্চিতভাবে মারা যাবেন।

—তবু, সত্যি কথা বললে ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি উইল করতে পারতেন।

মিনট্ কোন জবাব দিলেন না।

১৯২৬ সাল।

উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ বছর পব। জর্জ মিনট্ এবং উইলিয়াম মারফি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে একই ভাবে কাজ করছেন। না। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। অন্যান্য চিকিৎসকদের মত মিনট্ এবং মারফি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছেন। এলোপাতাড়ি ভাবে ওষুধ খুঁজে চলেছেন এই ভয়ংকর ব্যাধিকে রোধ করার জন্যে।



মিনট্ মুখ তুলে তাকালেন।

—গুড্ মরনিং—

মিনট্ মুখ তুলে তাকালেন। সামনে ভূত দেখার মত ভদ্রলোককে দেখলেন; পাঁচ বছর আগে ভদ্রলোককে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসার জন্যে ওষুধ দিয়েছিলেন।

—কি নাম আপনার?

মিনট্ সঠিক ভাবে জানার জন্যই প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পুরনো একটি কার্ড বার করলেন। কার্ডটি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের। পাঁচ বছর আগে মিনট্ নিজেই কার্ডটি লিখে ভদ্রলোকের হাতে দিয়েছিলেন।

—আসুন আমার সঙ্গে।

মিনট্ ভদ্রলোককে হাসপাতালের ভেতর মারফির কাছে নিয়ে গেলেন। মারফিকে

সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলে বললেন—এঁর ব্লাড পরীক্ষা করে এক্ষুণি দেখ। আমি আসছি।

মিনটু হাসপাতালের ওল্ড রেকর্ডরুমে ঢুকলেন, যেখানে রোগীদের রোগের ইতিবৃত্তের খোঁজ পাওয়া যায়। এইসব রেকর্ড-এর দায়িত্ব হাসপাতালের রেজিস্ট্রারের ওপর থাকে। মিনটু রেজিস্ট্রারকে বললেন, পুরনো রেকর্ড দেখে ভদ্রলোকের রোগের বিষয় খোঁজ দিতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে রেজিস্ট্রার সমস্ত রেকর্ড বার করে মিনটু-এর হাতে দিলেন। মিনটু পুরনো রেকর্ড-এর ওপর দেখলেন তাঁর নিজের হাতেই পরিষ্কার ইংরেজীতে লেখা আছে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া। রক্ত পরীক্ষার ফলও লেখা রয়েছেঃ পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া।

মিনটু পুরনো রেকর্ড হাতে মারফির কাছে ফিরে এলেন। মারফি রক্ত পরীক্ষা করেছেন ভদ্রলোকের। কোন দোষ নেই। কোন অ্যানিমিয়ার চিহ্ন নেই।

—না কোন দোষ নেই। রায় দিলেন মারফি—

—বাট্—পুরনো রিপোর্টগুলো দেখিয়ে মিনটু জিজ্ঞাসা করলেন—এ অসম্ভব কাণ্ড ঘটল কি করে?

মারফি সমস্ত কাগজপত্র নিখুঁতভাবে দেখলেন, তারপর ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ওষুধ খেয়েছেন?

—দুর্ মশায়! আপনাদের চিকিৎসা—চিকিৎসা সব বাজে। আমি মনের আনন্দে খেয়েছি আর ঘুরে বেড়িয়েছি।

—খেয়েছেন? আশ্চর্য হয়ে মিনটু জিজ্ঞাসা করলেন—

—কি খেয়েছেন?

—কি আবার? মাংস, ডিম, রুটি, কারী—লিভার—যা খুশি।

—আপনি দয়া করে মাসে মাসে একবার দেখা করে যাবেন। মিনটু বললেন।

—নিশ্চয়ই আসব। ভদ্রলোক একটু ঝাঁজের সুরে বললেন—আপনারা আমাকে রোগের কথা বলেননি, কিন্তু অন্য হাসপাতাল থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল আমার কি হয়েছে। আমি যে আর বছর খানেক বাঁচবো, তাও সবাই বলে দিয়েছিলেন। আমি কোন চিকিৎসাই আর করিনি। শুধু পেট ভরে খেয়েছি আর ঘুমিয়েছি। পাঁচ বছর পরেও যখন বেঁচে আছি; আমি প্রত্যেকের কাছে গিয়েছি এবং দেখিয়ে এসে বলেছি—এই দেখুন আমি বেঁচে আছি।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

মিনট্ এবং মারফি আবার নতুন করে ভাবতে লাগলেন, পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসার কথা।

ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস করে মিনট্ ও মারফি ঠিক করলেন বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দিয়ে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা করবেন। ওঁরা ঘোষণা করলেন পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার রোগী রোগিণীদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন বিনামূল্যে। একে একে অনেক রোগী রোগিণী এসে জুটলেন, কারণ ইওরোপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী।



·বলেছি—এই দেখুন আমি বেঁচে আছি। [পৃঃ ২১৬

মিনট্-মারফি এক - একজন রোগীকে এক এক ধরনের খাদ্য খাইয়ে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সবিস্ময়ে দেখলেন যে সব রোগী লিভার খান, তাঁদের রোগ ধীরে ধীরে সেরে যাচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেলেন মিনট্-মারফি। লিভার! যকৃৎ। যকৃতের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু পুষ্টিকর পদার্থ আছে, যার প্রভাবে পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়ার মত ভয়ংকর রোগও সেরে যায়। কি সে পদার্থ?

মিনট্-মারফি সেই পদার্থটির আবিষ্কার করতে পারেননি, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যকৃতের মধ্যে এমন পদার্থ আছে, যার কল্যাণে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার নিরাময় হয়।

রিসার্চ—রিসার্চ—রিসার্চ—

ইংলণ্ডের, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা অবিরাম রিসার্চ করে চলেছেন এই পদার্থটিকে খুঁজে বার করার জন্য। দেখা গেল যকৃতের মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স্ জাতীয় অনেক

পুষ্টিকর প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে। কিন্তু এরা লোহিতকণিকার পুষ্টিসাধন করতে পারে না।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল এক রকমের কোবাল্ট কম্পাউণ্ড লিভারের মধ্যে আছে। এই কোবাল্ট্ কম্পাউণ্ড বিনষ্ট করে দিলে আর লিভারের কার্যকারিতা থাকে না। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়াও সারে না। বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্তে এলেন যকৃতের মধ্যে বর্তমান কোবাল্ট কম্পাউণ্ডই হল অ্যান্টি পারনিসিয়াস ফ্যাক্টর। এই কোবাল্ট কম্পাউণ্ডের নাম দিলেন সায়ানোকোবালামিন্ (cyanocobalamin) অথবা ভিটামিন বি ১২।

ভিটামিন বি ১২ লোহিতকণিকার সৃষ্টিতে প্রধান সহায়ক। ধীরে ধীরে ভিটামিন বি ১২ কে লিভার থেকে আলাদা করা হল, কিন্তু কিছুতেই এর সঠিক চরিত্র উপলব্ধি করা সম্ভব হল না। আন্দাজে ভিটামিন বি ১২-এর ওজন ঠিক করা হতে লাগল।

১৯৫৫ সালে মিসেস ডোরথি ক্রোফুট্ হজ্‌কিন অক্সফোর্ডএ ভিটামিন বি ১২-এর ওজন সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। তিনি এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি যন্ত্রের সাহায্যে ভিটামিন বি ১২-এর নিখুঁত মলিকিউলার বর্ণনা দিলেন। এই অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মিসেস ডরোথি ক্রফোর্ড হজকিন্ ১৯৬৪ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন। তিনি মহিলা রসায়নশাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে তৃতীয় মহিলা যিনি এই সম্মানে ভূষিতা হন।

ভিটামিন বি ১২ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। নরম্যান জলিফে, নরম্যান ওয়েজেল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে ভিটামিন বি ১২ শিশুদের পুষ্টি এবং শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানকালের চিকিৎসাশাস্ত্রে ভিটামিন বি ১২ আবিষ্কার এক আশ্চর্য সংযোজন এবং বহু দুরারোগ্য রোগ এই ভিটামিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়। প্রতিদিন ভিটামিন বি ১২ অতি সামান্য পরিমাণেই লাগে। যাঁরা ওষুধ ব্যবহার করতে চান না, প্রতিদিন যকৃৎ খেলে রক্তাল্পতাজনিত রোগ বা পুষ্টিহীনতা জনিত রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়।



ভাওয়ালের গড় জঙ্গলে

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা—রোজ খবরের কাগজে তার বিবরণ পড়ি। এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল যে হাটে ঘাটে মাঠে শুধু সেই আলোচনা। আমার মনেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, সে অন্য কারণে।

ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ না কি ভাল শিকারী ছিলেন। তাঁর একটা বিশেষ ধরনের বন্দুক ছিল—যেটা ব্যবহার করার প্রণালী এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত বন্দুকের অংশগুলি জোড়া লাগানোর কায়দা একমাত্র তিনিই জানতেন। ভাওয়াল সন্ন্যাসী কোর্টে দাঁড়িয়ে টুক্ করে বন্দুকটা জুড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—এই খবরটা যেদিন কাগজে বের হল, সেদিনই মনে হল, একবার ভাওয়ালেই যাওয়া যাক। গিয়ে দেখে আসি ভাওয়ালের রাজবাড়ি আর ধারে কাছে যে সব জঙ্গল আছে, সেখান থেকে কিছু স্থানীয় সংবাদ পাওয়া যায় কিনা!

খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন মৃত্যুঞ্জয় কাহালী—সদ্য নিযুক্ত এক যুবক। বাড়ি পূর্ববঙ্গে, ঢাকা বিক্রমপুরে—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—এখন আর কাহালী বলেন না—কালী

বলেই নিজেকে জাহির করেন। মাথার চুলগুলি ঢেউ খেলানো—মাঝখান দিয়ে টেড়ি কাটা—লম্বা নাকের ওপর রুপোর ফ্রেমে আঁটা চশমা। কথা বলতে গেলেই দাঁতদুটো বেরিয়ে পড়ে—মনে হয় বিদ্রূপ করছেন।

তাকেই জিজ্ঞেস করি—

—কী হে কালী—ভাওয়ালের খবর তো রোজ পড়ে যাও—কখনও গিয়েছ সেখানে?

—গিয়েছি বৈকি। আমরা থাকতাম ঢাকায় কুমিটোলায়। জয়দেবপুরে দিদির বাড়িতে কতবার গিয়েছি।

—কিছু শুনেছো? ভাওয়ালের সন্ন্যাসী সম্বন্ধে?

—লোকে ত' বলে অনেক কথা—বাকল্যাণ্ড বাঁধের কাছে সন্ন্যাসীকে যখন প্রথম দেখা গেল—

তাকে বাধা দিই—

—ও সব থাক—ভাওয়ালের জঙ্গলে গিয়েছো কখনো?

মৃত্যুঞ্জয় হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার দ্বিতীয় কথা শুনে সে যেন সংবিৎ ফিরে পায়।

—ভাওয়ালের রাজকুমার কি কি শিকার করেছেন, জানো কিছু?

—আজ্ঞে না, তবে শুনেছি, বাঘ, শূয়োর, খরগোশ, পাখি, অনেক কিছু না কি শিকার করতেন।

—তবে চল না, একবার ভাওয়াল ঘুরে আসা যাক। যার নাম নিয়ে এত মামলা মোকদ্দমা—এক সন্ন্যাসী এসে কুমার বলে দাবি করছে, একবার ঢাকায় গিয়ে তাঁকে চাক্ষুষ করে আসি—সেই সঙ্গে জায়গাটারও জরিপ হয়ে যাক—

মৃত্যুঞ্জয় কালী মুখখানা কালি করে বল্লে—

—আজ্ঞে, আমার দিদি ত' বেঁচে নেই—

—আহা, বোনাইতো আছে—তাহলেই কাজ চলবে—

মৃত্যুঞ্জয় রাজী হয়ে গেল।

এখানেই বলে রাখি—ঢাকায় গিয়ে, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর দেখা পাইনি তখন—তবে ভাওয়ালের কুমারের উদ্ভট উদ্ভট সব আচরণের গল্প শুনেছি—অত্যন্ত খেয়ালী মানুষ—কথাবার্তায় না কি শ্লীলতার ধার ধারতেন না। বহুদিন পরে, যখন সেই মামলার ফয়সালা হয়ে গিয়েছে, তখন কাশীতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে—কথাও হয়েছে। তিনিই

বলেছিলেন, বারোজন সন্ন্যাসী নিয়ে তনি লালগোলার শিবমন্দিরে তিন রাত্রি কাটিয়েছিলেন—রাজবাড়ি থেকে ঘিউ, আটা, মিঠাই-এর সিধা এসেছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি—আমিও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে চেয়ে নিজের কথাও কিছু কিছু বলেছি—কিন্তু একথা বলা হয়নি যে শুধু তাঁকে দেখতেই আমি একদিন ঢাকা গিয়েছিলাম—আর জয়দেবপুর ও ভাওয়ালের জঙ্গল চষে বেরিয়েছিলাম—ফলে, কিছু মোটামুটি লাভও হয়েছিল। আমার শিকারের ঝুলিতে ঘুমিয়ে পড়ে থাকা সেই ছোট্ট একটি দিনের ছোট্ট একটি ঘটনাই আমার আজকের এই কাহিনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল।

মৃত্যুঞ্জয় কাহালী ভারী মজার লোক—বাধাও দেয় না, আবার উৎসাহও দেখায় না। আমার তখন রোখ চেপে গিয়েছে তাকে দিয়ে তার বোনাইয়ের কাছে চিঠি লেখালাম। জবাব আসতে দেরি হল না। চিঠি পড়ে উৎসাহিতই হলাম। তিনি লিখেছেন—আমরা অনায়াসে যেতে পারি—ঢাকায় ভাওয়াল রাজ কাছারির ভারপ্রাপ্ত নায়েব তিনি—সব ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন।

অতএব, আর দেরি কেন?

এক শুভদিনে রওনা দিলাম। কাহালী আরও একজন লোক সঙ্গে নিতে চাইল—বিদেশ বিভূঁই—। অতএব খাস খানসামা রতনও সঙ্গে যাবে। তোরঙ্গে কাপড় গুছিয়ে নেবার সময় আমার খাকী শর্ট ও জামাও নিতে বললাম। শীতকাল—খাকী রঙের জাম্পারটাও যেন সঙ্গে থাকে। রতন যে কতখানি হিসেব করে কাজ করে, তা টের পেয়েছিলাম, ঢাকায় যেতে স্টীমারেই। একটি হনুমান টুপি এনে আমার হাতে তুলে দিতেই, আমি তো অবাক্। যাই হোক, যত বিশ্রীই দেখাক—শীতের হাত থেকে তো বাঁচা যাবে—আর এ বিদেশে আমাকে চিনবেই বা কে! যেখানে পরিচয়ের বালাই নেই—বেশভূষার পারিপাট্য সেখানে অনাবশ্যক।

ঢাকায় পৌছে গেলাম—এখন আমার ভাগ্য কি পাথর চাপা হয়ে ঢাকা পড়ে যাবে, না, তার কিছু খোলতাই হবে—সেই সমস্যা!

ভাওয়াল রাজ কাছারিতে পৌছতেই কাহালীর বোনাইবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি ভালই করেছিলেন।

ভদ্রলোক খুব অমায়িক—নামটা এখন আর ঠিক মনে নেই—তবে ডাক নামটা ভুলিনি; কারণ, সেই নামেই নায়েববাবু বেশী পরিচিত। সাতুবাবুর ডাকে সাত গাঁয়ের লোক জড়ো হয়।

● শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়



রাইফেলটার গায়ে হাত বুলোতে থাকেন
সাতুবাবু। [পৃঃ ২২৩

প্রথম দর্শনেই প্রেম—সাতুবাবুর সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো বেশ। ভাওয়ালের কুমার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতেই তিনি একবার এদিক, আবার ওদিক, অগ্রপশ্চাৎ দেখে নিয়ে ফিস ফিস করে জানালেন—কাছারি বাড়িতে বসে এ নিয়ে আলোচনা ঠিক নয়। পরে কথা হবে।

আমিও পরের আশাতেই রইলাম।

দুপুরে খেতে বসে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে--

—ভাওয়ালের গড় জঙ্গলে কি আজও শিকার পাওয়া যায়?

—বিলক্ষণ! যায় মানে? অঢেল—প্রচুর—আজকাল তো এদিকে তেমন শিকারের হইচই নেই—ভাওয়াল মামলার সূত্রপাত হতে সবই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

এবার মুখ খুলতে হয়—

—কি কি শিকার পাওয়া যায়?

—বাঘ, শূয়োর, খরগোশ—পাখি, সবই আছে—কিন্তু শিকারের পেছনে ছুটে বেড়ানোর শখ আজকাল আর কোথাও দেখতে পাই না। এই ধরুন না কেন—আমার প্রথম পক্ষ চলে যাবার পর আর বন্দুকে হাত দিইনি।

—হুঁঃ, তা খবর টবর রাখেন কিছু?

—কেন আপনি কি যাবেন শিকারে? আপনি শিকারী?

সাতুবাবুর কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

আমার সঙ্গের ঐ লম্বা বাক্সটা নাড়াচাড়া করলেই বুঝতে পারবেন।

এক লাফে সাতুবাবু বাক্সটায় হাত দিয়ে তার চামড়ার বেল্ট খুলে ফেললেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে রাইফেলটা বের করে তার গায়ে হাত বুলোতে থাকেন—কখনো বা তুলে ধরেন, আবার নামিয়ে রাখেন। তারপর স্মিতহাস্যে প্রশ্ন—

—কবে যাবেন শিকারে—পায়ে হেঁটে না হাতিতে, হাঁকোয়া করে, না বেট বসিয়ে মাচা বেঁধে?

—যাতে সুবিধে হয়—আপনাদেরই রাজত্ব—মোদ্দা কথা—শিকার একটা পাওয়াই চাই—আর সেটা যেন বেশ বলার মত হয়—ভাওয়ালে এসে ভুলে না যাওয়ার মত একটা ভাল শিকার—

—আলবত—আমি বলি কি—একদল হাঁকোয়া নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়াই ভাল, কি বলেন?

—যথা অভিরুচি—আমি কিছুতেই পেছপা নই—তবে পায়ে হেঁটে শিকার করতে গেলে অনেক সময় বিপদ বেশী হয়—তা হোক—তাতেই উত্তেজনা বেশী!

—আমারও তাই মত, কী বল কালী? তুমিও যাবে তো?

—অবশ্য—তবে আমার তো বন্দুক নেই—খালি হাতে জঙ্গলে যাওয়া কি উচিত হবে?

—তার জন্যে ভাবনা কি? আমার মাজ্‌ল্ লোডেড্ গানটাই বরং তুমি নিও। আমি নেব আমার দেড় মানুষ লম্বা বল্লমটা—বাঘের দেখা যদি পাই—অর্থাৎ যদিই সে আমার সামনে দাঁড়ায়—তাহলে—এক ঘায়ে তার এফোঁড় ওফোঁড়—

আমি পাদপূরণ করি

—করে দেব, তাই না? তবে আর কী!

তখনকার মত কথাবার্তা শেষ। খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিয়ে ঠিক করা গেল, পরদিন বেলা তিনটের মধ্যেই ভাওয়ালের গড় জঙ্গলে ঢুকতে হবে—ইতিমধ্যে নায়েবমশাই লোকজনের ব্যবস্থা করবেন হাঁকোয়ার জন্য।

এদিককার জঙ্গল সম্বন্ধে আমার কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। পরদিন যথাসময়ে রওনা হয়ে পায়ে হেঁটেই জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। আমি, সাতুবাবু আর মৃত্যুঞ্জয় আগে পিছে, আমাদের পাশাপাশি স্থানীয় এক মুসলমান—নাম কোরবান আলী, পরনে লুঙ্গি, হাতে টাঙ্গি—মাথায় গামছা বাঁধা—চোখ দুটো যেমন ছোট, তেমনি গর্তে ঢোকানো। তা হলে হবে কী—ওই গর্ত থেকেই টর্চের মত জ্বলছে।

● শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ভাওয়ালের গড় জঙ্গল উঁচুনীচু—মাটির পাহাড় আর বড় বড় শালগাছ—যার স্থানীয় নাম গজারি—। তলদেশে ঝোপঝাড় আর বনশিউলী লতায় ঢাকা জঙ্গল। রেললাইনের আশেপাশেও এই লতানো গাছ দেখা যায়। জঙ্গলের মধ্যেই একটা গড়—গভীর গর্তের মত—খানিকটা জলও তার মধ্যে টলটল করছে।

হাঁকাই আরম্ভ করে দেওয়া উচিত কিনা, তার বিবেচনার ভার ছিল কোরবান আলীর ওপর। সে এদিক ওদিক তাকায় আর হাতের ইসারা করে—আমরাও এখান থেকে ওখানে সুবিধামত একটা জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি।

হাঁকোয়ার দল জঙ্গলটাকে ঘিরে ফেলেছে—হঠাৎ কোরবান আলী হাঁক দিতেই হাকাই আরম্ভ হয়ে গেল। আমরা সামনে একটা মাটির ঢিবি দেখে তার আড়ালে চলে গেলাম।

সাতুবাবু সড়কি হাতে বেশ বীরত্ব দেখিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় হয় তো মৃত্যুকে জয় করার জন্যই গাদা বন্দুকটা হাতে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। কোরবান আলী ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নেবার জন্যে একটা পিঠুলি গাছের মগডালে উঠে নিরীক্ষণ করে দেখে। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুভয় দেখে সাতুবাবু তাকেও সেই পিঠুলি গাছের ওপর উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু খেদার দল যতই কাছিয়ে আসে, তাদের চিৎকার যখন চরমে এবং কোরবান আলী যখন বাঘ—বাঘ—ঐ যে বাঘ বলে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলে—তখন আর সাতুবাবু স্থির থাকতে পারলেন না—'পড়ি কি মরি' করে ছুটলেন সেই গড়ের মধ্যে—একেবারে জলের ধারে। যদি বেগতিক বোঝেন—ডুব সাঁতার দিয়ে ওপারে চলে যাবেন।

সুতরাং আমি একা, নীচে; সামনের পিঠুলি গাছে কোরবান আলী আর মৃত্যুঞ্জয়।

হঠাৎ খেদার আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

তবে কি বাঘ উধাও? অন্য জঙ্গলে চলে গেল?

চুপ করে আকাশ পাতাল ভাবছি—ঢাকায় এসে বরাতটা কি ঢাকা চাপাই থাকল?—এমন সময় আমি যে মাটির ঢিবিটার আড়ালে হেলান দিয়ে আছি তার ঠিক পেছনে, শুকনো পাতার ওপর খসখস আওয়াজ। মাথা উঁচু করে ঢিবির উপর দিয়ে এক নজর তাকাতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম—একটা ঝোপের আড়াল থেকে বিড়ালের মত থাবা মেলে, দেহটা মাটির সঙ্গে প্রায় ঠেকিয়ে গুল্‌দার জানোয়ারটা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে আসছে।

● ভাওয়ালের গড় জঙ্গলে

এক মুহূর্ত দেরি না করে ট্রিগার টিপলাম—জানোয়ারটা বিকট গর্জন করে একটা বিরাট লাফ দিলে। লক্ষ্য আমাকেই—কিন্তু আমিও সুরুৎ করে সেই ঢিবির গায়ে শুয়ে পড়তেই—বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ল—ঠিক আমার সামনে—ছ' সাত হাত দূরে। তাকে আর দ্বিতীয় লাফের সুযোগ দিলাম না—কঠিন হাতে বন্দুক তুলে ধরি।

অত কাছে তো সচরাচর জানোয়ার মেলে না—তাই নিশানা করতে হয়নি—বন্দুক তুলে ধরতেই ও যেন বন্দুকের নলের মুখে বুক বাড়িয়ে দিলে—আর একটি মাত্র গুলির মোক্ষম আঘাতে তার প্রচণ্ড ব্যাঘ্র-বিক্রম স্তব্ধ।



—থাক, থাক, চামড়াটা আর নষ্ট করে লাভ কি!

কোরবান আলী ততক্ষণে তরতর করে নেমে এসেছে, তার হাতের টাঙ্গি তুলে ধরতেই হাতের ইশারা করি—শুনিয়ে দিই—থাক, থাক, চামড়াটা আর নষ্ট করে লাভ কি?

সাতুবাবু ছুটে এলেন। বাঘের ডাক শুনেই যে জলে ঝাঁপ দেননি—তাই যথেষ্ট। মৃত্যুঞ্জয় তার হাতের গাদা বন্দুকটা বোনাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। আমি কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত নই। বাঘটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে—আমার প্রথম গুলীটা কোথায় লেগেছে, না কি আদৌ লাগেনি।

বাঘের থুতনী থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে দেখে দুহাতে মুখটা তুলে ধরি।

—না, গুলিটা বেশ ভাল মতই লেগেছিল—থুতনি ভেঙে চামড়া ঝুলে পড়েছে—তাও রক্তে মাখা।



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তখন খুব ভোর। ভালো করে আলো ফোটেনি। একটু একটু অন্ধকার আর একটু একটু আলো মিশে একটা শরবতের মতন রং তৈরী হয়েছে। শুধু আকাশের পূর্ব দিকটা সামান্য লালচে। একটু পরেই সূর্য উঠবে।

রণজয় বিশ্বাস নামে একজন যুবক সেই সময় নদীর ঘাটে গিয়েছিল। রণজয় প্রত্যেকদিনই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর একা একা নদীতে চলে আসে। তার বাড়ি থেকে নদী প্রায় দু'মাইল দূর। রণজয়ের খুব মাছ ধরার শখ। সে সারাদিন তো মাছ ধরেই, রাত্তিরবেলাও নদীতে একটা ছিপ ফেলে রেখে আসে। ভোরবেলা এক একদিন গিয়ে দেখতে পায়, তার বঁড়শিতে একটা মস্ত বড় মাছ ধরা পড়ে আছে।

সেদিন রণজয় নদীর দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় আকাশে ফট্ করে একটা শব্দ হলো। শব্দটা খুব জোরে নয়, অনেকটা হাউইবাজি ফাটার শব্দের মতন। রণজয় ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার ঠিক মাথার ওপরে আকাশে, অনেক

উঁচুতে কি যেন একটা জিনিস ফেটে গিয়ে খুব আলো আর আগুন বেরুচ্ছে। জিনিসটা এত উঁচুতে যে কোনো বাজি অতদূর উঠতে পারে না। তা ছাড়া এখন তো কোনো পূজো টুজো নেই, কে আর এখন গ্রামের আকাশে বাজি ফাটাবে!

রণজয় জানে, অনেক সময় আকাশে এরোপ্লেনে আগুন ধরে যায়, তারপর সবসুদ্ধু ভেঙে পড়ে। প্রায়ই খবরের কাগজে এরকম খবর থাকে। সেইরকমই একটা কিছু হলো নাকি? রণজয় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

যদিও খুব উঁচুতে, তবু সেই জিনিসটা ঠিক এরোপ্লেন মনে হয় না। একটা বিরাট গোল জিনিস। ফটফট করে শব্দ হচ্ছে আর সেটার এক একটা টুকরো ভেঙে ভেঙে ছিটকে যাচ্ছে। যদি হঠাৎ একটা টুকরো মাথায় এসে পড়ে, সেই ভয়ে রণজয় দৌড়ে গিয়ে একটা তেঁতুল গাছের নীচে দাঁড়ালো। তবু সে ওপরের দিকে না তাকিয়ে পারলো না।

এরপর সে আর একটা আরও আশ্চর্য জিনিস দেখলো। সেই গোল জিনিসটা যখন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তখন দেখা গেল, সেটা থেকে বেরিয়ে কয়েকজন মানুষ হাওয়ায় ভাসছে। এত দূর থেকে তাদের খুবই ছোট ছোট দেখালেও বোঝা যায়, ওগুলো পাখি নয়।

সেই আকাশযানের জ্বলন্ত টুকরোগুলো ছিটকে কোন্‌টা কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই, শুধু একটা টুকরো কামানের গোলার মতন জ্বলতে জ্বলতে এসে পড়লো নদীতে। অনেকখানি জল ছিটকে উঠলো আর জায়গাটা এমন ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে গেল যে দু' এক মিনিটের মধ্যে রণজয় চোখে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর একটু পরিষ্কার হতেই দৌড়ে গেল নদীর ধারে। দেখলো যে, নদীর মাঝখানে এক জায়গায় জলে খুব ভুড়ভুড়ি কাটছে আর একটা লোক যেন ডুবে যাচ্ছে সেখানে। লোকটার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা হাত বেরিয়ে আছে জলের বাইরে, সেই হাতে কি যেন একটা গোল মতন জিনিস ধরা। আগুনে পুড়ে যাবার জন্যই বোধহয় লোকটার হাতের রং মিশমিশে কালো।

রণজয় খুব ভালো সাঁতার জানে। একজন লোক ডুবে যাচ্ছে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিন্তু রণজয় উদ্ধার করতে পারলো না লোকটাকে। সাঁতরে নদীর মাঝখানে যাবার আগেই লোকটা ডুবে গেল। নদীটা খুব বড় নয়, কিন্তু জোয়ারের সময় খুব

জল থাকে। কাল রাত্রেই জোয়ার এসেছে। রণজয় ডুবে ডুবে অনেক খুঁজলো, কিন্তু লোকটির কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবে, রণজয় দেখলো, সেখানে সাদা রঙের একটা বল ভাসছে। এই বলটাই লোকটার হাতে ধরা ছিল। লোকটা ডুবে গেলেও বলটা ডোবেনি। রণজয় সেটা ধরে ফেললো।

বলটা খুব বড় নয়, অনেকটা ক্রিকেট বলের মতন। চকচকে কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি, ভেতরটা ফাঁপা। জিনিসটা খুব সুন্দর, তাই রণজয় সেটা নিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগলো তীরের দিকে। একটা লোক তার চোখের সামনে ডুবে গেল, এজন্য তার মন খারাপ লাগছে। পুলিসকে বোধহয় খবর দেওয়া উচিত—বড় বড় জাল ফেলে যদি দেহটা পাওয়া যায়।

রণজয় আবার আকাশের দিকে তাকালো। সেই কয়েকজন এখনো সেখানে ওড়াওড়ি করছে। মোট পাঁচজন। পিঠে প্যারাস্যুট বাঁধা নেই, অথচ লোকগুলো আকাশে পাখির মতন ভাসছে কি করে—এই ভেবে রণজয় আশ্চর্য হচ্ছিল, এমন সময় বহুদূর থেকে আর একটা গোল মতন জিনিস বিদ্যুৎবেগে সেখানে উড়ে এলো। তার একটা দরজা খুলে যেতেই সেই পাঁচজন লোক ঢুকে গেল তার মধ্যে। সেটা আবার মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে।

রণজয় খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে ভিজে গায়ে বসে রইলো নদীর ঘাটে। কি হয়ে গেল ব্যাপারটা? গোল মতন জিনিসগুলো কি? মানুষ আকাশে ভাসে কি করে? ওরা কোথা থেকে এলো, কোথায় চলে গেল? ওদের মধ্যে একজন আবার জলে ডুবে গেল কেন? সব ব্যাপারটাই কি স্বপ্ন?

কিন্তু স্বপ্ন হতে পারে না। রণজয়ের হাতে রয়েছে সেই বলটা। এরকম বল সে আগে কখনো দেখেনি। জিনিসটা লোহার নয়, অ্যালুমিনিয়ামেরও নয়। জিনিসটা এমনই চকচকে যে সেটার দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যেতে চায়। এরকম জিনিসের বল রণজয় কখনো দেখেনি। জিনিসটা যে খুব দামী সেটা বুঝতে পেরে রণজয় ঠিক করলো, বলটার কথা এখন সে আর কারুকে বলবে না।

রণজয়ের এবার মনে পড়লো তার ছিপটার কথা। সেটা ধরে একটু টান দিতেই বোঝা গেল মাছ আটকেছে। তবে, বেশী বড় মাছ নয়, ছিপটা বেশ হালকা লাগছে। সে এক টান দিতেই মাছটা এসে পাড়ের ওপর পড়লো।

এবার রণজয়ের আরও অবাক্ হওয়ার পালা। একটা বিরাট বড় কাতলা মাছ,

অন্ততঃ চার কেজি হবেই। এত বড় মাছ অথচ এত হালকা লাগলো কি করে? ভাগ্যিস সুতো ছিঁড়ে যায় নি। রণজয় দু'হাত দিয়ে মাছটা তুলে ধরলো। তবু খুব হালকা লাগছে। এত বড় মাছ এত হালকা হয়! যাই হোক, বলটাকে প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে রেখে রণজয় মাছটা নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

রণজয়েব বাবা একজন চাষী। রণজয় কিছুটা লেখাপড়া শিখলেও সে কোনো চাকরির চেষ্টা না করে বাবার চাষবাসের কাজেই সাহায্য করে। তা ছাড়া সে গ্রামের ফুটবল টিমে ফুটবল খেলে। সামনের বছর তার বিয়ে হবার কথা।

রণজয়দের বাড়িটা মাটির তৈরী হলেও দোতলা। একে বলে মাটকোঠা। বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢোকার সময় সে মাথায় একটা ধাক্কা খেল। রণজয় বেশ লম্বা হলেও নিজের বাড়ির দরজায় কোনোদিন আগে ধাক্কা খায় নি।

মাছটা উঠোনে ফেলে সে চেঁচিয়ে বললো, মা দেখো, আজ কত বড় একটা মাছ পেয়েছি!

রণজয়ের মা কাছেই ছিলেন, মাছটা দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন, বাবাঃ, এত বড় মাছ তো অনেকদিন দেখি নি! চার পাঁচ সের হবে বোধহয। তোর কাকার বাড়িতে খানিকটা পাঠিয়ে দেবো, আর তোর মেসোমশাইয়ের বাড়িতে।

রণজয় বললো, কিন্তু এত বড় দেখতে হলে কি হয়! মাছটা কিন্তু হালকা!

মা মাছটা তোলার চেষ্টা করে বললেন, বলিস কি! হালকা কোথায়! এ তো দারুণ ভারী।

রণজয় অবলীলাক্রমে এক হাতে মাছটা ধরে উঁচু করে বললো, এই যে, দেখছো, কি রকম হালকা?

মা অবাক্ হয়ে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মাছটা দেখছেন না, রণজয়ের মুখখানা দেখছেন। তারপর বললেন, তোকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে! একটু বেশী লম্বা দেখাচ্ছে কেন রে?

রণজয় হেসে বললো, আমি কি এক সকালের মধ্যেই লম্বা হয়ে গেলাম নাকি?

মা বললেন, কি জানি বাপু। কি রকম যেন লাগছে। তুই কোথাও পড়ে টড়ে গিয়েছিলি নাকি? কপালে নীল রং হয়ে গেল কি করে?

রণজয় একটু আগে ধাক্কা খেয়েছে মাথার মাঝখানে। তার কপালে নীল রং



—এই যে, দেখছো, কি রকম হালকা? [পৃঃ ২২৯

হবে কি করে! সে অবিশ্বাস করে কপালে হাত দিল। না, কপালে কোনো ব্যথা-ট্যথা নেই তো!

মা বললেন, যা, আয়নায় দেখে আয়! অনেকখানি নীল রং হয়ে গেছে!

রণজয় উঠে গেল দোতলার ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো সত্যিই তার কপালে একটা হালকা নীল রঙের ছাপ পড়েছে। শুধু কপালে নয়, তার মুখে আর গলাতেও যেন হালকা নীল রঙের ভাব। সহজে বোঝা যাবে না, কিন্তু রণজয় আয়নার কাছে মুখ এনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আর মায়েরা তো ছেলেদের শরীরের যে-কোন বদল দেখলেই বুঝতে পারেন।

রণজয় হাত দিয়ে ঘষলো কপালটা। হাতে কোনো রং লাগলো না। তা হলে কপালটা নীল হয়ে গেল কি করে?

আর একটা ব্যাপারেও রণজয় খুব অবাক্ হয়ে গেল। দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেই সে তার মুখ দেখতে পেয়েছে সব সময়, কিন্তু এখন তাকে ঝুঁকে নীচু হয়ে মুখ দেখতে হচ্ছে। আয়নাটা তো ঠিক এক জায়গাতেই আছে। তাহলে সে কি হঠাৎ খানিকটা লম্বা হয়ে গেল? এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার!

রণজয় পকেট থেকে সেই বলটা বার করলো। বলটাকে দেখলেই মনে হয় খুব দামী। জিনিসটা এত চকচকে যেন মনে হয়, ওর গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। তা ছাড়া, মনে হচ্ছে যেন ওটার মধ্যে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে। ভালো করে শোনার

জন্য রণজয় বলটা কানের কাছে নিয়ে এলো। ঘড়ির মতন ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে ঠিকই, তবে খুবই আস্তে। তাহলে এটা বল নয়, কিছু একটা যন্ত্র।

সেটা হাতে নিযে রণজয় ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে চিন্তা করতে লাগলো। ব্যাপারটা তা হলে কি দাঁড়ালো? আকাশ থেকে একটা লোক এই যন্ত্রটা হাতে নিযে খসে পড়লো নদীতে। বাকী লোকগুলো হাওয়ায় উড়ছিল, তারপর একটা গোল জিনিস এসে নিয়ে গেল তাদের। এসব কিছুর মানে কি?

সেদিন বিকেলের মধ্যেই রণজয় প্রায় সাত ইঞ্চি বেশী লম্বা হয়ে গেল, আর তার মুখের রং হয়ে গেল রীতিমত নীল। তার বুক, হাত পায়েও নীল নীল ছোপ। তার বাড়ির সবাই এই ব্যাপার দেখে খুব ভয় পেযে গেছে। নিশ্চয়ই কোনো কঠিন অসুখ হয়েছে রণজয়ের। যদিও অসুখের অন্য কোনো চিহ্ন নেই। তার গায়ের জোর হঠাৎ বেড়ে গেছে অসম্ভব। সে একটা লোহার সিন্দুকও এক হাতে তুলতে পারে। সকালবেলায় অত বড় মাছটা ঐ জন্যই তার কাছে অত হালকা লেগেছিল।

নীল রঙের মুখ নিয়ে লজ্জায় সেদিন রণজয় আর বাড়ি থেকে বেরুলো না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। সে কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্যিই এসব কিছু হয়েছে? কিন্তু বলের মতন যন্ত্রটা যে হাতে রয়েছে, সেটা তো স্বপ্ন নয়! এই বলটার কথা রণজয় কারুকে এখনো বলেননি। একবার তার মনে হলো, এই বলটা নিশ্চয়ই অপয়া, এটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেই নিশ্চয়ই আবার সব কিছু ঠিক হযে যাবে। কিন্তু জিনিসটা এত সুন্দর যে কিছুতেই ফেলতে ইচ্ছে করে না।

রণজয়ের বাবা ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয়নি। ডাক্তার এসে তাকে দেখে গেলেই সবাই জেনে যাবে তার কথা। তার মুখের রং নীল হয়ে গেছে শুনেই সবাই দেখতে আসবে তাকে। সবাই তাকে দেখে যদি হাসে! সে পরে কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে রণজয় সেদিন নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে রইলো। যতবার সে আয়নায় মুখ দেখেছে, ততবার মনে হয়েছে, তার মুখখানা বেশী রকম নীল হয়ে যাচ্ছে। তবে লম্বায় আর বাড়েনি। সেই সাত ইঞ্চিতেই থেমে আছে।

বলটাকে সে রেখেছে তার টেবিলের ড্রয়ারে। রাত্তিরবেলা চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর রণজয় খাটে শুয়েও শুনতে পাচ্ছে সেটার ঝিকঝিক শব্দ। শব্দটা যেন বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়।



রণজয় কয়েকবার বলটা নিয়ে ড্রপ খাওয়ালো

রণজয় আর একবার উঠে ড্রয়ার খুলে বলটাকে দেখলো। এবার আবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। বলটা আপনি আপনি ঘুরছে আর সেটা থেকে ঝলকে ঝলকে আলো বেরুচ্ছে। ঠিক যেন কিসের সিগন্যাল দিচ্ছে। সেটাতে হাত দিতে রণজয়ের ভয়-ভয় করতে লাগলো। এটা কোনো সাংঘাতিক যন্ত্র নয় তো? কিংবা বোমা-টোমা যদি হয়? আজকাল মানুষ কত রকম যন্ত্র বানাচ্ছে। আমেরিকান আর রাশিয়ানরা মহাশূন্যে কত রকম পরীক্ষা যে চালাচ্ছে, তার ঠিক নেই। সেই রকমই একটা কোনো রকেট ভেঙে পড়েনি তো? কিন্তু এই যন্ত্রটা হাতে নিয়ে যে-লোকটা জলে ডুবে যাচ্ছিল, সে তো সাহেব নয়। তার গায়ের রং কালো ছিল।

হঠাৎ রণজয়ের খেয়াল হলো, বোধহয় লোকটা কালো ছিল না, ওর গায়ের রং ছিল নীল। ভোরবেলার পাতলা আলোয় রণজয় ঠিক দেখতে পায়নি। অজানা ভয়ে শিউরে উঠলো রণজয়। আলো জ্বেলে আবার মুখটা দেখলো। সে এখন পুরোপুরি নীল রঙের মানুষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ রাগের চোটে রণজয় বলটা তুলে নিয়ে এক আছাড় মারলো মেঝেতে। কিন্তু সেটা ভাঙলো না। একটু তুবড়েও গেল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেটা মাটিতে লাগলেও শব্দ হলো না একটুও। রণজয় আরও কয়েকবার বলটা নিয়ে ড্রপ

খাওয়ালো। না, এটাতে শব্দ হয় না। এটা সত্যিই একটা অদ্ভুত জিনিস। রণজয় ঠিক করলো, এই যন্ত্রটা নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিককে দেখাতে হবে। তাদের গ্রামেরই একটি ছেলের নাম অভিজিৎ কর। সে বিজ্ঞানে খুব ভালো ছাত্র, এখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করে। রণজয় কালই তার কাছে সব কথা খুলে বলবে।

কি মনে হলো, রণজয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো বলটা হাতে নিয়ে। নেমে এলো নীচে। মাঝ রাত, সবাই এখন ঘুমোচ্ছে। উঠোনে একটা শাবল পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে চলে এলো বাড়ির বাইরে। খানিকটা দূর গিয়ে একটা তাল গাছের নীচে বসে পড়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো। বেশ বড় একটা গর্ত খোঁড়ার পর বলটাকে তার মধ্যে রেখে মাটি চাপা দিল। গর্তটাকে ভালো করে বুজিয়ে নিশ্চিন্ত হলো রণজয়। মাটিতে কান ঠেকিয়ে সে দেখতে চাইলো, শব্দটা আর শোনা যায় কিনা! না, আর কোনো শব্দ নেই।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে বাড়ি ফেরার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে অমনি—।

রণজয় বেশ সাহসী ছেলে। ভূতের ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তার দুটো হাত যখন কেউ চেপে ধরলো, তখন ভয়ে তার মুখ দিয়ে আঁ আঁ শব্দ বেরিয়ে এলো। দু'পাশে তাকিয়ে সে প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না। তারপর দেখলো, দু'তিনজন লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ের রং কুচকুচে কালো কিংবা নীল। তাদের একজন সরু পেনসিলের মতন একটা টর্চ জ্বালালো, তারপর মাটি খুঁড়তে লাগলো। একটুক্ষণের মধ্যেই সে বার করে ফেললো সেই বলটা। বলটা থেকে তখনো সেই রকম আলোর সিগন্যাল বেরুচ্ছে।

আর দু' জন লোক রণজয়কে এমন চেপে ধরে আছে, যেন সে একটা চোর। কিন্তু রণজয় তো কিছু চুরি করেনি। একবার তার ইচ্ছে হলো, চেঁচিয়ে গ্রামের লোকদের ডাকে। তারপর ভাবলো, দেখাই যাক না, কি হয়।

লোকগুলো তার হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। রণজয় বুঝতে পারলো ওরা যাচ্ছে নদীর দিকে। নদীর পাশের ফাঁকা মাঠে একটা বিরাট গোল জিনিস রয়েছে। আগের দিন আকাশে রণজয় এই রকমই একটা গোল জিনিস দেখেছিল। সেই জিনিসটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন বেশ লম্বা মতন নীল রঙের মানুষ।

তারও হাতে একটা পেনসিলের মতন আলো। রণজয়ের আর কোন সন্দেহ রইলো না যে এরা এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

যে তিনজন লোক রণজয়কে ধরে এনেছিল তারা লম্বা লোকটিকে কিচিরমিচির ভাষায় কি যেন বললো। লম্বা লোকটি বেশ খুশী হয়েছে মনে হলো। সে রণজয়ের দিকে ফিরে তার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো। লোকটা কোনো কথা উচ্চারণ করলো না। কিন্তু রণজয়ের মনে হচ্ছে, লোকটা ঠিক কথা বলছে তার সঙ্গে। অর্থাৎ লোকটা মনে মনে কথা বলছে, রণজয় ঠিক বুঝতে পাচ্ছে।

লোকটা বলছে, হে পৃথিবীর মানুষ, নমস্কার। আপনি যে আমাদের যন্ত্রটা সাবধানে রেখেছিলেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

রণজয় অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলো লোকটির দিকে।

লোকটি আবার মনে মনে বললো, হে পৃথিবীর মানুষ, আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।

রণজয় এবার জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কে ?

লোকটি বললো, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনাদের চন্দ্র সূর্য থেকেও অনেক দূরে, সাত নম্বর গ্রহ বলয় থেকে।

লোকটি তারপর সেই গোল জিনিসটার একটা দরজা খুলে বললো, আসুন, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

রণজয় বললো, কেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো কেন ? আপনাদের জিনিস তো ফেরত পেয়ে গেছেন।

লোকটি বললো, আপনি আর এখানে থেকে কি করবেন ? আপনি তো আর পৃথিবীর মানুষ নেই ! আপনি তো এখন আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন !

রণজয় রেগে গিয়ে বললো, তার মানে ?

লোকটি বললো, আপনি রাগ করছেন কেন ? আপনি নিজের চেহারা দেখেছেন ? আপনার চেহারা বদলে গেছে। আপনি আমাদের যন্ত্রটা ছুঁয়েছিলেন, সেটা থেকে অতি নীল রশ্মি আপনার গায়ে লেগেছে। আপনাকে দেখলে পৃথিবীর মানুষ এখন ভয় পাবে। আপনাকে আর এখানে কেউ আপন করে নেবে না ! আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

রণজয় বললো, না, আমি যাবো না। আমার বাবা মাকে কিছু না বলে আমি চলে যাবো আপনাদের সঙ্গে? তা হয় নাকি?

লোকটি বললো, বাবা মা কি? বাবা মা কাকে বলে?

রণজয় বললো, বাবা মা কাদের বলে আপনি জানেন না? আপনি কি রকম মানুষ?

লোকটি হাসতে হাসতে বললো, আমি তো মানুষ নই। আমাদের ওখানে বাবা মা বলে কিছু নেই!

রণজয়ের পাশের একজন লোক এই সময় তাকে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। রণজয় এক ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললো, খবরদার! আমার কাছে গায়ের জোর দেখাতে আসবেন না।

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটি কোমর থেকে একটা পিস্তলের মতন অস্ত্র টেনে বার করলো। লম্বা লোকটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত তুলে নিষেধ করলো তাকে। রণজয়ের চোখে চোখ রেখে বললো, আমাদের সঙ্গে জোর করে লাভ নেই। এই দেখুন।

লোকটি তার হাতের পেনসিলের মতন আলোটা একটা তেঁতুল গাছের দিকে ফিরিয়ে একটা বোতাম টিপলো। সেটা থেকে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে চোখের নিমেষে পুড়িয়ে দিল অত বড় গাছটা। অর্থাৎ ঐ রকমভাবে ওরা রণজয়কেও পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

লোকটি আবার বললো, আপনাকে আমরা মারতে চাই না। আমাদের একজন এই পৃথিবীতে জলে ডুবে মারা গেছে, তাই এখান থেকে আমরা একজনকে নিয়ে যাবো, তাতে দোষের তো কিছু নেই। আপনি আপত্তি করছেন কেন? আপনাকে আমরা যত্ন করেই রাখবো।

রণজয় তবু জোর দিয়ে বললো, আমি যাবো না। আমি কিছুতেই যাবো না। যেখানকার লোকরা বাবা মা কাকে বলে তাই জানে না, সেরকম অদ্ভুত বিচ্ছিরি জায়গায় আমি কিছুতেই যাবো না।

লোকটি বললো, ঠিক আছে, আপনার জন্য আমরা না হয় বাবা মা তৈরি করে দেবো। এমন কিছু শক্ত নয়।

রণজয় বললো, বাবা মা আবার তৈরি করা যায় নাকি? কি বুদ্ধি আপনার!

এবার দু'জন লোক এক সঙ্গে চেপে ধরলো রণজয়কে। রণজয় একটা ঘুঁষি মারলো একজনের মুখে। সে ছিটকে যেতেই সে অন্যজনের পেটে ঢুঁ মারলো মাথা দিয়ে। এখন যেন তার গায়ে অসুরের মতন শক্তি।

কিন্তু যতই জোর থাক চারজন একসঙ্গে আক্রমণ করায় সে আর পারলো না। পড়ে গেল মাটিতে। একজন তার বুকে চেপে বসে নাকের ওপর ঘুঁষি মারতেই সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল তার চোখে।

রণজয় কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। আবার চোখ মেলে দেখলো, লোকগুলো তাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে সেই গোল জিনিসটার দিকে। তারপর ধরাধরি করে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। রণজয়ের আর নিস্তার নেই। তাকে চলে যেতে হবে কোন্ অচেনা অদ্ভুত জায়গায়। এই পৃথিবীকে আর দেখতে পাবে না।

লম্বা লোকটি তখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, রণজয় শেষ শক্তিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। লম্বা লোকটিকে এক ধাক্কা দিয়ে সে লাফিয়ে পড়লো মাটিতে। লম্বা লোকটিও নীচে পড়ে গেছে। কিন্তু সে ওঠবার আগেই রণজয় দৌড়োতে শুরু করলো নদীর দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়েছে, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেই সে একমাত্র বেঁচে যেতে পারে। জলের মধ্যে এদের আগুন-অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না। তা ছাড়া এরা বোধহয় সাঁতার জানে না। এদের একজন জলে ডুবে মরেছে।

লম্বা লোকটি রণজয়কে প্রায় ধরে ফেলেছিল, তার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সে এত ভালো সাঁতার জানে যে এরা জলে নামলেও তাকে ধরতে পারবে না। রণজয় এক ডুব দিয়ে চলে গেল জলের গভীরে। অনেকখানি দূরে গিয়ে সে যখন দম নেবার জন্য আবার মাথা তুললো, দেখতে পেল যে লম্বা লোকটির পাশে অন্য লোকগুলোও এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তারা জলে নামে নি। ওরা বিজ্ঞানের এত বেশী উন্নতি করেছে বটে, তবু জলকে ভয় পায়। হয়তো ওদের গ্রহে এরকম নদীই নেই।

লোকগুলো কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করে তারপর আবার ফিরে গেল গোল জিনিসটার কাছে। একটু বাদেই সেটা উড়তে উড়তে চলে এলো নদীর ওপরে। রণজয়ের ঠিক মাথার কাছে। রণজয় আবার ডুব দিল। শোঁ শোঁ করে ডুব সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে লাগলো স্রোতের সঙ্গে। আবার মাথা তুলতেই গোল জিনিসটা

তেড়ে এলো তার দিকে, সেটা থেকে একটা দড়ির ফাঁস ঝুলছে। যেন মাছের মতন রণজয়কে গেঁথে জল থেকে তুলে নেবে। বুক ভরতি বিশ্বাস নিয়ে রণজয় ডুবে গেল অনেক নীচে।

বহুক্ষণ পর্যন্ত চললো এই রকম। রণজয় হাঁপিয়ে গেছে, দম ফুরিয়ে যাচ্ছে, তবু সে হার মানবে না।

ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এ লড়াই শেষ হলো। গোল জিনিসটা আর অপেক্ষা করলো না, সোজা উঠে গেল ওপরের দিকে। কি অসম্ভব তীব্র গতি। প্রায় চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে রণজয় আস্তে আস্তে চলে এলো তীরের দিকে। ওপরে উঠে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। এত ক্লান্ত যে ধপ করে মাটিতে পড়ে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো।

আকাশ এখন পরিষ্কার। অল্প অল্প আলো ফুটছে, তারারা সব বিদায় নিচ্ছে। ভোরের আকাশ কি সুন্দর দেখায়! অথচ ঐ আকাশে কত রকম রহস্য আছে কে জানে! ঐ আকাশে বেড়াতে যেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু ঐ লোকগুলো তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল এমন একটা জায়গায়, যেখানে নদী নেই। যেখানকার লোক মা বাবা কাকে বলে জানে না। সেখানকার চেয়ে এই পৃথিবী অনেক ভালো।

তারপর রণজয় তাকালো নিজের হাত পায়ের দিকে। তার সারা শরীর এখন নীল। সে এখন আর মানুষের মতন নয়! কেউ আর তাকে আপন করে নেবে না। হয়তো ছেলেরা তাকে দেখে ঢিল ছুড়বে। বাচ্চারা তাকে দেখে ভয় পাবে। রণজয়ের কান্না পেয়ে গেল। একা একা খানিকক্ষণ কাঁদলো সে। তারপর চোখ মুছে ভাবলো, আর যে যাই ভাবুক, আমার মা-বাবাও কি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে? না, তা হতেই পারে না!

———



ঔদরিক বাদশার পরিণাম

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ধুধু মহাকান্তারের বুকে ছাউনি পড়েছে আরবী অভিযাত্রী সেনার। এদের পরিচালক স্বয়ং শাহজাদা জুহাক। তরুণ বয়সেই যিনি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মরুচর উপজাতি-বৃন্দকে ঐক্য এবং মৈত্রীর বাঁধনে গ্রথিত করে এক অভিনব সুদুর্জয় সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছেন পশ্চিম এশিয়াখণ্ডে।

বর্তমান অভিযানের উদ্দেশ্য হল ইরান-জয়। ইরানের বাদশা জামসিদ একদা ছিলেন ধরণীস্তুত পুরুষ। সাতশো বছর পৃথিবী শাসন করে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে তিনি প্রেরণা যুগিয়েছিলেন অপরিমেয়। বর্ম বল্লম তরবারি রণকুঠারের গঠন ও ব্যবহার কৌশলের শিক্ষা তিনিই সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন মানুষকে। সূতী, পশমী, রেশমী এবং চামড়ার পোশাক তৈরি করার বিদ্যাও তাঁর কাছ থেকেই শিখেছিল প্রজারা। সর্বাধিক কৃতিত্ব তাঁর প্রকাশ পেয়েছিল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রবর্তনে এবং নানাবিধ ঔষধ

আবিষ্কারে। নরসমাজে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দেবতুল্য, সারা পৃথিবী তাঁকে দেবতার মত সম্মান দিতেও শুরু করেছিল।

ক্ষতি ছিল না তাতে। উপকৃত মানবজাতি নিজেদের ঋণী মনে করবে তাঁর কাছে, উৎসুক হবে নানাভাবে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে, এ ত স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ থেকে ক্ষতি হল মারাত্মক। জামসিদ হারিয়ে ফেললেন তাঁর চিত্তের স্থৈর্য। উৎকট একটা দম্ভ এসে জুড়ে বসল তাঁর অন্তর। তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে তিনিই ঈশ্বর, অজর অমর সর্বশক্তিমান সর্বশক্তির উৎস তিনিই।

দেশে বিবেকবান পুরুষ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এতে সায় দিতে পারলেন না। জামসিদ মহামানব, তা তাঁরা কায়মনোবাক্যে মানেন। কিন্তু মহামানবও মানব ছাড়া কিছু নয়। মহামানবও ঈশ্বরেরই সৃষ্ট, প্রতি পদে ঈশ্বরকৃপার উপরেই নির্ভরশীল। দীর্ঘজীবী হলেও সে অমর নয়, জরা ব্যাধিরও অতীত নয় সে।

জামসিদ এই বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। নির্মম অত্যাচার চালালেন বিরুদ্ধবাদীদের উপরে। অচিরেই বিদ্রোহ দেখা দিল দেশে। জামসিদের স্বৈরাচার থেকে উদ্ধার করবার জন্য বিদ্রোহীরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন আরব জাতির নবোদিত নেতা জুহাকের কাছে।

ভুল হল তাঁদের এইখানে। হঠকারিতার চূড়ান্ত একেবারে। জুহাক সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁরা, কী করে প্রত্যাশা করলেন যে জামসিদের চেয়ে ধর্মনিষ্ঠ লোক হবেন এই অজ্ঞাতকুলশীল আরব যোদ্ধা ?

যা হোক, ইরানের আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে অধীর জুহাক! তদ্দণ্ডেই তোড়জোড় শুরু করে দিলেন রণযাত্রার। উপজাতীয় রণনায়কেরা আরবের প্রতি কোণ থেকে ছুটে আসতে লাগলেম সসৈন্যে। চিরশত্রু ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযানে তাঁরা অংশ নিতে চান। অচিরে বিরাট বাহিনী সমবেত হল জুহাকের পতাকাতলে।

সেই বাহিনীরই ছাউনি পড়েছে মহাকান্তারের বুকে।

দীর্ঘ পথ, দুর্গম পথ। ইরানের সীমান্তে পৌঁছোতে অন্ততঃ পক্ষকাল লাগবে। এই দীর্ঘ সময়টা প্রায় সবই কাটবে মরুর বুকে। যেখানে খাদ্য ত মেলেই না, পানীয় জল পর্যন্ত অমিল। একশো দেড়শো মাইল দূরে দূরে একটা একটা মরূদ্যান আছে হয়ত, সেখানে একটা কূপ বা একটা ফোয়ারাকে বেষ্টন করে গুটিকতক খেজুর বা বাবলা গাছ হয়ত গজিয়ে উঠেছে দুর্বার প্রাণশক্তি নিয়ে। এইরকম জায়গার নামই হল মরূদ্যান,



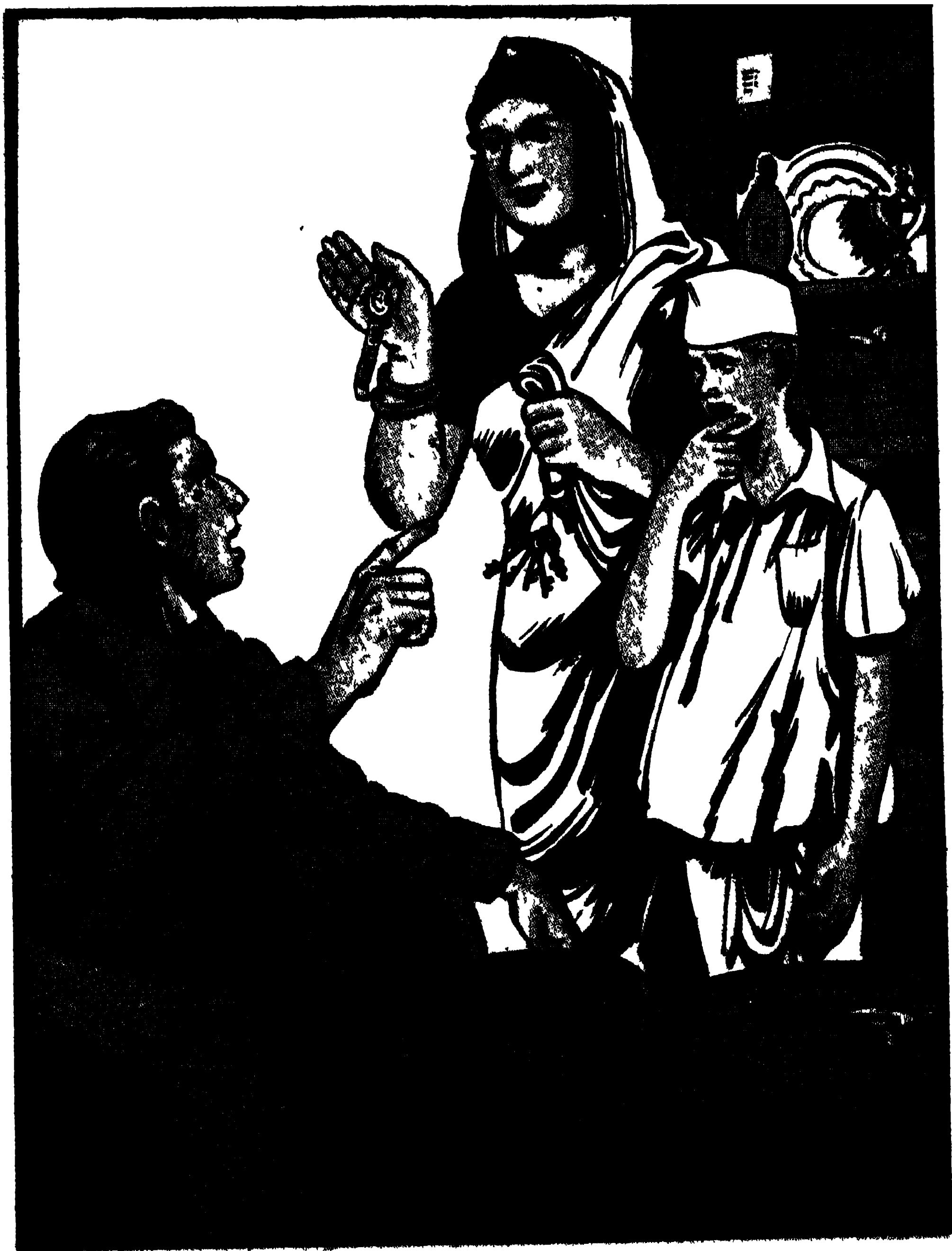
জুহাক হো-হো করে হেসে উঠলেন। [পৃঃ ২৪১

মরুযাত্রীদের উপায় নেই এই তথাকথিত উদ্যানগুলিতে একবার করে দর্শন না দিয়ে।

জুহাকও দিয়েছেন দর্শন। কূপটাকে মাঝখানে রেখে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছাউনি ফেলেছেন, সৈনিকদের কিছুটা বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। উটের পিঠে করে জল কিছু তিনি এনেছিলেন অবশ্য, তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে গত কয়েক-দিনে। এখন এই বিবর্ণ বিস্বাদ জল মরুবক্ষের। এই জলই জীবনীশক্তি বজায় রেখেছে দিগ্বিজয়ী জুহাকের সৈন্যগণের।

যত বিশ্রীই হোক, জল এখানে মিলছে। কিন্তু মিলছে না কোন খাদ্য। সমস্যা খুবই মারাত্মক। সৈন্যরা কৃচ্ছ্র সাধনে অভ্যস্ত। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় প্রত্যেকেই কিছু কিছু শুকনো খেজুর এনেছিল পিঠে করে, তাই এক এক মুঠো চিবিয়ে এক এক ঢোঁক ময়লা জল খাচ্ছে কুয়ো থেকে, তাতেই মোটামুটি তৃপ্তি তাদের। কিন্তু জুহাক? জুহাকের কী হয়? লোকটি তিনি যেমন ঔদরিক, তেমনি স্বার্থপর। কালিয়া কাবাব ভিন্ন অন্য খাদ্য মুখে রোচে না তাঁর। না খেতে পেয়েই তিনি মারা পড়বার যোগাড় হলেন।

কথা হতে পারে যে উপযুক্ত রসদের ব্যবস্থা না করে তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন কী বলে। এর জবাবে বলতে হয় যে জুহাক বীর বটে, কিন্তু দূরদর্শী নন তেমন। যাত্রাপথ যে মরুভূমির ভিতর দিয়ে, সে পথের আশেপাশে যে ক্ষেতখামার নেই বা ছাগল-ভেড়া পালে পালে চরে না, এটা তিনি গোড়ার দিকে খেয়াল করেন নি। পরামর্শদাতা? তা ত ছিল অনেক, আছেও এখন। তা তারাও এমন ভোজনবিলাসী নয় যে শুকনো খেজুরে মন উঠবে না। জুহাকও তাদের কাছে রসদ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেন নি, তারাও নিজে থেকে কোন কথা বলতে যায় নি এ-সম্পর্কে। ফলে এখন জুহাকের জীবন যেতে বসেছে।



"তুমি ওকে ঠিক নিয়মে খেতে দেবে. .এই হচ্ছে কথা।"

এমনি যখন পরিস্থিতি, একদা এক ছিমছাম ছোকরা এসে সেলাম বাজাল তাকে। “জাহাঁপনা, আমি দুনিয়ার সেরা বাবুর্চি, আপনার খিদমত করতে পেলে নসিবকে বাহবা দেব।”

বাবুর্চি? জুহাক হো-হো করে হেসে উঠলেন “কী তুমি পাকাবে এখানে বৎস? শুকনো খেজুর ছাড়া যেখানে অন্য কিছুই মিলছে না? এখন তুমি বিদায় হও। ইরান দখল করে যখন তক্‌তে বসব, তখন যদি আস, চেখে দেখব তোমার রান্না—”

“আমি কিন্তু জাহাঁপনা আপনার নোকরিতে এক্ষুণি বহাল হতে চাই”—নিবেদন করল যুবক—“উপকরণের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। ওস্তাদের আশীর্বাদ আছে আমার উপরে, রাঁধতে বসলে দত্যি-দানোরা মাল-মসলা যুগিয়ে দিয়ে যায়। এইখানে বসে আমি ভেড়ার কাবাব খাওয়াচ্ছি দুইদণ্ডের ভিতর। ভাল না লাগে ত রাখবেন না আমাকে।”

জুহাক ত এ কথা শুনে চমৎকৃত। দত্যি-দানো অবশ্যই আছে দুনিয়ায়, সাধারণ লোকে তাদের কদাচিৎ দেখতে পায়। কিন্তু অসাধারণ যারা, তাদের পক্ষে দত্যি-দানোর সাক্ষাৎ হামেশাই পাওয়া, বা তাদের খাটিয়ে নেওয়া নিজেদের দরকারে, অসম্ভব না-ও হতে পারে বই কি! অন্ততঃ পক্ষে, এ লোকটার কথা সত্যি না মিথ্যে, যাচাই করা ত খুব সহজ! যা বলছে তা করতে পারে যদি, জুহাকের দিন কাটবে পরমানন্দে! আর না যদি পারে তা করতে, তাড়িয়েও দেওয়া যেতে পারে বা গর্দানও নেওয়া যেতে পারে ওর। সেটা নির্ভর করবে, সেই মুহূর্তে মেজাজ কেমন থাকবে জুহাকের, তারই উপরে।

বাবুর্চিকে কাজ শুরু করে দেবার অনুমতি দিয়ে জুহাক অন্য ব্যাপারে মন দিলেন, এদিকে বাবুর্চি গিয়ে একটা তাম্বুতে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিল তার। জুহাকের কাছে ছোকরা অনুমতি নিয়ে নিয়েছে, সে-তাম্বুর ত্রিসীমাতেও কেউ ঘেঁষতে পারবে না।

এক চক্কোর ছাউনিটা ঘুরে এসেই জুহাক অনুভব করলেন—প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে তাঁর। স্বয়ং গিয়ে হাঁকডাক শুরু করলেন বাবুর্চির তাম্বুর কাছে—“ওহে, কত দেরি আর তোমার?”

“দেরি আবার কি, জাহাঁপনা?” বন্ধ দরজা ঈষৎ ফাঁক করে মুখটা বাড়াল বাবুর্চি—“মরজি যদি হয়, এক্ষুণি বসে যেতে পারেন। এই তাম্বুর ভিতরেই আপনার খাওয়ার ফরাস করে রেখেছি আমি।”

এই তাম্বুর ভিতরে? এই উটের চামড়ায় বোঁটকা-গন্ধ-ওয়ালা তাম্বুতে কী রকমের ফরাসটা করল এই উজবুক? জুহাকের নিজের তাম্বুতে বোগদাদী গালিচা পাতা মেজেতে, ছাউনিতে কাশ্মীরী শাল—সেখানে ভোজের আয়োজন করলে হানি কী? তিরস্কার শুরু করার আগে জুহাক ভিতরটার চেহারা একবার দেখে নেবার প্রয়োজন বুঝলেন। আর দেখবার জন্য উঁকি দিতে গিয়েই তিনি স্তম্ভিত হতবাক্ হয়ে গেলেন বিস্ময়ে। তাম্বু? উটের চামড়ার? বোঁটকা গন্ধ? সেসব কিছুই না।

জুহাকের সমুখে ত এক টুকরো বেহেস্ত একেবারে! এক মনোরম ফুলবাগিচায় মর্মরের বেদী, তার উপরে ভোজের ফরাস, বসরাই গোলাপের কল্‌কা তার চার পাশে, আর মরি কি মরি। এক হুরী লাস্যবিলাসে নৃত্য করছে সেই ফরাসের চারদিকে ঘুরে ঘুরে—

"এ কী বাবুর্চি? কী এসব? ভোজবাজি?"—জুহাকের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ থেকে বেরুলো একটা অর্ধস্ফুট উক্তি।

"ভোজবাজিও নয় জাহাঁপনা, অবাক্ হওয়ারও মত কিছু নয়। বলেছিলামই ত যে দত্যি-দানোরা আমার আজ্ঞাবহ, ওস্তাদের কৃপায়। 'হুরী' কথাটাও যোগ করে নিন 'দত্যি-দানোর' সঙ্গে।"

সেই নৃত্যশীলা হুরীই সবিনীত ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে জুহাককে মৌন আবেদন জানাল, ফরাসে গিয়ে আসীন হওয়ার জন্য। নেপথ্যে কোথায় যেন বাজনা বাজছে অপরূপ সুস্বরে, জুহাকের মনে হল সর্বেন্দ্রিয় তাঁর অতিমাত্র সজাগ হয়ে উঠছে এক অভিনব উপভোগের প্রত্যাশায়। তিনি গিয়ে উপবেশন করলেন স্বর্ণখচিত সুখাসনে।

এ কী দেবভোগ্য বস্তু সব থরে থরে সাজানো সমুখে! রাজপুত্র হলেও জুহাক ইতিপূর্বে আর এমন খাদ্য খান নি কোনদিন।

ছাউনি ভেঙে জুহাক আবার যাত্রা শুরু করলেন, সঙ্গে চলল সেই পাচক। ভৃত্য-মহলে তাকে স্থান দেওয়া হয় নি। জুহাকের অন্তরঙ্গ অভিজাত শেখ-সর্দারদের সমাজে সে সাদরে গৃহীত হয়েছে। সবাই তার নেকনজরের উমেদার। শাহজাদাকে যে-খাবার সে রোজ রোজ রেঁধে দেয়, তা থেকে ছিটে ফোঁটা পাওয়ার প্রত্যাশী তারাও।

ইরানে প্রবেশ করল আরবের সেনা। জামসিদ অপরাজেয় যোদ্ধা, তাতে ভুল নেই। কিন্তু ইদানীং তিনি প্রজাদের রাজভক্তি হারিয়ে বসে আছেন। তাঁর অতি-দম্ভই ইরানী জাতিটাকে শত্রু করে তুলেছে তাঁর। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তিনি দেখলেন, তাঁর

সৈন্যেরা সব পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে, আরবীদের বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টাই তারা করছে না। সেনাপতিদের তলব করেও সাড়া পাওয়ার উপায় নেই। তাঁর মনে হল হয়ত আড়ালে আড়ালে হানাদার বাহিনীর সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করছে তারা।

আশঙ্কা তাঁর সত্য বলেই প্রমাণ হল এক সময়। বন্দী হওয়ার ভয়ে নিশাযোগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন জামসিদ। কয়েকটি মাত্র বিশ্বস্ত দেহরক্ষীসহ তিনি দেশত্যাগ করলেন একেবারে। নানা দেশে ঘুরে নানা বিপর্যয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলেন চীন সীমান্তে। জুহাকের সেনা এযাবৎ পায়ে পায়ে অনুসরণ করেছে তাঁর। শেষ যুদ্ধে এইখানে অন্তিম শয়ন রচনা করলেন একদা-বিশ্ববরেণ্য জামসিদ।

পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে করে ক্লেশ পাওয়ার কোন প্রয়োজন বোঝেন নি জুহাক। জামসিদের পলায়নের পরই তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করে সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। আপামর সাধারণ প্রজাবৃন্দ এসে রাজভক্তি নিবেদন করে গিয়েছে তাঁকে, আশা করছে যে জামসিদের নাস্তিক্যবাদের পরিবর্তে এখন নিষ্ঠার সঙ্গে নানা দেবতার পূজার্চনা তারা নির্বিঘ্নে করতে পারবে। নতুন রাজার নামে সমুচ্চ জয়ধ্বনি তুলে তুলে তাদের আর ক্লান্তি নেই।

এদিকে জুহাক ক্রমে ক্রমে স্বমূর্তি প্রকাশ করছেন। সে-মূর্তি হল স্বার্থান্ধ, হিংস্র, ইন্দ্রিয়পরবশ, নিষ্ঠুর এক স্বৈরাচারীর। নব নরপতির শাসনে ইরানবাসীদের শান্তি-সুখ দু'দিনেই বিলুপ্ত হতে চলেছে। নিজের দেশে থাকতে এই লোকই ত এত খারাপ ছিল না! তাঁর আরব দেশাগত সহচরেরা ভেবে পায় না যে এত শীঘ্র তাদের প্রিয় শাহজাদার এমন অধঃপতন হল কেমন করে।

ভেবে পান না জুহাক নিজেও। ভাবনা যে একেবারে আসে না তাঁর মাথায়, তা নয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা ক্ষণিকের জাগরণ আসে তাঁর মূর্ছাহত বিবেকের, তখন চকিতের জন্য তিনি শিউরে ওঠেন নিজের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে। নিজের দেশে থাকতে তাঁর একমাত্র দোষ ছিল অসংযত ভোজনবিলাস। অশেষ গুণ তাঁর চরিত্রে ছিল বলে দেশবাসীরা ক্ষমার চোখে দেখত তাঁর অপরিমিত ঔদরিকতাকে। কিন্তু ইরানে এসে সর্বজনপ্রিয় সেই তরুণ শাহজাদার এ কী শোচনীয় পরিবর্তন ঘটল? ভেবে পায় না জুহাকের অন্তরঙ্গেরা, ভেবে পান না জুহাক নিজেও।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ওরা ভাবতে থাকুক, একজন আছে মনের আনন্দে। সে হল মরুর বুকে হঠাৎ কুড়িয়ে-পাওয়া সেই অজ্ঞাতকুলশীল বাবুর্চি। নিত্য নতুন উপাদেয় খাদ্য সে যুগিয়ে যাচ্ছে জুহাকের রসনাতৃপ্তির জন্য। উপকরণ সব কোথা থেকে আহৃত হয়, তা জিজ্ঞাসাও করেন না জুহাক। গোড়াতেই এক কথা বলে রেখেছে বাবুর্চি। জিন দৈত্য হুরীরা সবাই তার হুকুমবরদার, তারাই সংগ্রহ করে আনে দুর্লভ প্রাণীর মাংস, সুদূর দেশের মসলা। সেই সব দিয়েই অন্যের অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় বাবুর্চি খানা পাকায় ইরান বাদশার।

জিন দৈত্যদের পরিচয় নেবার দরকার নেই জুহাকের। খাবারটা মনোমত হলেই তিনি তৃপ্ত।

তা সেদিক দিয়ে একদিনও কোন অনুযোগের কারণ দেখতে পান নি জুহাক। মনোমত? এ-বাবুর্চির রান্না যেন দিন দিন স্বাদে গন্ধে আরও ভাল, তার চেয়েও ভাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খেতে বসে জুহাক যেন একটা নেশায় আবিষ্ট হয়ে যান। খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও সে-নেশা যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে বহুক্ষণ। এমনি এক নেশাগ্রস্ত মুহূর্তে একদিন জুহাক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"বাবুর্চি দোস্ত, বল, তোমায় কী বকশিশ দেব আমি! কী চাও তুমি? তোমার চেয়ে আপন আমার কেউ নেই। যা তুমি চাইবে, তাই দেব।"

বাবুর্চি ত একেবারে বিগলিত। নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাল—"জাহাঁপনা যদি বকশিশ দিতেই চান, তাহলে আপনার পবিত্র দুই স্কন্ধে দু'টি চুম্বন করতে দিন আমাকে। বাদশাহী দরবারের সেরা সম্মান ত ঐটিই! ওর চেয়ে বড় বকশিশ আর কী হতে পারে, তা এ বান্দা জানে না।"

এ প্রার্থনার মধ্যে অসংগত কিছু দেখতে পেলেন না জুহাক। সত্যই ত, যে কোন রাজভক্ত প্রজার পক্ষে ঐটিই সেরা সম্মান বলে আবহমান কাল বিবেচিত হয়ে আসছে। বাদশার স্কন্ধ-চুম্বন। ও সম্মান যার ভাগ্যে জুটেছে একবার, উচ্চতম পর্যায়ের আভিজাত্যের স্বীকৃতি সে সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে।

জুহাক অসংগত বিবেচনা করেন নি বাবুর্চির প্রার্থনাকে, স্মিতহাস্যে দুই স্কন্ধ থেকে স্বর্ণসূত্রে-গ্রথিত চীনাংশুকের অঙ্গত্রাণ নিজ হস্তে অপসারিত করে দিয়েছেন। বাবুর্চি সসম্ভ্রমে বাদশার পিছন-পানে সরে গিয়ে সেইখান থেকে সেই দুই নগ্ন স্কন্ধে মুদ্রিত করে দিয়েছে দুই নিবিড় চুম্বন।

তারপরই হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—একটা পৈশাচিক অট্টহাস্য। ভোজনাগারের ছাদ বিদীর্ণ হয়ে গেল বজ্রনাদে। সেই ফাটল পথে উধাও হয়ে আকাশে উড়ে গেল জুহাকের পেয়ারের বাবুর্চি, দু'খানা সুবিশাল কালো ডানা বিস্তার করে।

এদিকে বিস্মিত বা ভীত হওয়ার ফুরসুতই পেলেন না জুহাক। দুই স্কন্ধে বিষম যন্ত্রণা। পর পর দুই দিকেই মাথা ঘোরালেন। কী সর্বনাশ! তাঁর দুই স্কন্ধে ফণা তুলে গর্জন করছে দুই কালভুজঙ্গ। মুহুর্মুহু ছোবল মারছে তাঁর কাঁধে, পিঠে, মাথায়। কল্পনাতীত এ বিভীষিকায় হতভাগ্য বাদশা জ্ঞানচৈতন্য হারিয়েই ফেললেন প্রায়। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বসে থেকে তারপর তিনি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ভৃত্যদের নাম করে। ভোজনের সময় বাবুর্চি ছাড়া অন্য কেউ এ-যাবৎ হাজির থাকত না তার কাছে।

শুধু ভৃত্য নয়, মন্ত্রী সেনাপতি সভাসদ্—সবাই এল ছুটে, ব্যাপার দেখে সবাই থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইল পাষাণমূর্তির মত। অবশেষে সিপাহশালার মুবারক এল মুক্ত কৃপাণ হাতে নিয়ে, দংশনের ভয় না করে সাপ দুটোকে কেটে ফেলল একে একে। এতক্ষণে দেখা গেল সাপ দুটো বাইরে থেকে এসে কাঁধে অধিষ্ঠান করেনি, কাঁধের মাংসের ভিতর থেকেই গজিয়ে উঠেছে। মুবারকের অসি কাঁধসমান করে তাদের কেটে ফেলল বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে নতুন দুটো সাপ গজরাতে গজরাতে ফণা তুলল সেই একই জায়গাতে।

যতবার কাটে, ততবারই তারা নতুন করে গজিয়ে ওঠে। সেনাপতি হয়রান্ হয়ে ক্ষান্ত দিলেন। তুকতাক ঝাড়ফুঁক যারা জানে, ডাকা হল তাদের। তারা এসে মাথা নাড়ল। "সে বাবুর্চি হল স্বয়ং শয়তান, নরদেহধারী ইবলিশ, তার দেহের বিষই বিষধর সাপে সঞ্জাত হয়েছে বাদশার স্কন্ধে। এত দিন খানার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষই সে খাইয়েছে প্রতিদিন। এ বিষের প্রতিষেধক বা ওষুধ জানা নেই কারও।

অস্ত্রাঘাতে মরবে না ও সাপ, কোন ওষুধ-বিষুধেও না। তাহলে হতভাগ্য বাদশার উপায় হবে কী? সাপ দুটো অনবরত কামড়াচ্ছে তাঁকে। আশ্চর্য! এত কামড়েও কিন্তু কোন বিষক্রিয়া দেখা দেয় না বাদশার দেহে। যাতনায় অস্থির হয়ে শুধু চিৎকারই করেন তিনি, কিন্তু মৃত্যু হয় না কোনমতেই। দেশে দেশে ঢেটরা পড়ল, যে বাদশাকে উদ্ধার করতে পারবে এ বিপদ থেকে, সে পুরস্কার পাবে একটা রাজ্যখণ্ড।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা



ফাটল পথে উধাও হয়ে গেল জুহাকের পেয়ারের বাবুর্চি। [পৃঃ ২৪৫

অনেকদিন পর্যন্ত কেউ এল না বাদশার সংকটত্রাণের জন্য। অবশেষে এল আবার সেই ইবলিশই। এবার বাবুর্চি বেশে নয়, ফকির বেশে। দেখে শুনে সে বিধান দিল—"এ সাপ মরবার নয়। এদের দংশনের জ্বালা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে এদের মনোমত খাদ্য এদের প্রতিনিয়ত যুগিয়ে যাওয়া। ওরা যে ক্রমাগত কামড়াচ্ছে বাদশাকে, সে শুধু ক্ষিদের জ্বালায়।"

"কী তাহলে ওদের মনোমত খাদ্য?" প্রশ্ন করা হল ফকিরকে।

"একটি মাত্র জিনিস ওরা খাবে। পূর্ণবয়স্ক যুবকদের মাথার ঘিলু। দুটো সাপকে দুটো যুবকের ঘিলু খেতে দিন রোজ, তাহলে ওরা আর কামড়াবে না।"

ফকির বিদায় নিল এই ব্যবস্থা দিয়ে। নিরুপায় জুহাক উজিরকে হুকুম করলেন —"কারাবন্দীদের ভিতর থেকে দুটো যুবককে বধ করে তাদের ঘিলু নিয়ে এসো।"

আজ্ঞা পালিত হল। সাপেরা ঘিলু খেলো, এবং সত্যিই আশ্চর্যের কথা, খাওয়ার পরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল জুহাকের কাঁধের উপরে। একটিবারও দংশন করল না আর। কিন্তু পরদিন, নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত হয়ে আবার তারা কামড়াতে লাগল আগের মত। তখন আর উপায় কী। আবার দুটো কয়েদীকে বধ করে—

এইভাবে কয়েদীর দল খতম হয়ে গেল। তখন শুরু হল সৎ নাগরিকদের ধরে ধরে এনে কোতল করা। ঘিলু ত চাই! বাদশাকে বাঁচানো ত চাই! তার জন্য প্রজারা যদি ঝাড়েবংশে সবাই নিপাত হয়, বাদশা নাচার।

দেশে হাহাকার পড়ে গেল। যুবকেরা দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল। ইরানী বিজ্ঞেরা গোপন সভায় মিলিত হয় মন্ত্রণায় বসলেন—দেশটাকে, জাতিটাকে রক্ষা করার উপায় কী? জামসিদের দম্ভ যে জাতি সহ্য করে নি, তারা কি এই দৈনন্দিন অহেতুক নরহত্যা বরদাস্ত করবে? দেবতার মন্দিরে ধরনা দিলেন পুরোহিতরা—"বলে দাও দেবতা, কিসে নিপাত হবে এই জুহাক। দেশ কীভাবে মুক্তি পাবে এই অভিশাপ থেকে।"

অবশেষে দেবতারা প্রসন্ন হয়ে স্বপ্নাদেশ দিলেন—"কুহোড় পর্বতের এক উপত্যকায় এক যুবক আছে, সমগ্র ইরানে সেই হল নিষ্পাপ দেহমনের একমাত্র অধিকারী। ঈশ্বরের অনুগৃহীত পুরুষ সে। তার শরণ নাও গিয়ে, ইরানকে উদ্ধার করার শক্তি তারই আছে শুধু। নাম তার ফেরিদুন।"

ফেরিদুনের পিতা ছিলেন জামসিদেরই এক সেনাপতি। জুহাক যখন প্রথম হানা দেন ইরানে, তখনই আরবী সেনার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন তিনি। তখন থেকেই তাঁর পুত্রেরা কুহোড় পর্বতের নিভৃত গুহায় আত্মগোপন করে রয়েছেন জুহাকের ভয়ে। পিতৃবিয়োগের সময় ফেরিদুন ছিলেন বালকমাত্র, এখন তিনি যৌবন লাভ করেছেন। রূপে গুণে শস্ত্র ও শাস্ত্রের জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ পুরুষ দুনিয়ায় নেই। পরন্তু দৈবাদেশ থেকে জানা গেল তিনি নিষ্পাপও।

জাতির আহ্বানে সেই ফেরিদুন এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ইরানের। যুদ্ধে জুহাক পরাজিত হলেন। কিন্তু তাঁকে নিধন না করে যাবজ্জীবন শৃঙ্খলিত করে রাখলেন ফেরিদুন, কুহোড পর্বতের এক দুর্গম গুহায়। সেখানে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর কাঁধের দুই সাপ এখনও তাঁকে ক্রমাগত ছোবল মারছে ক্ষুধার জ্বালায়।

[পারস্যের মহাকবি ফির্দৌসিরচিত—"শাহনামা" মহাকাব্যের অন্যতম সুখ্যাত কাহিনী—**"জামসিদ অ্যাণ্ড জুহাক" অবলম্বনে**]



দৃষ্টিহীন

যত গোল বাঁধাল ওই লাঠিটা। এমন যে হয়, ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আর কেউ যদি এ গল্প আমায় বলত, তাহলে আমি হয়ত বিশ্বাসও করতাম না, গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতাম। মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে, তখন কি এ গল্প বিশ্বাস করা সম্ভব। সম্ভব নয়, সেকথা আমিও বুঝি, কিন্তু তবুও এই লাঠির গল্প লজ্জায় মুখ ফুটে আমি কারুকে বলতেও পারিনি।

যাক সে কথা, এখন আসল কথায় আসা যাক।

সেদিন ছিল রবিবার। দুপুরবেলা পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে একটা নীলামের দোকানে গেছলাম গোটাকতক ভাল চেয়ার কেনবার জন্য। চেয়ার না পাওয়া যায়, নিদেন একটা সোফা-সেট কেনবারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দোকানে পৌঁছে

দেখি বিরাট ভিড়। ভিড়ের কারণ অনুসন্ধান করে জানলাম, সেদিন সেখানে একজন দেশীয় রাজার জিনিসপত্র বিক্রি হবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রাজারা সম্পত্তি-কর দিতে দিতে ফোত হয়ে আসছেন, তাই অনেকেই তাঁদের বাড়তি পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছেন। তাতে বাড়তি জিনিসের জঞ্জালও গেল, আর কিছু জায়গাও হালকা হল।

মনটা বেশ খুশী খুশী হয়ে উঠল। কারণ আজ চেয়ার বা সোফা কিনতে পারলে সেটা রাজকীয় হবে। আর আমিও তাতে বসে বসে রাজা হবার স্বপ্ন দেখতে পাব। একবার ঘুরে ঘুরে জিনিসগুলো দেখলাম। সত্যই অদ্ভুত সব জিনিসপত্র। কর্পূর কাঠের আলমারি, চন্দন কাঠের চেয়ার, ভেলভেটের সোফা, হরিণের চামড়া মোড়া চেয়ারের গদি, আরও কত কি। এর মধ্যে যে কোন একটা সোফা-সেট কিংবা খানকতক উচ্চ রুচিসম্পন্ন চেয়ার কিনলেই হবে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, বন্ধুবান্ধবরা এসে আমার বাড়িতে ওই চেয়ার বা সোফা-সেট দেখে কত না প্রশংসা করবে।

সোফা বা চেয়ার নীলামে আসতে তখনও দেরি ছিল, তাই একটা সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অপেক্ষা করতে করতে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রাটা ভাঙ্গল ওই নীলামওলার চিৎকারে। 'এমন লাঠি আর পাবেন না, আইভরি দিয়ে বাঁধানো রাজকীয় লাঠি, মাত্র পনের টাকায় যাচ্ছে। পনের এক......'

আমি বিস্মিত হলাম। আইভরির লাঠি মাত্র পনের টাকায়। তাড়াতাড়ি উঠে নীলামওলার কাছে গেলাম। দেখি, একটা অপূর্ব সুন্দর লাঠি। ও ধরনের লাঠি আমার চোখে কখনও পড়েনি। পুরোটা আইভরি দিয়ে বাঁধানো, সাদা চকচক করছে। কোন রাজা-মহারাজার হাতের শোভাবর্ধন করত একসময়, তা দেখেই বোঝা যায়। অত সুন্দর এবং দামী লাঠি ইতিপূর্বে দেখা তো দূরে থাক, শিল্পী যে তৈরি করতে পারে, তাই ছিল আমার ধারণার বাইরে।

তাই চট্ করে বলে ফেললাম, ষোল। শেষ পর্যন্ত দর উঠল, আমারও যেন কেমন জিদ চেপে গেল। পঁচিশ টাকায় আমি সেটাকে কিনে ফেললাম।

তারপর ভাল গোটাকতক চেয়ার আর একটা সোফা-সেট কিনে ফিরে এলাম বাড়িতে। নীলামওয়ালাকে দাম দিয়ে বলে এলাম, কুলী দিয়ে যেন জিনিসগুলো আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পরের দিনই সব জিনিস চলে এল। গৃহিণী তো জিনিসগুলো দেখে ভারী খুশী। লাঠিটা দেখে সে প্রশংসা করল। আমার কিন্তু অন্য জিনিসের চেয়েও লাঠিটির ওপর একটা আকর্ষণ এল। লাঠিটা হাতে নিয়ে বারবার দেখতে লাগলাম। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত লাঠি বটে। যেমনি দেখতে, তেমনি শক্ত।

লাঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, আমার স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ার আর সোফা-সেটটা সাজাচ্ছেন, ঠিক এমনি সময় আমার কি মনে হল আজ আর বলতে পারি না, তবে লাঠিটা তুলে হঠাৎ আমার স্ত্রীর পিঠে জোরে আঘাত করলাম। তিনি চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়লেন। আমার সংবিৎ ফিরে এল, তাড়াতাড়ি হাত থেকে লাঠিটা ফেলে দিয়ে ছুটে গেলাম তাঁর কাছে।

প্রশ্ন করি, লেগেছে?

তিনি বলেন, মারলে আর লাগবে না। হঠাৎ মারতে গেলে কেন?

কি জবাব দেব, কেন যে মেরেছি, তা তো আমি নিজেই বুঝতে পারিনি। তবুও হেসে বললাম, আইভরি দিয়ে বাঁধান লাঠি, তাই দেখছিলাম কি রকম শব্দ হয়।

তিনি ব্যঙ্গ করে বললেন, নিজের মাথায় মেরে দেখলে না কেন?

যাক সে ব্যাপারটা তো সেইখানেই মিটল। অফিস যাবার সময় হয়ে যাচ্ছিল, তাই তিনিও তাড়াতাড়ি করলেন আর আমিও কথা বাড়াইনি। হ্যাঁ, ওই অদ্ভুত লাঠিটা হাতে নিয়েই সেদিন অফিসে গেছলাম।

একটা নামকরা অফিসে উঁচু পদে কাজ করি আমি। একাই একটা ঘরে বসি, মাঝে মাঝে সহকর্মীরা আসেন দেখা করতে। সেদিন প্রথমে যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম হল বিভূতিবাবু। তিনি আমার হাতে ওইরকম লাঠি দেখে তো বিস্মিত। ফাইলটা সামনের টেবিলে রেখে তিনি লাঠিটা কেমন দেখবার জন্য হাত বাড়ালেন। যেই হাত বাড়ানো, আমারও যেন কেমন রাগ হল। শুধু কি রাগ, সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিবাবুকে সেই লাঠির বাড়ি এক ঘা বসিয়ে দিলাম।



স্ত্রী চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়লেন। [পৃঃ ২৫০

আবার আমার সংবিৎ ফিরে এল বিভূতিবাবুর চিৎকারে—'ওরে বাবা, গেছি—গেছি।'

অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম আমি, কেন মারলাম! হেসে বললাম, বড্ড লেগেছে বিভূতিবাবু? এটা আপনি দেখতে চাইছিলেন না, তাই আপনাকে দেখালাম কতটা শক্ত।

পদমর্যাদায় আমি বিভূতিবাবুর চেয়ে বড়, তাই হাতের ব্যথা না যেতেই তিনি বললেন, বাবা দারুণ শক্ত তো লাঠি।

ব্যাপারটা কিছুটা হালকা হয়েছে বুঝতে পেরে লাঠিটা আমি একবার বিভূতিবাবুকে দিলাম। দিয়ে বললাম, দেখবেন আপনি, দেখুন না।

বিভূতিবাবু নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, বাঃ, সুন্দর লাঠি তো। কোন রাজা-মহারাজার হবে আর কি। কোথায় পেলেন স্যার?

আমি বললাম, কাল নীলামে কিনেছি।

উনি বললেন, হ্যাঁ, নীলাম ছাড়া এ জিনিস পাওয়া যাবে না তো। এসব কিউরিওতে রাখার জিনিস। বলে লাঠিটা হাতে নিয়ে আমায় জিগ্যেস করলেন, আমি একবার লাঠিটা বাইরে দেখিয়ে আনব স্যার?

লাঠির গুণাগুণ বোঝবার জন্য সেদিন বিভূতিবাবুর হাতে লাঠিটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর দেওয়ার ফলে কি ঘটনা ঘটেছিল, তাই বলছি।

বিভূতিবাবু তো লাঠির প্রশংসা করতে করতে লাঠিটা হাতে নিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর বারান্দায় গিয়ে পৌঁছতেই আমার ঘরের সামনে যে পিয়নটা বসে আছে পেছন ফিরে, তাকে সজোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিলেন। আমি কাচের দরজা দিয়ে পরিষ্কার তা দেখলাম।

সঙ্গে সঙ্গে পিয়ন বলে ওঠে, এ বিভূতিবাবু, কাহে হামকো লাঠি মারা?

বিভূতিবাবু আমতা আমতা করে বলেন, হামি ইচ্ছা করে নেহি মারা হ্যায়, লাগ্ গিয়া। বুঝলাম, বিভূতিবাবুও আমার মতনই ফেরে পড়েছেন। আর একটু দেখা দরকার। তাই ওঁকে আর ডাকলাম না। তবে বিভাগীয় ঘরে গেলে উনি কি করেন, লাঠিটাই বা ওঁর হাতে কেমন কাজ করে, একটু বোঝা দরকার। খানিকক্ষণ বাদে বিভূতিবাবু ও সুরেনবাবু দুজনেই ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলেন আমার ঘরে। তাঁরা বলেন, কি ভুতুড়ে লাঠি কিনেছেন স্যার?

আমি বললাম, কেন, কি হল?

বিভূতিবাবু বলেন, ঘর থেকে বেরিয়েই তো আপনার পিয়নকে এক ঘা বসালাম। কেন যে বসালাম তার কারণ আমি নিজেই বলতে পারি না। বিভাগে গেলাম, সুরেনবাবু বললেন, 'কোথা থেকে লাঠিটা পেলেন।' যেই বলা, রাগেতে আমার গা যেন জ্বলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে সুরেনবাবুকে এক ঘা বসিয়ে দিলাম।

'কেন মেরেছি' একথা সুরেনবাবু জিগ্যেস করাতে ওঁকে বললাম সব। উনি বিশ্বাস করলেন না। লাঠিটা হাতে নিলেন। নিয়ে বিভাগে বেড়াতে বেড়াতে সকলকে দেখাচ্ছিলেন, হঠাৎ অমিতেশের পিঠে উনি দুম করে এক ঘা বসিয়ে দিলেন।

অমিতেশ সুরেনবাবুকে জিগ্যেস করে, আমাকে শুধু শুধু মারলেন কেন। সুরেনবাবু কিছু জবাব দিতে পারেন না, এমনকি লজ্জার একশেষ। ওদিকে অমিতেশও তখন হাত গুটিয়ে ওঁর দিকে এগিয়ে এসে দু'এক ঘা বসিয়েও দিয়েছে। তাই আপনার কাছে এসে বলছি, এই লাঠিটাকে একটু সাবধানে রাখবেন।

এ কাহিনী শোনার পরও আমার যেন কেমন বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে অস্বীকার করতে পারি না, কারণ দুবার এর প্রত্যক্ষ ফলও আমি দেখেছি।

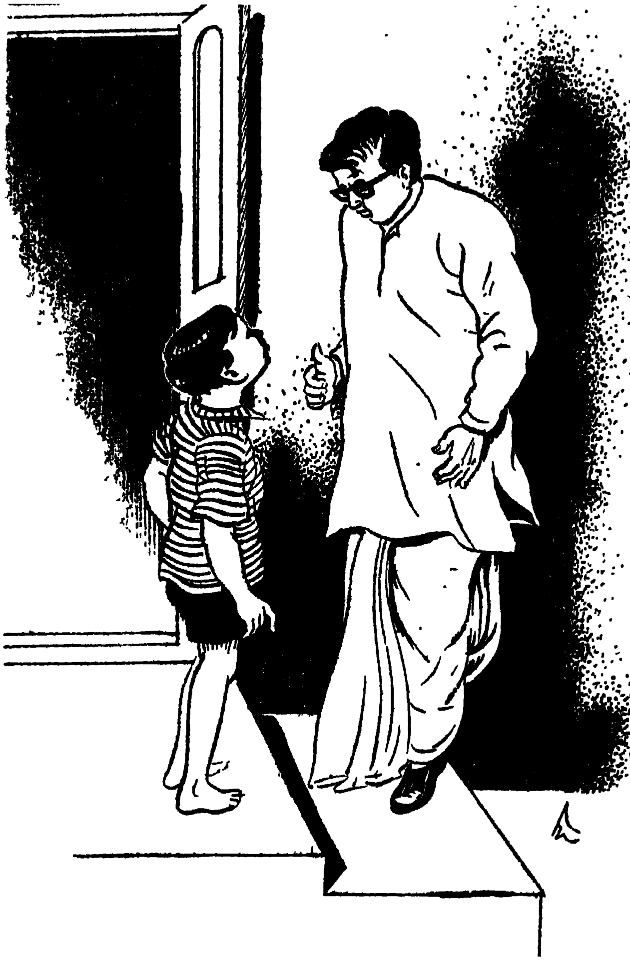
বিকেলবেলা লাঠিটা তাই হাতে নিলাম না। ফোলিও ব্যাগের মধ্যে পুরে ওটাকে বাড়ি নিয়ে গেলাম। হাতে নিতে আর আমার নিজেরও সাহস হচ্ছিল না। ফোলিও ব্যাগের ভেতর পুরলাম কি করে, দুটো দিকই বেরিয়ে রইল। অফিসের গাড়িতে বসলাম, মনে মনে ভাবছি সারাদিনের ঘটনা।

হঠাৎ মনে হল, সকালবেলা ভাগ্যিস্ লাঠিটা তুলে ড্রাইভারকে এক ঘা কষিয়ে দিইনি। যেই এই কথা মনে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে কি যেন পরিবর্তন হল। আর ফোলিও ব্যাগ থেকে লাঠিটা বার করে ড্রাইভারকে মারতে ইচ্ছে হল। কিন্তু আমি কিছুতেই ব্যাগ থেকে লাঠিটা টেনে বের করলাম না। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ সেই ব্যাগটা ছুড়েই মেরে দিলাম ড্রাইভারকে।

ড্রাইভারের লাগা উচিত নয়, কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ফোলিও ব্যাগের যে দিকটায় লাঠির বেশীটা বেরিয়ে আছে, সেই দিকটা গিয়ে ওর মাথায় ঠক করে লাগলো। 'গেছি' 'গেছি' করে সেও চেঁচিয়ে উঠল।

আমি নিজের লজ্জা বাঁচাতে তাকে বললাম, কি ভাই লেগেছে? ব্যাগটা রাখতে গিয়ে হাত ফসকে কি রকম বেরিয়ে গেল।

যাক সে যাত্রায় কোন রকমে লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেলাম। বাড়ি পৌঁছালাম। তারপর লাঠিটা তখনই আলমারিতে যত্ন করে তুলে রাখলাম।



বড় ছেলে পিণ্টু সজল চোখে এসে অভিযোগ করল

লাঠিটাকে আর ব্যবহার করতাম না। মাসখানেক বাদে হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখি তুলকালাম কাণ্ড চলছে। আমার বড় ছেলে পিণ্টু সজল চোখে এসে আমাকে অভিযোগ করল, তার মা নাকি তাকে লাঠি দিয়ে মেরেছেন। মারবার কারণ, সে বলে সে কোন অপরাধ করেনি। তার মা লাঠি পরিষ্কার করছিল, সে সেখানে গিয়ে শুধু বলেছিল, 'মা কি করছো।' সঙ্গে সঙ্গে তার মা হাতে লাঠি তুলে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছেন।

বুঝলাম, গৃহিণী তো এ ধরনের চরিত্রের লোক নন। নিশ্চয়ই তিনি সেই ভুতুড়ে লাঠিটাকে পরিষ্কার করছিলেন, আর পিণ্টু গিয়ে ওই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঘা বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে ইচ্ছে করে তাকে মারেননি, সেকথা আমি বুঝলেও পিণ্টু তো বুঝবে না। তাই ব্যাপারটাকে হালকা করবার চেষ্টা করলাম। আর এ ব্যাপার নিয়ে কারুকে কোন প্রশ্নও করিনি।

আরও মাসখানেক বাদ। হঠাৎ দেশ থেকে একটা জরুরী ডাক এল। আমার দেশ হাওড়া জেলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে। পিসীমা সেখানে থাকেন,

হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমাকে ছেলের মত মানুষ করেছিলেন। মৃত্যুর সময় বলে গেছেন, আমি যেন তাঁর মুখাগ্নি করি।

খবর পেয়েই আমি ছুটলাম সেই অজ পাড়াগাঁয়ে। যাবার সময় আমার স্ত্রী সেই লাঠিটা বের করে হাতে দিলেন। বলেন, রাত্রি হবে পৌঁছাতে। শিয়াল, কুকুর রাস্তায় আছে, লাঠিটা হাতে থাকা ভাল। তার ওপর যেতে হবে শ্মশানে।

তাঁকে কোন কথা আর না বলে লাঠিটা হাতে নিলাম। কিন্তু ভাবছি বাড়ির বাইরে বা ট্রেনে কি আবার বিপদ ঘটিয়ে ফেলি। নাঃ, তেমন কোন বিপদ ঘটল না।

সন্ধ্যের পর আমি গ্রামে গিয়ে পোঁছালাম। আলের পথ ধরে এগোতে লাগলাম। ঠিক এমনি সময় দূরে একদল শবযাত্রীকে দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে বুঝলাম, আমার পিসীমাকে নিয়ে গ্রামের লোকেরা শ্মশানে যাচ্ছে।

আমিও তাদের সঙ্গে যেতে লাগলাম। এই যেতে যেতে হঠাৎ একটা শিয়াল আমার পাশ দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল—লাঠিটা হাতে রাখ, রাস্তায় শিয়াল কুকুর আছে।

মনে পড়তেই আমি লাঠিটা জোর করে ধরলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে কি একটা পরিবর্তন হল। লাঠিটা আমি উঁচু করে ধরলাম, সঙ্গে সঙ্গে শবযাত্রীদের মধ্যে যে আমার সামনেই ছিল, তার মাথায় আঘাত করলাম। লোকটার ভাগ্যি ভাল, সে একটু এগিয়ে গিয়েছিল, তাই তার মাথার মাঝখানে লাগেনি। লাগলো গিয়ে তার ঘাড়ের কাছে। কেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। 'গেলুম' 'গেলুম' করে সে বসে পড়ল।

আমি লজ্জায় পড়ে তাকে ধরলাম। কিন্তু সে বাধ মানবার নয়, তাই আমায় থানায় ধরে নিয়ে গেল।

থানার ও. সি. ছিলেন আমারই বন্ধু। তাই সে যাত্রায় কোনরকম ভাবে বেঁচে ফিরে এলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, লাঠিতে আর কখনও হাত দেব না।

কোনরকম ভাবে সেটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তারপর ভাবলাম, নীলামের জিনিস, ওটাকে ফের নীলামে দেব। কিন্তু দিতে মায়া হয়, বাড়িতে রাখতেও আর সাহস হয় না। একদিন ওই লাঠিটার ভেতর কি আছে দেখবার জন্য ওর

আইভরির পাতটাকে খুলে ফেললাম। দেখলাম কাঠের ওপর জড়ান একটা কাগজ রয়েছে। বহু পুরান কাগজ, তাতে কি যেন লেখা রয়েছে। অনেক কষ্টে পড়লাম।

তাতে লেখা আছে, এই লাঠিটা কেউ যেন না ব্যবহার করে। কারণ এটা একটা ভৌতিক লাঠি। তৈরি করার পর থেকে বহু লোককে আমি অকারণে এই লাঠি দিয়ে আঘাত করেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারাও গেছে। ভগবান সাক্ষী, আমি তাদের মারতে চাইনি, শাস্তিও দিতে চাইনি, অথচ কেন যে মারলাম তা আমি নিজেও বুঝি না। বোধহয় ওই অভিশপ্ত হাতিটা, যার দাঁত দিয়ে এই লাঠিটা বাঁধান হয়েছে, তার আত্মা এতে ভর করে আছে। হাতিটা আমারই রাজ্যে গ্রামেতে ঢুকে লোকেদের পায়ে পিষে ফেলতো। তাই আমি বন্দুক নিয়ে গেছলাম তাকে মারতে। মারবার ইচ্ছে খুব একটা আমার ছিল না, তাই হাতিটাকে ধরে পোষ মানাতে ইচ্ছে হল। ধরবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার নাগাল পেলাম না।

একদিন হঠাৎ মধ্যরাত্রে একটা চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল, কোন এক মেয়েছেলে কাঁদছে, বোধহয় তার স্বামী বা ছেলেকে মেরে হাতিটা পালাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বন্দুক হাতে করে গেলাম রাস্তায়। হ্যাঁ, ঠিক একটি মেয়ে হাতিটার পেছনে ছুটছে আর গালাগালি দিচ্ছে।

হাতিটা আমাকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে ছুটে এল। তার লক্ষ্য ছিল আমাকে পিষে মারা, কিন্তু তার আগেই আমি তার কপাল লক্ষ্য করে গুলি করলাম। হাতিটা পড়ে গেল, আমি আবার গুলি করলাম। সে এবার আর্তনাদ করে উঠল। সেই আর্তনাদটা কি যে মর্মস্পর্শী, তা যে না শুনেছে তাকে বোঝান যায় না। আমারও সেই প্রথম মনে হল, আমি ভুল করলাম।

হাতিটার স্মৃতি রাখব বলেই ওর দাঁতটা নিয়ে এই লাঠিটা বাঁধিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝলাম, হাতির অভিশপ্ত আত্মা আজও মানুষের রক্ত চায়। ইতি—

রাজনারায়ণ

কে এই রাজনারায়ণ? তবে মনে হয় ইনি বোধহয় উত্তর বাংলার কোন জমিদার বা রাজা। তিনিও বুঝেছিলেন, হাতির অভিশপ্ত আত্মা তার দাঁতকে পরিত্যাগ করেনি।

রাজকুমারের অসি

ময়ূখ চৌধুরী

বহুবৎসর আগেকার কথা। মহাবীর আলেকজান্দারের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের বুকে হানা দিয়েছে দুরন্ত গ্রীক-বাহিনী। কয়েকজন হিন্দু নরপতি মাথা নত করে গ্রীসের আধিপত্য স্বীকার করলেন, আবার কেউ বা মুক্ত তরবারি হস্তে গ্রীসের বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধ-ঘোষণা। দুই একজন রাজা আবার প্রতিবেশী রাজ্যের সর্বনাশ করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন আলেকজান্দারের সঙ্গে! ...

চারদিকে যখন চলছে যুদ্ধ ও চক্রান্ত, সেই সময়ে আর্যাবর্তের এক অরণ্যপথ ধরে এগিয়ে চলেছে একটি কিশোর ...




পালিয়ে গেল!
হঠাৎ কিশোরের পায়ের তলায় একটা গাছের ডাল সশব্দে ভেঙে গেল! হরিণটা মুখ তুলে মানুষ দেখে চমকে উঠল, তারপর বিদ্যুৎবেগে ছুটল গভীর বনের দিকে...


আরে গর্দভ!


আরে গর্দভ! হরিণটাকে তাড়িয়ে দিলি! আমি লক্ষ্যস্থির করে তীর ছুঁড়তে যাব আর —


আর তুই এসে শিকার তাড়িয়ে দিলি! দাঁড়া, তোকে উচিত শিক্ষা দেব।


কেমন লাগছে?
ওঃ!


চাবুক তো নেই – এই ধনুকের ছিলা খুলে নিয়ে তোকে চাবুক-পেটা করব... কেমন লাগছে ?
উঃ!

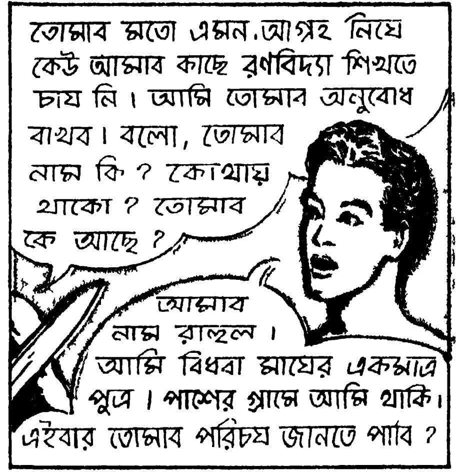

দাঁড়াও!

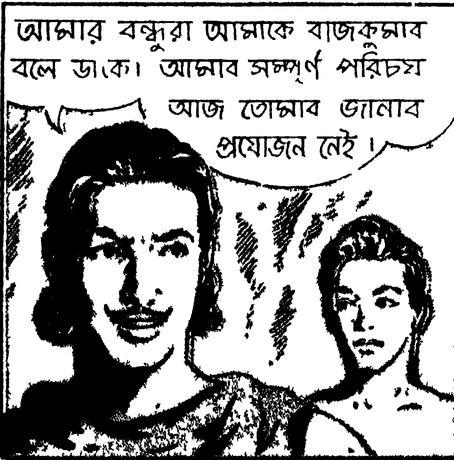

দাঁড়াও! বালকের উপর অত্যাচার করছ কেন ? সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে লড়ে যাও ।
তুমি কে হে ? এই অঞ্চলে শিকারী বল্লালের সঙ্গে কেউ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে সাহস করে না ! ... আমি তোমাকে এখনই অসির আঘাতে বধ করব...


আমি আসছি!
আমিও প্রস্তুত ।


এমন আশ্চর্য তলোয়ারের খেলা কখনও দেখি নি !


আমি তোমার কাছে যুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। তরবারি তীর ধনুক, মল্লযুদ্ধ — সব শিখব। বলো, তুমি রাজী ?
!


তোমার মতো এমন.আগ্রহ নিয়ে কেউ আমার কাছে রণবিদ্যা শিখতে চায় নি। আমি তোমার অনুরোধ রাখব। বলো, তোমার নাম কি ? কোথায় থাকো ? তোমার কে আছে ?
আমার নাম রাহুল। আমি বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র। পাশের গ্রামে আমি থাকি। এইবার তোমার পরিচয় জানতে পারি ?


আমার বন্ধুরা আমাকে রাজকুমার বলে ডাকে। আমার সম্পূর্ণ পরিচয় আজ তোমার জানার প্রয়োজন নেই।

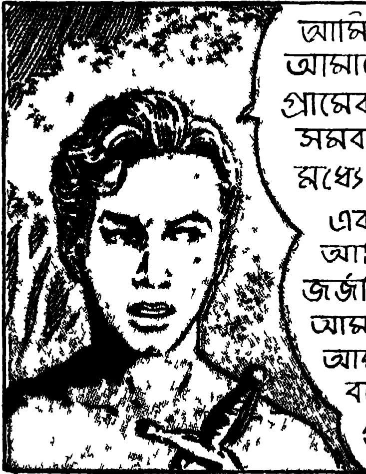

কয়েকদিন পরে গভীর অরণ্যের ভিতর রাহুলের শিক্ষা শুরু হল। রাজকুমারের সঙ্গী বজ্রসেন দিল তীর ধনুকের শিক্ষা


রাজকুমার নিজের হাতে রাহুলকে দিল অসিচালনার শিক্ষা ...




তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। রাহুল, এই অসি তোমাকে উপহার দিচ্ছি।


রাজকুমার, এখন আমি তোমাকে বলব কেন আমি রণবিদ্যা আয়ত্ত করতে চেয়েছি।


আমি বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আমার মা আমাকে কোনদিন অস্ত্রস্পর্শ করতে দেন নি। আমার গ্রামের মানুষ আমাকে ঘৃণা করতো, বলতো — ভীরু! সমবয়সীরা আমাকে সর্বদা অপমান করতো। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও কলহপরায়ণ ছিল অর্বুদ।
একদিন সে আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। আমি লড়তে রাজী হই নি, কিন্তু সঙ্গীদের বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত হয়ে লড়াই করতে বাধ্য হলাম। অবুদ সেদিন আমাকে প্রচন্ডবেগে প্রহার করল এবং অন্য সকলেই আমার লাঞ্ছনা উপভোগ করল। মনের দুঃখে আমি বনে চলে এলাম, প্রতিজ্ঞা করলাম এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে গ্রামে ফিরব··


তারপর ভাগ্যের কৃপায় তোমার দেখা পেয়েছি, রণবিদ্যা আয়ত্ত করেছি। এইবার আমি গ্রামে ফিরে যাব প্রতিশোধ নিতে।
সর্বনাশ! তোমাকে রণবিদ্যার শিক্ষা দিয়ে তো ভুল করেছি!


রাহুলকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একটা হরিণ মারতে পারলে রাতের ভোজটা ভাল হবে।
রাহুল, ফিরে এসো।
না।
রাজকুমার আমি হরিণ

গ্রামে প্রবেশ করে প্রথমেই আমি অর্দ্ধুদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করব··
এই যে গ্রামের সামনে এসে পড়েছি ··· ওকি!

আমাদের রাজা অম্ভি গ্রীসের সঙ্গে সন্ধি করেছেন। গ্রীকবীর আলেকজান্দারকে প্রচুর উপঢৌকন দিতে হয়েছে এবং আরও দিতে হবে। তোমাদেরও প্রাপ্য রাজস্বের দ্বিগুণ অর্থ কিছুদিনের মধ্যে রাজকোষে জমা দিতে হবে।

ওকি! একদল রাজসৈন্য গ্রামে প্রবেশ করেছে! সেনাধ্যক্ষ কি বলছে?

এই আদেশ পালন করলে আমাদের অনাহারে মরতে হবে।

কী! তুই রাজার আদেশ অমান্য করতে চাস?

গ্রামের মোড়ল এগিয়ে এল··

সেনাধ্যক্ষের চাবুক মোড়লের ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়ল··

তরবারি হস্তে অকুস্থলে

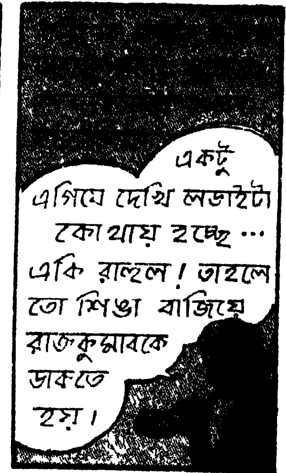
ওঃ!

সাবধান!

কি আশ্চর্য! রাহুল! রাহুল!

আমাদের সেনাধ্যক্ষকে মেরে ফেলল!·· সবাই ছুটে এস, ছেলেটাকে টুকরো টুকরো করে কাটব··





বজ্রসেনের শিঙার আওয়াজ শুনে ছুটে এল রাজকুমার ও সহচরা...

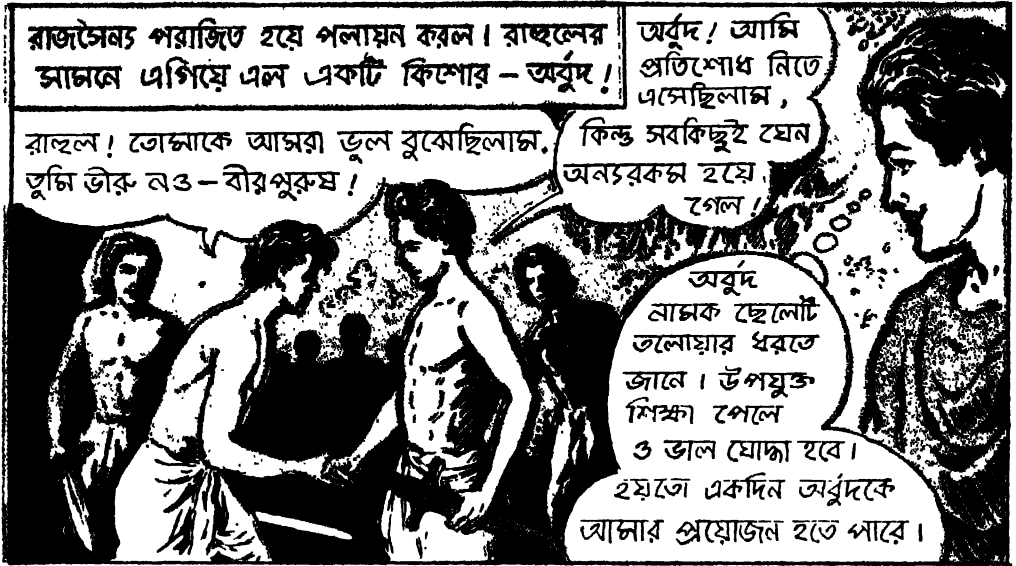
ভয় নেই রাহুল! আমি আসছি।

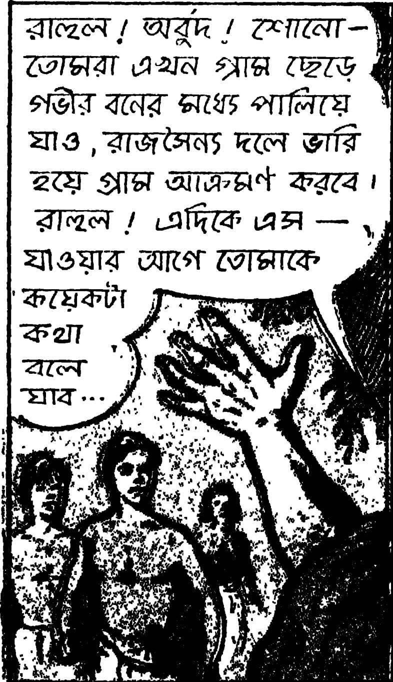
রাজকুমার। তুমি এসে গেছ। এইবার কুকুরের দল উচিত শিক্ষা পাবে।

রাহুল! ওরা হটে যাচ্ছে...

তুমি তো চমৎকার তলোয়ার চালাতে পারো দেখছি! তোমার নাম কি?

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজকুমার এবং তার


রাজসৈন্য পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। রাহুলের সামনে এগিয়ে এল একটি কিশোর – অর্বুদ!
রাহুল! তোমাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম. তুমি ভীরু নও – বীরপুরুষ!
অর্বুদ! আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম, কিন্তু সবকিছুই যেন অন্যরকম হয়ে গেল!
অর্বুদ নামক ছেলেটি তলোয়ার ধরতে জানে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ও ভাল যোদ্ধা হবে। হয়তো একদিন অর্বুদকে আমার প্রয়োজন হতে পারে।


রাহুল! অর্বুদ! শোনো – তোমরা এখন গ্রাম ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে পালিয়ে যাও, রাজসৈন্য দলে ভারি হয়ে গ্রাম আক্রমণ করবে। রাহুল! এদিকে এস — যাওয়ার আগে তোমাকে কয়েকটা কথা বলে যাব...


এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আমার সঠিক পরিচয় তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমি মগধের রাজকুমার, চন্দ্রগুপ্ত! আজ আমি রাজ্য থেকে বিতাড়িত, কিন্তু শীঘ্রই আমি মগধ আক্রমণ করব।
রাহুল! সেদিনের যুদ্ধে হয়তো তোমাকে আমার প্রয়োজন হতে পারে।
তেমন দিন যদি আসে তাহলে দেখবে তুমি যোগ্য মানুষের হাতেই অসি তুলে



আয়না নিয়ে খেলতে খেলতে

সমরেশ বসু

গোগোলের অনেক কাণ্ডকারখানার দুটো কাহিনী আমি তোমাদের শুনিয়েছি আর গোগোল কী রকম ছেলে, সেটাও ইতিমধ্যেই অনেকে জেনে গিয়েছে। কাশ্মীরের পহলগাঁও-এর ঘটনা বা পুরীর সমুদ্রের ধারের ঘটনা, দুটো ঘটনাই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। আমি একটা কাহিনীর নাম দিয়েছিলাম, 'ইঁদুরের খুটখুট' আর একটির নাম দিয়েছিলাম, 'সোনালি পাড়ের রহস্য'। আশা করি, পাঠকেরা তা ভুলে যায় নি। প্রথম ঘটনাটি ছিল একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতির, আর একটা অতি ভয়ংকর হত্যার ঘটনা। অবিশ্যি, এ কথা সবাই জানে, গোগোল এখন মাত্র একটি আট বছরের ছেলে। ও গোয়েন্দা না, বা সেরকম, নিজেকে ও কখনো ভাবে না। আসলে, ওর কৌতূহলের মাত্রাটাই বেশী। যা কিছু দেখবে, যা কিছু শুনবে, সব কিছুতেই ওর কৌতূহল মেটানো চাই।

ছেলেমানুষদের কৌতূহল থাকাটা যে খারাপ, তা কেউ বলবে না। কিন্তু অনেক সময়, এমন সব ঘটনা ঘটে, কৌতূহল নিয়ে সেই ঘটনার পিছনে ছুটলে, বিপদও ঘটতে পারে। গোগোল সেরকম বিপদেও পড়েছিল। আসলে বিপদের কথাটা তো ও বুঝতেই

পারে না। যদি বুঝতে পারতো, তা হলে হয় তো ভয়ে সেদিকে যেতো না। এখনো ওর সে-বোধই হয় নি। তা না হলে, পুরীর সমুদ্রের ধারে, একটা খুনে লোক তো ওকে মেরেই ফেলতো। কারণ, লোকটা ওর জন্যই ধরা পড়ে গিয়েছিল। অথচ ও কিন্তু জানতোই না, লোকটা একটা খুনের মতলব নিয়ে কিছু করছে। নিতান্ত ছেলেমানুষী কৌতূহলবশতঃ, লোকটার সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে, ও শুধু দেখতে চেয়েছিল, লোকটা একটা খালি বাড়িতে কী করছে। দেখতে গিয়েই, যতো গোলমাল।

যাক, সে ঘটনা একবার বলা হয়ে গিয়েছে, নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। গোগোলের মাথায় এক এক সময়, এক একটা ব্যাপার চেপে বসে। আজকাল ও আর ওর বাবার পাইপ নিয়ে, মুখে দিয়ে, বাবার মতো কথা বলবার অনুকরণ করে না, কিংবা বাবার অ্যাটাচি নিয়ে, খুব গম্ভীর ভাবে কাজে যাবার ভাব করে না। হাতে সময়ও কম। নিয়মিত স্কুলে যেতে হয়। বাড়িতেও সন্ধ্যেয় একজন আন্টি পড়াতে আসেন। গোগোল খুব মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। পড়াশোনার যতো চাপ বাড়ছে, ততোই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এক এক সময় ভেবেই পায় না, কেন এতো লেখা-পড়া করতেই হবে। তবু করতেই হয়। তা না হলে, বড় বড় লেখকের ভালো ভালো বই কখনো পড়তে পারবে না, কিছু বুঝতেও পারবে না।

ইদানিং গোগোলের খুব পয়সার দরকার হয়েছে। সব সময়েই, মায়ের কাছে, দশ পয়সা, কুড়ি পয়সার বায়না করে। ছোট ছেলেপিলেদের এতো পয়সার দরকার কিসের? ওর মা খুব বিরক্ত হন। বাবাকেও ছাড়ে না।

গোগোল প্রথম প্রথম পয়সা নিতো, গরিব-দুঃখীদের দেবার জন্য। বাড়ির দরজায় কেউ এসে দাঁড়ালেই হলো, হাত পেতে কিছু চাইলেই হলো। অমনি গোগোল ছুটলো, মায়ের কাছে পয়সার জন্য। আজকাল রেশনের দিনে মাথা পিছু যেরকম চাল আটা দেয়, তাতে তো আর গরিব-দুঃখীদের পেট ভরে খাওয়ানো যায় না। পয়সা দিয়েই বিদায় করতে হয়। কিন্তু পয়সাই কি সব সময়ে হাতের কাছে থাকে? গোগোল তা শুনবে না। পয়সা ওকে দিতেই হবে। হাতের কাছে না থাক, মাটির ভাঁড়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যা জমানো আছে, তার থেকেই দিতে হবে। তার ফলে যা হবার, তা-ই হয়। মা রেগে যান, বকুনি দেন। বেশী জেদ করলে, মায়ের কাছে চড়-চাপড়টাও খেতে হয়।

কিন্তু গোগোলই বা কী করবে? গরিব-দুঃখীদের দেখলে, ওর মন মানে না। এদিকে, আজকাল আবার খুব কথা বলতেও শিখেছে। মাকে বলে, 'আমরা কতো খাই,

আর ওরা গরিব বলে, খেতে পাবে না? ওদের পয়সা না দিলে যে পাপ হয়, তা বুঝি জানো না?'

মা ধমক দিয়ে বলেন, 'বেশী পাকা পাকা কথা বলো না। তোমার জন্য আমি কি দানছত্র খুলে রেখেছি, যে এসে হাত পাতবে, তাকেই পয়সা দিতে হবে? এতো পয়সা আমার নেই।'

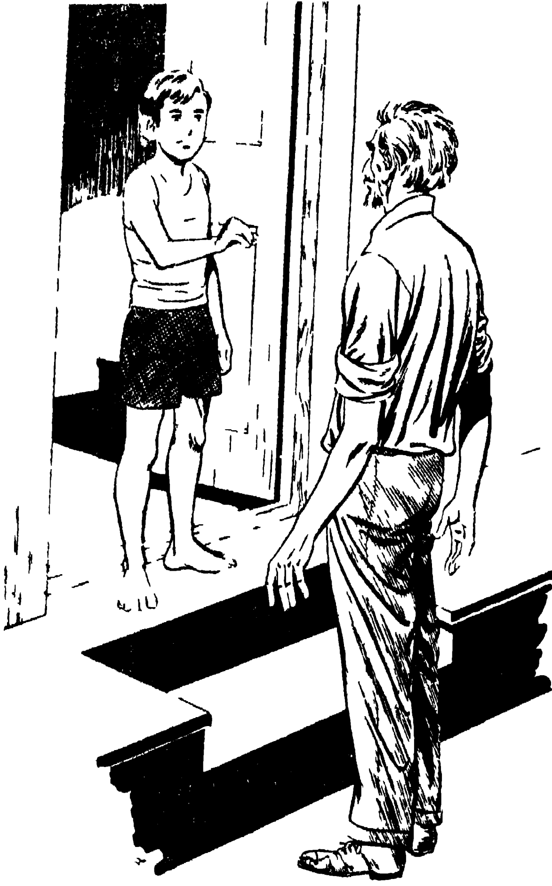
কযেক মাস আগে তো, বেশ একটা মজার ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল। ঘটনাটা বলছি।

সকালবেলা ইস্কুলে যাবার আগে, গোগোল নিজের মনেই একটা ব্যাটারিসেট ট্যাংক, ঘরের মেঝেয় চালিয়ে খেলছিল। ওর বাবা গিয়েছেন বাথরুমে চান করতে। মা রান্নাঘরের দিকে ব্যস্ত। আর আজকাল ইলেকট্রিক কারেণ্টের ব্যাপারটা সবাই জানে। যাকে বলে লোডশেডিং, যে কোনো শিশুও তা জানে। হয় তো সারাদিনই কারেণ্ট নেই। পাখা চলে না, আলো জ্বলে না, রেফ্রিজারেটর চলে না। বলতে গেলে, সবই অচল হয়ে যায। কবে যে দেশের এ দুর্গতি ঘুচবে, কে জানে।

যাই হোক, লোডশেডিং-এর জন্য, গোগোলদের কলিংবেলটাও বাজছিল না। ওদের বাড়িতে কাজ করে যে গুরুপদ, সে হয়তো কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিল, বাইরের দরজাটা খোলাই ছিল। দরজার কাছে, কারোর পায়ের শব্দ পেয়ে, গোগোল দৌড়ে গেল দেখতে, কে এসেছে। গিয়ে দেখলো, ঢলঢলে ময়লা একটা ট্রাউজার, আর তেমনি পুরনো ঘামে ভেজা জামা গায়ে একটি লোক দাঁড়িযে আছে। লোকটির পায়ের জুতোর অবস্থা আরো খারাপ, ছেঁড়া, তালি মারা, ধুলো কাদায় ভরা। মুখে গুচ্ছের কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথার চুলগুলো তেমনি উষ্কখুষ্ক। দেখেই, গোগোলের মনে হলো, লোকটা যেন ধুঁকছে, কতোদিন খায় নি। প্রথমে গোগোলের অবিশ্যি একবার সন্দেহ হয়েছিল, লোকটা ছেলেধরা, বা সেই ধরনের কিছু কী না। কিন্তু লোকটার কাঁধে কোনো ঝোলা ছিল না। ও হাত তুলে ইশারা করে লোকটিকে বললো, 'দাঁড়াও।'

বলে ভিতরে গিয়ে বাবার পড়ার টেবলের কাছে গেল। গোগোল দেখে রেখেছিল, বাবা ওখানে কিছু খুচরা পয়সা রেখেছেন। ও একটি দশ পয়সা নিয়ে, দরজার কাছে গিয়ে লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'খাবার দাবার কিছু নেই, এই দশ পয়সা নাও।'

লোকটি অবাক্ হয়ে কয়েক মুহূর্ত গোগোলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে



—'খাবার দাবার কিছু নেই, এই দশ পয়সা নাও।' [পৃঃ ২৬৭

নিজের হাত পা দেখে, মাথা ঝাকিযে হেসে বললো, 'মাত্র দশ পয়সা? আর কিছু বেশী পাওয়া যায না?'

গোগোল ঠোঁট টিপে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিযে বললো, 'আচ্ছা দেখছি।'

গোগোল আবার ঘরের মধ্যে গিযে, বাবার টেবল থেকে, আরো একটি দশ পযসা নিযে এলো। লোকটির হাতে এগিযে দিযে বললো, 'আর নেই, এই নাও।'

লোকটি সেই দশ পযসা নিয়ে বললো, 'থ্যাংক্যু। তবে কী না, আমার আরো কিছু বেশী পেলে ভালো হতো।'

গোগোল এবার যেন একটু হকচকিযে গেল। কোনো গরিব-দুঃখী, যারা ভিক্ষে করে, তাদের মুখে ও কখনো 'থ্যাংক্যু' শব্দটা শোনে নি। কথাটার মানে ও ভালোই জানে। তা ছাড়া, লোকটির গলার স্বর বেশ গম্ভীর, কথার উচ্চারণও বেশ পরিষ্কার। ওর মনে কেমন খটকা লাগলো। ও লোকটির মুখের দিকে তাকিযে বেশ চিন্তিত হযে পড়লো।।

সেই সময়েই ওর বাবা বাথরুম থেকে বেরিযে, তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন, গোগোল বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িযে। জিজ্ঞেস করলেন, 'গোগোল, তুমি ওখানে কী করছো?'

গোগোল পিছন ফিরে বাবার দিকে তাকালো। আর ঠিক সে সময়েই দরজার বাইরের লোকটি বলে উঠলো, 'আপনার কলিংবেলটা বাজছে না, আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলুম?'

গোগোলের বাবা, বাইরের দরজার কাছে একটু ঝুঁকে পড়ে, ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ওহো, মিস্টার ঘটক? আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

গোগোল তো থ! সেই ময়লা ছেঁড়া পোশাক আর জুতো পরা লোকটি, গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে হাসলেন। বাবার সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন। বাবা বললেন, 'কলিংবেলের আর দোষ কী বলুন, আজকাল তো লোডশেডিং-এর আর দিনক্ষণ বলে কিছুই নেই। যখন খুশী হলেই হলো। আসুন, আপনি একটু বসুন, আমি জামাকাপড় বদলে আসছি।'

মিস্টার ঘটক যাঁর নাম, তিনি গোগোলের একটি হাত চেপে ধরলেন, ওর বাবাকে বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যস্ত হবেন না, আপনি আসুন। আমি ততোক্ষণ এর সঙ্গে কথা বলছি। এটি কে?'

গোগোলের দিকে তাকিয়ে ওর বাবা ভিতর দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আমার ছেলে।'

গোগোলের অবস্থা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছে। মিঃ ঘটক বললেন, 'অনুমান করেছিলাম। এসো, তোমার সঙ্গে একটু গল্পটল্প করা যাক।'

কিন্তু গোগোলের আর সে ইচ্ছা মোটেই নেই। লজ্জাও করছিল, ভয়ও করছিল। বাবার কথা শুনেই বুঝেছে, ও একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছে। ইনি মোটেই ভিখিরী নন। বেশ মান্যগণ্য কোনো ভদ্রলোকই হবেন, তা না হলে বাবা ওরকম ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতর ডেকে এনে বসাতেন না। গোগোল মিঃ ঘটকের সঙ্গে বাইরের বসবার ঘরে গেল, কিন্তু থাকতে চাইলো না। বললো, 'আমি এখন মা'র কাছে যাবো।'

মিঃ ঘটক বললেন, 'তা তো নিশ্চয়ই যাবে। এখন, সত্যি করে বলো তো, আমাকে তুমি পয়সা দিলে কেন? আমাকে ভিখিরী ভেবেছিলে, তাই না?'

গোগোল মিঃ ঘটকের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানালো, হ্যাঁ।

মিঃ ঘটক হেসে বললেন, 'ভেরি গুড, কারণ তুমি সত্যি কথা বলেছ। অবিশ্যি আমার জামাকাপড়ের যা দশা, তোমাকে দোষ দিতে পারি না। তবে আমি ভিখিরী নই। পয়সাগুলো তুমি পেলে কোথায়?'

গোগোল বাবার টেবল দেখিয়ে বললো, 'ওখান থেকে।'

'ওখানে কার পয়সা রয়েছে?'

'বাবার।'

'তার মানে, বাবাকে না বলেই তুমি পয়সাগুলো নিয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি ঠিক হয়েছে?'

গোগোল অবাক্ হয়ে বললো, 'আমি তো বাবাকে বলেই দিতুম।'

মিঃ ঘটক বললেন, 'তবু এভাবে না বলে পয়সা নেওয়াটা ঠিক না, বাবা হয় তো রাগ করতে পারেন, তাই না?'

গোগোল স্বীকার করলো। কারণ, বাবা দু একবার সত্যি সত্যি রাগ করেছেন। মিঃ ঘটক আবার বললেন, 'তোমার মনটা অবিশ্যি খুবই ভালো। তবু তোমাকে বলে রাখি, ময়লা আর খারাপ পোশাকের লোক দেখলেই তাকে ভিখিরী ভেবো না। আমি অবিশ্যি গরিব মানুষ, কিন্তু ভিখিরী না। কাজকর্ম করি। সেইজন্যই তোমাকে আর একটা কথা বলে রাখি, কেউ যেচে তোমার কাছে ভিক্ষে না চাইলে, কখনো কারোকে ভিক্ষে দিও না। নাও, পয়সাগুলো যেখান থেকে নিয়েছিলে, আবার সেখানেই রেখে দাও।'

মিঃ ঘটক কুড়ি পয়সা গোগোলের হাতে দিলেন। গোগোল পয়সাগুলো বাবার টেবলে রেখেই, অন্য দরজা দিয়ে, একেবারে ভিতরে চলে গেল। আর মিঃ ঘটকের সামনে এলোই না। একেবারে দক্ষিণের ব্যালকনির এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে রইলো। ওর ধারণা হয়েছিল, মিঃ ঘটকের কাছ থেকে সব শুনে, বাবা নিশ্চয় রাগ করবেন, আর ওকে খুবই বকুনি দেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গোগোল চান করে খেয়ে, গুরুপদর সঙ্গে ইস্কুলে চলে গেল। বাবা ওকে একবারও ডাকলেন না, সেই মিঃ ঘটকের সঙ্গে, কী সব বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। গোগোলের আরো আশ্চর্যবোধ হলো, যখন সন্ধ্যেবেলাও বাবা বা মা, কেউ ওকে মিঃ ঘটকের কথা বললেন না। অথচ গোগোলের হয়েছে মুশকিল, ও কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারছে না।

রাত্রে খাবার আগে, গোগোল নিজেই, মায়ের সামনে, বাবাকে ঘটনাটা বলে ফেললো। বাবা মা দুজনেই একটু হাসলেন। তারপরে বাবা বললেন, 'আমি দেখছিলাম, তুমি নিজেই ঘটনাটা বলো কী না। আমি সবই জানি। জেনে রাখো, এই মিঃ ঘটক একজন মস্ত বড় পণ্ডিত লোক। বলতে গেলে, তিনি পৃথিবীর সব দেশের ভাষা জানেন।'

গোগোলের তো চক্ষু চড়কগাছ! বললো, 'পৃথিবীর সব দেশের ভাষা?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, আর সেই সব নিয়েই তিনি চর্চা করেন, বই লেখেন। আসলে, এক ধরনের লোক আছেন, যাঁরা কাজে কর্মে এমন ডুবে থাকেন, জামাকাপড়ের কথা তো তাঁদের মনে থাকেই না, এমন কি খাওয়ার কথাও মনে থাকে না।'

গোগোল বললো, 'বাবা, আমি একটুও বুঝতে পারি নি।'

বাবা বললেন, 'তা জানি। তবে, আমি আর নতুন করে তোমাকে কিছু বলবো না। মিঃ ঘটক তোমাকে যা বলে গেছেন, সেসব কথা মনে রেখো, বুঝলে?'

গোগোল ঘাড কাত করে বললো, 'রাখবো।'

সেই থেকে গোগোলের শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। পোশাক দেখে মানুষ বিচার, এটা যে একটা মস্ত বড় ভুল, তা ও আরো নানান ভাবে লক্ষ্য করে দেখেছে। ও যে পাডায থাকে, সেই পাড়াতেই দেখেছে। পোশাক দেখে গরিব বড়লোক মোটেই চেনা যায না। আর পণ্ডিত মানুষ? তা তো একেবারেই না। গোগোলদের পাড়ায় যে সব থেকে অশিক্ষিত, একেবারেই লেখাপড়া করে না, জীবনে কোনো দিন বই নিয়েই নাকি বসে নি, অথচ গোগোলেরই বযসী, পাড়ায সারাদিন খারাপ খারাপ কথা বলে বেডায, সেই ভোলা রোজ রোজ ভালো ভালো জামা প্যাণ্ট পরে সেজে ঘুরে বেড়ায। গোগোল শুনেছে, ভোলা নাকি চুরি করে, আর চুরি করেই ওসব সুন্দর পোশাক পরে। কথাটা গোগোল আগেও জানতো। কিন্তু মিঃ ঘটকের কথা শোনার পর থেকে, এসব কথা ওর নতুন করে মনে হযেছে।

গোগোল মিঃ ঘটককে জেনে শুনে ভিখিরী বলে অপমান করে নি। ভুলবশতঃ একটা অন্যায় করে ফেলেছে। কিন্তু মিঃ ঘটকের কথাগুলো ওর মনে গাঁথা হয়ে গিযেছে। পোশাক দেখে ভুল করার তো কোন কথাই নেই, তা ছাড়া, না চাইতে, যেচে কখনো কারোকে ভিক্ষে দেওয়া একটা মস্ত বড অন্যায।

গোগোলের ভিক্ষে দেওয়ার কথাটাই আসল না। আজকাল যে ওর পয়সার দিকে ঝোঁক হয়েছে, সেটা কেবল ভিক্ষে দেবার জন্য নয। দশ পয়সা, কুড়ি পয়সা, যখন তখন চাওয়ার অন্য একটা কারণও আছে। গোগোলের এবারের গল্পটার আসল কারণটাও সেখানেই।

কনফেকশনারি কথাটা আজকাল সবাই জানে। টফি লজেন্স চকোলেট, বিশুদ্ধ আর পরিচ্ছন্ন ভাবে তৈরী হলে, ছোটরা সবাই খেতে চায়। কিন্তু একটা সময় আসে,

রাস্তার যে কোনো দোকান থেকে, চানাচুর, চাটনি, ধুলোবালি মাখা আলুকাবলি, ছোট ছেলেমেয়েরা খেতে খুব ভালবাসে। গোগোলেরও সেই অবস্থা চলছিল। গরিব-দুঃখী দেখলে, ভিক্ষে দিতে যেমন ওর ইচ্ছে হতো, চানাচুর চাটনি ঘুগনি আলুকাবলি দেখলেও ওর তেমনি খেতে ইচ্ছে করতো। আর ইচ্ছে করলেই, মায়ের কাছে বারে বারে পয়সা চাইতো। মা বিরক্ত হতেন, ধমক দিতেন, বকুনি দিতেন, কিন্তু গোগোল জেদ করলে, কিছুতেই ওকে থামানো যেতো না। সব থেকে মজার কথাটা হলো এই, গোগোল মাকে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। ও যে রাস্তার ধারের ধুলোবালি মাখা খোলা খাবার কিনে খায়, মাকে কখনো তা বলতো না। বরং মা যদি জিজ্ঞেস করতেন, গোগোল কোনো বাজে জিনিস কিনে খায় কী না, ও তা মাকে বেমালুম চেপে যেতো।

কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? গোগোল অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রথম প্রথম পেট খারাপ। মাঝে মাঝে বমিও করেছে। গোগোলের বাবা মা, গোড়ার দিকে ব্যাপারটা তেমন বুঝতে পারেন নি। সামান্য ওষুধেই সেরে গিয়েছে। তারপরে দেখা গেল, গোগোলের গা প্রায়ই গরম থাকে। ওর খিদে হয় না। চেহারাটা দিনকে দিন কেমন যেন রোগা মতো হতে লাগলো। ওর বাবা একজন ভালো ডাক্তারকে দেখালেন। যেদিন দেখালেন, সেদিন গোগোলের বেশ জ্বর। ডাক্তার সব দেখে শুনে জানালেন, গোগোল আজে বাজে খাবার খেয়ে, শরীরটা খারাপ করেছে। ওর লিভার খারাপ হয়েছে, পেটে কৃমিও জন্মেছে, তা ছাড়া, আমাশয়ের বীজাণুও রয়েছে। ওকে এখন কিছুদিন বাইরে বেরোতে দেওয়া উচিত না। ইস্কুলে যাওয়াও বন্ধ। বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হবে, নিয়মিত ওষুধ আর পথ্য করতে হবে।

গোগোলের এখন সেই অবস্থা চলছে। জ্বরটা তেমন নেই, আগের থেকে একটু ভালো আছে। কিন্তু বাড়ি থেকে ওকে একেবারেই বেরোতে দেওয়া হয় না। অথচ গোগোল আর শুয়ে থাকতেও পারে না। ঘরের মধ্যেই, বই খেলনা নিয়ে কাটায়। বিকালবেলা ওদের দোতলার ব্যালকনি থেকে, বন্ধুদের খেলাধুলা দেখে।

গোগোলদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাড়িতে, বড় একটা বাগান আছে। ও বাড়িতে লোকজন কেউ থাকে না, গোগোল জানে, ওটা একটা অফিস বাড়ি। সরকারি অফিস বাড়ি। সারাদিন লোকজন কাজ করে। কিন্তু বাগানের দিকে বিশেষ কেউ

আসে না। বাগানটা হলো বাড়ির পিছন দিকে। কোনো কোনো সময় হঠাৎ দু একজন হয় তো আসে। কথা বলে, বিড়ি সিগারেট খায়, আবার চলে যায়। ও বাড়িটার দিকে, গোগোলের কোনো মনোযোগ নেই।

বাগানের বাঁ দিকের বড় বাড়িটার মধ্যে, অনেকগুলো ঘর। সেখানে অনেক খ্রীস্টান পরিবার থাকে। ওরা নাকি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। অর্থাৎ, যাদের বাবা মায়ের মধ্যে, একজন ইংরেজ, আর একজন ভারতীয়। গোগোল 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান' মানে কী, ওর বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে এ কথা জানতে পেরেছে।

গোগোল যে ইস্কুলে পড়ে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদেরও কেউ কেউ সেই ইস্কুলে পড়ে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে, গোগোলের বন্ধুত্বও হয়েছে। বিশেষ করে জর্জ, আর গ্যারি।

জর্জ আর গ্যারিদের বাড়িটা চারতলা। গোগোল অনেকদিন লক্ষ্য করেছে, চারতলার জানালা থেকে জর্জ প্রায়ই একটা আয়না নিয়ে ভারী মজার খেলা খেলে। খেলাটা এমন কিছু না। জর্জদের চারতলার জানালায় যখন রোদ পড়ে, জর্জ তখন ছোট একটা আয়না নিয়ে সেই রোদের বুকে মেলে ধরে। আয়নায় রোদ পড়লে, সেই রোদের একটা প্রতিফলন হয়। সেই প্রতিফলনটাও একটা আলো, যা অনেকটা টর্চ লাইটের আলোর মতো, যেখানে সেখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলা যায়। আসলে, ওটা রোদের আলোরই একটা প্রতিফলন। আয়নাটা যেদিকে ঘোরাবে, সেদিকেই আলোর ঝলক পড়ে। জর্জ অনেক সময়, গোগোলের মুখেও আলো ফেলেছে। অথচ জর্জদের জানালাটা বেশ দূরে। সেই আলো চোখে পড়লে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু বেশ মজাও লাগে। আয়নায় রোদ পড়ে, অনেক দূরে আলো ছিটকে পড়তে দেখলে, আর ইচ্ছামতো সেই আলোকে যেখানে খুশী ফেলতে পারলে, মজা লাগবারই কথা।

গোগোলের খুব ইচ্ছে, ও ওরকম আলো নিয়ে খেলা করে। কিন্তু ওদের বাড়িতে সেরকম ছোট আয়না একটাও নেই। ছোট আয়না বলতে, বাথরুমে, জলের বেসিনের ওপরেই, দেওয়ালে ঝোলানো একটা আয়না আছে, যেখানে বাবা মা দাঁত মাজেন, বাবা দাড়ি কামান। কিন্তু জর্জদের আয়নার থেকে, সেই আয়নাটা অনেক বড়। দেওয়াল থেকে পেড়ে আনাও মুশকিল। মায়ের কাছে অনেকবার বায়না করেছে, একটা ছোট আয়না কেনবার জন্য। মা রাজী হন নি, বরং বলেছেন, 'ওসব বাজে খেলা খেলতে

হবে না। খোলা জানালা দরজা দিয়ে, লোকের ঘরের মধ্যে তুমি আলো ফেলবে, সেটা আবার কেমন করে ভালো খেলা হতে পারে? ওতে লোকেরা রাগ করে।'.

গোগোল মাকে জর্জের কথা বলেছে, 'জর্জ যে আয়না নিয়ে আলো ফেলে খেলা করে?'

মা বলেছেন, 'জর্জ যা করবে,, তাই তুমিও করবে? জর্জ ওটা মোটেই ভালো খেলা করে না। পৃথিবীতে অনেক খেলা আছে। ঘরের জানালায় বসে, আয়না নিয়ে যেখানে সেখানে আলো ফেলা, মোটেই ভালো খেলা নয়।'

গোগোল বুঝতে পেরেছে, জর্জের মতো আয়না নিয়ে খেলা ওর কোনো দিনই হবে না। লুকিয়ে খেলারও কোনো উপায় নেই। ছোট আয়নাই তো বাড়িতে নেই।

কিন্তু হঠাৎ গোগোল একদিন একটা ছোট আয়নার সন্ধান পেয়ে গেল। ওদের বাড়িতে যে কাজ করে গুরুপদ, সে থাকে সিঁড়ির নীচে একটা ছোট ঘরে। গুরুপদর ছোট একটা আয়না আছে। সেটা হঠাৎ একদিন ওর চোখে পড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে, আয়না নিয়ে রোদের বুকে মেলে ধরে, আলো ফেলার খেলা খেলতে ইচ্ছে হলেই গুরুপদর আয়না নিয়ে এসে খেলতো। কিন্তু মাকে লুকিয়ে খেলতো, মা দেখলে রাগ করবেন। তিনি এ খেলাটা মোটেই পছন্দ করেন না।

এখন গোগোল ইস্কুলে যায় না। শরীরটাও আগের থেকে ভালো আছে। জ্বর নেই। ডাক্তার ওকে ভাত রুটি আর মাংসের স্টু খেতে দিয়েছেন। শরীর ভালো থাকলে কোন ছেলেরই ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। গোগোলেরও করে না। কিন্তু উপায় নেই, এখনো ওর বাড়ি থেকে বেরনো বারণ।

কিন্তু দুপুরবেলাটা গোগোলের একদম কাটতে চায় না। বাবা বাড়িতে থাকলে, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তা না হলে, কাজের জন্য বাইরে থাকেন। মা দুপুরবেলা বই পড়েন, একটু বা ঘুমোন। গুরুপদরও দুপুরবেলা ছুটি। সে ঘুমোতে যায়, নয় তো তার বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলে।

এরকম অবস্থায়, একদিন ঘোর দুপুরে, গোগোলের আয়না নিয়ে খেলার ইচ্ছে হলো। ও আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, গুরুপদর ঘরে গেল। দেখলো গুরুপদ ঘুমোচ্ছে। ওর আয়নাটা থাকে মেঝের ওপরেই, দেওয়ালে ঠেকানো। গোগোল আয়নাটা নিয়ে, পা টিপে টিপে, ওদের দক্ষিণের ঘরে চলে গেল। দুপুরে, এ সময়ে, ওদের দক্ষিণের ঘরের জানালায় রোদ থাকে।

● আয়না নিয়ে খেলতে খেলতে



জর্জের দিদি হেসে, হাত নেড়ে একটু ইশারা করলেন

গোগোল রোদে আয়না ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিকে আলো ফেলতে লাগলো। জর্জদের চারতলার খোলা জানালায আলো ফেলতেই, জর্জের দিদি এসে জানালায় দাঁড়ালেন। গোগোল তাড়াতাড়ি আলোটা সরিয়ে নিল, একটু ভযও পেলো। হয় তো জর্জের দিদি রাগ করছেন। কিন্তু জর্জের দিদি হেসে, হাত নেড়ে একটু ইশারা করলেন, তারপরে জানালার কাছ থেকে সরে গেলেন।

গোগোল জর্জদের বাড়ি থেকে আলোটা সরিয়ে নিয়ে, বাগানের বড গাছে ফেললো। পাতার ছায়ায় একটা কাক বসেছিল। গায়ে আলো পড়তেই, কাকটা ভয় পেযে, কা-কা করে ডেকে উড়ে চলে গেল। গোগোলের হাসি পেযে গেল। বাগানওয়ালা বাড়িটার এদিকে লোকজন বিশেষ আসে না। কিন্তু পিছন দিকের বারান্দায়, বা খোলা জানালা দিয়ে, ঘরের ভিতর লোকজন দেখা যায়। আজ দেখা যাচ্ছে না। দরজা জানালা বন্ধ। বারান্দায়ও কেউ নেই। সাধারণতঃ রবিবারেই এরকম হয়ে থাকে, বা অন্য কোনো ছুটির দিনে। ছুটির দিনে, লোকজন কেউ কাজে আসে না।

গোগোল দেখলো, বাড়িটার ছাদের আলসেয় একটা চিল বসে আছে। তৎক্ষণাৎ গোগোল আয়নার আলো চিলটার গায়ে ফেললো। চিলটা চমকে উঠলো, কিন্তু তখুনি উড়ে পালালো না। এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। গোগোল ভেবেছিল, চিলটা নিশ্চযই পালাবে। পালালো না দেখে, ওর জেদ বেড়ে গেল। আয়নার আলোটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বারে বারে চিলটার গায়ে মুখে ফেলতে লাগলো। চিলটাও যেন বারে বারে মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলো, মুখটা নামিয়ে নিতে লাগলো। তবু পালাবার

নাম নেই। গোগোল তখন চিলটার চোখের ওপর আলো ফেলতে লাগলো। চিলটাও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে লাগলো। গোগোল মনে মনে রেগেই গেল। চিলের এতো সাহস। একটু ভয় পায় না? বারে বারে চিলটার গায়ে আলো ফেলতে, হঠাৎ এক সময় চিলটা পাখা মেলে উড়লো। কিন্তু বেশী দূরে কোথাও গেল না। পুরনো অফিস বাড়িটারই চিলেকোঠার ছাদের ধারে গিয়ে বসলো।

গোগোলও ছাড়বার পাত্র না। ও আয়নার আলোটা ঠিক নিশানা করে, চিলে-কোঠার ছাদের ওপর, চিলের গায়ে ফেলবার চেষ্টা করলো। আর তখুনি, ও দেখতে পেলো, কেউ যেন চিলেকোঠার দরজার কাছে, মাথা নীচু করে বসে পড়লো। আয়নার আলোটা তখন চিলেকোঠার দরজার কাছেই পড়েছিল। গোগোলের মনে হলো, কোনো মানুষের মুখে আলোটা পড়তেই, সে যেন ঝুপ করে বসে পড়লো।

গোগোল খুব অবাক্ হয়ে গেল। ওর নিজেরই ধাঁধা লেগে যায় নি তো? ও কি ঠিক কোনো মানুষকেই দেখেছে? নাকি, আয়নার চোখ ধাঁধানো আলোতে ওরকম মনে হলো? গোগোল তখনো সেই দিকেই তাকিয়ে আছে। ওদের বাড়ি থেকে, অফিস বাড়ির ছাদ বা চিলেকোঠা বেশ দূরে। ও বাড়িটার সামনের দিক পড়েছে, পাশের রাস্তায়। গোগোল দেখেছে, মস্ত গেটওয়ালা বাড়ি। সামনের দিকে গাড়ি, লোকজন অনেক। কিন্তু আজ তো বাড়িটা বন্ধই মনে হচ্ছে।

গোগোল লক্ষ্য করলো, চিলটা নীচের দিকে মাথা নামিয়ে কিছু দেখছে। আর গোগোলের আয়নার আলো যে তখন কোথায় পড়েছে, খেয়ালই নেই। গোগোল আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলো, চিলেকোঠার দরজাটা খোলা। ও ঠিক মনে করতে পারলো না, দরজাটা রোজই খোলা থাকে কী না। এ ঘরে গোগোল বিশেষ আসে না। এটা বাবার শোবার ঘর। ছুটি ছাটার দিনে, বাবা না থাকলে, মাঝে মাঝে আসে। বাবা অবিশ্যি দিনের বেলা এ ঘরে আসেনই না। বাড়িতে থাকলে তিনি সারাদিন তাঁর কাজের ঘরে থাকেন, যেমন আজও আছেন। তা ছাড়া, গোগোল এ ঘরে এলেও, অফিস বাড়িটার দিকে বিশেষ তাকায় না, লক্ষ্যও করে না। কারণ, ও বাড়িটার প্রতি কোনো আকর্ষণই ওর নেই। তার চেয়ে, ডাইনে বাঁয়ে যে সব বাড়ি আছে, প্রায় সব বাড়িতেই, ওর বয়সী চেনাজানা দু একজন বন্ধু আছে। সেইজন্যই, ও মোটে মনেই করতে পারলো না, অফিস বাড়ির চিলেকোঠার দরজাটা রোজই ওরকম খোলা থাকে কী না।

ইতিমধ্যে গোগোলের আয়নার, রৌদ্রের প্রতিফলিত আলো অন্য একদিকে গিয়ে

পড়েছে, কারণ চিলেকোঠার দরজার কথা ভাবতে গিয়ে, ওর হাতের আয়না একটু ঘুরে গিয়েছে। ও মনে মনে ভাবলো, ওটা তো কোনো লোকের বাড়ি না, একটা অফিস বাড়ি। একতলা দোতলায় সারাদিন লোকেরা কাজ করে, বিকাল পাঁচটার পরে ফাঁকা হয়ে যায়। নীচে দু একজন দরোয়ান থাকে। এরকম বাড়ির চিলেকোঠা খোলা থাকলো, বা বন্ধ থাকলো, কে দেখতে যাচ্ছে?

কিন্তু চিলটা চিলেকোঠার ছাদ থেকে, ওরকম মাথা নীচু করে কী দেখছে? শুধু দেখছে না, চিলটা মাঝে মাঝে এমন ভাব করছে, যেন ভয় পেয়ে উড়ে যাবো যাবো করছে, অথচ যাচ্ছে না। কেবল, দু এক পা এদিকে ওদিকে সরে যাচ্ছে।

গোগোলের আবার জেদ চাপলো, ও আবার আয়নার আলো, চিলের গায়ে ফেলার চেষ্টা করলো। আয়নার প্রতিফলিত আলোটা এতক্ষণ একটা গাছের মাথায় ঠেকেছিল। গোগোল খুব আস্তে আস্তে, হাতের নিশানা ঠিক করে, আলোটা ফেললো চিলেকোঠার গায়ে। তারপরে একটু বাঁ দিকে নিয়ে, চিলেকোঠার দরজার পাশ থেকে ওপরের দিকে তুলতে লাগলো, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, একটা মানুষের মাথা আর উঁচুতে তোলা হাতও দেখতে পেলো। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যই, যেন পলক ফেলতে না ফেলতে, সেই মাথা আর হাত আবার আলসের আড়ালে, নীচে নেমে গেল। ফলে, গোগোলের হাতের নিশানা আবার গোলমাল হয়ে গেল। ও হকচকিয়ে, অবাক্ হয়ে, চিলেকোঠার দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। আশ্চর্য তো! সত্যি কি ওখানে লোক আছে নাকি? থাকলে, লোকটা করছেই বা কী?

গোগোলের দৃষ্টি গেল আবার চিলটার দিকে। চিলটাকে দেখেও মনে হচ্ছে, ও যেন নীচের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে। ওর ঘাড় নীচু করে দেখার ভাবভঙ্গী, ঠিক যেন একটা বুড়ো মানুষের মতো। কিন্তু গোগোল কি সত্যি কোনো মানুষের মাথা আর হাত দেখেছে? না দেখলে, শুধু শুধু মনে হবে কেন? ও তো অন্ধ না। ওদের ক্লাসে পড়ে, সুকুমার বলে একটি ছেলে, তার চোখে খুব মোটা কাচের চশমা। সুকুমার যখন বই পড়ে, তখন বইটা প্রায় নাকের ডগায় তুলে নেয়। যেন পড়ার বদলে, বইটা শুঁকছে। আসলে তা না, সুকুমারের চোখ খুব খারাপ। গোগোলের ভাবলেই কষ্ট হয়। সুকুমারকে কতো কষ্ট করে পড়তে হয়।

তা যাই হোক, সুকুমারের মতো খারাপ চোখ হলে হয় তো গোগোল ভুল কিছু দেখতে পারতো। কিন্তু পলকের জন্য হলেও, গোগোল ভুল দেখেছে বলে, মানতে পারলো না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই, গোগোল কখন যে হাতের আয়নাটা রোদ থেকে সরিয়ে এনেছে, খেয়াল নেই। ওর হাতের আয়নাটা তখন, জানালার ভিতরে, উঁচু করে তুলে ধরা অবস্থায় রয়েছে। গোগোল ভাবলো, আর একবার আয়নার আলোটা ফেলে দেখা যাক, সেরকম কিছু দেখা যায় কী না। এই ভেবে, ও আয়নাটার দিকে তাকাতেই, দেখতে পেলো, আয়নার বুকে, চিলেকোঠাটার অনেকখানি দেখা যাচ্ছে।

গোগোল এবার একটা নতুন খেলার মজা পেলো। ও একবার চিলেকোঠার দিকে তাকিয়ে, আবার আয়নার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে আয়নাটাকে একটু পাশ ফিরিয়ে, পুরো চিলেকোঠাটাকে দেখলো। কিন্তু চিলটাকে দেখতেই হবে। ও আয়নাটা আর একটু হেলিয়ে দিতেই, চিলেকোঠার ছাদটা, এবং চিলটাকেও দেখতে পেলো। চিলটা এখনো তেমনি বসে আছে। এটাও একটা মন্দ মজার খেলা না। ঘরের মধ্যে আয়নার বুকে, বাইরের ছবি দেখতে পাওয়া। গোগোলের খুব হাসি পেলো। চিলটা জানেই না, ওকে গোগোল কীরকম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। চিলেকোঠা, চিলেকোঠার ছাদ, তার ওপরে একটা চিল, পিছনে নীল আকাশ।

গোগোল দেখলো, চিলটা হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে, দু দিকে দুই পাখা মেলে দিল। উড়বে উড়বে করেও, উড়লো না, পাখা মেলেই কেমন যেন দুলতে লাগলো। তারপরেই, পাখা ঝাপটা দিয়ে কয়েক হাত ওপরে উড়ে গেল। ছোট একটা পাক দিয়ে, আবার নেমে এলো একই জায়গায়।

গোগোলের মনে হলো, চিলটা যেন একলা আপন মনে খেলা করছে। ওর লক্ষ্য ছিল চিলটার ওপরেই। হঠাৎ চিলেকোঠার দরজার কাছে, আবার মানুষের মূর্তি জেগে উঠতেই, ও আয়নার বুকে স্থির চোখে তাকালো। আয়নার বুকে ও স্পষ্ট দেখতে পেলো, কোনো একজনকে দুহাতে জাপটে ধরে, আর একজন চিলেকোঠার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

গোগোল এবার অবাক্। তাহলে সত্যি ওখানে মানুষ ছিল? এখন তো আর সন্দেহ করার কিছু নেই। আয়নার বুকে ছবি কি কখনো ভুল হতে পারে? তাহলে তো নিজেদের মুখ, চেহারা, সবই দেখা ভুল হয়ে যাবে। গোগোল ঘাড় ফিরিয়ে, চিলেকোঠাটার দিকে তাকালো। অনেকটাই দূরে, তবু খোলা চোখে দেখলো, সত্যি দরজাটা বন্ধ। অথচ এতক্ষণ খোলাই ছিল।

গোগোলের চোখে পড়লো, ঠিক ওদের বাড়ির দিকেই মুখ করা, চিলেকোঠার

একটা জানালা রয়েছে, তার একটা পাল্লাও খোলা রয়েছে। গোগোলের মনে হলো, খোলা চোখে দেখার থেকে, আয়নাতেই যেন দূরের ছবি বেশী ভালো দেখা যায়। ও পিছন ফিরে, আয়নাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, জানালাটা দেখতে চাইলো। খানিকটা বাঁ দিকে নিয়ে, একটু নীচু করে ধরতেই আয়নার বুকে জানালাটা দেখা গেল। জানালার খোলা পাল্লায় চোখ রেখে, গোগোল ঘরের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলো। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না, ভিতরটা অন্ধকার। কেবল খোলা পাল্লা দিয়ে, একটুখানি আলো ঘরের দেওয়ালে পড়েছে। তাও ঝাপসা দেখাচ্ছে।

গোগোল আগের ছবিটা মনে করার চেষ্টা করলো। একটা লোক, আর একটা লোককে যেন দুহাতে জাপটে ধরে, ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। কারোরই মুখ দেখা যায় নি। যে লোকটা আর একজনকে জাপটে নিয়ে ঢুকছিল, তার পেছনটাই, গোগোল এক পলকের জন্য আয়নায় দেখতে পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, লোকটার মাথায় কালো বড় বড় চুল। আর পুরো হাত ঢাকা, হলুদ গোছের রঙের একটা শার্ট। ট্রাউজারের রংটা মনে করতে পারছে না। কোমরে বেল্ট ছিল কী না, তাও মনে পড়ছে না।

গোগোল অবাক্ হয়ে ভাবলো, লোক দুটো কী করছিল ওখানে? এখনই বা দরজা বন্ধ করে, ঘরের মধ্যে কী করছে? এ কথা ভাবতে ভাবতেই, আয়নার বুকে, জানালার খোলা পাল্লা দিয়ে, ঘরের মধ্যে ও কিছু একটা ঝলকিয়ে উঠতে দেখলো। কী ওটা? আয়নাটা স্থির রেখে, গোগোল চোখের তারা দুটো বড় বড় করে দেখলো। আবার সেইরকম কী একটা ঝলকে উঠলো ঘরের মধ্যে, এবার তার সঙ্গে একটা হাতও দেখা গেল। যে হাতটা দেখে মনে হলো, সেই হলুদ হলুদ রঙের জামা পরা হাতটা।

গোগোল আয়নার দিকে তাকিয়ে, আরো কয়েকবার সেই রঙের জামা পরা হাতের সঙ্গে ঝকঝকে কী একটা ঝলকিয়ে উঠতে দেখলো। গোগোলের কেমন মনে হলো, আর নিজের মনেই জিজ্ঞেস করলো, ঝলকে ওঠা জিনিসটা কি ছোরা? ওর যেন সেইরকমই সন্দেহ হলো। তার মানে কী? চিলেকোঠার মধ্যে কি ছোরা মারামারি হচ্ছে নাকি?

গোগোল যখন এ কথা ভাবছে, তখন আর হাত বা কিছু ঝলকিয়ে উঠতে আর দেখা গেল না। কিন্তু জানালার খোলা পাল্লার সামনে একটা মুখ ভেসে উঠলো। গোগোল এবার অনেকটা পরিষ্কার দেখলো, একটি লোকের মুখ, খোলা জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখছে। সেই হলুদ মতো রঙেরই জামা, বুকের কাছে

বোতাম খোলা। জামার হলুদের ওপর সবুজ রঙের সরু ডোরাও যেন আছে। লোকটার মাথায় বড় বড় চুল, কপালের ওপর এমন ভাবে পড়েছে, চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

লোকটার ভাবভঙ্গী, গোগোলের মোটেই ভালো লাগলো না। সে এমন ভাবে জানালা দিয়ে নীচের দিকে দেখছে, যেন লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু করছে। অনেকটা দূরে, আয়নার বুকে তেমন স্পষ্ট না হলেও, মনে হচ্ছে, লোকটার মুখ যেন ঘামে ভেজা, আর হাঁপাচ্ছে। গোগোল আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে খোলা চোখে, চিলেকোঠার জানালার দিকে তাকালো। দেখলো, জানালার পাল্লাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। লোকটাকে আর দেখা গেল না।

গোগোল ভাবলো, এবার নিশ্চয় বন্ধ দরজাটা খুলে, লোক দুটো বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সময় চলে যেতে লাগলো, দরজা খুললো না, কেউ বেরলোও না। হতে পারে গোগোলের বয়স এখন মাত্র আট বছর, তবু ওর মনে কেমন খটকা লাগলো। খুব একটা কৌতূহল জাগলো, জানবার জন্য। চিলেকোঠার ঘরের মধ্যে কী ঘটছে?

কিন্তু জানবার কোনো উপায় নেই। এক তো গোগোলের এখন বাড়ি থেকে বেরনোই বারণ। তা ছাড়া, অফিস বাড়িটাতে ও ঢুকবেই বা কেমন করে? ছাদেই বা উঠবে কী করে। দরোয়ানরা ওকে ঢুকতেই দেবে না।

গোগোলের এই ভাবনার ফাঁকেই, হঠাৎ ওর লক্ষ্য পড়লো, চিলেকোঠার দরজা খুলে গেল। সেই লোকটাই মুখ বাড়িয়ে, যেন খুব সাবধানে বাইরে উঁকি দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। গোগোলের কী খেয়াল হলো, ও তৎক্ষণাৎ আয়নাটা রোদে ধরে, তার প্রতিফলিত আলো দরজার ওপরে ফেলবার চেষ্টা করলো। আলো চিলেকোঠার দেওয়ালে দু'একবার কেঁপে উঠেই দরজায় পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মুখ সরিয়ে নিল, আর দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

লোকটার এই লুকিয়ে পড়ার ভাবভঙ্গী, গোগোলের মনে আরো খটকা ধরিয়ে দিল। ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো, চিলটা কখন সেখান থেকে উড়ে চলে গিয়েছে। হঠাৎ গোগোলের খেয়াল হলো জর্জদের চারতলার জানালার ঠিক মুখোমুখি চিলেকোঠার দরজাটা। যদিও অনেকটা ফারাক, তবু ওখান থেকে কিছু দেখা যেতে পারে। কথাটা মনে হতেই, ও হাতের আয়না ঘুরিয়ে, জর্জদের জানালায় আলো ফেললো। আলোটা দু চারবার কেঁপে উঠতেই, জর্জের দিদিকে আবার জানালায় দেখা গেল। গোগোল

● আয়না নিয়ে খেলতে খেলতে

জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে, আঙুল দিয়ে জর্জের দিদিকে অফিসবাড়ির চিলেকোঠার দিকে দেখালো।

জর্জের দিদি অ্যালিস কিছু না বুঝে মাথা ঝাঁকিয়ে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গী করলেন। গোগোল আঙুল দিয়ে বারে বারে চিলেকোঠার দরজার দিকে দেখাতে লাগলো। ওর ইশারা আর সংকেত মতো, অ্যালিস চিলেকোঠার দিকে তাকালেন। আবার গোগোলের দিকে তাকালেন, ঘাড় বাঁকালেন একই ভঙ্গীতে। তার মানে, তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, বুঝতেও পারছেন না।

গোগোল একবার ভাবলো, চিৎকার করে কিছু বলে। কিন্তু বাবা কাজ করছেন, মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন বা বই পড়ছেন। গোগোল চিৎকার করলে, নিশ্চয়ই এ ঘরে তাঁরা কেউ এসে পড়বেন, আর গোগোলকে এভাবে জানলায় দাঁড়িয়ে আয়না হাতে দেখলে রাগ করবেন। তাই ও হাত নেড়ে নেড়ে, ঘাড় ফিরিয়ে, চিলেকোঠা দেখিয়ে, অ্যালিসকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অ্যালিস কিছুই বুঝলেন না। ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি ভেবেই, হেসে, হাত নেড়ে, জানালা থেকে সরে গেলেন।

গোগোলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা জানবার জন্য, ওর মনটা ছটফট করতে লাগলো। আর ঠিক সেই সময়েই, গোগোল দেখলো, লোকটা এবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, শিকল টেনে বন্ধ করছে। কিন্তু আর একজন কোথায় গেল? তাকে কি ঘরের মধ্যে আটকে রাখছে? গোগোল আবার তাড়াতাড়ি রোদে আয়না ধরে, প্রতিফলিত আলো লোকটার মুখের ওপর ফেলবার চেষ্টা করলো। আলো লোকটার বুকের কাছে পড়তেই, চমকে গোগোলদের বাড়ির দিকে তাকালো। গোগোল এবার লোকটার মুখের ওপর আলো ফেললো। ফেলতেই, লোকটা দু হাতে মুখ ঢেকে, দরজার কাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে নীচু হলো। আলসের আড়াল পড়ায়, তাকে আর দেখা গেল না।

গোগোল আয়নাটা সরিয়ে নিয়ে এলো। আরো বেশ খানিকক্ষণ অফিস বাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুই দেখতে পেলো না। তখন গোগোলের মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগলো, আচ্ছা, অফিস বাড়িটা আজ বন্ধ কেন? আজ তো ছুটির দিন না? সব ব্যাপারটাই গোগোলের মনে কেমন একটা খটকা ধরিয়ে দিল। ভাবলো, বাবাই একমাত্র বলতে পারেন, অফিসটা আজ কেন বন্ধ।

গোগোল মায়ের ঘরে ঢুকে দেখলো, মা বই বুকের কাছে নিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ও গেল বাবার ঘরে। বাবা এখন এক মনে কী যেন লিখছেন। গোগোলের ঘরে ঢোকা টেরই পেলেন না। কিন্তু গোগোল কিছুতেই মনের কৌতূহল চাপতে পারলো না। ও আস্তে আস্তে বাবার সামনে গিয়ে ডাকলো, 'বাবা।'

বাবা মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করলে, 'কী বলছো ?'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা বাবা, ও পাশের রাস্তার অফিস বাড়িটা আজ বন্ধ কেন ?'

বাবা এবার অবাক্ হয়ে গোগোলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ অফিস বাড়িটা ?'

গোগোল বললো, 'আমাদের বাড়ির পেছনের অফিস বাড়িটা।'

বাবা অবাক্ হয়ে, একটু ভাবলেন, তারপরে বললেন, 'ও, তুমি ওই অফিসটার কথা বলছো ? ওই অফিসের কোন্ একজন বড় অফিসার কাল রাত্রে মারা গেছেন, তাই আজ ছুটি দিয়েছে। তা তোমার আবার অফিসের খোঁজে কী দরকার পড়লো ?'

বলতে বলতেই, বাবার নজর পড়লো, গোগোলের হাতের আয়নার দিকে। অমনি বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এই বুঝি তোমার দুপুরের বিশ্রাম হচ্ছে ? আবার তুমি গুরুপদর আয়না নিয়ে এসে, ওইসব বাজে খেলা খেলছো ?'

গোগোল বাবাকে কিছু বলতে গেল। বাবা শুনলেন না, বললেন, 'না, এখন কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি গুরুপদর আয়না রেখে দিয়ে এসো, তারপরে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। শীগ্‌গির যাও।'

বাবা এমন ভাবে বললেন, গোগোলের আর কোনো কথা বলতে সাহস হলো না। ও নীচে গিয়ে, গুরুপদর ঘরে ঢুকে দেখলো, সে তখনো ঘুমোচ্ছে। গোগোল আয়নাটা রেখে দিয়ে, আবার ওপরে উঠে, বাবার ঘরেই গেল। অফিস বাড়ির ছাদ আর চিলেকোঠার দিকে দেখলো। চিলেকোঠার দরজায় শিকল লাগানো। সেখানে কেউ নেই।

গোগোল খানিকক্ষণ দেখলো, তারপরে বাবার বিছানাতেই শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ ভাবলো, আর ভাবতে ভাবতেই, ওর চোখ বুজে এলো, চোখে ঘুম নেমে এলো। ঘুম আসাটা খুবই স্বাভাবিক। গোগোলের শরীর এখনো বেশ দুর্বল। তার ওপরে চিলেকোঠার ব্যাপারটা নিয়ে এতো বেশী ভেবেছে, তাতেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

বিকাল প্রায় সাড়ে চারটের সময়, গোগোল ওদের রাস্তার দিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, লোকজন গাড়ি ঘোড়া দেখছিল। ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায়, গাড়ি কমই চলে। রাস্তার ওপরেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে, যারা অনেকে ওরও বন্ধু।

সেই সময়েই এলো জর্জ। বাবা মা চা খেতে খেতে, আর একজন বাইরের ভদ্রলোকের সঙ্গে, ঘরের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। জর্জকে দেখে গোগোল খুব খুশী হয়ে উঠলো। জর্জ ওর কাছে ব্যালকনিতে এসে, প্রথমেই বললো, 'গোগোল, তুমি আজ আয়নার আলো নিয়ে খেলছিলে?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ।'

জর্জ আবার বললো, 'তুমি কি জানালায় আলো ফেলে আমাকে ডাকছিলে? কিন্তু ও সময়ে আমি তো ইস্কুলে ছিলাম।'

গোগোল বললো, 'জানি। আসলে আমি তোমার দিদিকে একটা জিনিস দেখাতে চেয়েছিলাম।'

জর্জ বললো, 'তাই নাকি? দিদিও বলছিল, গোগোল যেন আমাকে কী একটা বলছিল, আর অফিস বাড়ির ছাদের দিকে হাত দেখাচ্ছিল। সত্যি নাকি?'

গোগোল বললো, 'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার দিদি বুঝতে পারেন নি।'

জর্জ বললো, 'ঠিক তাই। সেই জন্যই তো দিদি আমাকে তোমার কাছে পাঠালো। কী দেখাতে চেয়েছিলে তুমি?'

গোগোল তখন জর্জকে সব কথা বললো। গোগোল অবিশ্যি ইংরেজিতেই জর্জকে যতোটা সম্ভব, সব ব্যাপারটা বললো। জর্জ গোগোলের থেকে ইংরেজি ভালো জানে, কারণ ও ইংরেজিতেই সব সময় কথা বলে। তবে জর্জ বাংলাও একটু একটু বলতে পারে। ওর অনেক বাঙালী ছেলে বন্ধুও আছে।

জর্জ সব শুনে অবাক্ হয়ে বললো, 'তাই নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার তো? দিদি তোমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি, তা হলে ঠিকই দেখতো। আমি বাড়ি গিয়ে দিদিকে সব বলবো।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা জর্জ, চিলেকোঠায় কী হয়েছে তোমার মনে হয়?'

জর্জ মাথা নেড়ে বললো, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দিদি কী বলে দেখি।'



—'গোগোল, তুমি আজ আয়নার আলো নিয়ে খেলছিলে?' [পৃঃ ২৮৩

ওরা আরো খানিকক্ষণ অন্যান্য গল্প করলো। তারপরে জর্জ চলে গেল। গোগোল ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজন, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেখতে লাগলো। একটু পরেই, গোগোলের মা এসে ওর পাশে দাঁড়ালেন। ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'চলো ভেতরে, এবার তুমি একটু খাবার খেয়ে, ওষুধ খাবে।'

দুটো জিনিসেই গোগোলের বিশেষ আপত্তি। খাবার এবং ওষুধ। কিন্তু এখন অসুখ করেছে, কথা শুনতেই হবে, তা না হলে অসুখ সারবে না। গোগোল মায়ের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গেল।

গোগোল খাবার আর ওষুধ খেয়ে, সবেমাত্র শুকতারাটা নিয়ে পড়তে বসেছে। আর ওর মা তখন শাঁকে ফুঁ দিচ্ছেন। তখনই বহুলোকের চিৎকার ভেসে এলো, 'আগুন আগুন। আগুন লেগে গেছে!'...

গোগোল দৌড়ে রাস্তার ধারের ব্যালকনিতে গেল। দেখলো লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। গোগোলের মাও এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। ওর বাবা একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে কমলবাবু, কোথায় ছুটছেন? কোথায় আগুন লেগেছে?'

কমলবাবু নামে ভদ্রলোক না দাঁড়িয়েই বললেন, 'আপনার বাড়ির পেছনে, অফিস বাড়িতে।'

বাবা শুনেই তাঁর শোবার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। গোগোলও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। জানালা দিয়ে দেখলো, অফিস বাড়ির গা বেয়ে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে।

সন্ধ্যেবেলার আকাশ কালো হয়ে উঠছে। বাগানের গাছে কাকগুলো কা কা করে উড়ছে। আগুনের রেশ সামান্য এক আধবার দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়াই বেশী।

আশ্চর্য তো! গোগোল ভাবলো। আজই হঠাৎ অফিস বাড়িতে আগুন লাগলো? গোগোল বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী করে আগুন লাগলো বাবা?'

বাবা বললেন, 'আমি কী করে জানবো বলো। তুমি আমি, আমরা তো সবাই বাড়িতেই রয়েছি।'

এই সময়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির ঠং ঠং শব্দ শোনা গেল। বাবা বলে উঠলেন, 'যাক, ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা তাড়াতাড়িই এসে গেছে।'

দেখা গেল, হেড লাইট জ্বালিয়ে, একটা গাড়ি, বাড়িটার এক পাশ দিয়ে, পিছনের বাগানে এসে পড়লো। তখন কয়েকটা আগুনের শিখাও দেখা যাচ্ছে। ফট্ ফট্ শব্দে যেন কিছু ফাটছে, মনে হলো। বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়া গাড়িটা থেকে, দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল আলো বাড়িটার গায়ে পড়লো। আর হোস্ পাইপ্ দিয়ে জল ছুড়তে লাগলো। মানুষের চিৎকারের তো কোনো কথাই নেই।

গোগোল দেখলো, আর একটা গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে বাগানের দিকে এলো। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই, সেই গাড়ি থেকে কয়েকজন লাফিয়ে নামলো। গোগোলের বাবা বলে উঠলেন, 'পুলিসও এলো দেখছি।'

গোগোল পুলিস দেখে বুঝতে পারে নি। জানালা থেকে দেখলো, কয়েকজন হাত মুখ নেড়ে কী সব বলাবলি করছেন, আর ছাদের দিকে দেখাচ্ছেন। বাড়ির একটা দিকে তখন আগুনের লাল রেশ দেখা যাচ্ছে। তারপরেই দেখা গেল, অদ্ভুত এক ধরনের দড়ির মই ছাদের আলসের সঙ্গে আটকে, একজন লোক ছাদের উপরে উঠছে। গোগোলের বুক কেঁপে উঠলো। ছাদের একদিকে তখন আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

একজন ছাদে উঠে, কোথায় গেল, সেটা বুঝে ওঠবার আগেই আর একজনকে সেই মই বেয়ে ছাদে উঠতে দেখা গেল। তখন ছাদের দিকে, ঠিক সাপের জিভের মতো আগুনের শিখা যেন ছোবল মারছে।

বাবা নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছে, বোঝা যাচ্ছে না। ছাদের ওপরে কি কোনো মানুষ আছে নাকি?'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে বুঝলে?'

বাবা বললেন, 'কেউ না থাকলে, ওরা ছাদে উঠলো কেন? ছাদটা তো এখন

জ্বলন্ত কয়লার মতো তেতে আছে, যে কোনো মুহূর্তেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। কারোকে বাঁচাবার দরকার না থাকলে, এতো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চয়.ছাদে উঠতো না।'

ছাদের দিকে তখন আগুনের শিখা বেশ লেলিহান হয়ে উঠেছে। জলেও সে আগুন বাধা মানতে চাইছে না, যেন ফোঁস ফোঁস করে, রাগে দাউ দাউ করে উঠছে। তার মধ্যেই দেখা গেল, ছাদ থেকে, সেই মই বেয়ে কারোকে যেন নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। একজনের কাঁধের ওপরে, একজনের শরীর। দুজনে, সাবধানে মই বেয়ে নেমে আসছে। ধোঁয়ায় আর আগুনের শিখায়, তারা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, যদিও তাদের গায়ের ওপর আলো ফেলা আছে। আরো কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে, মইয়ের কাছে দাঁড়ালো। অনেকটা নীচে আসতেই, কয়েকজন হাত বাড়িয়ে তাদের ধরলো। আর ঠিক সে সময়েই ভীষণ শব্দে বাড়িটার এক অংশ ভেঙে পড়লো। সেই সঙ্গে লোকজনের আর্ত চিৎকার।

গোগোলের বাবা বললেন, 'ভাগিস বাগানটা ছিল। বাড়িটা যদি আমাদের বাড়ির গায়ে গায়ে হতো, তা হলে কী সর্বনাশই না হতো।'

গোগোলের গা কেঁপে উঠলো, ও মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো। বাবা যে কথাটা কেন বললেন, ও তা বুঝতে পেরেছে। গায়ের সঙ্গে লাগালাগি হলে, গোগোলের বাড়িতেও আগুন লেগে যেতো। কিন্তু অফিস বাড়িটার চারপাশেই অনেকখানি খালি জায়গা, ফাঁকার ওপরে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, আগুন কমে আসতে লাগলো। হোস্ পাইপের জলের তোড়ও বাড়তে লাগলো। কিন্তু বাড়িটার অনেকখানিই তখন পুড়ে গিয়েছে। এমন কি চিলেকোঠাটাও যেন মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে, থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

গোগোল ওর জীবনে এরকম ভয়ংকর দুর্ঘটনা চোখের সামনে দেখে নি। বাগানের পিছন থেকে গাড়ি দুটো যখন চলে গেল, বাবা জানালা বন্ধ করে দিলেন। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে, সামনের বসবার ঘরে গেল। সেখানে গিয়ে, টেবলের ওপর টাইমপিস্ ঘড়িতে দেখা গেল, রাত্রি নটা বেজেছে।

বাবা বললেন, 'ন'টা বেজে গেল? আশ্চর্য! তার মানে তিন ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বললো, এখনো জ্বলছে। সব নিভতে এখনো জল ঢালতে হবে।'

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, ওরা ছাদ থেকে কাকে নামালো?'

বাবা বললেন, 'সেটাই তো আমিও ভাবছি। ওই সময়ে ছাদে কে ছিল? নিশ্চয়ই খবর পেয়ে ওরা ছাদে উঠেছিল। দেখা যাক, কাল সকালের খবরের কাগজেই সব জানা যাবে।'

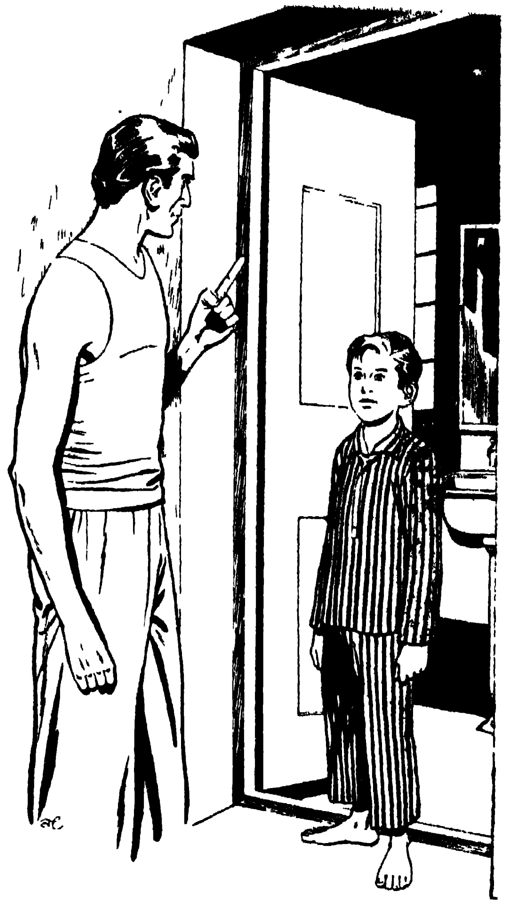
মা বলে উঠলেন, 'নটা বেজে গেল! গোগোল, শীগ্‌গির চল্‌, তোর খাবার খেয়ে, ওষুধ খেয়ে শোবার সময় হয়ে গেছে।'

গোগোলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খাবার আর ওষুধ আর শোয়া। কবে যে শরীরটা পুরোপুরি সেরে উঠবে! এখন ওর মোটেই খেতে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু উপায় নেই। যেতেই হবে। ও মায়ের সঙ্গে ভিতরের ঘরে গেল।

পরের দিন সকালে, গোগোল ঘুম থেকে উঠেই, বাবার কাছে গেল। খবরের কাগজে কী লিখেছে, তা শোনবার জন্য। বাবা তখন খবরের কাগজই পড়ছিলেন।

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা কালকের কথা কাগজে কী লিখেছে?'

বাবা বললেন, 'কিছুই না। লিখেছে, আগুন লেগেছিল, অনেক কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। পুলিস জানিয়েছে, আগুন লাগাটার ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এখনো বিশেষ কিছু জানা যায় নি।'



—'গোগোল, তুমি কাল দুপুরে অফিসবাড়ির চিলেকোঠায় কিছু দেখেছিলে?'

গোগোলের মনটা মোটেই খুশী হলো না। ও বাথরুমের দিকে গেল দাঁত মেজে মুখ ধুতে। সেই সময়েই ওদের কলিংবেল বেজে উঠলো। বাথরুম থেকেই, গোগোল টের পেলো, বেশ কয়েকজনের জুতোর শব্দ হচ্ছে। বাইরের ঘরে কী সব কথাবার্তা হচ্ছে। তার মধ্যে একজন মহিলার গলাও শোনা গেল, ইংরেজিতে কথা বলছেন।

গোগোল খুব কৌতূহল বোধ করলো। ভালো করে দাঁত মাজা হবার আগেই, বেসিনের কলের মুখ খুলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললো। আর ঠিক তখনই ওর বাবা এসে বাথরুমের দরজায় দাঁড়ালেন। বললেন, 'গোগোল, তুমি কাল দুপুরে অফিস-বাড়ির চিলেকোঠায় কিছু দেখেছিলে?'

গোগোল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হলো, ভয়ও পেলো। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

বাবা বললেন, 'এসো, বসবার ঘরে এসো।'

গোগোল অবাক্ হয়ে বাবার পিছনে পিছনে বসবার ঘরে এলো। দেখলো ঘর ভরতি পুলিসের পোশাক পরা লোক। তার মধ্যে জর্জের দিদি অ্যালিসও আছেন। গোগোল মনে মনে আরো ঘাবড়িয়ে গেল। গোগোলের দিকে তাকিয়ে সকলেই বড় বড় চোখ করে তাকালেন। তাঁদের চোখে অপার কৌতূহল আর বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা ফুটে রয়েছে। অ্যালিস এসে জড়িয়ে ধরলেন গোগোলকে। বললেন, 'গোগোল, কাল দুপুরে, জানালায় আলো ফেলে, তুমি অফিস বাড়ির দিকে আমাকে কী দেখাচ্ছিলে?'

গোগোল বললো, 'আমি তো জর্জকে সব বলেছি।'

অ্যালিস বললেন, 'এঁদের সকলের সামনে তুমি সব ব্যাপারটা বলো তো।'

গোগোল বাবার দিকে তাকালো। বাবা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বলো, তুমি যা দেখেছ, সব বলো ওঁদের।'

একজন পুলিস অফিসার, যাঁর কোমরের বেল্টে পিস্তল রয়েছে, তিনি উঠে বললেন, 'গোগোল তুমি বসে বসে, সব মনে করে বলো। তোমার কোনো ভয় নেই, বরং তুমি সব কথা ঠিক মতো বলতে পারলে, একটা বিরাট অপরাধ ধরা পড়বে।'

গোগোল আবার ওর বাবার দিকে তাকালো। বাবা ডেকে বললেন, 'এসো, তুমি আমার কাছে বসে সব কথা বলো।'

গোগোল বাবার গা ঘেঁষে বসে একটু স্বস্তিবোধ করলো। তারপর দুপুরে গুরুপদর ঘর থেকে আয়না নিয়ে এসে, খেলতে খেলতে, যা যা ওর চোখে পড়েছিল, আর মনে হয়েছিল, সব কথা একে একে বলে গেল। গোগোল লক্ষ্য করেছিল, একজন অফিসার সব কথাই লিখে নিচ্ছিলেন। আর একজন ভদ্রলোকও। ওর কথা শেষ হতেই, একজন ওর ফটো তুলে নিল।

অ্যালিস বললেন, 'গোগোল যা বললো, এসব কথাই আমি আমার ছোট ভাই জর্জের মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু তখনো ব্যাপারটাকে আমি তেমন আমল দিই নি। তারপরে অফিস বাড়িতে আগুন লাগতে দেখেই, গোগোলের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, কেমন একটা সন্দেহ হলো। আমি বাড়ির বাইরে ছুটে গিয়ে, ওষুধের দোকান থেকে থানায় ফোন করেছি।'

● আয়না নিয়ে খেলতে খেলতে

একজন পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনি তা করেছিলেন বলেই, চিলেকোঠা থেকে আমরা মৃতদেহ আবিষ্কার করতে পেরেছি, আর তার ফলেই একটা বিরাট ষড়যন্ত্র, এবং সেই সঙ্গে অপরাধীও ধরা পড়েছে।'

অ্যালিস বলে উঠলেন, 'না না অফিসার, আমি কেউ নই, সব আমার এই ছোট্ট ভাইটি গোগোলের কৃতিত্ব।'

বলেই অ্যালিস এগিয়ে গিয়ে গোগোলকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরলেন। অফিসার অ্যালিসের কাছ থেকে গোগোলকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে, তার গালে একটি চুমো খেয়ে বললেন, 'আমি জানি, আসলে সব কৃতিত্বই আমাদের এই সোনার টুকরো ছেলেটির।'

সবাই গোগোলকে আদরে আদরে ভরে দিতে লাগলো। বাইরে রাস্তায়, গোগোলদের বাড়ির সামনে তখন বিরাট জনতার ভিড়। পুলিস সামলিয়ে রাখতে পারে না। তারা জানতে চায়, ঘটনাটা কী ঘটেছে। একটু পরেই, জনতার মুখে মুখে গোগোলের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে গোগোলের মাও ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিসের বড় অফিসার গোগোলের বাবা মা, দুজনের কাছেই মাথা নত করে, আবেগের সঙ্গে বললেন, 'আপনাদের সন্তান গোগোল, আমাদের সকলের গর্ব। অনেক ছেলেই আয়না নিয়ে খেলা করে, কিন্তু খেলতে খেলতে তার চারপাশের সমস্ত খুঁটিনাটি কেউ এমন করে লক্ষ্য করে না। সে দৃষ্টিশক্তি আর ভাবনা করার ক্ষমতা সকলের থাকে না, যা গোগোলের আছে। সেইখানেই গোগোলের কৃতিত্ব।'

সকলেই গোগোলকে আরো কয়েক দফা আদর করে, অনেকগুলো ফটো তুলে বেরিয়ে গেলেন। গোগোলের বাবা মায়ের ফটোও বাদ গেল না। কিন্তু গোগোল দেখলো, মায়ের চোখে জল। সবাই চলে যাবার পরে গোগোল মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা তুমি কাঁদছো কেন?'

মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওরে, তুই যে এমন এক একটা কাণ্ড করিস, আমার বুকের মধ্যে কাঁপে। আমার একটা ছেলে তুই, কোন্ দিন যে কী বিপদে পড়বি, তাই ভাবি।'

গোগোল মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'ইস, বিপদে কেন পড়বো? আমি দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবো।'

● সমরেশ বসু

মা ওকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, 'তাই যেন আসতে পারো। এখন চলো তাড়াতাড়ি, তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেছে।'

উঃ, আবার সেই খাবার আর ওষুধ।

পরের দিন খবরের কাগজে, গোগোলের সঙ্গে অ্যালিস ভগ্নী আর বাবা মায়ের ছবিসহ, সরকারি অফিস ভবনের আগুন লাগা ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী প্রকাশ হলো। কিন্তু গোগোল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না। ও বাবাকে গিয়ে ধরলো।

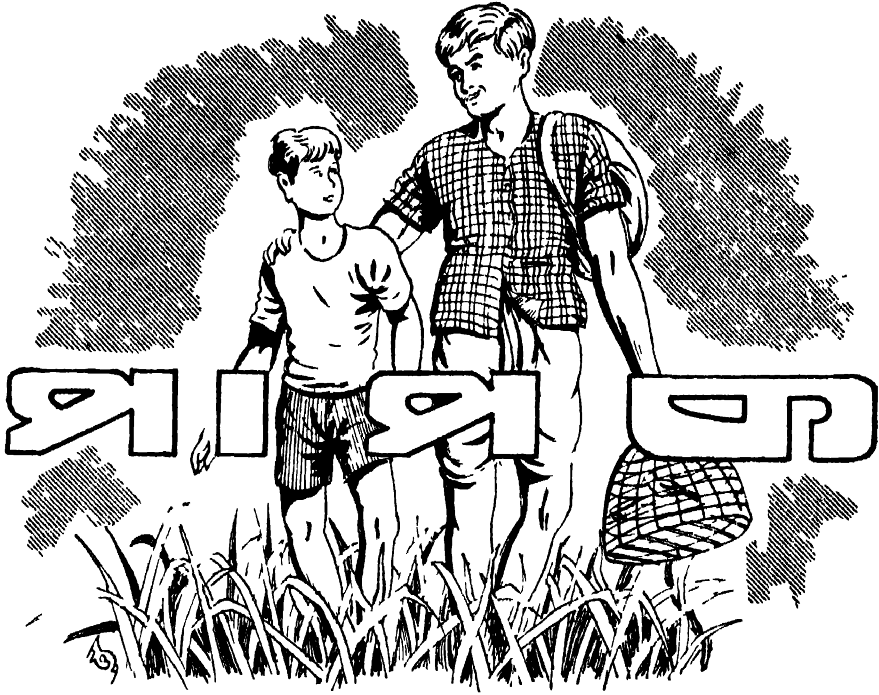
বাবা বললেন, সব বিষয়টা বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার এখনো হয় নি। তবু আমি তোমাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে লোকটিকে তুমি গতকাল চিলেকোঠায় একজনকে জাপটে ধরে ঢুকতে আর বেরোতে দেখেছিলে, সে লোকটা আসলে একজন জঘন্য খুনী। সেও একজন বড় অফিসার ছিল, কিন্তু বহু লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকা সে চুরি করেছিল। সেসব যাঁরা টের পেয়েছিল, তাঁদের দুজনকে সে দুদিনে মেরে ফেলেছে। প্রথমে একজনকে তাঁর বাড়িতে, সে কারণে অফিস বন্ধ ছিল। দ্বিতীয়, যাঁকে গতকাল চিলেকোঠায় মারতে দেখেছ। কিন্তু লোকটা তাতেও শান্ত হয়নি, কাগজপত্রের প্রমাণ লোপাট করার জন্য, দরোয়ানের সঙ্গে শলাষড়যন্ত্র করে, গোটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমার ঘটনাটা যদি অ্যালিসের মারফত পুলিসের কানে না যেতো, তবে পুলিস কিছুই ধরতে পারতো না।'

গোগোল অবাক্ হয়ে সব শুনলো, তারপরে জিজ্ঞেস করলো, 'সেই লোকটা ধরা পড়েছে?' বাবা বললেন, 'এখনো পড়ে নি, তবে তুমি যে বর্ণনা দিয়েছ, তার থেকে পুলিস তাকে চিনতে পেরেছে। সে পালিয়ে আছে কোথাও, তাকে খোঁজা হচ্ছে।'

গোগোল অবাক্ হয়ে, মনে মনে সেই লোকটার কথা ভাবতে লাগলো। এখন ও বুঝতে পেরেছে, চিলেকোঠার মধ্যে তাহলে ছুরি ঝলকিয়ে উঠতেই দেখেছিল!

বাবা বললেন, 'ওই, তোমার আয়না নিয়ে খেলার জ্বালায় কতো বড় কাণ্ড হয়ে গেল।'

গোগোল বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওর দুধে-দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠলো।



কণা সেন

গাঁয়ের পাঁচ বাড়িতে ধান ভেনে, মুড়ি ভেজে সংসার চালায় এক গরিব বুড়ী। তার নাতীর নাম পাপক। তিন বছর আগে পাপকের যখন ন বছর বয়স সেই সময় এক রাতে কলেরা হয়ে পাপকের মা-বাবা দুজনেই মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে আছে।

দেখতে ফুটফুটে সুন্দর চেহারা; ফরসা, গোলগাল। এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, টানা টানা চোখ, টানা ভুরু। ওকে দেখলেই সকলের ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু পাপকের দিদিমা এক এক সময় হাড় জ্বালাতন হয়ে যায় ওকে নিয়ে। পাপক বড় দুরন্ত। দুবেলা খাওয়া আর রাতে ঘুমোনর সময় ছাড়া অন্য সময় পাপককে কিছুতেই বাড়িতে ধরে রাখা যায় না। গাঁয়ে এক পাখি-শিকারী আছে, তার নাম জনার্দন ডোম। পাপক তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সব সময়। কোথায় পাখি, কোথায় প্রজাপতি,

কোথায় মাছ, কোথায় গাছ—এসব ব্যাপারে ওর দারুণ কৌতূহল। পাপকের একটা জাদুঘর মানে সংগ্রহশালা আছে। সেখানে সে কত আজব জিনিসও সংগ্রহ করে রেখেছে তার ঠিক নেই। একমাত্র লেখাপড়ার ব্যাপার ছাড়া আর সব কিছুতেই পাপকের খুব উৎসাহ। বই খুলে বসে বসে পড়া মুখস্থ করতে তার একটুও ভাল লাগে না, তাই লেখাপড়ার সঙ্গে তার ভাব নেই, আর এই নিয়েই দিদিমার সঙ্গে তার দুবেলা লাগে।

জনার্দন একদিন জিজ্ঞেসা করেছিল, "খোকাবাবু, তুমি ইস্কুলে যাও না?" পাপক তাকে লম্বা এক লেকচার দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, স্কুলটা বিচ্ছিরি জায়গা। ও আগে যখন বাবার কাছে থাকত তখন একটা স্কুলে পড়ত। একটুও ভাল লাগত না। পড়া না পারলে মাস্টারমশাইরা মারতেন। পাপক একদিনও পড়া বলতে পারত না তাই রোজই মার খেত। এখানেও গাঁয়ের স্কুলের খাতায় তার নাম আছে, দিদিমা ভরতি করে দিয়েছে (সে কিছুতেই ভরতি হতে চায় নি)। যেদিন তাকে ভরতি করা হল তার পরদিন থেকেই সে স্কুলে অ্যাবসেণ্ট মানে অনুপস্থিত।

দিদিমা যখন তাই নিয়ে খুব বকাবকি করে তখন এক একদিন স্কুলে যায় বটে কিন্তু, বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, একটা দুটো ক্লাস করেই পালিয়ে আসে।

জনার্দন সব শুনে খুব যেন চিন্তিত হয়ে বলেছিল, "লেখাপড়া শিখবে না? তাহলে তুমি কি করবে?" পাপক চটপট উত্তর দিয়েছিল, "তোমার মতো পাখি শিকার করব। তোমার কাজটা আমার খুব ভাল লাগে। তুমি তো পাখির মাংস খাবার জন্য শিকার কর না। জ্যান্ত পাখি ধরে হাটে বিক্রি করে দাও। আমিও তোমার মতো পাখি বিক্রি করব।"

ছেলেটাকে জনার্দনও ভালোবেসে ফেলেছিল। পাপক তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত, সে আপত্তি করত না।

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে একটা মস্তবড় ঝিল আছে। টলটলে জলভরা ঝিল, গাঁয়ের লোকেরা বলে, পদ্মঝিল। শরৎকালে পদ্মঝিলের বুক ভ'রে ফোটে রাজহাঁসের পালকের মতো রাশি রাশি সাদা পদ্ম। অন্য সময় নীল আকাশের বুকে মেঘেরা যত ছবি আঁকে সব ছবির ছায়া পড়ে তার বুকে। ঝিলটাকে তখন কখনো মনে হয় নানা রঙের চিত্র করা একখানা আয়নার মতো, কখনো বা ঘষা স্লেট পাথরের মতো। গাঁয়ের মেয়ে-বউরা মাঝে মাঝে জলে নেমে কোঁচড় ভরে গেঁড়ি-গুগলি তুলে আনে। তার

মাংস খেতে নাকি বড় সুস্বাদু। পদ্মঝিলের তিনদিকে মাঠ, ধানের খেত আর গাঁয়ের রাস্তা; আর একদিকের পাড় জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘন বন। ও বনে একটাও পদ্ম গাছ নেই, তবু গাঁয়ের লোকেরা বনটার নাম দিয়েছে, পদ্মবন। পদ্মবনে বেশী আছে নানারকম ফলের গাছ, আর আছে শিরিষ, পিপুল, জারুল, তেঁতুল, বাবলা, জাম, নিম প্রভৃতি কাঠের গাছ। আর আছে, অনেক পাখির আড্ডা। গাছে গাছে তাদের বাসা। চিল, শকুন, কাক, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, বনমোরগ, তিতির, ঘুঘু, চড়াই, ফিঙে, বুলবুলি, শালিক, কোকিল, মৌটুসি, বাবুই, ডাহুক—আরও কত পাখি সে জন্মকাল থেকে তিন পুরুষ-চারপুরুষ ধরে ও বনে বাস করছে তার লেখা-জোখা নেই।

শীতকালে পদ্মঝিলের পাড়ে বাইরে থেকে আসা সারস আর বালি হাঁসের দল আসর জমায়। এ গাঁয়ে ওরা 'টুরিস্ট' পাখি। কিন্তু জনার্দনের হাতে কারো রেহাই নেই। সে এমন নিপুণভাবে মাটির উপর তার জাল বিছিয়ে রাখে যে হাঁসেরা নীচে নামলেই আটকে যায় তার মধ্যে। সারস যে অত চালাক, তারাও বুঝতে পারে না জনার্দন কোথায় তাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে।

পাপক এসব দেখে, লক্ষ্য করে। তার খুব মজা লাগে। অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে হয়। একদিন সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, জনার্দনদা, পদ্মবনে কত পাখি আছে তুমি জানো?"

জনার্দন তার পাখি আটকে রাখার খাঁচাটা মেরামত করছিল; মুখ না তুলেই বলল, "মেলাই।"

—"তবু কত শুনি?"

—"এক হাজার, দু হাজার।"

—"ধ্যাৎ। ওইটুকু বনে অত পাখি ধরবে কি করে?" পাপক আপত্তি জানিয়ে বলল, "তুমি ঠিক করে বলো।"

জনার্দন তার হাতে ছোট্ট একটা মাথা বাঁকানো পেরেক দিয়ে বলল, "এইটে আগে সোজা করে দাও দেখি। দেখি তুমি কেমন বাহাদুর ছেলে।"

পাপক বলল, "ওঃ ভারী তো কাজ। পারি না ভাবছ বুঝি? এই ছাখো—।" একটা পাথরের উপর পেরেকটা রেখে আর একটা পাথর দিয়ে সেটাকে ঠুকে ঠুকে সম্পূর্ণ সোজা করল পাপক, তারপর পেরেকটা জনার্দনের হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও।"

—"শাবাশ ছেলে।" জনার্দন খুশী হয়ে বলল।

—"এইবার বলো।"

—"কি ?"

—"পদ্মবনে কত পাখি আছে ?"

জনার্দন ভেবেচিন্তে বলল, "পাঁচ হাজার, সাত হাজার।"

—"ধ্যাৎ। আবার তুমি আন্দাজে বলছ। পাঁচ হাজার কততে হয় জানো ? পাঁচের পিঠে তিনটে শূন্য বসালে তবে পাঁচ হাজার হয়। তার মানে পঞ্চাশ-শ। তাহলে পাঁচ হাজারের মধ্যে পঞ্চাশ-শটা পাখি থাকবে। তুমিই তো একদিন বলেছিলে, পদ্মবনে বড় বড় গাছ মাত্তর একশটা কি দু'একটা বেশী আছে। তাহলে একশটা গাছে পঞ্চাশ-শটা পাখি থাকতে গেলে একটা গাছে পাঁচশ পাখিকে থাকতে হয়। তাই কি থাকতে পারে নাকি ? একটা বড় গাছে কি পাঁচশটা করে বড় ডাল থাকে ?"

পাপকের হিসেব শুনে জনার্দন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "ওরে বাবা, অত সব আমি জানিনে। আমার পাখি পেলেই হল, গাছের ডালের হিসাব দিয়ে কি করব। চল, আজ তোমাকে একটা পাখি ধরে দেব।" পাপক দুহাতে তালি দিয়ে বলল, "কি মজা ! তুমি খুব ভাল জনার্দনদা, ভী—ষ—ণ ভাল তুমি। ওই যাঃ, একদম ভুলে যাচ্ছিলাম—" এই বলে পাপক পকেট থেকে একটা দেশালাই-এর বাক্স বার করল, তারপর সেটা জনার্দনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, "এই নাও। এর মধ্যে ঘাসপোকা আছে। পাখিরা এই পোকা খেতে খুব ভালোবাসে। আমি কাল মাঠ থেকে কুড়িয়ে এনেছি। যেখানে তুমি জাল পাতবে তার তলায় এগুলো ছড়িয়ে দিও, দেখো কত পাখি উড়ে আসবে পোকা খেতে।"

হাত বাড়িয়ে পাপকের হাত থেকে বাক্সটা নিতে গিয়ে জনার্দনের চোখ দুটো গিয়ে পড়ল পথের উপর। দেখল, দূরে হনহন করে এগিয়ে আসছে ক্ষান্ত বুড়ী, তার হাতে বেশ বড়-সড় একগাছা শলার ঝাঁটা। সর্বনাশ করেছে! জনার্দন হাত গুটিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "খোকাবাবু, পালাও। তোমার দিদিমা—।"

পাপকের দিদিমা যখন সেখানে এসে পৌঁছল, তখন ধারে-কাছে কেউ নেই, না পাপক, না জনার্দন। দুজনেই পালিয়েছে। ওরা যে ক্ষান্ত বুড়ীকে এত ভয় করে তার কারণ বুড়ীর বড় মুখ। জনার্দনকে দেখতে পেলেই সে গাল দিয়ে তার ভূত ভাগায়। কারণ তার ধারণা, জনার্দন তার নাতীর মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে। লোকটা নিশ্চয় কিছু

তুকতাক জানে, তা না হলে পাপক দিনরাত ওর কাছে পড়ে থাকে কেন। জনার্দন আগে আগে এই নিয়ে অনেক গাল খেয়েছে বুড়ীর। এখন তাই তাকে দূর থেকে দেখলেই সরে পড়ে। শুধু নিজে সরে পড়ে না, পাপক কাছে থাকলে তাকেও পালাবার পথ বাতলে দেয। বুড়ীর তো শুধু মুখ খারাপ নয়, রাগও খুব। রাগের মাথায় হাতের কাছে পেলে নাতীকে দু একঘা বসিয়ে দেওয়া কিছু বিচিত্র নয় তার পক্ষে।

বুড়ী চোখে ভাল দেখতে পায় না। কাছাকাছি এসে বাঁ হাতটা কপালে তুলে এদিক-ওদিক ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে গলা ছেড়ে হাঁক পাড়ল, "অ বউ, বউ—উ—উ—।"

ক্ষান্ত বুড়ী জনার্দনের বউকে ডাকছিল।

সামনেই তার বাড়ি। তকতকে করে গোবর দিয়ে নিকানো মাটির উঠোনে দুটো ছাগল আর একপাল মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বুড়ীর সেই ভাঙা কাঁসরের মতো গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে মুরগীগুলো তাদের কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে গেল উঠোন ছেড়ে। ছাগল দুটো ব্যা ব্যা করে ডেকে উঠল।

জনার্দনের বউ হন্ত-দন্ত হয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, "কি গো ক্ষান্ত দিদি, কি বলছ?"

বুড়ী রেগেই ছিল, এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, "বলছি আমার মাথা, বলছি আমার গুষ্টির পিণ্ডি। আমার নাতীটা গেল কোথায়? তোদের এখেনেই তো এসেছিল। হতচ্ছাড়া ছেলে কাক-কোকিল না ডাকতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তোরাই ওর মাথাটা খেলি বউ। জনাটার পাল্লায় পড়ে নাতীটা আমার গোল্লায় গেল।"

জনার্দনের বউ বুঝল এবার ব্যাপারটা। ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, "তা সকাল বেলায় হাতে ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছ কেন গা? ঝাঁটা দিয়ে মারবে নাকি নাতীকে?"

বুড়ী আরও রেগে গিয়ে বলল, "তাতে তোর কি লা? হাড়-জ্বালানে ছেলেটা কোথায় গেল বল্। ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে, তোর সঙ্গে বকবার সময় নেই আমার।"

জনার্দনের বউ-এরও কাজ পড়ে রয়েছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় তারও নেই। সে ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলল, "কি জানি কোথায় গেছে। আমি দেখিনি।"

বুড়ী খেঁকিয়ে উঠে বলল, "তুই না দেখিস জনা দেখেছে। সে কোথায়? ডাক তাকে।"

—"সে বাড়ি নেই, পদ্মবনে গেছে পাখি ধরতে।"

বুড়ী শুনে আর দাঁড়াল না, ঝাঁটা হাতে সোজা পদ্মবনের পথ ধরল। জনার্দনের বউ তাই দেখে ভাবল, যাঃ। না বললেই হতো কথাটা। ক্ষান্ত বুড়ীর মেজাজ আজ সত্যিই সপ্তমে চড়ে গেছে।

পদ্মঝিলের পাড়ে, ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে জনার্দন আর পাপক খুব হাসছিল। বুড়ী দিদিমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসে দুজনে মজাটা উপভোগ করছিল।

জনার্দন বলল, "কাজটা কিন্তু ভাল হল না খোকাবাবু। তোমার দিদিমা খুব রেগে যাবে। তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। আমি বিকেলে পাখিটা তোমাকে দিয়ে আসব।"

পাপক ঘাড় নেড়ে বলল, "উঁহু। তুমি পাখি ধর, আমি দেখব। এখন আমি বাড়ি যাব না। দেখনি, দিদিমা ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে!"

জনার্দন উঠে পড়ে বলল, "তবে চল। আজ কটা তিতির আর ঘুঘু ধরব। আর তোমার জন্য একটা শালিক।"

পাপক তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "শালিক না জনার্দনদা, একটা ময়না ধরে দাও। আমি পুষব। ময়না খুব সুন্দর কথা বলতে পারে।"

—"ময়না? ময়না তো পদ্মবনে নেই, খোকাবাবু।"

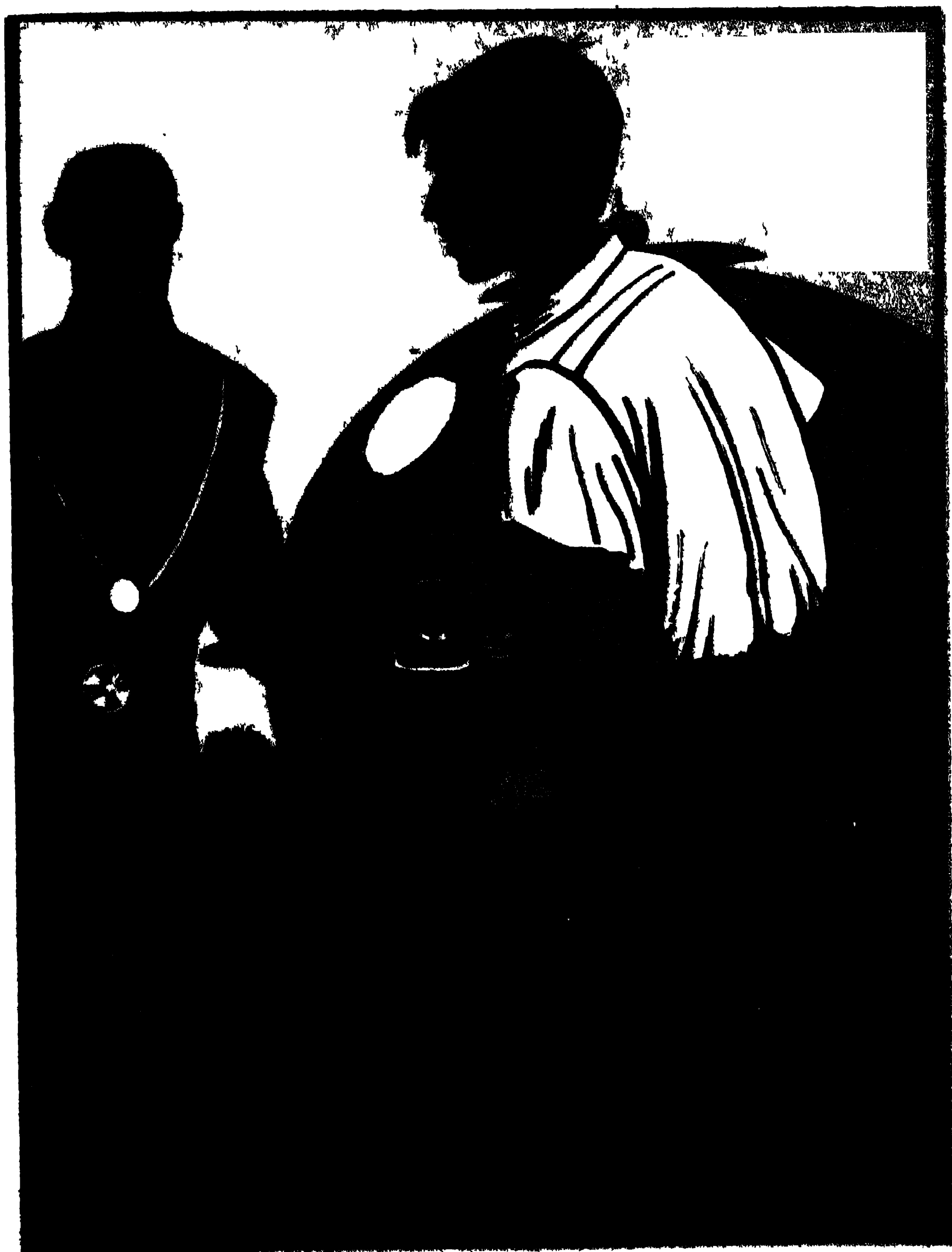
—"তাহলে টিয়া?"

—"টিয়াও নেই।" জনার্দন চলতে চলতে বলল, "বুলবুলি নেবে?"

—"উঁহু। তাহলে একটা হলুদ পাখি ধরে দাও। এত্তটুকু ছোট্ট পাখি কেমন ডাকে, বউ-কথা-কও—বউ-কথা-কও। আবার বলে, চোখ গেল—চোখ গেল।"

জনার্দন সংশোধন করে দিয়ে বলল, "চোখ গেল হলুদ পাখি বলে না, পাপিয়া বলে। কিন্তু তুমি যে-সব পাখি চাইছ তার একটাও এ বনে নেই। দেখিনি কখনো। আচ্ছা, এসো দেখি, কি পাখি তোমার জন্য ধরে দিতে পারি দেখি।"

বনে ঢুকে একটা জায়গায় ফাঁদ পাতল জনার্দন। এক চিলতে ফাঁকা, সবুজ, নরম ঘাসে ঢাকা জমি বেছে নিয়ে তার উপর সরু শক্ত সুতোয় বোনা জাল বিছিয়ে দিল। জালের তলায় এক মুঠো চাল মেশানো ধান দিল ছড়িয়ে। তারপর পাপককে নিয়ে কাছের একটা তেঁতুল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে বসল গা ঢাকা দিয়ে। একটু পরে সেখান থেকে অবিকল তিতির পাখির গলার ডাক ভেসে আসতে লাগল,



হে পৃথিবীর মানুষ আপনার কোন ভয় নেই

[পৃঃ ২৩৪

টি—টি—টি—। টি-ই—টি-ই—টি-ই—। থেমে থেমে এক একবার এক একরকমের সুর তুলতে লাগল জনার্দন তার গলায়।

সকালের এই সময়টায় বনের পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়ে যায় বাইরে, আহারের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। ওস্তাদ পাখি-শিকারীরা নানা কায়দায় গলায় আওয়াজ তুলে তাদের ডেকে আনে ফাদের কাছে।

পাপক প্রায় দম বন্ধ করে বসে বসে দেখছিল। তার চোখ ফাদের দিকে। সে জানে, একটু পরেই চারটে পাঁচটা তিতির উড়ে আসবে, তার মধ্যে অন্ততঃ দু তিনটে ফাঁদে আটকে যাবে চাল খেতে গিয়ে। তারপর—

কিন্তু তার আগেই সমস্ত বন কাঁপিয়ে ভাঙা কাঁসর বেজে উঠল যেন ঝন্ঝন্ করে, "পা—প্—পু—উ, ও—রে পা—প—ক, অ জনা—আ—আ—র্জ—না—র—দ—ন্—। ওরে ও হাড়হাবাতে, হতচ্ছাড়া, উনুনমুখো।"

পাপকের দিদিমা। বুড়ী একেবারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে ডাকাডাকি লাগিয়েছে দুজনের নাম ধরে। সেই সঙ্গে গাল পাড়ছে যা মুখে আসছে তাই বলে। শব্দ তো নয়, যেন স্টেনগানের গুলি বেরিয়ে আসছে বন দাপিয়ে।

পাপক জনার্দন দুজনেই চমকে উঠল এক সঙ্গে। বুড়ী যে পদ্মবনে এসে হানা দেবে তা ওরা ভাবতে পারে নি। পাপকের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল, সে একটা ঢোক গিলে বলল, "দিদিমা—।"

জনার্দন ভ্রূকুটি করে আস্তে আস্তে বলল, "দিলে সব মাটি করে। এত চ্যাচালে একটাও পাখি আসবে না। খোকাবাবু, তুমি যাও। দিদিমাকে ঠাণ্ডা করো গে।'

পাপকের চোখ ছল ছল করে উঠল, "যাব! কিন্তু—।"

—"না, না, কিন্তু টিন্তু নয়। শীগগির চলে যাও এখান থেকে।"

জনার্দন এবার বেশ কঠিন হয়েই বলল, "দিদিমাকে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে যাও। আঃ, দেরি কোর না, যাও বলছি।"

রাগে-দুঃখে পাপকের নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু উপায় নেই। এদিকে জনার্দনদা রেগে যাচ্ছে, ওদিকে বুড়ী দিদিমা সারা জঙ্গল মাতিয়ে চ্যাচাচ্ছে। চ্যাচাতে চ্যাচাতে এদিকেই আসছে। পাপক একবার তাকিয়ে দেখল জনার্দনের পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া মুখখানার দিকে, তারপর তেঁতুল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তীরের মতো ছুটল সামনের পথ ধরে। খানিকদূর এগিয়েই



—"শীগগির চলে যাও এখান থেকে।" [পৃঃ ২৯৭

দিদিমার সঙ্গে দেখা। বুড়ী তাকে দেখেই ঝাঁটা উঁচিয়ে ধরল, "শয়তান ছেলে, ইদিকে আয় একবার—।"

পাপক দাঁড়াল না, শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে দিদিমাকে পাশ কাটিয়ে ছুটতে ছুটতে বলল, "পালিয়ে এসো দিদিমা, শীগগির। সাপ গো, অ্যাত্ত বড় সাপ—কেউটে—।"

ক্ষান্ত বুড়ীর সাপে বড় ভয়। "—ওরে বাবারে" বলে সে চমকে উঠে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ঝাঁটা গাছা বগলে চেপে পাপকের পিছনে ছুটতে ছুটতে বলল, "কোথায় রে সাপ?"

—"তোমার পেছনে। দৌড়ে এসো।"

ক্ষান্ত বুড়ীকে সেদিন বাড়ি পর্যন্ত ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাপক। তিন দিন ধরে পায়ে কবিরাজী তেল মালিশ করে তবে তার পায়ের ব্যথা সারে।

জনার্দন তার কথা রেখেছিল। বিকেলে একটা ছোট খাঁচার মধ্যে ভরে একটা কালো পাখি, শ্যামা পাখি নাম—দিয়ে এসেছিল পাপককে। শ্যামা পাখি কথা বলতে পারে না বটে কিন্তু খুব সুন্দর শিস্ দিতে পারে।

দিদিমার শাসনের জ্বালায় পাপক যে কী করবে ভেবে পায় না। এক এক সময় ইচ্ছে করে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে। কিন্তু তাতেও বিপদ আছে। তখন আবার ওই বুড়ী দিদিমাই নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কেঁদে একসা কাণ্ড করবে। সে আরও খারাপ।

ক্ষান্ত বুড়ী ওকে ধরে বেঁধে স্কুলে দিযে আসে। এক পিরিয়ডের পর পাপক আর সেখানে নেই। বাইরে যাবার অজুহাতে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সে গিয়ে হাজির হয় চাষীরা যেখানে ধান রুইছে সেই খেতের ধারে।

এখন ভরা আষাঢ় মাস। ধানের খেতে জল থইথই করছে। মধ্যে মধ্যে মাটির আল বেঁধে জল আটকে রেখেছে চাষীরা, যাতে এক জমির জল আর এক জমিতে গিয়ে না পড়ে, কিংবা বেরিয়ে যেতে না পারে অন্য পথ দিয়ে। পাপক আলের উপর দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে ছুটছিল কারণ আলের পথগুলোই ওই রকম আঁকা-বাঁকা। তার দুই পা কাদায় মাখামাখি, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনদিকে তাকাবার সময়ও নেই তার। দুপাশের ধান জমিতে ধানগাছের চারা রুইছে চাষীমেয়েরা। একটা ছোট ছেলেকে ওরকম ভাবে ছুটতে দেখে তারা কিছু অবাক্ হয়ে তাকায় তার দিকে।

একটি মেয়ে থাকতে না পেরে বলে উঠল, "ও খোকা, ছুটছ কেন? পিছল পথ, পড়ে গেলে পা ভেঙে যাবে যে।"

পাপক থমকে দাঁড়ায়। ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নেয়। আকাশে ঘন মেঘ জমে আছে, যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। তার ঘামে-ভেজা ফুটফুটে সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে আর একটি বউ বলে, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছ তুমি? চারদিকে জলে ভরা আল, দেখছ না, পথ নেই? কোন্ গাঁয়ে যাবে তুমি?"

পাপক একবার বউটির হাতের গোছাভরা ধান গাছের কচি চারাগুলোর দিকে তাকায় তারপর কি ভেবে জিজ্ঞেস করে, "তোমরা ও কি করছ?"

● কণা সেন

বউটি হেসে বলে, "বীজধানের চারা লাগাচ্ছি।"

—"কি ধান?"

—"আমন।" বউটি জবাব দেয়, তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

—"ওই দিকে।" সামনের পথে দূরের দিকে হাত তুলে দেখায় পাপক। তার পরেই আবার ছুট। খানিকটা দূর গিয়ে আবার তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। সামনে আর পথ নেই। চাষী বউটি যা বলেছিল তা-ই ঠিক। চাষীরা আলের পর আল বেঁধে ওপারের মাঠ পর্যন্ত এমন ভাবে টেনে নিয়ে গেছে যে পথের সব চিহ্ন হারিয়ে গেছে।

চারিদিকে কাদা ভরা জমিগুলোতে জল, শুধু জল। খেত ভরা নতুন ধান গাছের চারা বর্ষার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে খুশীতে এদিক ওদিক দুলছে। হাওয়াটা বেশ ভিজে ভিজে আর ঠাণ্ডা, বর্ষার হাওয়ায় জলকণার ভাগ বেশী থাকে। পাপকের কেমন শীত শীত করতে লাগল। মনটাও দমে গেল বেশ। সে যাচ্ছিল পদ্মবিলে। আলের পথে তাড়াতাড়ি পৌঁছবে ভেবেছিল। সে জানত না, এখন ধান রোয়ার সময়। এখন আর এ পথে চলাফেরার সুবিধা নেই, শুকনোর সময় যেমন থাকে।

পাপক ফিরে চলল। পথে আবার সেই চাষী মেয়েদের সঙ্গে দেখা। ওরা তখনো কাজ করছে। সেই বউটি সকৌতুকে বলে, "কি খোকা, যেতে পারলে না?" পাপক গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, "না। তোমরা সব রাস্তা আটকে রেখেছ। আমাকে অন্য পথ দিয়ে যেতে হবে।" অন্য একটি মেয়ে এবার বলে, "হ্যাঁ খোকা, তুমি আমাদের 'ক্ষান্ত দিদির নাতী না?"

পাপক চমকে গিয়ে বলে, "এই রে, তুমি আমার দিদিমার নাম জানো? বলে দিও না যেন আমি এদিকে এসেছিলাম।" বলে সে আর দাঁড়ায় না, সোজা দৌড় দেয় স্কুলের দিকে।

—"গোবিন্দ দাদা, এটা কি চালের ধান বলো দেখি?" পাপক পকেট থেকে এক মুঠো ধান বার করে দেখাল চাষী গোবিন্দ মণ্ডলকে। বুড়ো দেখেই বলল, "বোরো ধান।"

—"আর এইটে?" আবার কতগুলো কাগজে মোড়া ধান আর এক পকেট থেকে বার করল পাপক, খুলে ধরল গোবিন্দর সামনে।

"—কাশিফুল।" "—এইগুলো?" "—আমন।" "এইগুলো?" "সীতাশাল।" "এইগুলো?" "রামশালী।" "আর এইগুলো?" "এ তো খৈ-এর ধান।" বুড়ো গোবিন্দ ফোকলামুখে হেসে বলল, "এত ধান তুমি কোথায় পেলে খোকাবাবু?"

—"যোগাড় করেছি। পাখিতে কোন ধান ভাল খায়, বলো তো?"

পাপক গোবিন্দ দাদার গা ঘেঁষে বসে গোপন কথা বলার মত করে জিজ্ঞেস করল।

গোবিন্দ পাপককে চেনে। এ গাঁয়ে এই দুরন্ত, প্রাণচঞ্চল শিশুটিকে চেনে না এমন কেউ নেই। পাপককে যত চেনে তত চেনে তার ডাকসাইটে দিদিমাকে। গোবিন্দ আবার হেসে বলল, "পাখিতে সব ধান খায়। কিন্তু কাল সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে খোকাবাবু?"

পাপক চটপট উত্তর দিল, "জেলেপাড়ায় গিয়েছিলাম। পাখিরা মাছ খায় কিনা, কোন্ পাখিতে কি মাছ খায়, এইসব জানতে। একটা কবিতা শোন,

সব পাখিতেই মাছ পেলে খায়
মাছরাঙাটাই কলঙ্কিনী।
সবাই কলম ধার করে নেয়,
আমিই শুধু কলম কিনি।

কবিদাদু আর তার এক বন্ধু দু'জনে মিলে এই কবিতাটা লিখেছেন। শেষ লাইন দুটো কবিদাদুর লেখা। কবিদাদু কে, বুঝতে পারলে?"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "না। তোমার দাদু?"

—"না, না, আমার দাদু কবিতা লিখতে জানত না। কবিদাদুর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মস্তবড় কবি ছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিদ্বান কবি। কবিতাটার মানে কিছু বুঝতে পারলে?"

গোবিন্দ আবার হাসিমুখে মাথা নাড়ে, "না। তুমি বুঝিয়ে দাও।"

পাপক পরম উৎসাহের সঙ্গে বলে, "তাহলে শোন। মানেটা আমি আগে যে ইস্কুলে পড়তাম সেই ইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। কবিতাটার মানে হচ্ছে, সব পাখিই মাছ পেলে খায় শুধু মাছ-খেকো পাখি বলে নিন্দে হয় মাছরাঙার। আর কবিদাদুর কাছ থেকে সবাই কলম ধার করে নিয়ে যেত, সে কলম তিনি আর ফেরত পেতেন না, তাই তাঁকে রোজ একটা করে কলম কিনতে হতো।"

● কণ্না সেন

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বলল, "রোজ?"

—"হ্যাঁ, রোজ! তিনি তো খুব লিখতেন, কলম না হলে তাঁর চলত না যে।"

কবিতা এবং তার ব্যাখ্যা শুনে গোবিন্দ মুগ্ধ। সে বলল, "তুমি এত জানো, এমন ভাল ছড়া বল, তাহলে তুমি ইস্কুলে যাও না কেন, খোকাবাবু?"

পাপক এ-কথায় একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমাদের সব্বার খালি ঐ এক কথা, ইস্কুল—ইস্কুল। ইস্কুলে কি হয়? ধান চেনায়? পাখি চেনায়? গাছ চেনায়? গাছ চেনায়? প্রজাপতি ধরতে দেয়? পিঁপড়েদের চিনি খাওয়াতে দেয়? কাঠবিড়ালীর সঙ্গে খেলতে দেয়? পাখির বাসা থেকে ডিম পাড়তে দেয়? ইস্কুলে শুধু বই পড়ায়। আমি কখ্খোন ইস্কুলে যাব না।"

গোবিন্দ যেন এবার কিছুটা চিন্তিত হয়ে বলল, "কিন্তু ইদিকে যে তোমার দিদিমা তোমাকে ভূতে পেয়েছে ভেবে ওঝা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাল আমার কাছে এসেছিল। না খোকাবাবু, তুমি ইস্কুলে যাও। ওঝার ঝাঁটার চেয়ে ইস্কুল ভাল। আর তোমার যা বুদ্ধি তুমি পড়া-লেখা শিখলে অনেক বড় হবে।" এই বলে গোবিন্দ উঠে পড়ল। বেলা হয়ে যাচ্ছে, তাকে মাঠে যেতে হবে। পাপকও বেরিয়ে পড়ল পাখিদের ধান খাওয়াতে।

এর কয়েকদিন পরেই ঘটল সেই সাংঘাতিক ঘটনাটা।

*

বেলা তখন নটা, সাড়ে নটা হবে। পাপককে নিয়ে তার বাড়িতে মহামারী কাণ্ড বেধে গেছে। কদিন আগে পাপকের দিদিমাকে কে যেন বলেছিল, "তোমার নাতীকে ভূতে পেয়েছে। দিন রাত বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় আর আবর্জনা কুড়োয়। ওকে ওঝা দেখাও।" ক্ষান্ত বুড়ী এদিকে খুব সরল মানুষ, সে তাই বিশ্বাস করেছে। বাস্তবিক, ছেলেরা এই বয়সে একটু আধটু দুরন্ত হয়, দল বেঁধে দুষ্টুমি করে, ঝগড়া মারামারি ইত্যাদিও তাদের মধ্যে হয়। কিন্তু পাপক যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। আর দিন দিনই বেয়াড়া হচ্ছে। ওর দৌরাত্ম্যও একেবারে অন্য রকম। কারো সঙ্গে ওর ঝগড়া-বিবাদ নেই। বন্ধুদের সঙ্গে বেশী ভাবও নেই, মারামারিও নেই। তাকে কেউ মারলেও সে নালিশ করে না, কাঁদে না, মুখ খারাপ করে গালাগালি করে না। এসব ভুতুড়ে কাণ্ড ছাড়া আর কি? ভূতে না পেলে এই বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে খেলাধুলো, নাওয়া-খাওয়া ভুলে, স্কুল পালিয়ে সারাদিন কোথায় পাখি, কোথায় পোকামাকড়, কোথায়

মাছের দাঁত, পাখির ডিম, সাপের খোলস—এই সব খুঁজে বেড়ায়? নিজেদের বাড়িতে পাপকের নিজের একটা সংগ্রহশালা আছে, তার কথা আগে বলেছি। কি নেই সেখানে? গাছের শুকনো বাকল, কাঠের টুকরো, রকমারি গাছের শিকড়, পাতা, শুকনো ফল, তেঁতুল—শিরীষ—ঘাসের বিচি, শালিক—টিকটিকি—সাপের ডিম, সাপের খোলস, বোতলের জলে মাছ, কৌটোর মধ্যে ধান, মাটির সরায় খোল, তুষ, ভুষি, খুদ, ভোলামাছের দাঁত, রুই মাছের আঁষ, মরা কাঁচ পোকা—ভেলভেট পোকা—প্রজাপতি, বাবুই—টুনটুনি—ছাতার পাখির বাসা, ভাঙা পুতুল, দেশলাই-এর বাক্স ইত্যাদি অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যাবে তার সেই আজব জাদুঘরে ঢুকলে। দিদিমা একবার ঐ অখাদ্য জিনিসগুলো ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে গিয়েছিল, পাপক সেদিন রেগে-কেঁদে, হাত-পা ছুড়ে সাংঘাতিক কাণ্ড করেছিল। সেই থেকে নাতীর ওসব জিনিসে সে আর ভয়ে হাত দেয় না।

কিন্তু এসব তো ভাল কথা নয়। লেখাপড়ায় মন নেই শুধু রাজ্যের আবর্জনা কুড়িয়ে এনে ঘরে জড়ো করা আর তাই নিয়ে দিন কাটানো। এসব অপদেবতার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। পাপকের বাড়িতে তাই ওঝা এসেছে পাপকের ঘাড়ের ভূত নামাতে। সঙ্গে এসেছে অনেক লোক।

গাঁয়ের নাম করা গুণীন ওঝা লক্ষ্মণ সামুই। চেহারাটা শুকনো, দড়ির মতো পাকানো। তালপাতার সেপাই-এর মতো লম্বা, ঢ্যাঙা, গায়ে একটুও মাংস নেই, শুধু হাড়। বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে। গায়ের রং আবলুশ কাঠের মতো কালো। মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি চুল। মুখে গোঁফ-দাড়ি মিলে মিশে নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত, এক এক জায়গায় তার এক এক রকমের রং! গলায় লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, গেরুয়া ইত্যাদি রকমারি রঙের চার পাঁচটা পাথরের মালা। দুহাতে দুটো মোটা লোহার বালা, বাহুতে রুদ্রাক্ষের অনন্ত, কানে দুটো ছোট তামার গোল রিং। কপালে একটা বড় তেল সিঁদুরের ফোঁটা। পরনে মাল-কোঁচা মেরে পরা লাল কাপড়, গায়ে গেরি মাটিতে ছোপানো একটা ময়লা ফতুয়া। চোখা নাকের দুপাশে ছোট ছোট দুটো চোখে তীব্র দৃষ্টি। ছোট ছেলে মেয়েরা ওর ধার-পাশ দিয়ে হাঁটে না। দূর থেকে দেখলেই পালায়।

লক্ষ্মণ ওঝা সব রকমের তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র জানে। ভূত তাড়াতে পারে, সাপের বিষ নামাতে পারে, রোগ সারাতে পারে, হাত গুণতে জানে। গাঁয়ে তার খুব নাম-

ডাক। এ সব কাজের জন্য পয়সা-টয়সা সে আলাদা কিছু নেয় না, শুধু চাল-ডাল-তেল-নুন আর কাঁচা আনাজপাতি দিযে একটা 'সিধে' সাজিয়ে দিতে হয় পাঁচ সিকা দক্ষিণা সমেত। রোজগার তার ভালই হয়।

আবার পাপকের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

সকাল থেকে পাপককে সেদিন দিদিমা বাড়িতে আটকে রেখেছে। লক্ষমণ ওঝার পিছন পিছন পাপকের স্কুলের অনেক বন্ধু এসেছে, আরও এসেছে অনেক লোক। তাদের মধ্যে গাঁয়ের মাতব্বরও দুচারজন আছে।

ওঝা মশাই উঠোনের মাঝখানে সাজি মাটির খড়ি দিয়ে একটা দাগ কাটল বেশ বড় আর গোল করে। সরষে ছিটিয়ে, মন্ত্র পড়ে দাগটানা গণ্ডীটাকে শুদ্ধ করল। তার ভিতরে পাতা হল একটা ছোট জলচৌকি রোগীকে বসাবার জন্য। সেটাকেও মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করে নেওয়া হল। তারপর চৌকির পাশে একটা ঝাঁটা রেখে পাপককে নিয়ে আসতে বলল লক্ষ্মণ।

পাপক বারান্দায় বসে সব দেখছিল। লক্ষমণ ওঝাকে সে মোটেই পছন্দ করে না। চেহারাটাই তার এমন যে দেখলেই পাপকের ভয় করে। দিদিমা কাছে আসতেই সে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, প্রবল বেগে দুহাত ছুড়ে বলল, "না, আমি যাব না।" দিদিমা সমান তেজে ধমক দিয়ে বলল,—"যাবি না মানে? তোর ঘাড় যাবে। চল্ বলছি।" —পাপকের একখানা হাত ধরে ফেলে টানতে লাগল ক্ষান্ত বুড়ী।

পাপক নিজের হাত ছাড়াবার চেস্টা করতে করতে চেঁচিয়ে বলল, "না যাব না। ছাড় আমাকে। ওই বিচ্ছিরি লোকটার কাছে আমি কিছুতেই যাব না। ও আমাকে ঝাটা দিয়ে মারবে।" পাপক এর আগে একবার ভূত ছাড়ানো দেখেছে। সে যে কি ভয়াবহ কাণ্ড, সে জানে। জোর করে দিদিমার হাত ছাড়িয়ে সে দাওয়া থেকে নেমে একদিকে ছুট দিল। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। উঠোনের চারিদিকে তখন মেয়ে পুরুষের ভিড় জমে গেছে। তাদের মধ্যে ছিল গাঁয়ের দুটো ডানপিটে ছেলে, কানাই আর বলাই। তারাও এসেছিল মজা দেখতে। তারা ছুটে এসে ধরে ফেলল পাপকের দুটো হাত। পাপক চেঁচিয়ে উঠল, "ছাড়, ছাড়, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার অসুখ করেনি, আমার কিছু হয়নি। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।"

কিন্তু কেউ তাকে ছেড়ে দিল না।

কানাই-বলাই তাকে টানতে টানতে এনে হাজির করল ওঝার কাছে। এমন একটা



—"ছাড়, ছাড়, আমাকে ছেড়ে দাও।" [পৃঃ ৩০৪

তামাশার ব্যাপার শুরুতেই ভণ্ডুল হয়ে যায়, এটা তাদের মনঃপূত নয়। কানাই দাঁত বার করে হেসে বলল, "ঠাণ্ডা হয়ে বোস্, না হলে হাত-পা বেঁধে দেব।"

পাপক এবার ভয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

লক্ষ্মণ ওঝা দাড়ির ফাকে মুচকি হেসে বলল, "ভয় নেই খোকা। চুপটি করে চৌকিতে বোস। তোমার ঘাড়ে যিনি ভয় কইরেছেন একবার দেখি। যদি শাকচুন্নী হয় মাত্তর তিন ঘা। বেম্ম্যদত্যি হলি পাঁচ, কন্দকাটা হলি দুই।"

পাপক কিছুতেই গণ্ডীর মধ্যে বসবে না, কাঁদতে কাঁদতে দাপাদাপি লাগিয়ে দিল। ওঝা মাথা নেড়ে বলল, "হইছে। এনারে কারিয়া পিরেত বাবায় পাইছে। তা কারিয়া পিরেত বাবা, অত মেজাজ কোরোনি, মুই লক্ষ্মণ ওঝা আইছি।"

বলতে বলতে ঝাটাগাছা তুলে নিল সে।

পাপক পা দাপাতে দাপাতে তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছিল, এবার জলচৌকিতে এমন একটা

লাথি মারল যে সেটা গণ্ডীর বাইরে ছিটকে চলে গেল। তাই দেখে ওঝার সঙ্গে অনেকেই হইহই করে উঠল।

পাপক তখন সত্যি ক্ষেপে গেছে।

ফরসা টুকটুকে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, দরদর করে কপালের ঘাম, মুখের লালা আর চোখের জল এক সঙ্গে গড়াচ্ছে মুখ-বুক বেয়ে। দুহাতের উলটো পিঠে চোখ দুটো একবার মুছে নিয়েই সে আবার ছুটল, যেদিকে কানাই-বলাই দাঁড়িয়ে ছিল তার উলটো দিকে।

ওঝা চেঁচিয়ে বলল, "ধর ধর—।"

জনতাও চ্যাঁচাতে লাগল, "ধর ধর—।"

কিন্তু ওদিকে পাপককে কেউ ধরতে সাহস করল না।

সে তো আর পাপক নেই, কারিয়া পিরেত বাবা হয়ে গেছে! ভূতের গায়ে কে হাত দেবে?

পাপক একে ঠেলে, ওকে গুঁতো মেরে ভিড়ের মধ্যে দৌড়োচ্ছিল মরিয়া হয়ে! হঠাৎ মাঝ পথ থেকে দুখানা হাত তাকে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল একেবারে। পাপক তাকিয়ে দেখল এবং দেখেই চিনল, ইনি তাঁদের স্কুলে নতুন-আসা বিজ্ঞানের মাস্টার-মশাই। মধ্যবয়স্ক, চশমা পরা, সুদর্শন, সৌম্য চেহারার ভদ্রলোকটি তাকে তুলে ধরেছেন বুকের কাছে। তাঁর মুখে মৃদু কৌতুকের হাসি। পাপক ছটফট করতে করতে বলল, "নামিয়ে দিন, নামিয়ে দিন আমাকে। ছেড়ে দিন আমাকে।"

ভদ্রলোক তাকে নামিয়ে দিলেন কিন্তু ছেড়ে দিলেন না, একখানা হাত শক্ত করে ধরে রেখে বললেন, "কি হয়েছে? এখানে এত ভিড় কিসের? তোমাকে ওরা কি করছে?"

পাপক হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ওঝা এসেছে আমাকে মারতে। আমি ওখানে যাব না। আমাকে ছেড়ে দিন আপনি।"

ভদ্রলোক ছাড়লেন না, বরং তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "ভয় নেই। আমার কাছে থাক।"

ইতিমধ্যে উপস্থিত সকলের চোখ গিয়ে পড়েছে ভদ্রলোকের দিকে। তাঁকে চিনতে পেরে ভিড়ের মধ্য থেকে একজন মাতব্বর গোছের লোক এগিয়ে এল, দুহাত জোড় করে ঝুঁকে পড়ে বলল, "পেন্নাম হই মাস্টারমশায়। আপনি ইদিকে?"

মাস্টারমশাইও তাকে চিনলেন, মৃদু হেসে বললেন, "তুমি রামপদ। স্কুলে যাচ্ছিলাম। শুনলাম এখানে নাকি একটা বাচ্চা ছেলেকে ভূত ছাড়ানো হচ্ছে। ছেলেটি কে হে?"

রামপদ বলল, "ওই যে আপনার কাছে দাঁড়িয়ে। ছেলেটাকে সত্যি ভূতে পেয়েছে, না হলে এতগুলো লোককে হিমশিম খাইযে দিলে! ওকে ছেড়ে দ্যান মাস্টারমশায়। ওঝার ওষুধ না পড়লে—।"

মাস্টারমশাই সমবেত জনতার উৎসুক মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তারপর দ্রুত চিন্তা করতে করতে গম্ভীর মুখে বললেন, "এ তো আমাদের স্কুলের ছেলে। তাই না পাপক, স্কুলের খাতায তোমার নাম আছে না?"

পাপক নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। তারপর ভদ্রলোকের হাতখানা আরও ভাল করে আঁকড়ে ধরল। সে বুঝতে পেরেছিল, ইনি তার উদ্ধারকর্তা হয়ে এসেছেন।

মাস্টারমশাই আরও গম্ভীর হলেন এবার, বললেন, "স্কুলের ছেলের উপর এমন অত্যাচার করছ কেন তোমরা? ওকে ভূতে পেয়েছে কে বললে তোমাদের?"

রামপদই উত্তর দিল, "ওর দিদিমাকে বলেছে কেলে বাগদির বউ। লক্ষ্মণ ওঝাও এইমাত্র বলছিল, ওর ঘাড়ে কারিয়া পিরেত বাবা ভর করেছেন। ইস্কুলের খাতায় নাম থাকলে কি হবে, ও ছেলে ইস্কুলে যায় না। বন-বাদাড়ে আবর্জনা কুড়িয়ে বেড়ায়। আমাদের এসব গাঁ গেরামে ভূতের খুব উৎপাত, মাস্টারমশায। এই তো মাস দুই আগে চণ্ডীপদর বউকে পেত্নীতে পেয়েছিল। লক্ষ্মণ ওঝার ঝাঁটা খেযে তবে পেত্নী পালায়। এ ছেলেটারও চিকিচ্ছে দরকার, না হলে পাগল হয়ে যাবে। ক্ষান্ত দিদির তাহলে আর দুঃখের সীমা থাকবে না।"

মাস্টারমশাই ধৈর্য ধরে রামপদর সব কথা শুনে গেলেন তারপর মুখের গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, "কই, লক্ষ্মণ ওঝা আছে এখানে? ডাকো তো তাকে।" ডাকতে হল না, লক্ষ্মণ নিজেই এগিয়ে এল। মাস্টারমশাই তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে কঠোর কণ্ঠে বললেন, "কারিয়া পিরেত বাবা কোন গোত্রের ভূত, ওঝা মশাই?" লক্ষ্মণ ওঝা সেই গলার আওয়াজেই ঘাবড়ে গেল, আমতা আমতা করে বলল, "আজ্ঞে—ছেলেটা—ওর দিদিমা—।" লক্ষ্মণ তার কথা শেষ করতে পারল না, মাস্টারমশাই গলা চড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "ওর দিদিমা যাই বলুক এর কিছুই হয়নি, আমি তো দেখছি দিব্যি সুস্থ ছেলে। আপনিই একে ক্ষেপিয়ে দিযেছেন। যান, আপনি বাড়ি যান। আপনারাও বাড়ি চলে যান। আমি একে স্কুলে নিয়ে যাব। আর রামপদ, তুমি টিফিনে আমার সঙ্গে স্কুলে একবার দেখা করবে।"

মাস্টারমশাইয়ের সেই তেজোদৃপ্ত মুখের চেহারা দেখে এবং গলার আওয়াজ শুনে

কেউ আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। একে একে সকলে সরে পড়ল। রামপদও। লক্ষ্মণ ওঝাও তার মাল-পত্র গুটিয়ে নিয়ে ব্যাজার মুখে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

আজকের দিনটাই তার মাটি।

জীবনরতনবাবু নতুন এসেছেন গাঁয়ের স্কুলে, বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে। এসে প্রধান শিক্ষক ভূদেববাবুর মুখে পাপক-সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছিলেন। গরিব বুড়ীর একমাত্র নাতী, ওর উপর অনেক আশা-ভরসা বুড়ীর। ছেলেও খুব বুদ্ধিমান, আচার ব্যবহারও ভদ্র। কিন্তু কি যে ওর ব্যাপার মোটেই স্কুলে আসতে চায় না। নিজে ওদের ক্লাস নিয়ে দেখেছেন ভূদেববাবু, ছেলেটি শুধু বুদ্ধিমান নয়, তীক্ষ্ণধী, বইয়ের পড়ার বাইরে নানা দিকে ওর প্রচণ্ড আগ্রহ এবং জ্ঞানও আছে। কিন্তু ওকে স্কুলে আনার এবং আটকে রাখার সবরকম চেস্টাই তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। এইসব দুঃখ করে একদিন বলেছিলেন ভূদেববাবু। শুনে পাপক-সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছিল জীবনরতন-বাবুর। পাপক যাদের সঙ্গে পড়ে তাদের কাছেও খোঁজখবর নিয়েছিলেন তিনি। পাপক একদিনও তার ক্লাস করেনি। ওদের বিজ্ঞানের ক্লাস টিফিন পিরিয়ডের পর এবং সে সময় কোনদিনই পাপক স্কুলে থাকে না। খাতায় ও মাসে তিন চারদিনের বেশী সে হাজির থাকে না।

জীবনরতনবাবু তাই ঠিক করেছিলেন, পাপকের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবেন এবং স্কুলের দিকে তার মন ফেরাতে চেষ্টা করবেন। পাপকের গল্প শুনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ছেলেটি কিছু অসাধারণ।

আজ সকালে স্কুলেরই একটি ছেলে, পাপকদের পাড়ায় থাকে, খবর দিয়েছিল তাঁকে যে, পাপকের দিদিমা ওঝা ডেকেছে কারণ পাপককে নাকি ভূতে পেয়েছে। শুনে আর বিলম্ব করেন নি তিনি। সেই ছেলেটিই তাঁকে এ বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছে। খুব ভাল সময় এসে পড়েছেন তিনি। ওঝার ঝাঁটা থেকে পাপককে বাঁচিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তার বন্ধু হয়ে উঠলেন জীবনরতনবাবু। কিছুক্ষণ আলাপের পর তাকে তিনি রাজী করিয়ে ফেললেন স্কুলে যাবার জন্য। ক্ষান্ত বুড়ীকে ডেকে বললেন, "ও বুড়ীমা, তোমার নাতীকে দুটি খাইয়ে দাও। ওকে আমি স্কুলে নিয়ে যাব।"

ক্ষান্ত বুড়ী তো আনন্দে দিশাহারা। তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপর একখানা চাটাই-এর আসন পেতে দিয়ে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলল, "এই যে বাবা দিই।

আপুনি বাবা, একটুকু বোস। হ্যাঁ বাবা, আপুনি কি নতুন এয়েচ আমাদের গাঁয়ে? তাই তো বলি, আমার পাপুর লেগে তো এমন করে কেউ ভাবে না!"

জীবনরতনবাবু দাওয়ায় জেঁকে বসলেন।

পাপকের নাওয়া-খাওয়া শেষ হলে, পাপকই তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের জাদুঘরে। জীবনরতনবাবু যেন তার সমবয়সী বন্ধু। তাঁকে নিজের সংগ্রহশালাটি না দেখিয়ে তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। পাপকের সেই বিচিত্র জাদুঘরটি দেখে জীবনরতনবাবুর বুঝতে বাকী রইল না যে প্রকৃতির রাজ্য ছেলেটির মনে কোথায় বাসা বেঁধে আছে। বড় আনন্দ হল তার সব দেখে শুনে, তারপর পাপকের হাত ধরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন স্কুলের উদ্দেশে।

পথে যেতে যেতে জীবনরতনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পাপক নাম কে রেখেছে?"

পাপক উত্তর দিল, "দিদিমা। এক রাত্তিরে, সে অনেকদিন আগে, আমার বাবা-মা কলেরা হয়ে মরে গেল! তখন দিদিমা খালি বলত, তুই একটা পাপ। বাপ-মা দুটোকেই খেয়েচিস। সেই 'পাপ পাপ' করতে করতে দিদিমাই নাম বানাল পাপক। আমার ভাল নাম তো পার্থসারথি দাস, ইস্কুলের খাতাতেও তাই আছে। বাবা ডাকত 'পার্থ' বলে।"

জীবনরতনবাবু বললেন, "তোমার দিদিমাকে বলতে হবে তোমার ডাক-নামটা বদলে রাখতে। তুমি পাপক নও, আজ থেকে তুমি জীবক।"

—"জীবক! জীবক মানে কি?" পাপক উৎসুক হয়ে জানতে চাইল। জীবনরতনবাবু বললেন, "জীবক মানে যে বেঁচে আছে। নামটা পছন্দ হয়েছে তোমার?"

—"খু-উ-ব পছন্দ হয়েছে।" পাপক ঘাড় হেলিয়ে হাসল, তারপর বলল, "পাপক নাম বিচ্ছিরি। পাপক মানে আমি জানি। যে পাপ করে তার নাম পাপক, তাই না মাস্টারমশাই?"

জীবনরতনবাবু শুধু একটু হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

তাঁর চোখের সামনে তখন একজন জীবক হাজার জীবক হয়ে হাসছিল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

———



সাধু ও চোর

মায়া বসু

রাজা বিক্রম মহাধার্মিক, মগধের অধিপতি,
প্রজাহিত ব্রতে সদা অচপল মতি।
দীনের বন্ধু মহৎ হৃদয় নৃপতি পুণ্যশ্লোক
ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তাঁহারে জানিত দেশের লোক।
পুত্রে প্রজাতে ছিল নাকো ভেদ তাঁর,
রাজার নিকটে পাইতো সকলে যথার্থ সুবিচার।

একদিন তিনি দিবস দ্বিপ্রহরে—
বন্দীশালাতে গেলেন একাকী কারা দর্শন তরে।

হেরি নৃপতিরে কয়জন অপরাধী
চরণ জড়ায়ে ধরিয়া তাঁহার উঠিল সকলে কাঁদি।
মগধেশ্বর বিচলিত অতি, বলিলেন; 'বল তবে,
কোন্ অপরাধে বন্দী হয়েছ সবে?'

সমস্বরেতে কহিল তাহারা, "পড়িয়াছি রাজ রোষে,
চৌর্যাপরাধে ধরিয়া এনেছে আমাদের বিনা দোষে।
তব বিচারক অন্যায় করি, করিয়াছে দণ্ডিত
তার অবিচারে হয়েছি আমরা স্বাধীনতা বঞ্চিত।
চোর একজন আছে অবশ্য, সত্য করেছে চুরি,
দোষী সেই তাই অনুতাপানলে মরিতেছে জ্বলি পুড়ি।

আমরা কেহই করি নাই চুরি, হরি নাই কারো ধন,
বিনা দোষে তবু বিচারক দিল এ হেন নির্বাসন।"
"সত্য তোমরা হও যদি সাধু, হও যদি নির্দোষ,
আদেশ আমার, স্পর্শ কখনো করিবে না রাজরোষ।
কোন্ জন চোর, কোন্ জন সাধু, হলে নিঃসংশয়
নিরপরাধেরে মুক্তি আজ্ঞা দিব আমি নিশ্চয়।"

সেথা হতে রাজা চলে যেতে যেতে চাহি কারা প্রাঙ্গণে
দেখিলেন সেই চোর একা বসে, অতি বিষাদিত মনে।
ক্ষীণ দেহে তার কোথায় পাপের ছাপ?
মুখের রেখায় আঁকা আছে শুধু সুগভীর সন্তাপ।

● মায়া বসু



হেরি নৃপতিরে
নয়নের জলে ভাসি,
প্রণমি তাঁহারে অবনতশিরে
নিকটে দাঁড়াল আসি।

অভিজ্ঞ চোখে চাহি তার পানে
কহিলেন রাজা তারে,
"সত্য করিয়া কহ, কোন্ দোষে
বন্দী এ কারাগারে ?"

কুণ্ঠিত ভাবে
অপরাধী তাঁরে কয় ;
"আমি চোর প্রভু,
সত্য এ পরিচয়।

জানেন কৃষ্ণ এই চুরি মোর সর্বপ্রথম পাপ,
অনুতাপে তাই জ্বলে পুড়ে মরি, পাই বড় সন্তাপ।

বহুদিন ধরে ছিলাম রুগ্ন, দয়ালু মনিব তাই,
চাকুরি হইতে বিদায় আমারে করিলেন সহসাই।
সত্যের পথ আঁকড়ি ধরিয়া রহিলাম প্রাণপণে,
দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিলাম কত, অর্থের প্রয়োজনে।
দিনের ওপরে কেটে গেল দিন জুটিল না কোন কাজ
বৎসর গেল অনাহারে আর অনটনে মহারাজ !

চোখের ওপরে শিশু সন্তান, পত্নীর অনাহার
সহ্য হল না একদিন প্রভু আর।

সৎপথে থেকে উপার্জনের উপায় না দেখি চোখে
ভিক্ষা চাহিলে করে দূর দূর, বিদ্রূপ করে লোকে।
নয়কো স্বভাবে, অভাবের দায়ে তস্কর তাই আমি
মিথ্যা বলিয়া তোমার করুণা লভিতে চাহি না স্বামী।

স্বপক্ষে মোর বলিবার কিছু নাই—
করিয়াছি চুরি, উচিত শাস্তি পেয়েছি যে আমি তাই।"

ভৎর্সনা করে কহিলেন রাজা, "ধিক্ ধিক্ শত ধিক্!
নিজ মুখে দোষ করিলে স্বীকার, বড় দেখি নির্ভীক।
কঠিন দণ্ড আরো কিছু
দিলে তবে,
তোমার মতন সাহসী চোরের
উচিত শাস্তি হবে।
চিত্তে আমার
সংশয় ছিল ঘোর,
প্রথম দিনেই পড়িয়াছ ধরা,
এ কেমন কাঁচা চোর?
বিনা অপরাধে যত সাধুদের
রেখেছে কারায় ধরি,
তারি মাঝখানে
একা তুমি চুরি করি

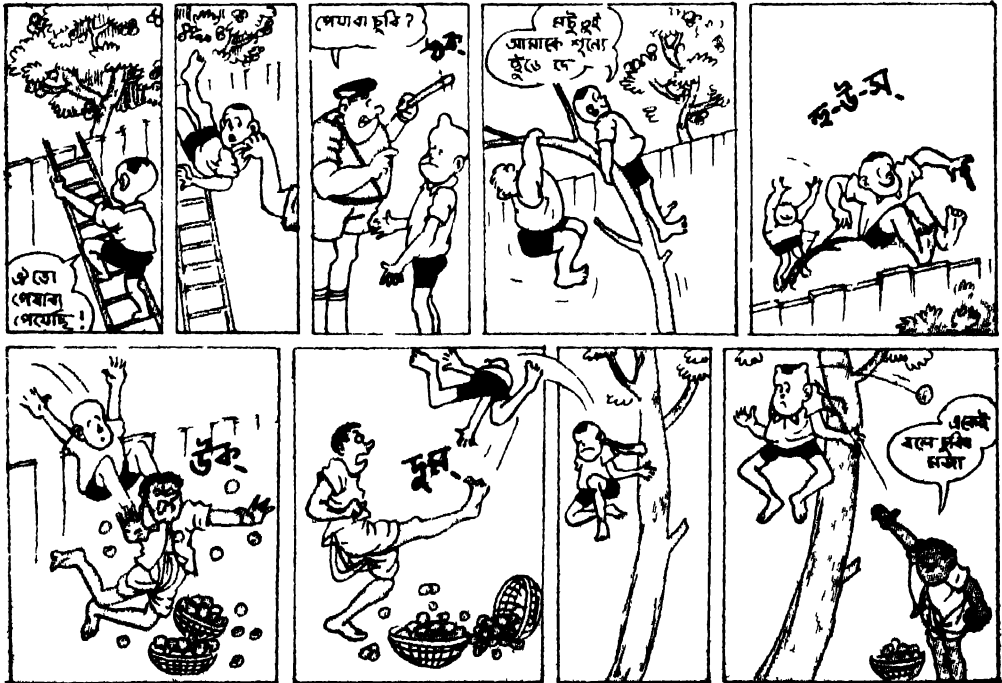


থাকিবে হেথায়, এ ত ভাল কথা নয়—
সৎ জন যেবা, কুসঙ্গে পড়ে সেও তো অসৎ হয়।

রাখিতে তোমারে এতেক সাধুর সনে—
ভরসা পাই না মনে।
গুরু দণ্ডই দিব হে তোমাকে, শুন ওহে তস্কর
মোর কোষাগার রক্ষার ভার দিলাম তোমার পর।
মাসান্তে পাবে ভাল দক্ষিণা যাহা তব প্রয়োজন
তাতেই ঘুচিবে দারিদ্র্য তব, অভাব ও অনটন।”

রাজার বচন শুনি বিহ্বল ভাসি নযনের জলে
বিমূঢ় বন্দী লুটায়ে পড়িল তাঁহার চরণ তলে।

● **অতি লোভের ফল**



প্রতিশোধ



ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বাস রাস্তা থেকে একটা চওড়া মেঠো রাস্তা ধান ক্ষেতের বুক চিরে সোজা নদীর দিকে এগিয়ে গেছে। এই রাস্তার ধারেই বহুদিনের পুরনো একটা ছোট্ট বাড়ি। বাড়িটা বিক্রি হবে। সেই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে খবরের কাগজে। কিন্তু এমনই অসম্ভব দাম চাওয়া হয়েছে বাড়িটার জন্য যে বিজ্ঞাপন দেখে বাড়ি কেনা দূরের কথা সকলে তো হেসেই অস্থির। কাজেই খদ্দের আর আসে না। পুরনো ভাঙা ছোট বাড়ি। তাও শহরের বাইরে। গ্রামের দিকে। অবশ্য পরিবেশটা বেশ মনোরম। তা যাই হোক। বাড়িটার খুব বেশী করেও দাম হওয়া উচিত সাত হাজার টাকা। তার জায়গায় দাম চাওয়া হয়েছে আশি হাজার। কাজেই কে কিনবে ঐ বাড়ি?

অবশেষে একদিন বাড়ি কেনবার খদ্দের এলো।

তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একজন বয়স্ক ছেলে বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ল—খট-খট-খট।

—কে? সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন একজন ভদ্রমহিলা।—কি চাই?

ছেলেটি ভদ্রমহিলার চোখ মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেল। কি ভয়ংকর রাশভারী মহিলা রে বাবা। বলল—আজ্ঞে আমি এই বাড়িটা কেনবার জন্যে—

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন—তুমি বাড়ি কিনবে? এর দাম জানো? আশি হাজার টাকা।

—তা হোক। তবু বাড়িটা আমার চাই।

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ চোখে একবার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন—অ। ভেতরে এসো। তারপর ঘরের ভেতর একটা নড়বড়ে চেয়ারে ছেলেটাকে বসিয়ে বললেন—বসো একটু। ভর সন্ধ্যেবেলায় যেমন এসেছ। আমি একটু তুলসীতলায় সন্ধ্যে দেখিয়ে আসি।

ঘরে একটি ছোট্ট লণ্ঠন জ্বেলে ছেলেটিকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা সন্ধ্যে দিতে চলে এলেন।

ছেলেটি বসে বসে ঘামতে লাগল। একবার পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা মুছে নিল। তারপর একসময় দেখল ভদ্রমহিলা আসছেন।

ভদ্রমহিলা এসে বললেন—তুমি কি সত্যিই বাড়িটা কিনবে বাবা?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন? এই বাড়িটার দাম পাঁচ হাজার টাকাও নয়। সাত হাজার হলেও খুব বেশী হয়ে যায়। সেই জায়গায় আমি চাইছি আশি হাজার। অথচ দাম আমি এক পয়সাও কমাবো না। তবু কিনবে?

—তবু কিনবো। বাড়িটা আমার চাই। এই রকম নিরিবিলি জায়গাই মনে মনে আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু এমন অসম্ভব দাম আপনি চাইছেন কেন?

—সে অনেক কথা। দাঁড়াও আগে তোমাকে একটু শরবত করে দিই। অনেকক্ষণ এসেছ তুমি।

—না না। থাক না। আবার ওসব কেন?

—তাতে কি হয়েছে। তোমাকে তো আর আমি সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াচ্ছি না।

ভদ্রমহিলা পাশের ঘরে চলে গেলেন শরবত তৈরি করতে। তারপর একটা কাচের গেলাসের এক গেলাস শরবত এনে ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন। ছেলেটি পরম তৃপ্তির সঙ্গে চোঁ চোঁ করে মেরে দিল শরবতটুকু।

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ। যে কথা বলছিলাম। বাড়িটার জন্যে এমন অসম্ভব দাম আমি কেন চাইছি জান?

—কেন?

—তাহলে শোন।

আমার একটি ছেলে ছিল। ঠিক তোমার মতোই বয়স তার। বড় আদরের। ঐ একটিই ছেলে আমার। সংসারে আমার আর কেউ নেই। ছেলেটি যখন মাত্র এক বছরের তখন সে তাব বাবাকে হারায়। আমি বিধবা মানুষ। এর ওর বাড়িতে ঝিগিরি করে অতি কষ্টে ছেলেকে প্রতিপালন করি। কিন্তু ছেলেটা বড় হয়ে ভয়ানক অবাধ্য হয়ে উঠল।

একদিন সে কলকাতা যাচ্ছি বলে অনেক দিন বাড়ি ফিরল না। আমি তো কেঁদে কেঁদে সারা। অনাহার অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তায় আমি পাগল হয়ে উঠলাম প্রায়। এমন সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ সে ফিরে এলো। তার সঙ্গে একটা স্যুটকেস। কেমন গম্ভীর মুখ তার। কিছু খেল না দেল না। আমার সঙ্গে কথাও কইল না। আমি কথা কইতে গেলাম মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল আমাকে। বলল শরীর ভাল নেই আমাকে বেশী বকিও না। আমি তো ছেলের মেজাজ জানি তাই আর কিছু বললাম না। ছেলে ফিরে এসেছে দেখে মনটা আমার ঠাণ্ডা হল।

সেদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। ঘুম ভাঙতেই শুনতে পেলাম আমার ছেলের ঘর থেকে উত্তেজনাপূর্ণ কথা-কাটাকাটির শব্দ ভেসে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা ঠেলে দেখলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

কে যেন বলছে—কি বলছিস তুই! চল্লিশ লক্ষ টাকা ছিল তাইতে। বল কোথায় রেখেছিস স্যুটকেস?

আমার ছেলের গলা শোনা গেল—জানি না।

—তোকে বলতেই হবে। ডাকাতি আমরা সবাই করেছি। তুই একলা সব নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালাচ্ছিস কেন? আমার ভাগটা অন্ততঃ দে।

—না দেবো না।

—এখনো বলছি টাকা দে।

—না।

—বল স্যুটকেস কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

—বলবো না।

—এই বাড়িতেই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস তুই। এখনো সময় আছে। যদি বাঁচতে চাস তো বল।

—বলছি তো বলবো না।

—তবে রে? বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শব্দ হল গুড়ুম।

তারপরই দেখলাম মুখে কালো কাপড় ঢাক' কে যেন একজন ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি বুঝতে পারলাম টাকা না পেয়ে আমার ছেলেকে হত্যা করে চলে গেল সে।

আমি ছুটে গিয়ে মেঝেয় রক্তাপ্লুত আমার ছেলেকে বুকে তুলে নিলাম। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। সে একবার মা বলেও ডাকতে পারল না আমাকে।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রমহিলা থামলেন। তারপর আবার বললেন, সেই থেকেই আমি আমার ছেলের হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। কিন্তু কি করে কি করি? আমার গায়ের গয়নাগাঁটি যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলাম বাড়িটার অসম্ভব দাম চেয়ে। আমি জানতাম এই রকম অসম্ভব দাম চাইলে কেউ কেনা তো দূরের কথা হেসেই অস্থির হবে। কিন্তু একজন ঠিকই আসবে। আমার ছেলের হত্যাকারী। সে ঐ চল্লিশ লক্ষ টাকার লোভ সহজে ছাড়তে পারবে না। আমি যত অসম্ভব দামই চাই না কেন তত দাম দিয়েই বাড়িটা সে কিনবে।



কে যেন একজন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। [পৃঃ ৩১৮

তারপর দেয়াল ভেঙে ঘরের মেঝে খুঁড়ে ঠিক বার করে নেবে টাকাটা। এমন সময় তুমি এলে। ওকি? তুমি অমন করছ কেন? কি হল?

ছেলেটি বলল—আমার গা মাথা কেমন করছে। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আমার বমি পাচ্ছে।

ভদ্রমহিলা বললেন—ওরকম হবেই বাবা। আমি যে শরবতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি আমার ছেলের হত্যাকারী। আমার ছেলেকে তুমি যেখানে পাঠিয়েছ সেখানে কি তোমাকে আমি না পাঠিয়ে থাকতে পারি? একটু পরেই মরে যাবে তুমি।

ছেলেটি একটু একটু করে নেতিয়ে পড়ল। তারপর নীল হতে হতে—।

বিদেশী গল্পের আংশিক ছায়াবলম্বনে।



শৈল চক্রবর্তী

বিরাট বিরাট বিস্ফোরণের খবর এখন হামেশা শোনা যায়।

অবশ্য পারমাণবিক বিস্ফোরণ আমাদের দেশের একটা হালফিলের ঘটনা। কিন্তু মানবিক উত্তেজনা বা ভুলভ্রান্তি বশতঃ বিস্ফোরণ কোথাও না কোথাও যে নিত্য ঘটছে তা খবরের কাগজ পড়লেই মালুম হবে। সত্যি বলতে কি সেগুলো এতই হামেশা ঘটে যে মনে রাখা বেশ কঠিন। মনে রাখা শক্ত বলেই ভুলে যেতে হয়। আজ তাই পরবর্তী বিস্ফোরণের সংবাদে চক্ষু বিস্ফারিত করতে হয়।

যাই বলিস, বিস্ফোরণ একটা হয়েছিল জামতাড়ায়, তার খবর পেয়েছিলি তোরা? বিস্ফোরণের আলোচনায় ফোড়ন কাটে ভূতনাথ। বিস্‌ফোড়নও বলা যায়।

জামতাড়ায়? সপ্রশ্ন উক্তি আমার।

হ্যাঁ, জামতাড়ায়। কিছুদিনের আগের ঘটনা অবশ্যি। কিন্তু তার সঙ্গে যে রহস্য ছিল তা আজ অবধি কেউ উদ্‌ঘাটন করতে পারল কি?

বোমা টোমা তৈরী হত বোধহয়, কফিতে চুমুক দিয়ে মন্তব্য ছাড়ল অনুপম।

একটু কাত মেরে ভূতো বলল, আরে সে ত আকছার হচ্ছে। ছুড়ে ফাটাচ্ছে নয়ত তৈরি করতে গিয়ে ফাটছে। তার আর রহস্য কি? যদি কিছু থাকে ত তা পুলিসেরই নোট করার মত। আর এটা হচ্ছে একটা অদ্বিতীয়। ভৌতিকও বলতে পারিস।

মনে হয় তুই ঠিক রহস্য করছিস না যেন, বলে ফেলি আমি।—কি ব্যাপারটা খুলে বল না বাপু। তবে ভূতের গল্প ছেড়ো না বাছা। এখন এই লোড শেডিং-এর বাজারে হেঁটে বাড়ি যেতে হবে।

ভূতনাথের স্টক ভৌতিক হতে বাধ্য, ফোড়ন দিল অনুপম। আহা, ভূতদের কি আর ও অনাথ করতে পারে?

যা যাঃ, শুনিস যদি তবে বলি—ভূতো বলল! আর এক কাপ করে বলে দে। কফিই গেলা যাক!

নিজের জবানীতে ভূতো আরম্ভ করল।

আমার টুনি পিসীর বাড়ি জামতাড়ায়। মাঝে মধ্যে আমি যাই সেথা। সাঁওতাল পরগনায় গেলেই আমার খিদে বাড়ে। আর টুনি পিসীর হাতের রান্না মাংসের ঝোল। সে যে কি! থালা থালা ভাত উড়ে যায়। আমি বলি, এসব পিসী তোমার হাতের গুণ। পিসী বলে, না রে ভূতো, এ হল জল-হাওয়া বদলের গুণ। তোর পিসে, যে এখানে এসে তোর মত থালা থালা ভাত ওড়াতো এখন তার মুখে আমার রান্না রোচে না। কি বলব বল।

সেবারে গিয়েই শুনলুম জামতাড়ায় এক সাহেব এসেছে। সাহেব? হতে পারে আমারই মত জল-হাওয়ার লোভে এসে থাকবে। হতে পারে তার কোনো পিসীও থেকে থাকবে এখানে।

খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলুম ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরের তিন চার মাইল দূরে এক ভুতুড়ে জায়গায় একটা টিলার ওপর একখানা একানে বাড়ি—সেইখানে তিনি আস্তানা নিয়েছেন। হঠাৎ ওরকম জায়গা সাহেবের পছন্দ হল কেন ভেবে পেলুম না।

যেতে লোভ হচ্ছে আবার ভয়ও হচ্ছে। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের ধাত ত আমার। শেষে যাবই ঠিক করলুম। কিন্তু ইংরিজি ভাষায় বাতচিৎ চালাতে হবে ত। অবিশ্যি আমিও ইংরিজিতে কম যাই না। অনেক সাহেবের নাম মুখস্থ, যেমন রবার্ট পিটার, ব্রুক অ্যাণ্ডারসন এট্সেটরা। তোরা ত জানিস একবার ইংলিশে সেভেন্টি ফাইভ পেয়েছিলুম।

কিন্তু নম্বর পাওয়া এক আর ইংরেজকে সামনে পাওয়া এক। দুয়ে আকাশ পাতাল ফারাক। সামনাসামনি হলে চোখে চোখ রেখে টক্ করা এক কথা আর পরীক্ষা হলে বসে খাতায় টুকলিফাই করা আর এক কথা।

পিংকীর সঙ্গে একটু রপ্ত করে নে না, বললে পিসী। ও ত ডায়োসেশানে পড়েছে। আমি বললুম, কিচ্ছু দরকার হবে না পিসী। মুড এলে আমি ঠিক চালিয়ে যাব।

পিংকী বললে, ছোড়দা, তোর না মেমারি উইক। নিজেই ত বলছিলি। কথাগুলো যোগাবে ত?

আমি বললুম, দেখ, মেমারি উইক বলেই ত বানিয়ে নিতে পারি। মেমারি স্ট্রং হলে কি? না চর্বিত চর্বণ। তাতে আর বাহাদুরিটা কোথা?

বাহাদুরি ধরা পডল যখন একদিন দুর্ধর্ষ ঝাঁ ঝা রোদ্দুরে মাঠ ভেঙে পাক্কা চার মাইল হেঁটে সাহেবের ডেরার কাছে হাজির হলুম। বাড়িটার মুখশ্রী চোখে পড়তেই পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। পুরোন জরাজীর্ণ বাড়িঘর ঢের ঢের দেখেছি কিন্তু এর তুলনা হয় না। এককালে, মানে কয়েক শতাব্দী আগে ইনি যে কেমন ছিলেন তা অনুমান করাও শক্ত। খাড়া খাড়া দেয়াল উঠে গেছে, বারান্দার রেলিংগুলো কেউ আস্ত নেই। প্রবেশপথের পিলারগুলো উইএ খাওয়া পচা কাঠের মত কোথাও সরু কোথাও মোটা।

গেটের কাছে একটা পালিস-ওঠা কাষ্ঠফলকে বাংলা হরফ দেখেই আমার চক্ষুস্থির। ভেলকিনভ ভিলা। এ যে ডাহা বঙ্গভাষা!

মনে মনে অনেক কিছু হাতড়াতে হাতড়াতে খোলা দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকে পড়েছি। কেউ কোথাও নেই। না না, থাকবে না কেন, কতকগুলো চামচিকে ছিল। তারা আমায় দেখে ঝটপট করে উঠল। তাদের ফটফটানির ভাষাটা এই—"তুমি আবার কে বট হে? খসে পড় বাপু!"

কিন্তু বিদেয় হবার পাত্তর আমি নই। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলুম। হঠাৎ দেখি নাকের ডগায় দশাসই এক সাহেব। বয়েস হয়েছে কিন্তু কুঁজো হয়নি। কোন্ দিক থেকে লোকটা এসে উদয় হল বুঝতেই পারলুম না।

বিজ্ঞাপন দেখে আসা হচ্ছে? পরিষ্কার বাংলায় বলল সে।

নো স্যার। আমি এমনিই আসছি। টু সী ইউ। জগাখিচুড়ি ভাষা বেরিয়ে গেল।

ভেরী গুড্। এসো—বলেই আমাকে করতলগত করে একটা ঘরে নিয়ে গেল।

সাহেব বলল, প্রথমেই বলে রাখি, আমি বাংলা ভাল জানি। তোমাদের দেশে অনেক দিন আছি ত। আর তোমরা যেমন ইংরিজির ভক্ত আমি কিন্তু তা নই।

ঈশ্‌! লজ্জায় পড়ে বলে ফেললুম, ওটা শ্লিপ অব টাং হয়ে গেছে স্যার। এক্‌সকিউজ, মানে, মাপ করবেন।

তুমি বাংলাতেই বল। দেখেছ ত আমার নামের সবটাই বাংলা, সাহেব বলল, ঐ যে কাঠের ফলকে লেখা আছে দেখেছ? আমার নাম জাদুকর ভেলকিনভ। শুধু নভ্‌টা আমাদের রুশ ভাষা থেকে নেওয়া। তার মানে বুঝলে, আমি রুশিয়ার লোক। আর আমি জাদুকর মানে ম্যাজিসিয়ান। তোমার নামটা কি যেন—

ভূতনাথ।

বাঃ, ভূতনাথ বেশ নাম। ম্যাজিক ভাল লাগে?

দারুণ!

বংশে কেউ ম্যাজিসিয়ান আছে? কিংবা ছিল?

ঠিক নেই। তবে আমার কাকার বন্ধুর বন্ধু ছিলেন পি. সি. সরকার।

ওটা সরকার নয়, সোরকার। একটু বেশী দূরসম্পর্ক হয়ে গেল। দেখা যাক কতদূর কি হয়। অ্যাই, দাঁড়ুলাল—

বলেই সাহেব ফট করে হাতে তালি বাজালো। আর অমনি একজন কালো স্যুট পরা লোক এসে হাজির হল। তার মুখটা ঠিক দাঁড়কাকের মত।

একে আমার ক্লাসে ভরতি করে নাও। প্রথম থেকে ম্যাজিকের সহজ পাঠ শেখাবে। আমার দিকে ফিরে সাহেব বলল, এটি হচ্ছে আমার সহকারী · ও আগে ছিল দাঁড়কাক, এখন হয়েছে দাঁড়ুলাল। যাও ওর সঙ্গে।

ব্যস্‌, ভরতি হয়ে গেলুম। রোজ যাই আর আসি।

জাদুর ওপর অনেক দিনের আকর্ষণ আমার। কারই বা নেই। ঐ যে একটা টুপি থেকে সতেরোটা খরগোশ আর পায়রা বার করা ইস্তক মানুষ কেটে জুড়ে দেওয়া কি সব তাজ্জব কাণ্ড নয়? একটা টাকা থেকে টাকার আণ্ডিল বানানো কি কম কথা? দুনিয়ায় এই ম্যাজিকটাই ত চলছে আজকাল। একজন টাকার পাহাড় করে আঠারোতলা বাড়ি বানাল আর আমরা ফকিরচাঁদ ঘুরে বেড়াচ্ছি ট্যাঙস ট্যাঙস করে, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। এসব হয় কি করে? কারবারের ম্যাজিক ফাটকার ম্যাজিক ব্ল্যাকের ম্যাজিক। ইত্যাকার নানান চিন্তা খেলত আমার মাথায় ··

● শৈল চক্রবর্তী



খরগোশের কানটা আচ্ছা করে মলে দিলুম।

তারপরে কি হল বল। আমি এবার তাড়া দিয়ে ভূতোকে আবার জামতাড়ায় ঠেলে পাঠাই।

হ্যাঁ, প্রথম পাঠ রুমাল ওড়ানো শিখতেই আমি গলদ্‌ঘর্ম। রুমালটা কেবল পড়ে যায় মাটিতে। আর টুপি থেকে খরগোশ বার করতে গিয়ে খরগোশটা এমন আঁচড়ে দিল হাতে যে আমি ঐ অবোলা জীবেরও কানটা আচ্ছা করে মলে দিলুম। এক টাকাকে একশ করা শিখলুম কিন্তু লুকোনো টাকাগুলো কেবলই আস্তিন থেকে পড়ে যেত। আর কাটা মুণ্ডুর খেলা করতে গিয়ে নিজেরই গলাটা কেটেছিলুম আর কি! মোট কথা, ঐ দাঁড়ুলাল আমাকে দুচোখে দেখতে পারত না। তাই আমাকে ভাল করে শেখাত না।

কিন্তু প্রোঃ ভেলকিনভ আমায় খুব ভালবাসত। সে বলত, তার ভূতপূর্ব ছাত্রদের চেয়ে আমি নাকি অনেক ভাল। তারা নাকি ছিল ফাঁকিবাজ। ভেলকিনভ বলল, ঐ যে দেখছ দাঁড়ুলাল ও হচ্ছে চতুরের রাজা আর স্বার্থপর। ওকে আমি আবার দাঁড়কাক করে দেব। তবেই ও জব্দ হবে।

মনে মনে ভাবলুম, তাহলে ত আমায় ও ঠুকরে মারবে। ইচ্ছে করে অন্য কথা পাড়লুম, আচ্ছা স্যার, আপনি ওই ভুতুড়ে বিদিকিচ্ছি বাড়িতে থাকেন কেন?

দেখ, ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে এ রকম বাড়িই ভাল। কালকুত্তায় আমি ত ছিলুম। ওখানে কাজ হয় না। শোন। আমি ভারতীয় তন্ত্রমন্ত্র শিখেছি। তার সঙ্গে

ম্যাজিক আর কেমিস্ট্রি মিশিয়েছি—বুঝলে। ভেলকিনভ তার সাদা গোঁপজোড়া পাকাতে পাকাতে বলল, ঐ মেহগনি কাঠের আলমারিতে এক রাশ খাতা আছে তাতে আমার রিসার্চের মন্ত্র আর ফরমুলা লেখা আছে, তোমাকেই আমি আমার সব দিয়ে যাব। মনে রেখো, ভূতনাথ, আমার সিন্দুকে একটা লাল খাতা আছে সেটা কিন্তু মারাত্মক। নষ্ট করা পণ্ড করা ধ্বংস করা—এই সব মন্ত্রতন্ত্রও আমি অনেক রিসার্চ করে সংগ্রহ করেছি আর টুকে রেখেছি।

জানি না আমাকে প্রোফেসার এত ভালবাসতো কেন। কেনই বা এ গুপ্ত কথা বললে আমাকে।

সাত দিন ভেলকিনভ ভিলায় যেতে পারেনি।

মনে যৎপরোনাস্তি ভয় ছিল প্রোফেসারের বকা শুনতে হবে। কিন্তু ঢুকতেই দাঁড়ুলাল যা বলল তাতে তাজ্জব হয়ে গেলুম। সাহের তার গোপন চেম্বারে ঢুকেছেন আর বেরোন নি। পাঁচ দিন হয়ে গেল। দরজা খোলা বারণ, তাই কেউ খোলেনি, ক্যার-কেরে গলায় বলল দাঁড়ুলাল। আর আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল।

আমি বললুম, সেকি? আমি ঢুকে দেখব, যা থাকে বরাতে। লোকটার কি বিপদ হল কে জানে।

জং-ধরা হাসকলটা খুলতে বেশ খানিকটা কষ্ট হল। কিন্তু তাতে কি! দরজা খুলতে গিয়ে ক্যাঁচ-কোঁচ করে দরজাটা যেন ককিয়ে উঠল। ঢুকলুম ভেতরে।

ঘরটা মস্ত বড়। চারদিকে কাঠের তাক, আলমারি। তাতে নানান বই আর খাতা-পত্তর। কতকগুলো আয়রন চেস্ট তাতে ম্যাজিকের সরঞ্জাম কি ধন-দৌলত আছে কে জানে!

কিন্তু হঠাৎ ঘরের এক পাশে নজর পড়তেই দেখি এক মাঝারি সাইজের বেশ হৃষ্টপুষ্ট হিপো। হ্যাঁ, জলজ্যান্ত। মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করছে আর বিরাট হাঁ করছে। ঐ হাঁকারের তুলনায় আমার সর্বশরীর নিতান্তই নগণ্য। তাই বীরের মত পেছু হটে নিরাপদ জায়গায় এসে ভাবছি দরজা ভেদ করে তীরবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাব কিনা। ঠিক এমনি সময় কানে এল, কে ভূতো? তুমি এখানে ঢুকলে কেন? মরতে চাও নাকি?

টেবিলের আড়াল থেকে মাথা জাগিয়ে যে কথাগুলি বলল সে আর কেউ নয় জাদুকর ভেলকিনভ।

● শৈল চক্রবর্তী

স্যার। আপনি এই অবস্থায়?

শোনো, কাছে এসো, পাঁচদিন না খেয়ে আর এখানে বন্ধ থেকে আমার অবস্থা কাহিল। যাকে বলে চিঁ চিঁ করছি।

খাবার কিছু আনব?

না না। ঐ যে হিপোটা। ও আমায় কিছু করতে দেবে না। দেখছ না, টেবিলের কোণটা ও চিবিয়েছে। আমাকে পেলে—

তা, ঐ রকম জীব ত চিড়িয়াখানাতেই থাকে। এখানে—? বলে ফেললুম আমি।

সংক্ষেপে বলছি তবে শোনো। আমি সারাজীবন ধরে জাদু নিয়ে রিসার্চ করেছি। ভারতবর্ষে এসে অনেক গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্রও শিখেছি। ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমার কান্না পেত। তাই ভাবতুম এই দেশকে জাদুবলে সুজলা সুফলা করে গড়ে তুলব। চোর জোচ্চোর ঘুষখোরদের সাচ্চা মানুষ করে দেব। কিন্তু গোল বাধাল ঐ হিপো। ও আসলে কিন্তু হিপো নয়। ও হল আমার স্ত্রী মিচিকোভা। ও আমার কাজে কেবলই বাধা দিত। ওর বায়না হল ওকে বয়েস কমিয়ে সুন্দরী করে দিতে হবে।

সেকি? আমি বলে ফেলি, তার এই অবস্থা?

সেটা আমারই ভুলের জন্যে। রোজ ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান শুনতে আর কার ভাল লাগে! তাই দেহ বদলের প্রক্রিয়া শুরু করলুম। কিন্তু একটু অনুস্বার চন্দ্রবিন্দুর গোলমালই হবে……তার ফলে মিচিকোভ হয়ে গেল হিপো। ভীষণ মোটাসোটা আর কুৎসিত ছিল কিনা—এখন ও আমায় ছাড়ছে না।

বেশ ত, এখন অন্ততঃ ওকে মিচিকোভায় ফিরিয়ে দিন না!

সেইটাই ত পারছি না। আমার মন্ত্রতন্ত্র লেখা আসল খাতাগুলো সব ঐ লোহার সিন্দুকে। ওখানে ঘেঁষতে গেলেই ও আমাকে হালুম করে দেবে। এখন তুমি যদি কোনো উপায় করতে পার…হা ঈশ্বর! আমার আবার হাই প্রেসার…

আমি খানিকটা ভাবলুম। তারপর একটা খবরের কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে সেটা পাইপের মত পাকালুম। আর তার এক দিকটা ফালি ফালি করে ছিঁড়ে নিলুম। তখন সেটা বেশ ফুলঝাড়ু বা চামরের মত হয়েছে। তাই নিয়ে এগিয়ে গেলুম হিপোটার দিকে। ও তেড়ে এলেই আমি পিছিয়ে যাই।

অনেকক্ষণ কসরতের পর ঐ চামরের ডগা দিয়ে তার নাক ছুঁয়েছি। শুড়শুড়ি লেগে হিপো তখন এমন এক হাঁচি দিল যে আমি থুড়িলাফ খেয়ে সাত হাত পেছনে।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নই আমি। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি দিব্যি তার নাকে গালে চোয়ালে শুড়শুড়ি দিয়ে যাচ্ছি। হিপো চুপ চাপ। হয়ত হাসছিল। ফটো তুললে সেটা দেখা যেত।

ভেলকিনভ ইত্যবসরে সন্তর্পণে হিপোর পেছনে এসে সিন্দুক থেকে একটা খাতা বার করে আব্রা কাডাব্রা হাদ্রাং জিওদ্রাং ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। আমি খাতার রংটা শুধু দেখে রাখলুম। লাল রং, আলতার মত।

হিপোর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো বুজে এল। সে এখন ঝিমুচ্ছে। ও মা! ও কি ঘুমুবে নাকি? ভেলকিনভের দিকে তাকিয়ে আমি ঐ কথা মাত্র জিজ্ঞেস করেছি, মুখ ফিরিয়ে দেখি, ও হরি, কোথায় হিপো? তার জায়গায় এক বদখত মোটকা বুড়ী হাফাচ্ছে। বুড়ী তার হাত ব্যাগ থেকে আয়না বার করে নিজের মুখশ্রী দেখে বলল, এই তোমার বিদ্যে! ছিঃ ছিঃ! আমায় নিয়ে খেলা পেয়েছ? শোনো, আমার বয়েস যদি বত্রিশ বছর কমিয়ে না দাও ত দেখে নিও আমি কি করি!

ভেলকিনভ অবরোধ থেকে মুক্ত হল। কিন্তু ঐ ধাক্কায় আর মিচিকোভার দৌরাত্ম্যে তার হার্ট বিকল হল। একদিন আন-ইজি চেয়ারে আধ-বসা অবস্থাতেই চোখ বুজল। আর উঠল না।

এখন দাঁড়ুলালের সঙ্গে মিচিকোভার খুব শলা-পরামর্শ চলে। একদিন দেখি ওরা আলমারি সিন্দুক থেকে খাতা বের করে ঘাঁটছে। বুড়ী একটা লেন্স চোখে ধরে একটা ঝুরঝুরে খাতা থেকে একটা কি লেখা বার করল।

এইবার পেয়েছি, বলেই মাঝরাতে যখন ঘড়ির কাঁটা দুটো ঠিক বারোটার ঘরে তখনই ওরা দুজনে সুর করে পড়ল:

অচ্চং তচ্চং করমোরাং
বাহান্ত কান্দ্র পং ডিণ্ডিমাঃ

তিনবার বলবার সঙ্গে সঙ্গেই কড়িকাঠ থেকে ঝুরঝুর করে বালি খসে পড়ল। কটকটে ব্যাঙের বিশ্রী ডাক শুরু হল। আর তিনটে কঙ্কাল ভীষণভাবে নাচতে লাগল। এর চেয়েও ভয়ংকর দৃশ্য হল, একটা সবুজ ছোপওয়ালা নোংরা কুমির হাঁ করে ঘরে ঢুকল। ওদেরই দিকে তেড়ে আসছে।

বুড়ী আর দাঁড়ুলাল একসঙ্গে চিৎকার করে উঠেছে, সর্বনাশ! হঠাৎ মিচিকোভা

চেঁচিয়ে বললে, ও ভূতো। দেখছিস কি তুই বসে বসে! ঠেকা ওদের। কুমিরের পেটেই যাব নাকি শেষে?

আমি একটু ভাবলুম, মনে মনে একটু লজিক আর জিওমেট্রি ভেঁজে নিলুম। তারপর করলুম কি, ঐ মন্তরটাই পড়লুম কিন্তু উলটো করে—

করমোরাং তচ্চং অচ্চং
ডিণ্ডিমাঃ কান্দ্রুপং বাহ্বান্ত

তিনবার বলার সঙ্গে সঙ্গেই কঙ্কালেরা ঘরে ঢুকল, কুমির পেছু হটল আর ব্যাঙের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল।

ওমা! তুই ত বেশ শিখেছিস! বুড়ীর কি আনন্দ।

আমি বললুম, শেখা নয়। এটা কমন সেন্স।

না না, তোর অনেক বুদ্ধি। দাঁড়ুটা কোনো কর্মের নয়।

আবার কয়েকদিন পরে একদিন চোখে পড়ল বুড়ী আর দাঁড়ুলাল চুপি চুপি ঢুকেছে প্রোফেসারের সেই গোপন ঘরে। সিন্দুক খুলেছে। গাদা গাদা খাতা পেড়েছে। দেখছে কোথাও কিছু লেখা আছে কি না। আশ্চর্য! প্রোফেসার কোথাও ধরা দেননি। বোঝবার উপায় নেই কোন্‌টা কিসের মন্তর। কোন্ মন্তরের কি ফল। কোন্ ক্রিয়ায় কি অঘটন ঘটবে। শুধু খাতার মলাটের রং রকমারি আর নম্বর দেওয়া। একই নম্বরের কয়েক রঙের খাতা আছে। সুতরাং হাতড়ে কূল পাওয়া শক্ত।

আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি আর শুনছি ওদের কথা।

বুড়ী বলছে, এবার পারবি ত দাঁড়ুলাল? নাকি সেদিনের মত কুমিরের আমদানি করবি। এ্যাদ্দিনেও তুই আসল জিনিসটাই শিখলি না!

সেটা জানলে কি আর আমি এখানে পড়ে থাকতুম ম্যাডাম, বলল দাঁড়ুলাল। তাহলে কি করতুম জানো, একজন কোটিপতি লোককে চামচিকে বানিয়ে দিতুম। আর তারপর? নিজেকে তার চেহারা বানিয়ে তারই গদিতে বসতুম। যদি পারি ত কি ব্যাপার হবে বল ত? এই দাঁড়ুলাল যা খুশী তাই করবে তখন।

আমি বাবা বয়েস কমিয়েই খুশী, বুড়ী বলল, তারপর তেরেশকোভার মত আকাশে উড়ব। কিন্তু কি হবে বল ত? ভূতোকে একবার ধর না···ছেলেটা মিটমিটে কিন্তু বুদ্ধি আছে।

হ্যাঁ। মিটমিটে শয়তান, দাঁড়ুর মন্তব্য।



একজন পুলিস অফিসার বললেন, গোগোল তুমি মনে করে বল। [পৃঃ ২৮৮

এমন সময় দরজাটায় কোঁচ করে শব্দ হতেই ওরা আমায় দেখতে পেল।

বুড়ী তখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলল, ভূতো বাবা, সোনার ছেলে, একবার বলে দে না বাবা। তুই ত দেখেছিলি সেই খাতাটা আমি যখন হিপো হয়ে ছিলুম। মাগো! কী নোংরা একটা হিপো হয়ে গিছলুম আমি!



বুড়ী আর দাঁড়ুলাল একসঙ্গে চিৎকার করে উঠেছে। [পৃঃ ৩২৭

ঐ ত, লাল খাতা একটা, বলে উঠলুম আমি। সেদিনের কথা মনে পড়ল। খাতাটা যে লাল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর একবার প্রোফেসার বলেছিল ৩২৯নং। সেটাও লাল। সেটা নাকি মারাত্মক। হতে পারে। ওরা যা চাচ্ছে সেটাও ত মারাত্মক ব্যাপার।

লালটা ত! খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল দাঁড়ুলাল। সে বলল, মার দিয়া! আমিও ঠিক তাই ভাবছিলুম।

বুড়ী বলল, বাবা ভূতো, তুমি একটু ঘরের বাইরে যাও ত। কিচেনে কেক আর কলা আছে, খাওগে।

আমি সোজা চলে এলুম টুনি পিসীর বাড়ি। যা খুশী করুকগে ওরা। পরীক্ষাটা ত হয়ে যাক তারপর খাতাখানা উদ্ধার করা যাবে।

সেইদিন গভীররাত্রে এক বেধড় আওয়াজে ঘুমের মধ্যে আমরা চমকে উঠলুম। জামতাড়ার মাটিটা যেন কেঁপে উঠল।

পিসী বললে, রাম নাম কর, ভূমিকম্প।

পিসে বললে, উঁহু, এ একটা বড় গোছের এয়ার রেড না হয়ে যায় না। আবার কি পাকিস্তান অ্যাটাক করল? কাল কাগজ না দেখলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

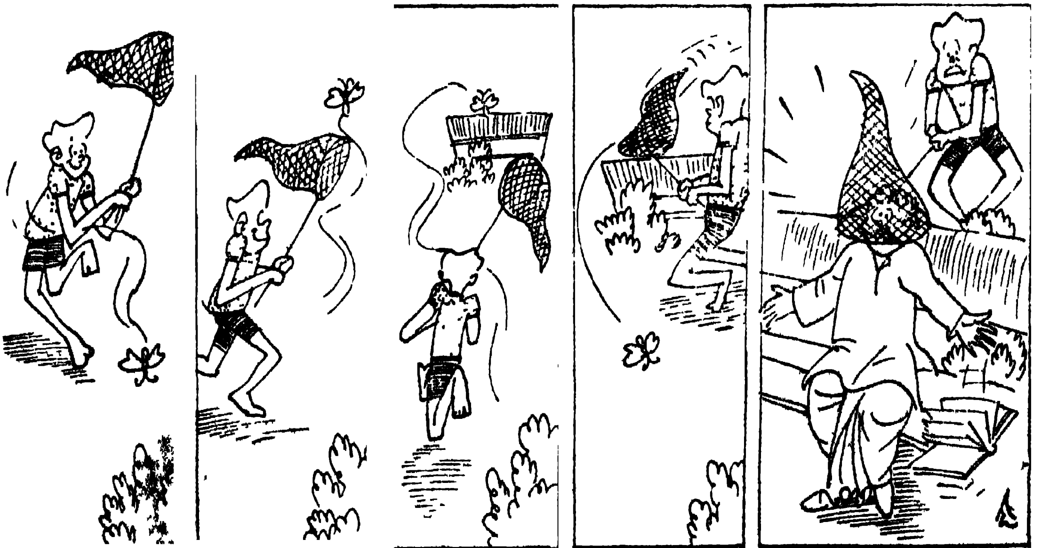
পরদিন সকাল আটটা নাগাদ অভ্যেসের বশে ভেলকিনভ ভিলার দিকে হাঁটা দিলুম। কিন্তু কোথায় সেই ভিলা? তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই। ইট কাঠ পাথর সব গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে।

তবে কি কাল রাত্রের সেই পিলে চমকানো বিস্ফোরণ সেই লালরঙের মারাত্মক খাতার পাতা ফুঁড়ে ঘটল? হতে পারে লাল রঙের মধ্যে কোন্ লালটা সেটা ত আমায় জিজ্ঞেস করেনি ওরা। তবে কি মারাত্মক ৩২৯ নম্বরেই হোঁচট খেল ওরা?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভূতো বলল, আহা, আগেই যদি খাতাটা সরাতে পারতুম রে তাহলে কি আর তোদের পয়সায় এখানে বসে শুধু কফি গিলতুম। এতক্ষণ হয়ত যেতুম একটা রাজকীয় হোটেলে বুঝলি!

———

● প্রজাপতির রসিকতা





[অলৌকিক কাহিনী]

স্বপনবুড়ো

ভট্‌চাজ বাড়ির মেয়ে চামেলী যখন কারো কথা না শুনে কৈবর্তদের মেয়ে চণ্ডীর সঙ্গে "গঙ্গা-যমুনা" পাতালো, তখন সারা গাঁয়ের মানুষ নাক কুঁচকে, গালে হাত দিয়ে কেবলি ছি-ছি করতে লাগলো।

গাঁয়ের মোড়লরা বললে, না, না, এ একেবারে অনাছিষ্টি কাণ্ড। ভট্‌চাজ বাড়ির মেয়ে কেন কৈবর্তের মেয়ের সঙ্গে "গঙ্গা-যমুনা" সই পাতাবে?

পাড়ার গিন্নীর দল পান চিবুতে চিবুতে পিক্‌ ফেলে বললে, কেন? পাড়াতে কি আর বামুনের মেয়ে ছিল না? চামেলী দিব্যি তার সঙ্গে সই পাতাতে পারতো।

আর যারা সব সময় ভোজের নামে নাচে,—তারা কপাল চাপড়ে আক্ষেপ করে বললে, বামুনের মেয়েদের ব্যাপার হলে দিব্যি একটা ভোজ হত। আর আমরা

কলার পাতা পেতে দিব্যি ফলারে বসে খেতে পারতাম। সেই সুযোগটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল!

গ্রামের সব মানুষ কেবলি আক্ষেপ করতে লাগল। শুধু পাঠশালার তীর্থবাসী পণ্ডিত বললেন, তোদের দুটির পড়াশোনাতে যেমন মন, তেমনি ভাব-ভালোবাসাও অক্ষয় হোক। চামেলী আর চণ্ডী হাসিহাসি মুখ করে তীর্থবাসী পণ্ডিতের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলে।

চামেলী আর চণ্ডীর ভাব ওদের খুব ছেলেবেলা থেকে। ভট্চাজ বাড়ির চামেলীর যখন জন্ম হয় তখন কৈবর্তের বাড়ির বৌ দাইয়ের কাজ করে চামেলীর প্রসবকালে দারুণ পরিশ্রম করেছিল। এই কৈবর্তের বৌটিই হচ্ছে চণ্ডীর মা।

চামেলী আর চণ্ডী প্রায় এক বয়সেরই মেয়ে।

ছোট্ট মেয়ে চণ্ডীকে কোলে নিয়ে চণ্ডীর মা প্রায়ই ভট্চাজ বাড়ি বেড়াতে আসতো। তখন চামেলী আর চণ্ডী আপন মনে খেলাঘর সাজিয়ে বসতো। ছাড়াছাড়ি হবার সময় ওদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে যেতো।

চামেলীর ঠাকুমা রসিকতা করে বলত, ওরা একবৃন্তে দুটি ফুল। ওদের ছাড়াছাড়ি করতে গেলেই চোখের জলে বুক ভাসাবে।

তা ঠাকুমা মিথ্যে কথা বলে নি।

ওরা দুটিতে ঘুম থেকে উঠেই বকুল তলায় বকুল ফুল কুড়োতে যেতো।

গঙ্গার ধারে নিরিবিলি গ্রামটি। ঠিক গঙ্গার ওপরেই বাঁধানো বকুলতলা। রাশি রাশি ফুল পড়ে থাকে এই বকুলতলার ঘাটে। পাশেই শিবমন্দির। অনেক কালের পুরোনো। সেই কতকাল আগে এই গাঁয়ের জমিদারের এক বুড়ী ঠাকুমা অনেক টাকা খরচ করে এই শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন। শিবরাত্রে এখানে বিরাট মেলা হয়। গাজনের সঙ বের হয়। দশখানা গ্রাম থেকে ছেলেমেয়ে-বুড়ো শিবমন্দিরে পূজো দিতে আসে। অনেকে এসে ছেলেমেয়ে নাতী-নাতনীর নামে মানত করে, হত্যে দেয়। সেই সময় ঢাকের বাদ্যে কান-পাতা দায় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এত সব উৎসব-আয়োজন আর হাঙ্গাম-হুজ্জতের মধ্যেও চামেলী আর চণ্ডীকে কেউ তফাত করতে পারে না। ওরা দোকানে-দোকানে ঘুরে পুঁতির মালা কেনে, বেলোয়ারী চুড়ি পরে, বকুলতলায় বসে মনের সাধে বকুল ফুলের মালা গাঁথে, —তারপর ভিড় যখন কমে আসে, একটু বেশী রাত্তিরে শিবমন্দিরে ঢুকে শিবের পূজো

দেয়, তারপর গলাগলি করে শিবের গাজনের গান শুনতে শুনতে যে যার বাড়িতে ফিরে যায়।

অনেক রাত অবধি জেগে জেগে ওরা ঢাকের বাদ্যি শোনে। চামেলী ভাবে —চণ্ডীও ত তার বিছানায় শুয়ে এই বাদ্যি শুনছে! আবার চণ্ডী ভাবে,—গাজনের গান শুনে চামেলীর দুই চোখে হয়ত ঘুম নেই!

রাত নিঝুম হয়ে আসে। তারপর ওরা দুই সখী—যে যার বিছানায় শুয়ে এক সময ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

ধীরে ধীরে ঢাকের বাদ্যি থেমে আসে।

যাত্রীর দল মন্দির-প্রাঙ্গণে, বকুলতলার বাঁধানো চাতালে, গঙ্গার ধারে—যে যেখানে খুশী ঘুমিযে পড়ে। তারপর শিবের বাহনরা জোনাক-জ্বলা পথে নৃত্য শুরু করে কিনা কে জানে!

এইভাবে দুটি সই বকুলমালা গেঁথে, গঙ্গাস্নান করে, শেলাই শিখে, গান করে, শিব পূজোর মন্ত্র মুখস্থ করে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে।

সারাটা গাঁয়ের ফুল, ফল, আকাশ-বাতাস, নদীর জল, আর মধুর সমীরণ যেন ওদের সুন্দর রূপ ফুটিয়ে তুলতে তিল তিল করে সাহায্য করে।

একবার ওরা দুটি সখী শিবরাত্রে একসঙ্গে শিবের পূজো দিতে গেছে, বামুন বাড়ির এক বুড়ী ঠাকুমা যেন একেবারে খেঁকিয়ে উঠল!

—নাঃ, আমাদের গাঁয়ে আর জাত-জন্ম রইল না দেখছি! বামুনের মেয়ে আর কৈবর্তের মেয়ে একসঙ্গে শিবের মাথায় ফুল দিচ্ছে! কী অলক্ষুণে কাণ্ড! আমাদের মন্দিরের পুরুত ঠাকুর গেলেন কোথায়? তিনি কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছেন? জমিদার বাড়ি থেকে তাঁকে মাস-মাস মাসোহারা দেয়া হয় না? এই অনাচ্ছিষ্টি কাজ দেখেও কি তিনি অন্ধের মতো চোখ বুঁজে বসে থাকেন?

মেয়েমহলে একটা হইহই পড়ে গেল।

ছুটে এলেন বুড়ো পুরোহিত ঠাকুর।

তিনি চামেলী আর চণ্ডীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, বুঝতেই ত পারছিস মা! তোদের দুই সখীর মনের মিল কেউ ভালো চোখে দেখতে পারে না! গাঁয়ের বৌ-ঝিরা যখন পূজো দিতে আসবে, তোরা দুটিতে লুকিয়ে থাকবি। তারপর সবাই চলে গেলে তোরা দুই সখী এসে পূজো দিবি। তখন আমি মন্দিরের দরজা ভেজিয়ে

দেবো। কেউ তোদের দেখতে পারবে না। তোরা প্রাণ খুলে শিবের মাথায় জল দিবি, ফুল বেলপাতা চড়াবি, মনের মতো বর চেয়ে নিবি।

চামেলী আর চণ্ডী ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে বললে, সেই ভালো পুরুত দাদু, আমরা দেরি করে এসেই পূজো দেবো। তখন আর কেউ আমাদের বাধা দেবে না।

চামেলী আর চণ্ডী দুই সখী লতার মতো বাড়তে লাগলো। অবশেষে ওদের বিয়ের বয়েস ঘনিয়ে এলো।

দুই বাড়ির অভিভাবকেরাই মেয়ের মনোমত বর খুঁজতে উঠে পড়ে লাগল।

ইতিমধ্যে শিবরাত্রির উৎসব আর মেলা এসে পড়ল। শিবরাত্রের অতি ভোরে দুই সখী চামেলী আর চণ্ডী গঙ্গা নদীতে স্নান করে অনেকক্ষণ ধরে বকুলতলায় বসে দুটো করে মালা গাঁথলে। সারাদিন উপোস করে রইল। তারপর পাড়ার বৌ-ঝি গিন্নী-বান্নিদের পূজো শেষ হয়ে গেলে—গভীর রাত্রে শিবমন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হল। পুরুত দাদু বললেন, গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সব চলে গেছে। এইবার দুই সখী "গঙ্গা-যমুনা" গিয়ে মনের আশ মিটিয়ে শিবঠাকুরের পূজো করো। হ্যাঁ ভালো কথা, মনের মতো বর চাইতে ভুলো না কিন্তু।

পুরুত দাদু দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। দুই সখী গিয়ে প্রথমে শিবের পূজো করে শিবের মাথায় বকুল ফুলের মালা পরিয়ে দিল। তারপর শিবঠাকুরকে সাক্ষী রেখে ওরা দুটিতে নিজেদের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, জীবনে মরণে কক্ষণো ওদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

তারপর নির্মাল্য আর চরণামৃত নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে এলো। আসবার সময় পুরুত দাদুর পায়ের ধুলো নিতে ওরা ভুললো না।

পুরুত দাদু রসিকতা করে বললেন, বর চাইতে ভুলিস নি ত নাতনীরা?

নাতনীরা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, আমরা শেষ পর্যন্ত দাদুর গলাতেই মালা দুলিয়ে দেবো—! আমরা হবো দুই সখী-সতীন।

পুরুত দাদুর প্রাণখোলা হাসি শোনা গেল।

অবশেষে অভিভাবকদের ছুটোছুটি আর আন্তরিক আগ্রহে চামেলী আর চণ্ডীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

আবার একই তারিখে ওদের বিয়ের দিন পড়ল। দুই সখী আবার গোপনে দেখা করল গঙ্গার ঘাটে।

শিবঠাকুরের কাছে ওরা প্রতিজ্ঞা করেছে, এইবার মা গঙ্গায় জল ছুঁয়ে আবার অঙ্গীকার করল, জীবনে-মরণে ওদের কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

দুই সখীর চোখের জল গঙ্গার জলে মিশে গেল!

শুভদিনে—শুভক্ষণে ভট্‌চাজ বাড়ির চামেলী আর কৈবর্ত বাড়ির চণ্ডীর বিয়ে একই লগ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা বিয়ের দিন সবাইকে লুকিয়ে নিজের নিজের গাঁথা বকুল ফুলের মালা সইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

সে কথা কিন্তু কাক-পক্ষীতেও জানতে পারলে না।

বিয়ের পরের দিন—বরেরা নিজেদের কনে নিয়ে রওনা হবে।

মেয়েদের আগ্রহে আর অভিভাবকদের ব্যবস্থাপনায় ঠিক হল—একটা নৌকোয় থাকবে দুই কনে, আর একটা নৌকোয় উঠবে দুই বর। গ্রাম থেকে একটা খাল সোজা চলে গেছে স্টীমার ঘাটের দিকে। সেইখানে আর এক নদীতে স্টীমার স্টেশন।

এই স্টীমার স্টেশন পর্যন্ত ওরা নৌকো করে একই সঙ্গে যাবে সোজা খাল ধরে।

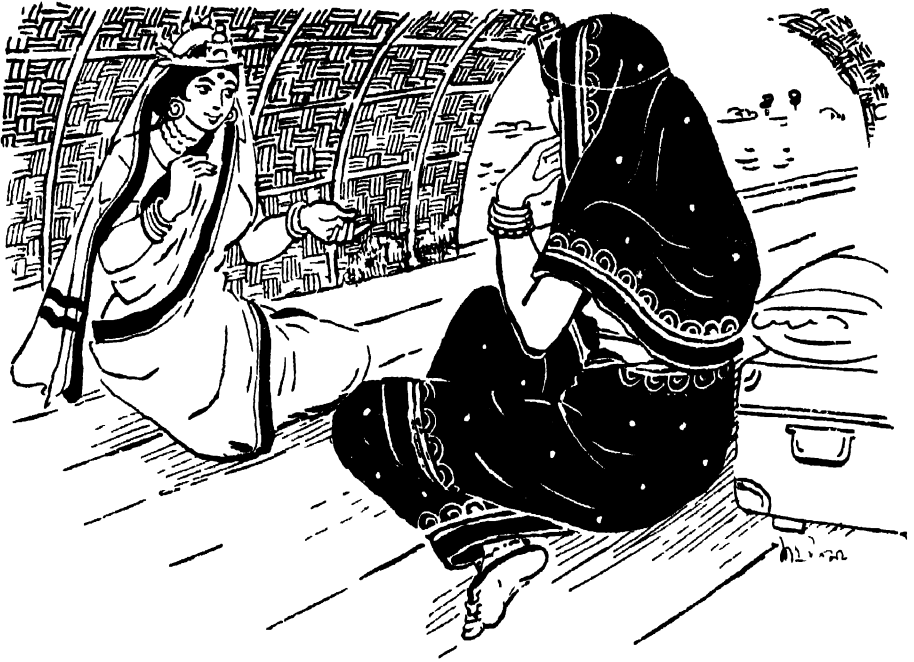
তারপর স্টীমার স্টেশনে পৌঁছে চামেলী আর তার বর যাবে উত্তর দিকের স্টীমারে, আর চণ্ডী আর তার বর যাবে দক্ষিণ দিকের পথে।

খালের এই রাস্তাটুকুতে দুই সখীর যত রাজ্যের মনের কথা। সে কথা আর কিছুতেই ফুরোয় না!

অতি ছেলেবেলা থেকে শুরু করে কত দিনের ভুলে-যাওয়া কত মধুর স্মৃতি। সেই খেলাঘর গড়ার কথা, গঙ্গা-যমুনা সইয়ের কথা, বকুলতলায় বকুল ফুলের মালা গাঁথার কথা, নিশুতি রাতে শিবরাত্রের নিঝুম রজনীতে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে আজীবনের প্রতিজ্ঞার কথা!

সে সব কথার না আছে আদি, না আছে অন্ত।

গল্প করতে করতে কখন দিনের আলো নিভে এলো, কখন আকাশপথে বলাকার দল মেঘের রাজ্যির ভেতর দিয়ে ঘরে ফিরে গেল, কখন খালের দুই পাশের ঝোপ-জঙ্গলে জোনাক্ পোকার দল পথ খুঁজে ফিরতে লাগল,—ওরা দুই সখীতে কিছুই লক্ষ্য করেনি!



খালের এই রাস্তাটুকুতে দুই সখীর যত রাজ্যের মনের কথা। [পৃঃ ৩৩৫

হঠাৎ মাল্লা-মাঝীদের সমবেত চিৎকারে ওদের দুজনের চেতনা যেন ফিরে এলো।

জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সে দিকটায় কে যেন একেবারে কালো কালি লেপে দিয়েছে।

তাল, সুপুরি আর নারকেল গাছের ঝুঁটি ধরে কে যেন অকারণে নাড়া দিচ্ছে—তা ভালো করে বোঝবার আগেই দুই সখীর নৌকোটা কেমন যেন দুলে উঠল।

ওরা ভয় পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলে!

মাঝী মাল্লার দল—দারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়ে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল, —সামাল—সামাল !!!

কিন্তু নদীর বুকে তখন ঝড় উঠে গেছে।

নৌকোটাকে মোচার খোলার মতো ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে নদীর মাঝখানে কাত করে উলটে দিলে।

আশেপাশের অনেকগুলি নৌকো থেকে বুকফাটা চিৎকার উঠল, গেল—গেল —সব গেল !!!

তারপর কিছু বোঝবার আগেই দুই সখীর নৌকোটা একেবারে ডুবে গেল।

এই দুঃসংবাদ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছুবার পর সারা গ্রামের মোড়ল আর অভিভাবক-দল বকুলতলায় সমবেত হয়ে হুঁকোয় টান দিতে দিতে বিধান দিলে, ধর্মের অনাচারের জন্যেই এই অশুভ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাপারেই কুলপ্রথা আছে, ধর্মের বিধান আছে। সে সব অমান্য করে ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে কৈবর্তের মেয়ের এই অবাধ মেলামেশায় জাতি-ধর্ম একেবারে রসাতলে গেছে।

দেব-দ্বিজে ভক্তি হারালে যা হবার—এ ক্ষেত্রেও তাই রয়েছে। বিশেষ করে শিবের মন্দিরে ব্রাহ্মণ-কন্যা আর কৈবর্ত-কন্যা একই সঙ্গে বসে পূজা করেছে। তাতে তারা উভয়েই পাতক হয়েছে। এই দুই কন্যার অভিভাবকদের সেজন্য গ্রামস্থ লোককে আহ্বান করে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

শিবমন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত এই দুই কন্যাকে অনাচার করবার সুযোগ দেবার জন্য তাঁকেও যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

গঙ্গার ধারে মেয়েদের স্নানের ঘাটেও কুল-কামিনীদের রসনা কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল।

—ছি—ছি ঘেন্নার কথা। আমাদের এই পুণ্যের গাঁয়ে কখনো অনাচার ঢুকতে পারে নি! কালে কালে এ কী হল?

—এই দুটি মেয়ে নিজেরা ডুবল, আর আমাদেরও মজিয়ে রেখে গেল। তুষানলে পুড়ে মরলেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

—তা' দুই ছুঁড়িকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাদের বাড়ির লোকেরাই বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করুক। নইলে সবাই নির্বংশ হবে। শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের লোকের চাপে পড়ে দুটি নির্দোষ পরিবারকে প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠতে হল।

কালের আবর্তে আবার ফিরে এলো শিবরাত্রির উৎসব। দলে দলে লোক এসে জড় হল মেলায়।

মানত করতে এলো কত পুণ্যলোভাতুর নরনারী।

ঢাকের বাদ্যি আর গাজনের গানে গঙ্গাতীরের সেই নীরব গ্রামখানি মুখরিত হয়ে উঠল।

কুল-ললনাদের পূজোপাট শেষ হয়ে গেছে। তারা দল বেঁধে ঘরে ফিরে গেছে। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুর নিজের গামছাখানি মন্দির

চত্বরে বিছিয়ে একটু চোখ বুঁজেছেন। এমন সময় তাঁর কানে ভেসে এলো, ঘণ্টার টুং টাং শব্দ, মঙ্গল শঙ্খের মৃদু আর গম্ভীর ধ্বনি। আর সেই সঙ্গে শিবের স্তোত্র।

বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুর সচকিত হয়ে উঠলেন।

মন্দিরের ভেজানো দরজাখানি একটুখানি খুলে দেখলেন, জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না, ঘণ্টা উঠছে, বাজছে, শঙ্খ উঠছে, মঙ্গলশঙ্খ থেকে ধ্বনি জাগছে, দুটি নারীকণ্ঠ থেকে সুন্দর শিবের স্তোত্র শোনা যাচ্ছে! তারপর দেখা গেল, দুটি বকুল ফুলের মালা আপনা থেকেই শিবলিঙ্গের মাথায় গিয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরের সারা দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন, চামেলী ও চণ্ডীর অশরীরী আত্মা শিবের পূজো করতে মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সেই নিশীথরাতের মৃদু সমীরণে বৃদ্ধ শিউরে উঠলেন। তাঁর হাত-পা শিরশির করে উঠতে লাগলো। তাঁর দুটি স্নেহের নাতনী যে এই শিব মন্দিরের মায়া কাটাতে পারে নি, সেকথা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন।

তিনি উঠে বসলেন না। আবার সেই বিছানো গামছার ওপর পরম আনন্দে শুয়ে পড়লেন। তাঁরা দুটি চোখ জলে ভিজে এলো।

দুটি অশরীরী আত্মা তাদের আশ মিটিয়ে শিব পূজো সমাধা করল। তারপর আর তাদের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

এক বছর পরে আবার শিবরাত্রি ফিবে এসেছে। এবার একটু বেশী ধুমধামের আয়োজন করা হয়েছে।

বর্তমান জমিদারের একমাত্র নাতীর বিয়ে হয়েছে। জমিদার নাতবৌকে নিয়ে দেশের বাড়িতে এসেছেন কয়েকটা দিন বসবাস করবার জন্যে।

নাতবৌ শহরের মেয়ে হলেও মেলা দেখতে বড় ভালোবাসে। দাসীকে সঙ্গে নিয়ে সারাদিন ঘুরে-ঘুরে শিবরাত্রের মেলা দেখেছে। কোথায়ও পুঁতির মালা কিনেছে, কোথায়ও পুতুল দেখে খুশীতে আত্মহারা হয়েছে, আবার কোথায়ও 'মঠ' মিষ্টি খেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া কাঠের হাতি কিনেছে, কাঠের ময়ূরপঙ্খী নৌকো কিনে মনের খুশীতে হাততালি দিয়েছে। আবার দাসীকে দিয়ে গরম জিলিপি ভাজিয়ে কুড়মুড করে চিবিয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

বেশী রাত্তিরে যখন গাঁয়ের সব বৌ-ঝিদের পূজো শেষ হয়ে গেছে ? শহরের মেয়ে নাতবৌ গোপনে ঝিকে সঙ্গে নিয়ে শিবমন্দিরে এসেছে পূজো দিতে।

এসে দেখে মন্দিরের দরজা ভেজানো। বৃদ্ধ পুরোহিত গামছা বিছিয়ে একেবারে দরজার মুখে শুয়ে আছে।

নাতবৌ বললে, উঠুন পুরুত ঠাকুর, পথ ছেড়ে দিন, এইবার আমি নিরিবিলিতে শিবপূজো করবো।

পুরোহিত ঠাকুরের চোখে মুখে অনুনয়। বললেন, একটু দাঁড়াও বৌমা। এক্ষুণি আমি দরজা খুলে দেবো। বরং এই চাতালে একটু বোসো। জমিদারের নাতবৌ চটে-উঠে বললে, আমি কে জানেন ? এক্ষুণি মন্দিরের দরজা আমি খুলবো। দেরি আমার সইবে না।

ছুটে গিয়ে নিজে হাতে ঠেলে দরজা খুলে দিলে নাতবৌ। কিন্তু ভেতরকার দৃশ্য দেখে নাতবৌয়ের দু চোখ কপালে গিয়ে উঠল। আপনি প্রদীপ জ্বলছে, আপনি ধূপ-কাঠি শিবলিঙ্গের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি ঘণ্টা উঠছে বাজছে, নিজে থেকে শঙ্খ উঠছে, তার থেকে ধ্বনি বেরুচ্ছে ! তারপর দুটি বকুল ফুলের মালা আপনা-আপনি শিবলিঙ্গের মাথার ওপর গিয়ে পড়ল।

এই দৃশ্য দেখে শহরের মেয়ে জমিদারের নাতবৌ সেইখানেই মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল।

● **কলকাতার পথে**





নরেন্দ্রনাথ মিত্র

এবার বর্ষা এল তাড়াতাড়ি। আষাঢ় মাস শুরু হতে না হতেই নদীর জল দুই তীর ছাপিয়ে গেল। আর আমাদের বাড়ির দুপাশের দুদিকের দুটি খালই কানায় কানায় ভরে উঠল।

এখন আর হেঁটে আমাদের বাড়ি থেকে ভাঙ্গা হাই স্কুলে যাতায়াত করা যায় না। পুব দিকে যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু রাস্তা আছে সে রাস্তাও জল কাদায় পিছল। তাঁছাড়া কাঠের ব্রিজ মাঝে মাঝে থাকলেও দু তিন জায়গায় যে ভাঙ্গন আছে তার ওপর দিয়ে শুধু একখানা কি দুখানা করে মোটা তক্তা ফেলে দেওয়া রয়েছে। বইখাতা বগলে পা টিপে টিপে সেই তক্তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে যদি পা পিছলে কেউ হঠাৎ নীচে পড়ে যায় সে একেবারে অথই জলে তলিয়ে যাবে।

বাবা বললেন, 'ও পথে তুই যেতে পারবিনে। আরো যখন বর্ষা বৃষ্টি নামবে ও পথে হাঁটাই যাবে না। কালীবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তুই বর্ষার তিন মাস ভাঙ্গায় তাঁর বাসায় থাকবি।'

বাবার উকিল কালীকুমার সেন। তাঁকে আমি ছোট বয়স থেকেই চিনি। ভাঙ্গার সেরেস্তায কতবার দেখেছি। তিনি কাছে ডেকে নিয়ে আদর করেছেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছেন, 'বড় হলে কী হবে, জজ না ম্যাজিস্ট্রেট?' আমি মনস্থির করতে না পেরে বলেছি, 'দুইই হব।' ওঁর বাসাতেও বেড়াতে গিয়েছি। কিন্তু বেড়াতে যাওয়া এক কথা, আর দিনের পর দিন নিজের বাড়ি ফেলে অন্যের বাড়িতে থাকা অন্য ব্যাপার।

বাবার কথায় আমি মন থেকে সায় দিতে পারলাম না। বললাম, 'কেন বাবা। পাড়ার আরো সব ছাত্র নেছুদা, বেচুদা, পুটুদা সবাই তো নৌকো করে স্কুলে যায়। আমিও তাদের সঙ্গে যাব।'

ওরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড। পড়েও ওপরের ক্লাসে।

বাবা মাথা নাড়লেন, 'উঁহু। তোমাকে ওই সব নৌকোয় আমি যেতে দিতে পারব না। তুমি ওদের মত শক্ত নও, সাঁতারও জানো না। শেষে একটা বিপদ আপদ কিছু ঘটুক। তার চেয়ে তোমাকে কালীবাবুর বাসায় রাখা অনেক ভালো। নিশ্চিন্তে থাকতে পারব।'

শুধু বাবা নন, কাকা, বাবার পিসীমা—আমরা তাঁকে দিদিভাই বলে ডাকি সবাইয়েরই দেখলাম ওই এক মত। কেবল মা একটু কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন, 'ও কি অন্যের কাছে গিয়ে থাকতে পারবে?'

বাবা বললেন, 'থাকতে পারবে না তো কী করবে? তুমি কি চাও তিন মাস ও স্কুল কামাই করে বাড়িতে বসে থাকুক?'

মা-ই বা তা চাইবেন কেন? তিনিও চান ছেলে ভালো করে লেখাপড়া শিখুক।

সেই বছরই গাঁয়ের এম. ই. ইস্কুল থেকে পাস করে আমি ভাঙ্গা হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভরতি হয়েছি। শুকনোর সময় কোন সমস্যা ছিল না। হেঁটেই দেড মাইল দূরের স্কুলে যাতায়াত করেছি। কিন্তু বর্ষা যত রাজ্যের সমস্যা নিয়ে এল।

কাকু বলল, 'অত ভাবছ কেন? শহরে থাকতে পারবে, স্কুল ছুটির পরে আর বাড়ি ফেরার তাড়া থাকবে না। ঘুরে ঘুরে সব দেখবে। তোমার তো সুবিধাই হল। সবচেয়ে সুবিধা সন্ধ্যা হলেই থার্ডমাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়তে বসতে হবে না। বই থেকে একটু এদিক ওদিক তাকালে ধমক খেতে হবে না।'

বাঙ্কু বলল, 'তাছাড়া ইচ্ছা করলেই রসগোল্লা খেতে পারবে। বাজারের পারেই তো কালীবাবুর বাসা। দুবেলাই যেতে পারবে দোকানে।'

বাঙ্কুর রসগোল্লা প্রীতির কথা সবাই জানে।

কিন্তু নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্যের বাড়িতে গিয়ে থাকাটা কিছুতেই আমার কাছে যেন তেমন মনঃপূত হচ্ছিল না। তেমন চেনা-জানা নেই। দরকার হলে কারো কাছে কিছু চাইতে পারব না। কোন রকম অসুবিধা হলে কিছু বলতে পারব না। বাড়ির মত অবাধ স্বাধীনতা কি অন্য বাড়িতে আছে?

কিন্তু বাবা যখন স্থির করে ফেলেছেন আমাকে যেতেই হবে। বাইরে বসবাসের জন্য আমার জিনিসপত্র গুছানো হতে লাগল।

কালীবাবু বলে দিয়েছিলেন, 'থালা-বাসন আনতে হবে না শুধু বিছানাটা পাঠিয়ে দেবেন। শীতের দিন তো নয় যে লেপ তোশকের ভারী বিছানা হবে। শুধু একটা বালিশ আর একটা চাদরই যথেস্ট।'

মা আমার বিছানা আলাদা করে দিলেন। এত দিন মায়ের পাশে ঘুমোতাম, এবার থেকে আলাদা ব্যবস্থা। কোথায় কার সঙ্গে থাকব না কি একাই এক ঘরে থাকতে হবে তা জানিনে।

একটা বালিশে আমার চলে না, আর একটি পাশ বালিশ লাগে। মা সেটি দিয়ে দিলেন। মোটা তোশক আর ধবধবে বিছানার চাদর দিলেন সঙ্গে।

ছোট একটা স্যুটকেস পেলাম জামা-কাপড় রাখবার জন্যে। কিন্তু বই খাতাপত্র রাখব কিসে? তেমন ছোট বাক্স-টাক্স কিছু নেই। মা খুঁজে পেতে কোত্থেকে পুরোন একটা হারমোনিয়মের বাক্স যোগাড় করে আনলেন। এই বাক্সের হারমোনিয়মটা কোথায় গেছে কে জানে। কোন দিন সেই বাদ্যযন্ত্রটিকে আমরা দেখিনি। হয় তো ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু তার বাক্সটাই পড়ে আছে।

তক্তপোশের তলা থেকে সেই বাক্স বের করা হল। সরিয়ে ফেলা হল তার ভিতরকার অকেজো শিশি-বোতলগুলি। তলায় কাগজ পেতে তার ওপর সাজিয়ে রাখলাম আমার বইখাতা পেনসিল কলম। কালির দোয়াতটা আলাদা করে রাখা হল। পাছে কালি ঢেলে পড়ে

চাকলাদার ঠাকুরমা ঠাট্টা করে বললেন, 'পণ্টুর সাম্রাজ্য কে দেখবে? লাইব্রেরী ড্রামেটিক ক্লাব, পূজা-পার্বণ?'

বললাম, 'আপনি দেখবেন। আপনি হবেন রাজ-প্রতিনিধি।'

ভিতরে ভিতরে আমি অবশ্য সব কিছু চালাবার ভার আমার ছোটভাই কানু আর পরম বন্ধু বিনোদকে দিয়ে রেখেছিলাম।

আমার জেঠতুতো দাদার স্ত্রী বউদিও গোছগাছের ব্যাপারে সাহায্য করলেন। বয়সে বছর দশেকের বড হ'লেও তিনি আমার সঙ্গিনী। তার সঙ্গে আমি কড়ি খেলি, সাতগুটি বাঘবন্দী খেলি আর লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল নাটক পড়ি।

তিনি আমার মাকে ধনখুড়ীমা বলে ডাকেন।

বউদি বাক্স গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছেন নাকি ধন-খুড়ীমা?'

মা বললেন, 'ষাট। মেয়ে হতে যাবে কেন। ব্যাটা ছেলে কত দেশ-দেশান্তরে যাবে। ও কি আমাদের মত? শ্বশুরবাড়ি ছাড়া যাওয়ারও জায়গা নেই, থাকবারও জায়গা নেই।'

তারপর সকালবেলায় আমাদের নিজেদের যে ডিঙি নৌকোয় বাবা কাকা কাছারিতে যান সেই নৌকোয় বিছানাপত্র বইয়ের বাক্স নিয়ে উঠে বসলাম। সঙ্গে ওঁরা দুজনেই আছেন। নৌকো বেয়ে চলেছে আসগর। আমাদের বাড়ির মুসলমান চাকর।

মাত্র দেড়মাইল দূরের রাস্তা। তবু মনে হচ্ছিল যেন কত দূরদূরান্তরে যাচ্ছি। খালের ঘাটে মা দিদিভাই সবাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিদায় দেবার জন্যে।

এ ভাবে চলবি ও ভাবে চলবিনে, এ কথা বলবি, ও কথা বলবিনে—এমন বহু উপদেশ নির্দেশে ভরতি আর একটি অদৃশ্য থলি আমার মালপত্রের সঙ্গে চলল।

তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে কালীবাবুর ঘাটে এসে নৌকো ভিড়ল।

স্নান করার জন্যে গামছা কাঁধে তিনি তখন ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের নৌকো দেখে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো এসো।' বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসুন মিত্তিরমশাই।'

আসগরের গায়ের রং কালো কুচকুচে। বেশ শক্তসমর্থ শরীর। যেন একটি তরুণ গাবগাছ। আমার চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ ছয় বছরের বড়। আঠের-উনিশ বছর হবে ওর বয়স।

সে নৌকো ঘাটে বেঁধে বৈঠা রেখে গামছা দিয়ে বিড়ে তৈরি করে সেটা মাথায় রাখল। তারপর বইয়ের বাক্সটা তুলে নিল তার ওপর। গোল করে পাকানো দড়ি দিয়ে দিয়ে বাঁধা বিছানাটা তুলে নিল বগলে।

মণিকাকা বললেন, 'একটা একটা করে নিয়ে যা। ফেলে দিবি জলে।'

আসগর বলল, 'না ধলা কর্তা, কিচ্ছু পড়বে না পানিতে।'

কালীবাবু নদীতে আর নামলেন না। ফিরে চললেন বাড়ির ভিতরে। ততক্ষণে বাড়ির অন্যান্য সবাই এসে আমাদের ঘিরে ধরেছেন। এসেছেন কালীবাবুর ছেলেরা, মেয়েরা, ভাইঝিরা। পরে ওঁদের সবাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আর এল আমারই বয়সী একটি ফরসা টুকটুকে সুন্দরপানা ছেলে।

বাবা বললেন, 'এসো বিনু, তোমার একজন সঙ্গী হল।'

তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন ওর সঙ্গে। কালীবাবুর সবচেয়ে ছোট ছেলে। ক্লাস সিক্সে পড়ে। ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

বাড়িতে খান তিন চার ঘর আছে। মাঝখানে উঠোন।

পশ্চিমের ভিটের ঘরখানা অপেক্ষাকৃত ছোট। সেই ঘরে আমার মালপত্র তোলা হল।

ঘরখানা দিনের বেলায় বাড়ির সবাইর বসবার ঘর। রাত্রে কেউ কেউ ঘুমোয়। উত্তর দিকের বেড়া ঘেঁষে একখানা তক্তপোশ পাতা। বিছানা গুটানো রয়েছে। তার সামনে খান চারেক চেয়ার। পুব দিকে দুখানা, পশ্চিম দিকে দুখানা। দক্ষিণ দিকে ছোট একজোড়া টেবিল-চেয়ার। এ পাশে ও পাশে ছোট বড় র‍্যাক। বইয়ে ঠাসা।

বাবা কাকা একটু বাদেই বিদায় নিলেন। সেরেস্তায় তাঁদের কাজ আছে। কালীবাবুও চলে গেলেন স্নান করতে। বিনু ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

হঠাৎ নিজেকে বড় একা মনে হল। আমার বইপত্র বিছানা-টিছানা নিয়ে কী করব ভেবে পেলাম না। বাড়িতে নিজের জিনিস তো আমি নিজে গুছোইনে। সব মা করে দেন, না হয় দিদিভাই।

একটু বাদেই জন তিনেক মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। দুজন আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। একজনকে মনে হল সমবয়সী। হয়তো দু একবছরের বড় হবে। কিসের যে সংকোচ। আমি তাদের দিকে ভালো করে তাকাতে পারলাম না। কথা বলা তো দূরের কথা।

একজন বলল, 'পল্টু খুব লাজুক।'

আর একজন বলল, 'দুদিন সবুর কর। ভাঙ্গার তিন মোহনার জল খেলে দুদিনেই চটপটে হয়ে উঠবে।'

এই ছোট্ট সহরে কুমার নদের তিনটি ধারা তিন দিক থেকে এসে মিশেছে। তাই তিন মোহনা। গাঁয়ের লোক সংক্ষেপে বলে তিন মুনি।



একটু বাদেই জন তিনেক মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। [পৃঃ ৩৪৪

তিন জনের মধ্যে শ্যামবর্ণ শান্ত স্বভাবের মেয়েটিকে বেশী সহানুভূতিশীল বলে মনে হল।

সে বলল, 'অত লজ্জা করলে তো চলবে না পল্টু। বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হবে। তোমার বাবাকে আমরা মিত্তিরদা বলে ডাকি। সেই সুবাদে তুমি আমাদের পিসী বলে ডাকবে। আমি টুলু পিসী আমার বোন দুলু পিসী। আর কুন্তী, তোকে কি ফুল পিসি বলবে? তুইতো বিন্নুর ফুলদি।'

কুন্তী বলল, 'আমি অতবড় ছেলের পিসী টিসি হতে পারবনা। তোরা যা হবার হয়ে নে।'

হেসে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনে মনে ভাবলাম, 'আমি কাউকে কিছু বলে ডাকতে পারব না। অত তাড়াতাড়ি আমার মুখ থেকে সম্বোধন বেরোয় না।'

আমাকে কিছু করতে হল না। দুলু পিসী টুলু পিসীরাই আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিল।

আর একজন মহিলা আমার সামনে এসে হেসে বললেন, 'আমি তোমার ঠাকুরমা হই সম্পর্কে। তোমার বাবা আমাকে মা বলে ডাকেন।'

ছোটখাট চেহারা। দেখতে বেশ সুশ্রী। একগাছি চুলও পাকেনি। একটি দাঁতও পড়েনি। এঁকে ঠাকুরমা বলতে হবে?

দুলু পিসী আমার মনের কথাটা বলে ফেলল, 'ঠাকুরমা হওয়া তোমাকে মানায় না। পল্টু, তুমি ওঁকে রাঙাদি বলে ডেকো। দেখেছ কেমন রাঙা টুকটুকে চেহারা আমার কাকীমার?'

রাঙাদি হেসে বললেন, 'তুই বড্ড ফাজিল হয়েছিস দুলি। তোর আর সর্দারি করতে হবে না।'

পরে শুনেছিলাম মহিলাটি কালীবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার অনেক পরে ওকে বিয়ে করেছেন।

স্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তেল মেখে গামছা নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেলাম। বিনুও এল সঙ্গে সঙ্গে।

দুজনেই জলে নামলাম।

বিনু বলল, 'সাঁতার কাটতে জানো?'

অল্পস্বল্প জানি। কিন্তু মুখে বললাম 'না।'

বিনু বলল, 'কিরকম ছেলেরে বাবা! গাঁয়ের ছেলে—সাঁতার জানো না?'

ও যেভাবে গাঁয়ের ছেলে বলল তাতে আমি অপমান বোধ করলাম। ভাঙ্গা যেন কত বড় শহর। তাছাড়া—বিনুরা যেদিকটায় থাকে সেদিকটা মোটেই শহরের মধ্যে পড়ে না। কিছু ভদ্রলোকের ছোট ছোট বাসা আছে। আর কিছু নেই। সেদিক থেকে এটাও তো পাড়াগাঁ।

আমি বললাম, 'তুমি জানো সাঁতার?'

বিনু বলল, 'নিশ্চয়ই। ইচ্ছা করলে আমি এপার-ওপার হতে পারি।'

এই বর্ষার সময় নদী হয়েছে সমুদ্রের মত। অগাধ জল। বেশ স্রোত বইছে। এসময় গাঁয়ে যারা ভালো সাঁতার জানে তারাই শুধু নদী পারাপার করতে সাহস করে। ছোট ছেলেরা পারেও না, তাদের চেষ্টা করতেও দেওয়া হয় না।

আমি বিনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'সত্যি?'

আমার সংশয় দেখে বিনু চটে উঠল, 'সত্যি নয়ত কি মিথ্যে বলছি? আমি তোমাকে হাতে হাতে প্রমাণ দেখাতে পারতাম, বাবা বকবেন দাদারা বকবেন তাই।'

বিনু চালাক ছেলে। আমার মুখ দেখে ও বুঝতে পারল ওর কৈফিয়ত আমি

বিশ্বাস করিনি। ফলে ও ভিতরে ভিতরে রেগে রইল। বেশ শক্ত, গম্ভীর ওর মুখের ভাব।

সেই মুখের দিকে চেয়ে আমার আশঙ্কা হল এই ছেলেটির সঙ্গে বোধহয় কোন দিনই আমার বন্ধুত্ব হবে না। ও আমাকে দেখা মাত্রই অপছন্দ করেছে। আমিও ওকে তেমন পছন্দ করতে পারিনি। বিনোদ নামে আরো একটি বন্ধুকে আমি গাঁয়ে রেখে এসেছি। সে আমার আরো ছেলেবেলার বন্ধু। কত ভালোবাসে আমাকে। এর নামও বিনোদ। কিন্তু দুজনের মধ্যে কত তফাত। শুধু নামেই মিল আছে আর কোন কিছুতে মিল নেই।

স্নান করে উঠে খেতে গেলাম। পুব দিকের যে ঘরখানা আছে, সেই ঘরেরই একটা দিকে রান্না হয়, আর একটা দিকে খাবার ব্যবস্থা। সেখানে দুখানা পিঁড়ি পেতে বিনুর বড় বউদি আমাদের খেতে দিলেন।

অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। মুখে মিষ্টি হাসি। গলার স্বরেও খুব মমতা।

তিনি ভাত বেড়ে দিয়ে বললেন, 'পল্টু, লজ্জা কোরো না। নিজের বাড়ির মত সব চেয়েটেয়ে নেবে। যা খেতে ভালোবাসো বলবে।'

সবই ভালো কিন্তু রান্নাটা যেন কেমন কেমন। আমাদের বাড়ির রান্নার মত মোটেই নয়। ডাল খুব পাতলা। মাছের ঝোলটাও তাই। তাছাড়া বড্ড বেশী হলুদের গন্ধ।

ভালো না লাগলেও খেতে হবে। নইলে ওঁরা ভাববেন ছেলেটা কা অভদ্র।

আমি বুঝতে পারলাম বাড়িতে যেমন আবদার চলে এখানে তা চলবে না। কোন খাবার পছন্দ না হলে আমি বাড়িতে তা ফেলে দিতে পারি, ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, এখানে তা অসম্ভব।

আমার খেতে দেরি হচ্ছিল। বিনু তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠল।

বড় কাকীমা (বিনুর বড় বউদি) বললেন, 'পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যেয়ো। ওকে ফেলে যেয়ো না বিনু।'

বিনু বলল, 'কেন, ও কি স্কুলের পথ চেনে না?'

বললাম, 'চিনব না কেন। তুমি যাও। আমি একাই যেতে পারব।'

বিনু অবশ্য একা গেল না। স্কুলে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

থানার কোয়ার্টারের ভিতর দিয়ে রাস্তা। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জমি। উত্তর দিকে একটি লম্বা হলঘর। বিনু বলল, 'ওটা হল অফিস।' পুব আর দক্ষিণ দিকের ঘরগুলি দেখিয়ে বলল, 'ওগুলি কোয়ার্টারস।'

দুজন কনেস্টবল একটি লোককে হাতকড়ি পরিয়ে টেনে নিতে নিতে অফিসের ভিতরে ঢুকল। ব্যাপারটা দেখে আমার গা শিরশির করে উঠল।

বিনু আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার বুঝি ভয় করছে? তুমি চোর না ডাকাত? পুলিসকে এত ভয়?'

চোরও নই, ডাকাতও নই। তবু বিনুর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় আমি লজ্জিত হলাম। ওকে কী করে বোঝাব কাউকে হাতকড়ি পরিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য দেখতে আমার ভালো লাগে না। অস্বস্তি বোধ হয়।

বিনু বলতে বলতে চলল থানার অফিসারদের সঙ্গে ওদের খুব জানাশোনা। ওর বাবা সরকারী উকিল বলে অফিসাররা তাঁকে খুব সম্মান করেন। ওর দাদাদের সঙ্গেও কারো কারো বন্ধুত্ব আছে।

থানা এলাকা পার হলে ডান দিকে খেলার মাঠ। মাঠের উত্তরে কালীবাড়ি। তার পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে বাজারের দিকে। দুদিকে দোকানপাট। সব ছাড়িয়ে খেয়াঘাটে এলাম। এ ঘাট আমার চেনা। ভাঙ্গা স্কুলে ভর্তি হবার পর গত কয়েক মাস ধরে এই খেয়া তো আমি রোজই পার হচ্ছি। স্কুলে যাবার সময় একবার, স্কুল থেকে ফেরার সময় একবার। তবু আজ যেন কেমন নতুন নতুন লাগছে। আজ আমি নিজেদের বাড়ি থেকে আসিনি, এসেছি বিনুদের বাসা থেকে।

নানারকম যাত্রীতে নৌকা বোঝাই হয়ে উঠল। ছাত্রেরা আছে, শিক্ষকেরা আছেন, মক্কেলরা আছেন, শামলা-পরা উকিলরা আছেন। আরো কতজন কত উদ্দেশ্য নিয়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে।

বিনু নিজেদের ক্লাসের একটি ছেলেকে পেয়ে তার সাথে গল্প জুড়ে দিল। আমার কথা ওর মনেই রইল না। নৌকো থেকে নেমে সারাটা পথ ও সেই ছেলেটির সঙ্গেই কথা বলতে বলতে চলল। আমি যেন কেউ নই। আমার কথা ও যেন একেবারে ভুলেই গেছে।

স্কুলের কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকলাম। আমি আমার ক্লাসে চলে গেলাম। ও গেল ওর ক্লাসে।

পথে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম শহরের অনেকের সঙ্গেই ওর জানাশোনা। হবেই তো। ও জন্মাবধি এখানে আছে। ক্লাস ওয়ান থেকে এই স্কুলে পড়ছে। বছর বছর ফার্স্ট হচ্ছে। সবাই ওকে সমাদর করে। বাবার কাছে শুনেছি ও শুধু ক্লাসের



বিনু নিজেদের ক্লাসের একটি ছেলের সাথে গল্প জুড়ে দিল। [পৃঃ ৩৪৮

ফার্স্ট বয় নয়, ওর আরো অনেক গুণ আছে। ও আবৃত্তি করে গ্রুপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়, অভিনয় করে প্রশংসা পায়। অতটুকু ছেলে হলে কি হবে শহরসুদ্ধু লোক ওকে চেনে।

আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। বিনু আমার চেয়ে এক বছরের ছোট, পড়েও এক ক্লাস নীচে। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় বিদ্যায় বুদ্ধিতে খ্যাতিতে প্রতিপত্তিতে ও যেন আমার চেয়ে ঢের বড়। প্রতিমুহূর্তে আমার ইচ্ছা হয় আমারও যে কিছু আছে ওর কাছে তার প্রমাণ দিই। কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পেয়ে উঠিনে।

তুলনায় আমার সেই গাঁয়ের বন্ধু বিনোদকে আবার মনে পড়ে। সে আমার চেয়ে বয়সে এক বছরের বড় কিন্তু পড়ে নীচের ক্লাসে। লেখাপড়ার ব্যাপারে তার কাছে আমার নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। কিন্তু বাইরের কাজকর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপারে আমি তার প্রভুত্ব স্বীকার করি। সেই বিনোদের সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব এই বিনোদের সঙ্গে তা কি কখনো হবে?

ক্লাসে আমার জানাশোনা বন্ধুদের মধ্যে যাকে পেলাম তাকেই বললাম, 'আমি আজ আর বাড়ি যাব না। ডাঙ্গায় থাকব। সারা বর্ষাটাই এখানে থাকব।'

মানিকদির রাখাল ব্যানার্জি বলল, 'আমরা নৌকো বেয়ে আসি, নৌকো বেয়ে যাই। মাঠ এখন সাগরের মত। জলে জলাকার। কী যে মজা তুমি তা টের পেলে না।'

ছুটির পর আমি খেয়াঘাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খেয়া নৌকো ছাড়াও ঘাটে আরো নানারকমের নৌকো রয়েছে। বটগাছের তলায় সারি সারি ছইওয়ালা এক মাল্লাই নৌকো, ডিঙ্গি নৌকো। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামের ছাত্রদের নৌকোও দেখতে পেলাম।

সদরদি থেকেও কয়েকখানা নৌকো আসে। আমাদের পাড়ার নৌকোখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নেছুদা, পুটুদারা নৌকোয় উঠে বসেছে। রাহাবাড়ির ছেলেরা, সাহা পাড়ার ছেলেরা সবাই আছে। নৌকো ভরতি। নেছুদা আমাকে দেখে বলল, 'কি রে যাবি নাকি আমাদের সঙ্গে?'

নৌকোয় ওঠার জন্যে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কিন্তু আমাকে বলতেই হয়, 'না, আমি যাব না নেছুদা। আজ থেকে এখানেই থাকব।'

ওদের নৌকো চলে গেলে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিনু আমাকে আগেই বলে দিয়েছিল ছুটির পর সে আমার সঙ্গে যাবে না। ক্লাবের কাজ আছে। আমি যেন একাই ওদের বাসায় চলে যাই। আমার মনে হল এটা ওর এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দি। আসলে আমার সঙ্গে ও যেতে চায় না।

যে ছেলে আমাকে এমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে তাদের বাসায় আমাকে থাকতে হবে ভেবে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু উপায় তো নেই। আমি তো আর আজই গিয়ে বাবাকে বলতে পারিনে আমি থাকব না এখানে। বললে বাবা তা শুনবেনই বা কেন।

খেয়া পার হয়ে সেই থানার মাঠের ভিতর দিয়ে বিনুদের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। বিনুর কথা সবাই জিজ্ঞাসা করলে বললাম, 'ও পরে আসছে।'

ওঁরা আমাকে জলখাবার খেয়ে নিতে বললেন।

বাড়ি ভরতি লোক। আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। ঠিক আলাপ নয়। দূর থেকে দেখলাম আর কি। বিনুর মেজদা, মণিদা, বিলুদাকে দেখলাম। সবাই যুবক। দেখতেও বেশ ভালো, হাসিখুশি প্রকৃতির। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমি মিশব কী করে?

বিনুর বড়দা থাকেন বাটকেমারি। মাইল দশেক দূরের একটি গ্রামে। সেখানে স্কুলে মাস্টারি করেন। সপ্তাহের শেষে একবার করে আসেন বাড়িতে। মেজদারও বিয়ে হয়েছে। বউ এখন বাপের বাড়ি সিরাজগঞ্জে।

টুলুপিসী দুলু পিসীরা তাদের ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। দক্ষিণের ভিটিতে আটচালা ঘর। অত বড় ঘর আমি এর আগে দেখিনি। একখানা ঘরকেই ভাগ ভাগ করে তিন চারখানা ঘর করা হয়েছে।

টুলু পিসীরা তাদের বুড়ো মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। বেশ বুড়ো। মুখে দাঁত-টাত নেই। পিঠ অবধি চুল নেমেছে। সেই চুলের রাশের অর্ধেকের বেশী পাকা। তাঁকে দেখে আমার দিদিভাইয়ের কথা মনে পড়ল।

সম্পর্কে ইনিও ঠাকুরমা। হ্যাঁ, ওঁকে ঠাকুরমা হওয়া মানায়। আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন, 'বিদ্বান হও, পণ্ডিত হও।'

বিনু এল স্কুল থেকে। সন্ধ্যার পর হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসল। আমি যে ঘরে থাকব, পড়ব সে ঘরে নয়। অন্য ঘরে বইপত্র নিয়ে গিয়ে বসল। আর কেউ ঘরে থাকলে ওর নাকি পড়া হয় না। ওর জায়গা আমি দখল করেছি ভেবে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী মনে হতে লাগল।

ওর মেজদা অবশ্য বললেন, আমাদের দুজনের জন্যেই উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। বাড়িতে তো জায়গার অভাব নেই।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল। আগে ছোটরা, তারপর বড়রা। তারও পরে মেয়েদের ব্যাচ।

আমার ঘরে আমি আর বিনু একসঙ্গে থাকব। এক বিছানায় নয়। পাশাপাশি খাটে আলাদা বিছানায়।

বিনুর দাদারা নিজেদের মধ্যে গল্পটল্প ক'রে চলে গেলেন। বারবার আমাকে বললেন, 'পণ্টু, তোমার ঘুম পেয়ে থাকলে তুমি শুয়ে পড়।'

বিছানা পাতাই আছে। কে যেন পেতে রেখে গিয়েছে। বাড়ির মতই আদর যত্ন। মন খারাপ করবার কিছু নেই। তবু অবুঝ মনের খারাপ হতে বাধে না।

ঘর খালি হয়ে গেছে। তবু আমার শুতে ইচ্ছা করছে না, ঘুমও পাচ্ছে না। বিনুর দেখা নেই। ও হয়তো ঘরে দাদা বউদিদের সঙ্গে গল্প করছে নাকি সেখানেই শোবার ব্যবস্থা করেছে কে জানে।

ঘরের নীচেই নদী। জলের কুলুকুলু শব্দ শোনা যাচ্ছে। নৌকো চলার শব্দও শুনতে পেলাম। এত রাত্রেও এ-সব নৌকো কোথায় চলেছে কে জানে। কোন কোন নৌকো হয়তো আমাদের সদরদিতেও যাবে। জানলার পর্দা সরিয়ে জলের দিকে তাকালাম। কিন্তু অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখতে পেলাম না।

হারিকেনটা জ্বলছে টেবিলের ওপর। পাশেই আমার বই খাতাপত্র সাজানো।

আমি ফের গিয়ে চেয়ারে বসলাম। একটা খাতা টেনে সাদা পাতা বের করলাম। তারপর পেনসিল দিয়ে তাতে লিখতে লাগলাম।

'এই আমি প্রথম বিদেশে এলাম। আজ আমার প্রথম প্রবাস। মনে হচ্ছে যেন কত দূরে চলে এসেছি। সকলের জন্যেই মন কেমন করছে। বিশেষ করে মার জন্যে।'

আর কিছুই লিখতে পারলাম না। পেনসিল হাতে চুপ করে বসে রইলাম।

হঠাৎ হাসির শব্দে পিছন ফিরে তাকালাম। তাকিয়ে দেখি বিনু। বুঝতে পারলাম, আমার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ও সব পড়ে নিয়েছে।

আমি বললাম, 'তুমি চুরি করে আমার লেখা পড়লে কেন?'

বিনু তার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'চোখেও জল এসে গেছে। ইস কত বড় প্রবাস। আমার এক মামা থাকেন গৌহাটিতে। কটন কলেজের প্রফেসর। অতুলদা থাকেন দিল্লীতে। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার। কেউ প্রবাসী নন। সব এই দেশের মধ্যে। রাঙা কাকা থাকেন লণ্ডনে। রিসার্চ স্টুডেন্ট। এঁদের মধ্যে তিনিই থাকেন শুধু বিদেশে। তুমি কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে এসেছ শুনি?'

তারপর বিনু আমাকে হাত ধরে টেনে তুলল, 'ওগো প্রবাসী আর লিখতে হবে না। এবার শোবে চল।'

তাকালাম ওর দিকে। ওর গলায় ঠাট্টার সুর। ওর চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক, মুখের হাসিতে পরিহাস।

তবু এতক্ষণে, এই প্রথম ওর মুখে আমি একজন বন্ধুর মুখ দেখতে পেলাম।

———



শ্রীতুষার চ্যাটার্জী

লিং মাস্টার আর মিস্টার ফাই,
খুলেছে ব্যবসা এক বলিহারি যাই।
দেশের চাহিদা বুঝে
বুদ্ধি করে
নদী থেকে মাছগুলো
এনেছে ধরে।
লাল মানুষের দেশে
ভীষণ সাড়া!
মাছ কিনে নিতে আজ
লেগেছে তাড়া!
যত মাছ ধরে আনে
হয় তা কাবার,
জলে যত মাছ ছিল
হ'ল তা সাবাড়।

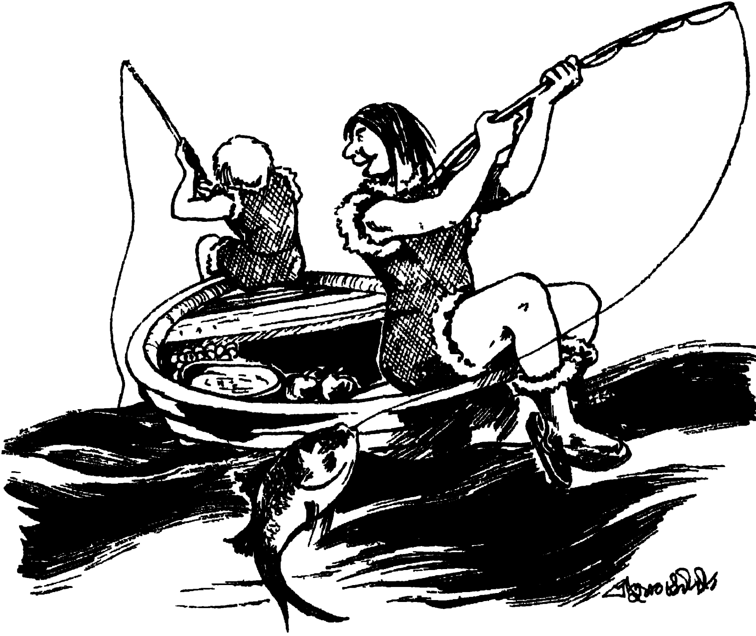




মাছ চাই! মাছ চাই!
শোরগোল ওঠে
লালমুখো লোকগুলো
এসে তাই জোটে।
মিস্টার ফাই দেয় .
মাথা'পরে হাত
মাছ নাই পেলে
মেরে করবে রে কাত!
হেথাকার লোকগুলো
সব জানোয়ার
ভালো কথা কিছুতেই
বোঝে নাকো আর

মিস্টার লিং বলে ফাই মাস্টার
উদোমাদা তোর মত দেখিনে তো আর।
সাগরেতে মাছ আছে হাজার হাজার
তুলে এনে ঢেলে দেব ভরবে বাজার।
খদ্দের কত আছে আন বে-ধড়ক
মাছ দেখে হবে সব চক্ষু চড়ক।
তুজনেতে আঁক কষে মাথা খাটিয়ে
আজব কাঠের নাও নিল বানিয়ে!
লাল নীল রং দিয়ে নৌকা গড়ে!
তুজনেতে প্রস্তুত নাওতে চড়ে।
নৌকাতে ভেসে চলে শিকারী তুজন!
কাঠের নৌকা ভাসে হালকা ওজন।

● আরে আরে একি হ'ল?



দুই জনে দুই দিকে ধরে ছিপগাছ !
এবার ধরবে তারা বিস্তর মাছ !
কিছু জল কিছু ফল সঙ্গে নিলো
আঙুর সঙ্গে নিলো দু'এক কিলো !
থৈ থৈ জল-মাঝে নৌকা ভাসে
দুজনেতে মশগুল আমোদে হাসে।
ফাই তাই চোখ বুজে চুরুট টানে
লিং বসে চেয়ে থাকে সাগর পানে।
মাছ ওঠে টপাটপ্ সাগর থেকে
দুজনেতে ছিপ নিয়ে বসেছে জেঁকে !
ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ কি আওয়াজ লিং চমকায়
ছিপ ফেলে পিছনেতে ফিরে সে তাকায়।

● শ্রীতুষার চ্যাটার্জী



আরে আরে একি হল কি সর্বনাশ
ওটা কিরে কিম্ভূত গায়ে ভরা আঁশ!
—ওরে উজবুক ফাই নিরেট গাধা!
বাঁচার উপায় কিছু কর না দাদা!
কোথা থেকে জুটল এ বিটকেলটাই
বাড়া ভাতে আমাদের দিল এসে ছাই!
হায় হায় সব গেলো জলের মাঝে!
বাঁচার উপায় কিছু দেখছি না যে!
ফাই খালি যম শুধু চুরুট ফোঁকার
কোন দিকে হুঁশ নেই উজবুকটার!
ব্যবসাতে লালবাতি প্রাণ রাখা দায়!
জলে ডুবে মরা নাকি আছে শেষটায়!!!



কাঁকড়া কারখানার দ্বীপে

অদ্রীশ বর্ধন

খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম বিরাট বিজ্ঞাপন। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র পরিকল্পিত 'মলিকিউলা'র রেস্তোরাঁ'র দ্বারোদ্ঘাটন হবে আজ। মিনিস্টাররাও আসছেন।

মলিকিউলার রেস্তোরাঁ! অনেকদিন আগে প্রফেসরের মুখে এরকম একটা আইডিয়া শুনেছিলাম বটে। মলিকিউল অর্থাৎ অণু-ই হবে সেই রেস্তোরাঁর খাবার-দাবারের মূল উপাদান। তরি-তরকারি, আটা-ময়দা, মাছ-মাংস, মসলা-পেঁয়াজ—কিছু লাগবে না। এমন কি রাঁধুনির দরকারও হবে না। হোটেল বয়কেও প্রয়োজন হবে না। সুইচ টিপলেই খাবার বেরিয়ে আসবে। চপ কাটলেট, দই সন্দেশ, চিকেন চৌ চৌ, বিরিয়ানি—সব।

প্রফেসরের উর্বর মাথায় আইডিয়া রোজ গজায়। কিন্তু এই আইডিয়াটা নিশ্চয় কোনো হোটেলওয়ালা লুফে নিয়ে গেছে। লাখ লাখ টাকা কামাবে মলিকিউলার রেস্তোরাঁর দৌলতে। আক্রাগণ্ডার বাজারে বাজার করার কোনো হাঙ্গামাই নেই। শুধু কড়াং কড়াং করে সুইচ টেপা। অমনি বেরিয়ে আসবে গরম গরম খাবার।

মেনুতে মনের মত খাবার না থাকলেও পাকপ্রণালী দেখে মাইক্রোফোনে অর্ডার দিলেই চলবে। মলিকিউলার রেস্তোরাঁ, চক্ষের নিমেষে তা বানিয়ে দেবে!

সেই মলিকিউলার রেস্তোরাঁর আজ উদ্বোধন। অথচ আমি জানি না? কাগজ ফেলে ছুটলাম প্রফেসরের বাড়ি।

প্রফেসর ঐ সাতসকালেও বসেছিলেন গবেষণা মন্দিরে। দৃষ্টি টেবিলের ওপর রাখা একটা কাচের বাক্সর দিকে।

দেখলাম, বাক্সর মধ্যে রয়েছে একটা কাঁকড়া!

ধুত্তোর কাঁকড়া! আমার মাথায় তখন মলিকিউলার রেস্তোরাঁ ঘুরছে। প্রফেসরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—"শুনছেন?"

"অ্যাঁ!" ভীষণ চমকে উঠলেন প্রফেসর।

"মলিকিউলার রেস্তোরাঁর আজ তো উদ্বোধন।"

"মলিকিউলার রেস্তোরা!……মলিকিউলার রেস্তোরাঁ!……ও হ্যাঁ, খুশবন্তকে খুশী করার জন্যে দিয়েছিলাম ফরমুলাটা। রেস্তোরাঁ তৈরি করে ফেলেছে নাকি?"

"বলছি কি তাহলে, আজ উদ্বোধন। আপনিও যাচ্ছেন—খবরের কাগজে নাম বেরিয়েছে।"

"আমি!" অসহায় চোখে কাঁকড়ার দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। "আমার সময় কোথা?"

"চলুন, চলুন, মলিকিউলার রেস্তোরাঁর কোপ্তা-কাবাব তো খেয়ে আসি।"

জুলজুল করে তখনো বাক্সবন্দী বিদকুটে প্রাণীটার দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। আমি দেখেও দেখলাম না, কাঁকড়ার চেহারাটা যেন কেমনতর!

এক কথায়, কিম্ভূতকিমাকার!

মলিকিউলার রেস্তোরাঁর বিরাট প্যানেলটার ছবি সব খবরের কাগজেই বেরিয়েছে। অগুন্তি সুইচ, পাশে খাবারের নাম লেখা, টি-ভি স্ক্রীনের মত ঘষা কাচের পর্দায় ভেসে ওঠা মাছ, মুরগীর ছবি অনেকেই কেটে বাঁধিয়ে রেখেছে ঘরের দেওয়ালে।

নেই শুধু ডক্টর আলফোঁসের ছবি। ভদ্রলোক বেঁটে, বড়জোর পাঁচ ফুট। শুকনো মুখ। চিবুকে সোনালী ছাগলদাড়ি। চোখে লাল ফ্রেমের চশমা। সোনালী চুল টেনে

আচড়ানো, ঠোঁটের দুপাশে চামড়া কুঁচকোনো—যেন সবসময়ে হাসছে। হাসলেই অবশ্য ঝকঝক করে সামনের স্টেনলেস স্টীলের দাঁতটা।

ডক্টর আলফোঁসে জাতে ফরাসী। ইণ্ডিয়ায় এসেছে গভর্নমেণ্টের আমন্ত্রণে। মলিকিউলার রেস্তোরাঁয় প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রকে দেখেই 'বোঁজোর' বলে জড়িয়ে ধরলে। সোজা এলো ল্যাবোরেটরীতে, কাঁকড়াটাকে দেখেই 'ফ্রনেস্তে' বলে হাঁক ছেড়েই জার্মান-ফ্রেঞ্চ-ইটালিয়ান মিশোনো জগাখিচুড়ি ভাষায় প্রফেসরের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বকবক করলে অনেকক্ষণ ধরে।

এবার আসা যাক মূল ঘটনায়।

ঘটনাস্থল ভারত মহাসাগরের একটা ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপটার অবস্থান ডিয়েগো গার্সিযা দ্বীপের কাছাকাছি। এর বেশী এখন আর কিছু বলব না।

"আছটুং! আছটুং!" সে কী চিৎকার আলফোঁসের। কোমর জলে দাঁড়িয়ে খালাসীদের সঙ্গে হাতাহাতি করে প্যাকিং বাক্সগুলো নামাচ্ছে ডক্টর। মোট দশটা বাক্সর নটা নেমে গিয়েছে—বাকী আছে এই একটা। নৌকোর গলুইতে দাঁড়িয়ে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।

আমি দাঁড়িয়ে আছি দ্বীপের ওপর। মাইলখানেক দূরে ভাসছে হালকা জাহাজটা। বিজন দ্বীপে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে। ফের আসবে তিন সপ্তাহ পরে।

সর্বশেষ বাক্সটা নিয়ে দুই বৈজ্ঞানিক দ্বীপে উঠে এলেন। প্রফেসর হাসছেন ফোকলা দাঁত বার করে। ডক্টর হাসছে স্টেনলেস স্টীলের দাঁত বার করে।

দেখেই পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার।

বললাম—"কোনো মানে হয়? দ্বীপে তো কাকপক্ষীও দেখছি না। এদিকে রোদ্দুরের চোটে তো কাঠ ফাটছে। কি দরকার ছিল আসার?"

লাল রঙের ব্যানডানা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো ডক্টর। বললে—"এনফাস্ত।" অর্থাৎ শিশু!

ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। গোড়া থেকেই দেখছি, আমাকে দেখলেই গুজগুজ ফুসফুস করা হচ্ছে। যেন আমি বাইরের লোক, ঘরের কথা বলা চলে না। ঘরের লোক হল ঐ আলফোঁসে—উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!

গোদের ওপর বিষফোড়া ঐ টিটকিরি! বোমার মত ফেটে পড়তে যাচ্ছি, অমনি

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন বুড়ো প্রফেসর—"দীননাথ, কড়া রোদের দরকার আছে বলেই তো এতটা পথ এলাম। ভরদুপুরে সূর্য মাথার ওপর এসেছে, তাই কষ্ট হচ্ছে। সব সয়ে যাবে।"

রাগে অভিমানে ফুলতে ফুলতে বললাম—"খাস আফ্রিকাতেও এত গরম নেই! চাঁদি ফেটে গেল আমার!"

মালপত্র নামিয়ে খালাসীরা সামনে এসে দাঁড়ালো। আলফোঁসে এক তাড়া নোট বের করল পকেট থেকে। গুনেও দেখল না।

দাঁত খিঁচিয়ে বলল—"এন আভাণ্ট!"

অর্থাৎ, বাপু হে, এবার কুইক মার্চ করে কেটে পড়ো!

খালাসীরা তো অবাক্! বকশিশের জন্যে এত টাকা। ঝটপট নোটের তাড়া পকেটস্থ করে তারা লাফিয়ে উঠল নৌকোয়, ঝপাঝপ দাঁড় টেনে ফিরে গেল জাহাজে।

আমার চোখও কপালে উঠে গিয়েছিল আলফোঁসের দান-ধ্যানের বহর দেখে। টাকা কি খোলামকুচি? এত টাকা পাচ্ছে কোত্থেকে?

দ্বীপে এখন আমরা তিনজনে।

থুড়ি, চারজন। আলফোঁসের পোষা পমেরিয়ান কুকুরটাও দ্বীপে নেমেছে। লোমশ কুকুর। কুতকুতে চোখ। নামের ডাকে অবশ্য গগন ফাটে। ডায়মণ্ড!

জাহাজে জিজ্ঞেস করেছিলাম আলফোঁসেকে—"কুকুরের নাম ডায়মণ্ড কেন?"

"আইনস্টাইনের কুকুরের নাম ডায়মণ্ড কেন?" পালটা প্রশ্ন করেছিল আলফোঁসে।

অত খবর আমার জানা ছিল না। সত্যেন বোসের বেড়ালের শখ ছিল জানি। আইনস্টাইনের খবর রাখতাম না।

সেই ডায়মণ্ড ল্যাজ নাড়তে নাড়তে লাফালাফি শুরু করে দিল দ্বীপের বালির ওপর।

প্রফেসর একগাল হাসলেন। বললেন—"দীননাথ, চটছো কেন। এস, হাত লাগাও।"

"কেন হাত লাগাব? আমি কি কুলী?"

"আরে ছ্যা, ছ্যা, তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট!"



দিব্যি তার নাকে গালে চোয়ালে শুড়শুড়ি দিয়ে যাচ্ছি। [পৃঃ ৩২৭

"অ্যাসিস্ট্যান্ট না কচু! দ্বীপে কেন এসেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট এখনো তা জানে না।"

"এই ছ্যাখো! তোমাকে বলবার সময়টা পেলাম কোথা? জাহাজে তো এসব কথা বলা যায় না। টপ সিক্রেট যে।"

মনে মনে বললাম—আল-ফোঁসেকে তো বলতে পেরেছিলেন?

প্রফেসর দন্তহীন মাড়ি বার করে হি-হি করে হাসছেন।

"রাগ করেছো? শোনো তাহলে কেন এসেছি। ডারউইনের নাম শুনেছো?"

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। চোখ মুখ লাল করে বললাম—"যতটা গণ্ডমূর্খ ভাবছেন, ততটা নই।"

"ভীষণ চটে আছো দেখছি। ডারউইনের থিওরি নিয়ে একটা জবর এক্সপেরিমেণ্ট করার জন্যে এসেছি।"



তিন নম্বর বাক্সটায় হাতুড়ি মারতেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর। [পৃঃ ৩৮২

"ডারউইন! তিনি তো বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেছেন।"

"আমারও তাই বলতে পারো।" বলে চোখ টিপলেন আলফোঁসের দিকে চেয়ে। আমার কেমন জানি মনে হল, প্রফেসর সব কথা ভাঙলেন না।

মুখ গোঁজ করে বললাম—"হুকুম করুন, কি করতে হবে।"

"এক নম্বর বাক্সটা আগে খুলে ফ্যালো।"

খুললাম। ভেতর থেকে বেরোলো তাঁবু, কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতি, স্ক্রু ড্রাইভার, শখানেক টিন ভরতি খাবার, আর জল, র‍্যাঁদা ও হাতুড়ি।

তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করার পর আমি আর আলফোঁসে দুজনে মিলে খুললাম দু নম্বর বাক্স। দেখলাম, ফরাসী জাতটা খাটিয়ে বটে। শুকনো খ্যাটখেটে চেহারা নিয়েও অসুরের মত খাটতে পারে আলফোঁসে।

দু নম্বর বাক্স থেকে বেরোলো একটা চাকাগাড়ি অর্থাৎ 'ট্রলার'। রেলের প্লাট-ফর্মে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে কুলীদের কাছে যা থাকে আর কি।

তিন নম্বর বাক্সটায় হাতুড়ি মারতেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর।

"দীননাথ! স্টপ!"

"কেন?"

"ম্যাপটা ছাখো। দ্বীপময় ছড়িয়ে দিতে হবে জিনিসপত্র।"

"সে আবার কী!"

প্রফেসর আর আলফোঁসে ততক্ষণে খুলে ফেলেছেন ম্যাপটা। ম্যাপের নানান জায়গায় লাল পেনসিলের দাগ দেওয়া।

প্রফেসর বললেন—"এক্সপেরিমেণ্ট নইলে জমবে না।"

ম্যাপের দিকে তাকাতেই দ্বীপের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঠিক যেন কাচের প্লেট উপুড় করা জলের ওপর। পঞ্চাশ গজ চওড়া বালির পাড় দিয়ে বাঁধানো। সৈকতভূমির পর কাঁটাঝোপ। রোদ্দুরে সব যেন ঝলসে পুড়ে গিয়েছে।

দ্বীপটার ব্যাস মাত্র দু মাইল।

লাল দাগগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন প্রফেসর।

"প্যাকিং কেসগুলো এইসব জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুলতে হবে।"

"কেন?" ফের শুধোলাম আমি।

"এক্সপেরিমেণ্ট!" জবাব দিল আলফোঁসে।

চাকাগাড়িতে প্যাকিং কেস চাপিয়ে চিহ্নিত অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে জিনিসপত্র খুলতেই গেল পুরো তিনটে দিন।

তিন নম্বর কেসটা খুলেই কিন্তু ভ্যাবাচাকা খেয়েছিলাম প্রথম দিন। ভেবেছিলাম অত ভারী বাক্সর মধ্যে থেকে নিশ্চয় একটা পেল্লায় মেসিন বেরোবে। কিন্তু দেখলাম রাশিরাশি লোহালক্কর ছাড়া কিছুই নেই ভেতরে। আজেবাজে লোহা। বিভিন্ন মাপের

রকমারি ওজনের পেতল। তালতাল দস্তা। কোনোটা চৌকোনা, কোনোটা লম্বাটে। কোনোটা গোল বলের মত। ব্যাপার কী? এ আবার কি এক্সপেরিমেণ্ট?

চার নম্বর কেস থেকে ন নম্বর কেস পর্যন্ত ঠাসা এই ধরনের ফেলে দেওয়া ধাতুর রদ্দিমার্কা টুকরো টাকরা দিয়ে।

শেষ বাক্সটা যেই খুলতে যাচ্ছি, আবার হাঁ-হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর—"দাঁড়াও! দাঁড়াও!"

"আবার কি হল?" চমকে উঠলাম আমি। মাথাটাও গেল গরম হয়ে। এই কদিন ধরে ভূতের মত খেটেছি প্রফেসরের কথা মত। কিন্তু বুঝিনি কেন উনি তাগাড় করে রাখছেন লোহালক্করগুলো দ্বীপের এক এক জায়গায়। কোথাও সব ধাতু মিশিয়ে রেখেছেন। কোথাও রেখেছেন শুধু একরকম ধাতু। কোথায় মাটির ওপর স্তূপাকারে রেখেছেন, কোথাও মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখেছেন, কোথাও রেখেছেন জলের কিনারায়, কোথাও রেখেছেন টিলার ওপর। কিন্তু কেন? যতবার জিজ্ঞেস করেছি, অনামুখো ঐ আলফোঁসে বলেছে, "এক্সপেরিমেন্ত!"

তবুও মুখ বুঁজে হাড়ভাঙা খেটে গিয়েছি। দশ নম্বর প্যাকিং কেসটা আকারেও ছোট, ওজনেও হালকা। হাতুড়ির দু'ঘা আর শাবলের একটা চাড় দিলেই ডালা খুলে ছিটকে যাবে। কিন্তু এমন হা-হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য রয়েছে বাক্সর মধ্যে!

চটেমটে বললাম—"হয়েছেটা কী? চিল্লাচ্ছেন কেন?"

"আস্তে আস্তে খোলো। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

খুললাম আস্তে আস্তে। যেন ঠুনকো জিনিসে বোঝাই এমনভাবে বিলিতী খড় দিয়ে ঠাসা ভেতরটা। কাঠের গুঁড়ো, বনাত আর মোম-মাখানো কাগজ দিয়ে প্যাক করা বেশ পরিপাটী করে।

অতি সন্তর্পণে ডালা খুলে নামালাম। বিলিতী খড় সরালাম। কাঠের গুঁড়োর মধ্যে থেকে টেনে বার করলাম একটা কাচের বাক্স।

বাক্সর মধ্যে রয়েছে কিম্ভূতকিমাকার সেই কাঁকড়াটা।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম কাঁকড়া মহাশয়ের দিকে!

কাচের বাক্সে লাটসাহেবী আপ্যায়নে যাকে নিয়ে আসা হয়েছে জাহাজে চাপিয়ে

বিজন দ্বীপে, কিম্ভূতকিমাকার সেই কাঁকড়াটা কিন্তু জীবন্ত কাঁকড়া নয়। কাছ থেকে ভাল করে দেখতে দেখলাম, খেলনার কাঁকড়া!

এ কী রহস্য! এ কী প্রহেলিকা!! এ কী গোলকধাঁধা!!!

ছেলেভুলোনো খেলনার কাঁকড়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম বলে সেকেণ্ড কয়েক পরেই খেয়াল হল, জিনিসটা সাধারণ কাঁকড়া নয়। মামুলী খেলনাও নয়।

ছটা গাঁটযুক্ত দাঁড়ার ওপর দিব্বি দাঁড়িয়ে আছে মস্ত কাঁকড়াটা। সেই সঙ্গে সামনের দিকে রয়েছে দুজোড়া শুঁড়। শুঁড়ের ডগা 'মুখ' নামক ভীষণাকৃতি বিবরের মধ্যে ঢোকানো। পিঠের ওপর চকচক করছে আরশির মত কি যেন। আরশির মত দেখতে হলেও জিনিসটা আরশি নয়। ঠিক যেন একটা পেটমোটা চকচকে ধাতু—মাঝে গাঁথা কালচে-লাল রঙের একটা ক্রিস্ট্যাল। মামুলী কাঁকড়া হলে সামনের দিকে শুধু একজোড়া চোখ থাকত। কিন্তু অতি কদাকার এই কাঁকড়ার চার চারটে চোখ! দুটো সামনে, দুটো পেছনে!

সৃষ্টিছাড়া এমন একটা মেট্যাল টয়, দেখলে ভ্যাবাচাকা হব, এ আর আশ্চর্য কী! সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হল, দু-দুটো ঝানু বৈজ্ঞানিক এই কাঠফাটা রোদ্দুরে বিজন দ্বীপে বদখত খেলনাটা নিয়ে এলেন জীবজগৎ নিয়ে এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে?

ভাবতে ভাবতে আমি নিজেই যেন একটা খেলনা হয়ে গেলাম, পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলাম বালির ওপর।

আলফোঁসে চটপটে হাতে বাক্সটা তুলে নিল। ডালা খুলে আলতোভাবে তুলে ধরল কাঁকড়াবাবুকে—নামিয়ে দিল আমার পায়ের কাছে বালির ওপর।

দেখলাম, দুই বৈজ্ঞানিকের চোখ কাঁকড়ার চোখের মতই বুঝি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ডাঁটির ডগায়। অগত্যা আমিও গোলগোল চোখে তাকালাম পায়ের দিকে!

আঁতকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে!

কাঁকড়ার পিঠে বসানো আরশির মত ক্রিস্ট্যালটা আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে সূর্যের দিকে!

ম্যমী কাঁকড়া! এতক্ষণ মরে ছিল, এখন বেঁচে উঠছে!

লাফিয়ে সরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ছায়া গিয়ে পড়ল কাঁকড়ার ওপর।

তৎক্ষণাৎ কিলবিলিয়ে উঠল ছটা দাঁড়া, চারটে শুঁড়। সরসর করে কাঁকড়া এগিয়ে গেল ছায়ার বাইরে—রোদের মাঝে! সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে উঠল ডায়মণ্ড!

এরকম ভুতুড়ে ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি। পাছে আমার পা কামড়ে ধরে এই ভয়ে তিন লাফে গিয়ে দাঁড়ালাম আলফোঁসের পেছনে। বাঁধানো দাঁত বার করে হাসল আলফোঁসে। বলল: "এনফান্ত!"

চলন্ত কাঁকড়া আবার চলতে শুরু করেছে। গুটি গুটি এগোচ্ছে জলের দিকে। রোদে পিঠ দিয়ে বালির ওপর এঁকাবেঁকা রেখা এঁকে এগিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে।

কিনারায় গিয়ে শুঁড় ডুবিয়ে রইল জলের মধ্যে। জল খাচ্ছে নাকি? নইলে শুঁড় ডোবাতে যাবে কেন?

পেট ভরে গেছে বোধ হয়। আবার পিছু হটে এল কাঁকড়া। কড়া রোদে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ দেহে।

আমার গা সিরসির করে উঠল। রোমাঞ্চ কাকে বলে, প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে অনুভব করলাম। মনে হল যেন মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে বিদকুটে প্রাণীর ভৌতিক কাণ্ডকারখানা দেখে!

ঢোঁক গিলে শুধোলাম—"আবিষ্কারটা কার? আপনার?"

ফোকলা মাড়ি বার করে হাসলেন প্রফেসর।

"এই দিয়ে ডারউইনের থিওরী টেস্ট করবেন?"

"একরকম তাই বলতে পারো", বলে আবার আলফোঁসের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসলেন প্রফেসর।

অর্থাৎ আসল কথাটা এবারেও ভাঙলেন না।

কাঁকড়া আর নড়ছে না। ক্ষুদে দানবের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মিহি বালির ওপর। একটা চোঙাকে শুইয়ে দিয়ে তলার দিকে ছটা পা আর চারটে শুঁড় লাগিয়ে দিলে যা হয়, পুঁচকে রাক্ষসকেও দেখতে হুবহু তাই। শুধু সামনে পেছনে চোঙাটা চ্যাপটা চাতালের মত হয়ে গিয়েছে। দুজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে সেখানে।

চোখ বলে মনে হলেও আসলে তা পাথরের মণি বললেও চলে। স্পষ্ট দেখলাম ভেতরে ধকধক করছে রক্তবর্ণ ক্রিস্ট্যাল। মেট্যাল মনস্টারের ক্রিস্ট্যাল চোখ।

দানোটার পেটের দিক্‌টা প্ল্যাটফর্মের মত সমতল। ভেতরে কি আছে, তা অবশ্য দেখতে পেলাম না।

জার্মান-ইটালি-ফ্রেঞ্চের জগাখিচুড়ি ভাষায় কি যেন বলল আলফোঁসে। খিকখিক করে হেসে উঠলেন প্রফেসর।

সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিমে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দ্বীপের উত্তরে। তাই রোদ্দুর সরে সরে যাচ্ছে জলের দিকে। সেই ছায়া এসে পড়ল কাঁকড়ার ওপর, অমনি চঞ্চল হল তার ধাতব বপু। সরসর করে ছায়া থেকে বেরিয়ে গেল—দাঁড়াল রোদে পিঠ দিয়ে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। চকচক করছে পিঠের ক্রিস্ট্যাল। আচমকা গাছপালার ছায়া এসে পড়ল পিঠে। তক্ষুণি চনমনে পায়ে ফের রোদের দিকে সরে গেল মেট্যাল মনস্টার।

আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম পেছন পেছন। কাঁকড়া এগোয়, আমরাও এগোই। এইভাবে জলের ধার দিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এসে পৌঁছোলাম দ্বীপের পশ্চিম দিকে।

দ্বীপের এই দিকে জলের ধারে বালির ওপর ভাগাড় করা ছিল দস্তা-পেতল-লোহার একটা স্তূপ। ফুট দশেক দূরে এসে থমকে দাঁড়াল ছপেয়ে দানো। পরমুহূর্তেই সাঁ করে ছুটে গেল বালির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎরেখার মত। একটা পেতলের ডাণ্ডার সামনে গিয়েই নিথর হল দেহ।

উদ্দেশ্যটা বুঝলাম না। লোহালক্কর দেখে কেন এত উত্তেজনা, ধরতে পারলাম না। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই খিক্-খিক্ করে ফের হেসে উঠলেন প্রফেসর। বললেন—"চলো হে দীননাথ, তাঁবুতে ফেরা যাক। কাল এসে কাঁকড়ার কাণ্ড দেখে পিলে চমকে উঠবে এখন।

"ইন্টারেস্টিং!" ফিক করে হেসে বলল আলফোঁসে।

টিন ভরতি খাবার দিয়ে ডিনার খেলাম তিনজনে। চাদর মুড়ি দিয়ে ক্যাম্পখাটে শুতে না শুতে ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু পারলাম না। অত হাসির আওয়াজে

ঘুম আসে? সমস্ত রাত ধরে ক্যাম্পখাটে উসখুস করলেন প্রফেসর আর হেসেই চললেন খিকখিক করে। যেন ভারী মজার এমন একটা ব্যাপার ঘটতে চলছে যার বৃত্তান্ত তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

ভোর হল। আমি দাঁত-টাত মেজে মুখ ধুতে গিয়ে সমুদ্রের জলে বেশ খানিকটা সাঁতার কেটে নিলাম। ফুরফুরে হাওয়ায় ঠাণ্ডা জলে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

আচমকা শুনলাম প্রফেসরের চিৎকার।

'দীননাথ, ও দীননাথ।'

হাঁকপাঁক করে জল থেকে উঠে পড়লাম। বাঘে তাড়া করেছে নাকি প্রফেসরকে? এত চেঁচানি কেন?

"দীননাথ! ও দীননাথ! শীগগির এসো।"

ছুটতে ছুটতে গেলাম তাঁবুতে। প্রফেসর নেই, আলফোঁসেও নেই। চেঁচানিটা ভেসে আসছে দ্বীপের মাঝখান থেকে।

সাতারের পোশাক পরেই দৌড়োলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। কাঁটাঝোপ টপকে গাছপালা পাশ কাটিযে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল উঁচু টিলাটা। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে প্রফেসরের হ্যাংলা মূর্তি। হাত নাড়ছেন আর গলার শির তুলে চেঁচাচ্ছেন—"শীগগির এসো। সুন্দরীদের দেখবে এসো!"

সেই সঙ্গে কুকুরের তড়পানি—"ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ ঘেউ।"

ডায়মণ্ড চেঁচাচ্ছে!

সুন্দরী! বিজন দ্বীপে সুন্দরী!

কথা না বাড়িয়ে ছুটলাম প্রফেসরের পেছন পেছন। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে ফেলে দেওয়া ধাতুর স্তূপের কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে বললেন প্রফেসর—"ছাখো।"

সবার আগে দেখলাম আলফোঁসেকে। হেঁট হয়ে তাকিয়ে আছে বালির দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে সমানে ঘেউ-ঘেউ করে গলা ফাটাচ্ছে ডায়মণ্ড।

কিন্তু তন্ময় হয়ে কি দেখছে আলফোঁসে?

আমিও হেঁট হলাম। আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল তক্ষুণি!

নীল ধোঁয়া উঠেছে কাঁকড়ার গা থেকে। কিন্তু এ কী! কিলবিলে শুঁড় নাড়ছে একটা নয়—দুটো কাঁকড়া!

ভুরু কুঁচকে বললাম—"কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন জোড়াটাকে ?"

"লুকিয়ে রাখতে যাবো কেন," যেন আকাশ থেকে পড়লেন প্রফেসর। "কাল রাতে জন্মেছে !"

"জন্মেছে !"

"আরে হ্যাঁ, চোখ মেলে ছাখোই না।"

চোখ মেলে দেখতে গিয়ে একবার চোখ রগড়ে নিতে হল। কেননা যা দেখলাম, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য ! স্বপ্ন দেখছি না তো ?

দেখলাম, তুরন্ত বেগে কাজ করছে দুটো কাঁকড়াই। হুবহু একরকম দেখতে দুজনকে। সামনের দুটো শুঁড় নাড়ছে, অমনি যেন ইলেকট্রিক স্পার্ক বেরুচ্ছে শুঁড়ের মধ্যে থেকে। স্পার্ক দিয়ে ধাতুর ছোট ছোট টুকরো কেটে নিয়ে মুখে পুরছে। সেই সঙ্গে কেমন জানি গুন-গুন গুন-গুন শব্দ হচ্ছে পেটের মধ্যে। যেন কত কলকবজা ঘুরছে পেটের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরেই তৈরী কলকবজা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে হিসহিস শব্দে, অন্য দুটো শুঁড় 'ফিনিশড' পার্ট নিয়ে পেটের তলায় প্ল্যাটফর্মে সাজিযে রাখছে নিখুঁতভাবে থরে থরে বিশেষ একটা প্যাটার্নে।

প্ল্যাটফর্মটাও একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে। বেশ বুঝলাম, আর একটা কাঁকড়ার আদল দেখা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল কাঁকড়ার কারখানা দেখে।

কোন মতে বললাম মিনমিন করে—"কাঁকড়া কাঁকডা বানাচ্ছে।"

তবে আর বলছি কী। লেদ মেসিন দিয়ে যদি লেদের কলকবজা তৈরি করা যায়, তাহলে আমিই বা পারব না কেন ? তাই এমন একটা মেসিন বানিয়েছি যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের নকল বানাতে পারবে। এই হল সেই মেসিন।"

এইটুকু সময়ের মধ্যেই প্রথম কাঁকড়ার পেটের প্ল্যাটফর্মে ক্ষুদে কাঁকড়ার কঙ্কাল প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। হঠাৎ কড় কড় শব্দে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল খাঁজকাটা ধাতুর একটা ফিতে। শুঁড় দিয়ে ফিতেটা নিয়ে ক্ষুদে কাঁকড়ার কঙ্কালকে মুড়ে দিতেই সম্পূর্ণ হল তার চেহারা। দুটো লিকপিকে দাঁড়া সামনের ঘাঁটিতে লাগিয়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্মটাকে বালির ওপর নামিয়ে দিল 'মা' কাঁকড়া।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল নবজাতক। তার পরেই পিঠের ক্রিস্ট্যাল বসানো ধাতুর আয়না আস্তে আস্তে ঘুরে গেল সূর্যের দিকে। যেন গা গরম করছে। একটু পরেই

গুটি গুটি গেল জলের ধারে। শুঁড় দিয়ে জলপান করল কিছুক্ষণ। ফিরে এসে বালির ওপর পড়ে রইল নিস্পন্দ দেহে।

বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, দ্বিতীয় কাঁকড়ার পেটের প্লাটফর্মেও আদল দেখা দিয়েছে আরেকটা ভাবী কাঁকড়ার। প্রথম কাঁকড়াটাও নির্বিকারভাবে ফের স্পার্ক দিয়ে ধাতু কাটছে, মুখে পুরছে। ঠিক যেন ওয়েল্ডিং মেসিন থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে অত্যুজ্জ্বল শিখা নিয়ে।

খাবি খেতে খেতে বললাম—"আপনার মেসিন জল খায় কেন?"

"নোনা জল দিয়ে পিঠের ব্যাটারী চার্জ দেবে বলে।"

"রোদ পোহায় কেন?"

"সূর্যের শক্তি দিয়ে সিলিকন ব্যাটারী চালু করবে বলে। সারাদিনের সৌরশক্তি অ্যাকুমুলেটরে সঞ্চয় করে রাখে সারারাত কাজ করবে বলে।"

"বলেন কী! দিনে রাতে সমানে কাজ করে আপনার মেসিন?"

"এক সেকেণ্ডও বিশ্রাম নেয় না। মেসিন তো!"

"কিন্তু এত সিলিকন পাচ্ছেন কোথায়? লোহালক্করের মধ্যে তো সিলিকন নেই?"

"তোমার পায়ের তলায় রয়েছে সিলিকনের অফুরন্ত খনি।" বালিতে লাথি মেরে বললেন প্রফেসর, "বালি হল সিলিকন অক্সাইড। কাঁকড়ার পেটের কারখানায় গিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক তা থেকে বের করছে শুধু সিলিকন। ত্যাখো, ত্যাখো, চার নম্বর কাঁকড়া ভূমিষ্ঠ হল।"

সচমকে দেখলাম চতুর্থ নবজাতককে। গুটিগুটি এগোচ্ছে জলের দিকে ব্যাটারী চার্জ করার মতলবে। ঠিক যেন দম দেওয়া কলের কাঁকড়া!

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে শুধোলাম—"কিন্তু কি হবে এত কাঁকড়া নিয়ে?"

"বোকা ছেলে! কি হারে বংশবৃদ্ধি করছে ওরা, তা তো নিজের চোখেই দেখলে। কাল ছিল একটা, রাতারাতি হল দুটো। এখুনি হবে আটটা। কাল হবে চৌষট্টিটা। পরশু দিন পাঁচশো বারোটা। দশ দিনে এক কোটি। তখন ওদের পেটের কারখানা চালু রাখতে লাগবে তিরিশ হাজার টন ধাতু।"

"তারপর?"

"তারপর? আচ্ছা বোকা ছেলে তো! শত্রু এলাকায় একটা কাঁকড়া পাচার করার

পরিণামটা কল্পনা করতে পারছো না? দশ দিনেই তো শত্রুদের কামান বন্দুক সাবাড় করে দেবে। লড়াইয়ের দফারফা হয়ে যাবে।"

এতক্ষণে বুঝলাম, কেন ইণ্ডিয়ান নেভী সামান্য একটা কাঁকড়াকে এত জামাই আদরে পৌঁছে দিয়ে গেছে বিজন দ্বীপে।

চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। আমতা আমতা করে বললাম— "শত্রুদের ধাতু খেয়ে ফেলার পর ওরা যদি মিত্রপক্ষের এলাকায় চলে আসে?"

"যে হুকুম নিয়ে কাঁকড়ারা কাজ করছে, তার চাবিকাঠি তো আমার কাছে। ইচ্ছে করলেই মেসিন বন্ধ করে দেব। তার আগেই অবশ্য শত্রুপক্ষের সমস্ত ধাতু নিয়ে চলে আসবে কাঁকড়া বাহিনী। ভাবো দিকি কত খরচ বাঁচিয়ে দেবে আমাদের?"

শুনেই বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল মাথা। ধপ করে বসে পড়লাম বালির ওপর।

"এনফান্ত!" বলল আলফোঁসে।

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যেও চমকে চমকে উঠলাম দুঃস্বপ্ন দেখে। দেখলাম, কাঁকড়া-রোবটরা পিলপিল করে গায়ে উঠছে আমার। তীক্ষ্ণ দাঁড়া দিয়ে খুবলে খাচ্ছে আমার চোখ, মাংস, নাক!

চারদিন পর সারা দ্বীপ ছেয়ে গেল কাঁকড়াবাহিনীতে। রোদে বসে দেখতাম পাঁই পাঁই করে ছুটোছুটি করছে কলের কাঁকড়ার দল। দারুণ ব্যস্ত প্রত্যেকেই! মরবারও বুঝি সময় নেই।

শুনলাম, ওদের সংখ্যা এখন চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

সেই দিনই বিকেলের দিকে একটা অশুভ ঘটনা ঘটল।

দ্বীপের একপ্রান্তে বালির মধ্যে দস্তা পুঁতে রেখেছিলাম প্রথম দিন। কাঁকড়াদের কলকবজায় বিশেষ একটা অংশ তৈরি করতে দস্তার দরকার হয়। তাই দ্বীপের অন্য অঞ্চল থেকেও পিলপিল করে ওরা ছুটে আসত এখান থেকে দস্তা যোগাড় করতে।

সেদিন একসঙ্গে কাতারে কাতারে কাঁকড়া জড়ো হয়েছে দস্তা নিতে। ফলে, গাদাগাদি ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোমাত্রায়। এদের মধ্যে একটা কাঁকড়াকে দেখলাম যেন একটু দলছাড়া। গায়ে গতরে বেশ ভারী। পালোয়ান ধাঁচের চেহারা। জাতভাইদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফ মেরে এগিয়ে এল সে। দস্তার একটা ডাণ্ডা সবে ধরেছে দাঁড়া দিয়ে, অমনি আর একটা কাঁকড়া উলটো দিক থেকে টেনে ধরল ডাণ্ডাটা।

শুরু হয়ে গেল টাগ অব্ ওয়ার —টানাটানির লড়াই। জিতল অবশ্য পালোয়ান কাঁকড়া। কিন্তু পরাভূত কাঁকড়ার তেজ দেখে কে। রণে ভঙ্গ দেওয়া দূরে থাকুক, পেছন থেকে সাঁ করে ছুটে এসে দুটো দাঁড়া সটান ঢুকিয়ে দিল পালোয়ানের মুখের মধ্যে।

তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড লড়াই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অবশ্য পালোয়ানটা উলটে দিল প্রতিপক্ষকে। সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে হড়কে সরে গেল চিৎ-পটাং কাঁকড়ার পেটের প্ল্যাটফর্ম। হরেকরকম ক্ষুদে কলকবজা বেরিয়ে পড়ল উদরের মধ্যে।

ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখতে হল এর পরেই। চক্ষের নিমেষে ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে অসহায় কাঁকড়াটার পেট কাটতে শুরু করল বিজয়ী কাঁকড়া। নীল ধোঁয়ার রেখা উঠল। দেখলাম, লিভার, হুইল, পিস্টন কেটে কেটে মুখে পুরছে গুণ্ডা কাঁকড়াটা। ক' সেকেণ্ডই বা গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল জাতভাই বেচারা।



অসহায় কাঁকড়াটার পেট কাটতে শুরু করল বিজয়ী কাঁকড়া।

আশপাশে নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঁকড়ার দল। তিলমাত্র উত্তেজনা দেখলাম না কারো মধ্যে। মেসিন। ডাহা মেসিন।

পালোয়ান কাঁকড়ার পেটের প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এর মধ্যেই ঘন ঘন নড়তে শুরু করেছে। গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে দেহের কারখানায়। অতি দ্রুত জন্ম নিচ্ছে আর একটি কাঁকড়া। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হল নবজাতক এবং দৌড়োলো ব্যাটারী চার্জের জন্য জল আনতে!

আমি দৌড়োলাম প্রফেসরের সন্ধানে। আলফোঁসেকেও দেখলাম সেখানে। বসে বসে ডাইরী লিখছে।

প্রফেসর আমার শুকনো মুখ দেখে হন্তদন্ত হযে বললেন—"কি হয়েছে দীননাথ?"

আমি সব বললাম। শুনে কোথায় ঘাবড়ে যাবেন, তা না বেশ খুশীই হলেন। খিকখিক করে বেশ খানিকটা হেসে নিযে বললেন—"যাক, যা চাইছিলাম, তা শুরু হয়ে গেছে।"

"তার মানে? কাঁকড়ায় কাঁকড়া খেলে তাহলে আর রইল কি?"

"সব চাইতে পালোয়ান কাঁকড়াটা তো বাঁচবে? সব চাইতে শক্তিশালীরা টিকে গেলে তাদের চাইতেও আরো ভয়ংকর কাঁকড়া তো জন্মাবে?"

"প্রফেসর—"

"ছ্যাখো, ডুটো জিনিস হুবহু একরকম কখনো হয় না। ডুটো বলবিয়ারিং পর্যন্ত সমান ছাচের হয় না। আমি যে ছাঁচ, যে ব্লুপ্রিণ্ট ওদের মেসিনের মধ্যে বসিয়েছি, ওরা হুবহু তার নকল করার চেষ্টা করলেও উনিশ বিশ তফাত থাকবেই। আস্তে আস্তে এই তফাত বাড়বে। শেষে এমন কাঁকড়ার সৃষ্টি হবে যার সঙ্গে আমার তৈরী আদি কাঁকড়ার কোনো মিল থাকবে না। কিন্তু যত দিন যাবে, ততই ডেঞ্জারাস আর পাওয়ারফুল রোবট তৈরী হবে রোবট কারখানার মধ্যেই। দীননাথ, এই হল আমার বিবর্তন এক্সপেরিমেণ্ট। কাঁকড়াদের জগতে আমিই হব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আমি সৃষ্টি করছি, পালন করছি, সংহারও করছি। এমন একটা দিন আসবে যেদিন দ্বীপে একরত্তি ধাতুও থাকবে না। সেদিন কি হবে জানো? ধাতুর লোভে নিজেদের জাতভাইদের ধরে ধরে খাবে এরা। তারপরেই জন্মাবে নতুন কাঁকড়া। তারা কি ধরনের হবে, আমি তা জানি না। কিন্তু দেখতে পাব আর কদিনের মধ্যেই।"

দেখলাম, ডাইরী লেখা থামিয়ে গোগ্রাসে কথাগুলো গিলছে আলফোঁসে!

রাত নেমেছে। চুপ করে বসে আছি অন্ধকারে। বৈজ্ঞানিক তুজনের নাসিকা-গর্জন শুনতে পাচ্ছি বাইরে বসেও। আমার চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছে। প্রফেসর শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়বেন না তো? মানুষের মঙ্গল করতে গিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না তো? ভয়ংকর এই কাঁকড়াদের একটিও যদি কোনো রকমে কলকাতায় ছেড়ে দেওয়া যায়। তাহলেই তো দফারফা হবে কলকাতার বাবুদের। টালার ট্যাঙ্ক

থেকে আরম্ভ করে ট্রামলাইন পর্যন্ত সমস্ত নিশ্চিহ্ন হবে! ট্রাম, বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন—সব অদৃশ্য হবে!

পাশ দিয়ে খড়খড় করে ছুটছে কাঁকড়ার দল। অসীম এনার্জি ওদের মধ্যে। বিরামবিহীন কর্মব্যস্ততা। দেখেই মেজাজ খিচড়ে গেল। তাঁবুর মধ্যে থেকে একটা শাবল এনে দমাস করে থেঁতলে দিলাম একটা রোবটকে। ভেবেছিলাম জাতভাইরা তাই দেখে চোঁচা দৌড় দেবে। কিন্তু উলটোটা ঘটল। অর্থাৎ পিণ্ডি পাকানো ভাইয়ের লাশ নিয়ে কামড়াকামড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি শুরু হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। নীল ধোঁয়া, ইলেকট্রিক স্পার্কের দ্যুতিতে রাত ঝলসে উঠল চোখ ধাধিয়ে গেল। দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল বিকল রোবটকে। দেখে রাগে গা রি-রি করে উঠল আমার। মড়াখেকোদের মধ্যে সবচাইতে ধুঁদেটাকেই মনে হল পালের গোদা। শাবল দিয়ে তাকে উলটে দিতে গিয়ে আপাদমস্তক অবশ হয়ে এল দারুণ ইলেকট্রিক শকে।

সর্বনাশ! বিবর্তনের ফলে এ কী সৃষ্টি হয়েছে! এ-কাঁকড়ার গা দিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে! ছুঁলেই সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠছে প্রচণ্ড শকে!

শাবলটা হাত থেকে খসে পড়েছিল। তুলতে গিয়ে দেখলাম, পালের গোদাটি তা ভক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটছে আরো অনেকে!

তাঁবুতে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে ধড়মড় করে ফের লাফিয়ে উঠলাম। গায়ের ওপর দিয়ে সরসর করে কাঁকড়া হাঁটছে!

শুনলাম, ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির শব্দতে টিন কাটছে দস্যু কাঁকড়ারা। খাবারের টিন, জলের টিন লুট করতে এসেছে নিশাচররা।

তাড়াতাড়ি ডেকে তুললাম প্রফেসরকে। আলফোঁসেও লাফিয়ে উঠল। অমনি হাঁকডাক শুরু করল ডায়মণ্ড।

টর্চের আলোয় ভাঁড়ার লুটের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলেন প্রফেসর!

"জলের মধ্যে টিন ডুবিয়ে রাখো। দীননাথ! আলফোঁসে! কুইক!"

এক হাঁটু জলের মধ্যে বালির ওপর তাগাড় করে রাখলাম আমাদের খাবার ভাঁড়ার আর যন্ত্রপাতি। বাকী রাতটা সবাই মিলে বসে রইলাম তীরের ওপর।

মনে মনে অভিসম্পাত করলাম খ্যাঁটকেল ফরাসীটাকে! প্রফেসরকে নাচিয়েছে

নিশ্চয় সে! নিশ্চয় কোনো ফিকিরে ঘুরছে। কিন্তু কি সেই ফিকির, ধরেও ধরতে পারছি না।

ধরলাম দিন কয়েকের মধ্যেই।

এরপর কটা দিন কেটেছে, ঠিক মনে নেই।

প্রফেসর বললেন—"যাক, অ্যাদ্দিনে দ্বীপের সমস্ত ধাতু ফুরোলো।"

সেই সঙ্গে কাঁকড়া কারখানার কাজও বন্ধ হয়ে গেল। ধাতুর সরবরাহ না থাকলে কারখানা তো বন্ধ থাকবেই। পালে পালে কাঁকড়ারা ঘুরতে লাগল দ্বীপময়। কাজ নেই, কর্ম নেই, শুধু টোঁ টোঁ করা।

প্রফেসরের কথা যে কতখানি সত্যি, কাঁকড়া দঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। দেখলাম, রকমারি সাইজের কাঁকড়া ঘুরঘুর করছে আশে পাশে। কেউ রোগা, কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ ঢ্যাঙা, কেউ চটপটে, কেউ ঢিলেঢালা, কেউ পিগমি, কেউ দৈত্য!

কিন্তু কাজ নেই। কারো কাজ নেই।

কাঁকড়াদের রকমারি চেহারা দেখতে ঘুরছি দ্বীপের সর্বত্র, এক সময়ে একটা ঝোপের মধ্যে দেখলাম আলফোঁসে চুপিচুপি গিয়ে ঢুকল চোরের মত।

আলফোঁসে। তাবু থেকে এত দূরে কি করছে? এত চুপিসাড়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকছেই বা কেন?

বেড়ালের মত নিঃশব্দে পা টিপে টিপে উঁকি দিলাম ঝোপের মধ্যে, দেখলাম, সেই কাঁচের বাক্সটার মধ্যে বিলিতী খড় আর কাঠের গুঁড়োর মধ্যে একটা আদি কাঁকড়া প্যাক করছে আলফোসে। প্রথম যে জাতের কাঁকড়া দ্বীপে ছেড়েছিলেন প্রফেসর, এটা সেই শ্রেণীর। বেশ ভাল করে বাক্সর মধ্যে পুরে বালিমাটি খুঁড়ল আলফোঁসে। বেশ গভীর গর্তের মধ্যে বাক্সটা রেখে ফের বালিমাটি চাপা দিয়ে দিল ওপরে! সুট করে সরে এলাম আমি।

ওর রহস্যজনক গতিবিধির রহস্য ধরতে পারলাম না। প্রফেসরকেও কিছু বললাম না। নজর রাখলাম আলফোঁসের ওপর।

কিন্তু তার আর দরকার হল না!

তাঁবুতে ফিরতেই দেখি প্রফেসর আমায় খুঁজছেন।

বললেন—দীননাথ, এবার একটা নতুন মজা দেখাবো। জলের মধ্যে কতকগুলো কোবাল্টের ডাণ্ডা রেখেছি মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"কাঁকড়ার কলকবজা এমনভাবে তৈরী যে কোবাল্টের খাদ গিয়ে ভেতরে মিশলেই হিংস্র হয়ে উঠবে ওরা। তখন আর জাতভাই বলে কাউকে রেযাত করবে না। সোজা কথায়, গৃহযুদ্ধ লাগাবো এবার।"

বলে, হাঁটু জলে গিয়ে চারটে কোবাল্টের ডাণ্ডা মাথার ওপর তুলে ফের বালিতে এসে উঠলেন প্রফেসর। সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক ভাবে চনমনে হল কাকড়ার দল। প্রফেসরকে ছেঁকে ধরল চারদিক থেকে। কয়েকজনকে স্পষ্ট দেখলাম লাফিয়ে ডাণ্ডা ধরবার চেষ্টা করছে।

ডাণ্ডাগুলো একে একে দূরের ঝোপে ছুড়ে দিলেন প্রফেসর।

সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বিদ্যুৎরেখার মত সব কটা কাঁকড়া ধেয়ে গেল ঝোপের দিকে। শুরু হল কামড়া-কামড়ি ঠেলাঠেলি। কোবাল্টের স্বাদ প্রথম যারা পেল, তারাই জাতভাইদের ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে কাটতে লাগল সবার আগে। কেটে মুখে পুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। এদের পেটের মধ্যে যারা জন্মালো, তারা তৎক্ষণাৎ লড়াই আরম্ভ করে দিলে পাশের কাঁকড়াদের সঙ্গে। আওয়াজ নেই, চিৎকার নেই—শুধু ইলেকট্রিক স্পার্কের চোখ ঝলসানো দ্যুতি আর নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখলাম, ব্যাটারী চার্জ করার বা অ্যাকুমুলেটরে পাওয়ার সঞ্চয় করার দরকারও হচ্ছে না নবজাতকদের। সোজাসুজি সৌরশক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছে জাত-ভাইদের সঙ্গে।

সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিমে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কেমন জানি শান্ত হয়ে এল ক্ষুদে কাঁকড়ার দল। পালে পালে গিয়ে ভিড় করল পশ্চিম প্রান্তে।

প্রফেসরকে এই প্রথম ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম।

বিড়বিড় করে বললেন—"সর্বনাশ হল দেখছি। এদের অ্যাকুমুলেটর নেই, সূর্য ডুবলেই সবাই বিকল অচল হবে।"

বলতে না বলতেই সূর্য ডুব দিল। অগুন্তি কাঁকড়া নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল বালির ওপর। নির্জীব মেসিন প্রত্যেকেই—ধাতুর পিণ্ড ছাড়া কিছু নয়!

● অদ্রীশ বর্ধন

বিশালকায় কাঁকড়াদের দেখা গেল ঠিক তখনি। দ্বীপের অন্য প্রান্ত থেকে এল তারা হেলতে দুলতে। আকারে তারা আমার কোমর সমান। ছোট ছোট পাথরের চাঁই যেন। ধীর গতিতে এসে কপাকপ ক্ষুদে কাঁকড়াদের চালান করতে লাগল পেটের মধ্যে।

দুহাতে রগ টিপে ধরে বসে পড়লেন প্রফেসর। এমনটি তিনি আশা করেন নি। এত ভারী এত বড় কুমড়ো-পটাশ প্যাটার্নের কাঁকড়া শত্রু এলাকায় কোনো কাজেই আসবে না। নিজেরাই নড়তে পারে না—শামুকের গতি নিয়ে চলতে ফিরতে হয়।

এক্সপেরিমেন্ট বুঝি ব্যর্থ হতে চলল।

খিকখিক হাসি শুনলাম পেছনে। বাঁধানো দাঁত বের করে হাসছে অনামুখো আলফোঁসে।

সেই রাতেই আলফোঁসের হাসি ছুটে গেল। কাঁদতে হল একগলা জলে দাঁড়িয়ে!

মাঝরাতে বিকট আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল আমার। প্রফেসরও দেখি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছেন।

তাঁবুর মধ্যে আলফোঁসে নেই।

কোথায় সে? নিশুতি রাত কিন্তু শিউরে শিউরে উঠছে আর্তনাদের পর আর্তনাদে ...আলফোঁসে প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে চলেছে বাইরে কোথাও

ছুটলাম তাবুর বাইরে।

চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে দিগ্বিদিক। সমুদ্র অতিশয় প্রশান্ত। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালুকাবেলায়। টিনভরতি খাবারদাবার জলের মধ্যে যেখানে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, সেইখানে সামান্য আলোড়ন দেখলাম বটে, কিন্তু আলফোঁসেকে দেখলাম না।

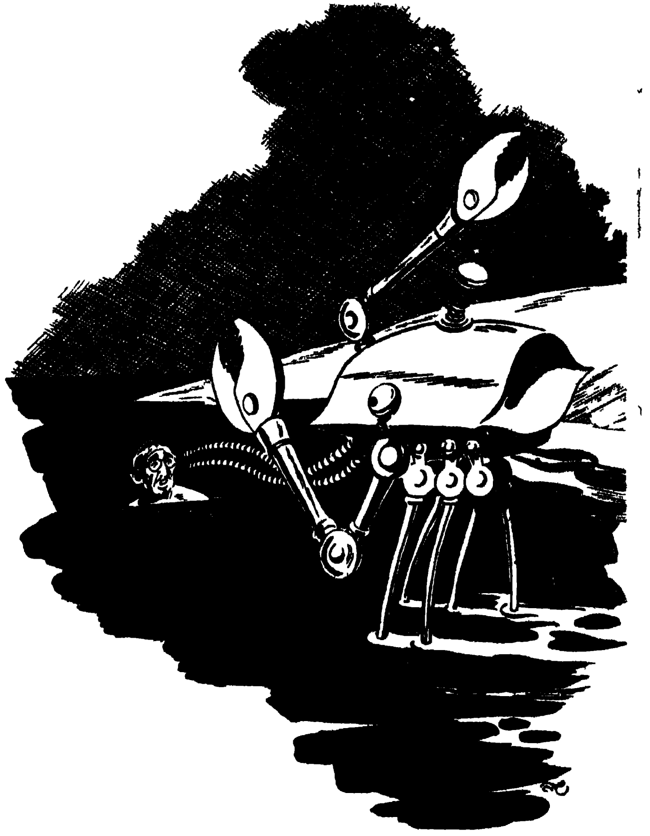
চিৎকারটা আবার ভেসে এল ডান দিক থেকে।

দৌড়ে গেলাম আমি আর প্রফেসর। তীর থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে জলের মধ্যে একটা মুখ। সোনালী চুল, ছাগল দাড়ি আর লাল ফ্রেমের চশমার কাচে চাঁদের চমক দেখে বুঝলাম মুখটা কার।

গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলফোঁসে।

আমাদের দেখেই হাউমাউ করে উঠল সে। জলে নেমে কাছে যেতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম একটা অতিকায় কাঁকড়ার ওপর। দাঁড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ধাতব দানব। পাঁচ হাত তফাতে ভয়ার্ত মুখে আলফোঁসে! কাঁকড়া শুঁড় বাড়িয়ে আলফোঁসের মুখ ছুঁতে চাইছে।

প্রফেসরও এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার পেছনে। আলফোঁসে ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্মান ভাষার জগাখিচুড়ি দিয়ে যা বলল, তা শুনে পিলে চমকে গেল আমার।



কাঁকড়া শুঁড় বাড়িয়ে আলফোঁসের মুখ ছুঁতে চাইছে।

ঘুমের মধ্যে কয়েকটা কাঁকড়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকে শুঁড় বুলোচ্ছিল তার মুখের ওপর। সরে শোয় আলফোঁসে। কাঁকড়ারাও ফের সরে যায় তার পাশে। আলফোঁসে বেরিয়ে আসে বাইরে। কাঁকড়ার দলও আসে পেছনে। আলফোঁসে ছুটতে শুরু করতেই কাঁকড়ারাও ধাওয়া করে তাকে। নিরুপায় হয়ে বেচারী গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে আছে বটে, কিন্তু যে হারে নতুন নতুন দানব জন্মাচ্ছে, আরও একটু ঢ্যাঙা কাঁকড়া ভূমিষ্ঠ হয়ে তেড়ে এলেই জল থেকেই তুলে নিয়ে যাবে আলফোঁসেকে!

কিন্তু কেন? শুধু তার ওপরেই কাঁকড়া দানবদের এত রাগ কেন?

প্রফেসর মাথা চুলকোলেন। বিবর্তনের ফলে যদি মানুষজাতটা তাদের চোখের বালি হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে আর প্রফেসরকেও অ্যাটাক করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তো হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলাম বড় কাঁকড়াটাকে। কিচ্ছু তো বলল

না? শুঁড়টা দুমড়ে মুচড়ে দিলাম, যেন বিরক্ত হয়ে পিছু হটে গেল কাঁকড়া, আক্রমণ তো করল না? ফরাসীরা কি বেশী মুখরোচক? বাঙালীরা কি এতই অখাদ্য?

মনে মনে বড় ফুর্তি হল আলফোঁসের দুরবস্থা দেখে। একটু মায়াও হল। আমি তার হাত ধরে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এলাম টিনভরতি খাবার যেখানে লুকোনো ছিল সেইখানে।

কিন্তু একটা টিনও পেলাম না পায়ের তলায়!

"প্রফেসর!" আঁতকে উঠলাম আমি, "প্রফেসর!"

"আবার কি হল?"

"সর্বনাশ হয়েছে। আপনার কাঁকড়ারা আমাদের সমস্ত টিনগুলো তুলে নিয়ে গেছে জল থেকে!"

টিনগুলো আর পাওয়া গেল না বটে, তবে ভেতরকার মাছ, মাংস, কড়াইশুঁটি, রসগোল্লার ছড়াছড়ি দেখলাম বালির ওপর। আলফোঁসেকে জলে দাঁড় করিয়ে রেখে খাবারদাবারগুলো যতখানি সম্ভব দুহাতে জড়ো করলাম। রাত ভোর হল শুধু এই করতেই।

জলে দাঁড়িয়ে সারারাত বকেছে আলফোঁসে। মনে হল যেন মুণ্ডপাত করছে প্রফেসরের। প্রফেসর জবাব দিতেও পারছেন না। ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে আছেন বালির ওপর।

ভোরের সূর্য উঠতেই কাঁকড়ার দল সরে গেল পুব দিকে। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল আলফোঁসে। বেচারীর নিউমোনিয়া না হয়! বালির ওপর সটান শুয়ে পড়ল অসীম ক্লান্তিতে। আমি উষ্ণ বালি দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলাম শরীর গরম করার জন্য। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

প্রফেসরকে বললাম—"আসুন।"

"কোথায়?" অসহায়ের মত তাকালেন প্রফেসর।

"কাঁকড়াদের কাছে।"

"কেন?"

"খুন করব ওদের। কোথায় চোট দিলে মেসিন বিগড়োবে চটপট বলুন।"

আমতা আমতা করলেন প্রফেসর—"পিঠের আয়না ভাঙলেই সিলিকন ব্যাটারী বিগড়োবে, পেটের অ্যাকুমুলেটর সরিয়ে নিলেও মেসিন বিকল হবে—কিন্তু এখন ওদের মরণ মার কোথায় মারতে হবে বলা মুশকিল। বিবর্তনের ফলে ওদের কলকবজা কিরকম দাঁড়িয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করা দরকার!"

"ধুত্তোর গবেষণা, আসুন আমার সঙ্গে।" বলে এগোলাম। তাঁবুর ভেতর থেকে একটা কাঠের হাতুড়ি নিলাম। দ্বীপের পুবদিকে গিয়ে দেখলাম, চুক চুক করে জল টেনে বালির ওপর গা তাতাচ্ছে বুকসমান পেল্লায় কাঁকড়ার দল।

বিনা দ্বিধায় পিঠের ক্রিস্ট্যাল-দর্পণ ভাঙতে লাগলাম হাতুড়ির ঘায়ে। এলোপাতাড়ি হাতুড়ি চালাতেই গোটা পঞ্চাশ কাঁকড়া এলিয়ে পড়ল বালিতে। তার বেশী পারলাম না। কেন না, ভাঙা কলকবজা লুট করার জন্যে প্রচণ্ড মারামারি লাগল বাকী কাঁকড়াদের মধ্যে। বালির ঝড় উঠল যেন ওদের হুটোপাটিতে। কিছুক্ষণ কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর বালির মেঘ থেকে বেরিয়ে এল আরো বড় কয়েকটা কাঁকড়া!

দেখলাম, এরা আগের কাঁকড়াদের চাইতে ভালো দৌড়বাজ! চটপটেও বটে। আকারে আমার চিবুক পর্যন্ত। হাতুড়ি দিয়ে মারবো কি, শুঁড় বা দাঁড়া ধরতে না ধরতেই ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে অসম্ভব গতিতে!

বেদম হয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ পরে। প্রফেসর তখনো ভাবছিলেন মুখ কালো করে। আলফোসের ওপর কাঁকড়াদের এত কৃপা কেন! রোদের তাতও খুব বেড়েছে। জলে ডুব দিয়ে ক্লান্তি কাটিয়ে উঠে এলাম। প্রফেসরকে নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুর কাছে।

কিন্তু তাঁবু কোথায়? তাঁবুর জায়গায় লণ্ডভণ্ড তেরপলের স্তূপ ছাড়া কিচ্ছু নেই। লোহার খুঁটি উদরস্থ করেছে কাঁকড়া কোম্পানি, তাঁবু গড়াগড়ি যাচ্ছে বালিতে। শুধু তাঁবু কেন, আমাদের শার্ট ট্রাউজার্সের ধাতুর বোতাম, জিপ চেন পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে কাঁকড়ারা। ঘড়িটা পর্যন্ত হজম করেছে—ফেলে গেছে প্লাস্টিকের কেসটা!

দূরে বালির মধ্যে দিয়ে শুধু মুণ্ডু বার করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বেচারী আলফোঁসে।

আচমকা কাঁটাঝোপ টপকে খোলা জায়গায় আবির্ভূত হল একটা দানবিক কাঁকড়া!

কাঁকড়া না বলে তাকে 'ইকথিওসরাস' বলা উচিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যেন সহসা এ-যুগে বেরিয়ে এল মূর্তিমান শয়তান। আকারে ছোটখাটো টিলা বললেই চলে। লম্বায় আমার মাথার সমান। কিন্তু চলন ভঙ্গিমাটা যেন কেমনতর! অপলকা সামনের দাঁড়ার ওপর ঈষৎ ঝুঁকে পেছনের দেহটা টেনে আনছে সামনে—অনেকটা হামাগুড়ি দেওয়ার মত। পরক্ষণেই ঝাঁকুনি দিয়ে এগোচ্ছে খানিকটা পথ।

বিবর্তনের নবতম নমুনা দেখে প্রফেসরের চোয়াল ঝুলে পড়ল! ক্ষিপ্র, বেগবান,

শক্তিমান কাঁকড়া আশা করেছিলেন তিনি, এমন জবুথবু মেসিন তো চান নি! এক্সপেরিমেণ্ট এ কোন্ পথে চলেছে? বিবর্তনের বিপাকে পড়ে একি হাল হল তাঁর আশ্চর্য আবিষ্কারের?

ধুঁকতে ধুঁকতে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছিল বিরাট 'ইকথিওসরাস'। জল নেওয়ার মতলব বোধহয়। তাই আর তার দিকে নজর দিই নি। দিলে দুর্ঘটনাটা ঘটতে দিতাম না।

আমি দেখছিলাম প্রফেসরের শুকনো মুখখানা। গলা দিয়ে 'কুই, কুই' আওয়াজ বেরোচ্ছে। কণ্ঠাটা ওঠানামা করছে আপনা থেকেই।

বিপুল মেসিনটা জলের ধারে পৌছোলো শম্বুকগতিতে। জলের ওপর শুঁড় নামিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। শুঁড়গুলো হাওয়ায় নাড়িয়ে যেন হালচাল বুঝতে চাইছে। কি যেন খুঁজছে, পাচ্ছে না।

পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গেল ইকথিওসরাস। এত তাড়াতাড়ি মোড় নিল যে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না কি তার মতলব। তারপরেই ধনুক থেকে ছিটকে যাওয়া তীরের মতই সাঁ করে ছুটে গেল ঘুমন্ত আলফোঁসের সামনে।

আঁতকে উঠলাম আমি। তিন লাফে হাজির হলাম দানব-যন্ত্রর সামনে। কাঁকড়া কিন্তু ততক্ষণে শুঁড় বুলোচ্ছে আলফোসের মুখের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বালির মেঘ উড়ল যেন। ধড়মড়িয়ে বালির মধ্যে থেকে লাফিয়ে উঠেছে আলফোঁসে। আমি দুহাতে কাঁকড়ার দুটো শুঁড় চেপে মুচড়ে দিলাম। শুঁড় মানে পেতলের ফ্লেক্সিবল পাইপ। কিন্তু বাকী দুটো শুঁড় চক্ষের নিমেষে আলফোসের গলা পেঁচিয়ে ধরে তুলে ফেলল শূন্যে। দেখলাম, আলফোঁসের চশমা ঠিকরে গেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে!

ঠেলে উলটোতে গেলাম কাঁকড়াকে, পারলাম না। হাতুড়ি নিয়ে থামের মত পা ধরে উঠে পড়লাম পিঠের ওপর। দুহাতে হাতুড়িটা মাথার উপর তুলতেই দেখলাম আলফোঁসের লাল টকটকে শীর্ণ মুখ কাঁকড়ার মুখের সামনেই উপস্থিত হয়েছে। এমন সময়ে রোদ্দুর ঝিলিক দিয়ে উঠল স্টেনলেস স্টীলের দাঁতে।

দাঁত! ইস্পাতের দাঁত!

নিমেষমধ্যে পরিষ্কার হয়ে এল ধাধার রহস্য। বিদ্যুৎ চমকের চাইতেও কম সময়ের মধ্যে বুঝলাম কেন আমাদের ছেড়ে আলফোঁসেকে তেড়ে গেছে কাঁকড়ারা! দাঁত স্টীলের দাঁত! ঐটুকু ইস্পাতও চাই বুভুক্ষু কাঁকড়াদের!

রহস্য পরিষ্কার হল শেষ মুহূর্তে। কেননা, পলকের মধ্যে আমার হাতুড়ি নেমে এল ক্রিস্ট্যাল-আরশির ওপর—চুরমার হল সিলিকন ব্যাটারী!

ভয়ংকর ইলেকট্রিক স্পার্কটা ঠিক সেই সময়ে হিস্ করে বেরিয়ে এল শুঁড় দিয়ে —পুড়ে কালো হয়ে গেল আলফোঁসের চোখ, মুখ, কপাল!

ধড়াম করে বালির ওপর আছড়ে পড়ল বিকল কাঁকড়া—সেইসঙ্গে আলফোঁসের প্রাণহীন দেহ!

তেরপল দিয়ে মুড়ে কবর দিলাম আলফোঁসেকে। ডায়মণ্ড বেচারী করুণভাবে কাঁদতে লাগল মনিবের সমাধি ভূমিতে।

কুকুরটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল এই ক'দিনে। দুহাতে কোলে তুলে নিলাম ওকে। লম্বা লম্বা লোমের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে গিয়ে হাতে ঠেকলো এক-গাছি সুতো! লোমে ঢাকা পড়ে গেছে সুতোটা। সুতো দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ছোট্ট একটা কবজ। ধাতুর নয়—প্লাস্টিকের।

প্লাস্টিকের কবজ! কৌতূহল হল। সুতো ছিড়ে খুলে আনতেই দেখলাম কবজ নয়—একটা চ্যাপ্টা কৌটো। ভেতরে মিহি কাগজে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কি যেন লেখা!

প্রফেসরও দেখলেন। ফরাসী ভাষা তিনি জানতেন। চোখ বুলিয়েই দু'চোখ কপালে তুলে বসে পড়লেন বালির ওপর।

"আলফোঁসে! স্পাই!"

স্পাই? আলফোঁসে স্পাই? ধীরে ধীরে ফরাসী লিপির মানে জানলাম প্রফেসরের মুখে। জানলাম, প্রফেসরের কাঁকড়া এক্সপেরিমেণ্টের মূল উদ্দেশ্য। জানলাম, কেন ইণ্ডিয়ান নেভী আস্ত একটা জাহাজে এত খরচপত্র করে প্রফেসরকে মালপত্র সমেত নামিয়ে দিয়ে গেছে বিজন এই দ্বীপে। জানলাম, কেন আঠার মত প্রফেসরের পেছনে লেগে থেকেছে আলফোঁসে এবং কেনই বা দ্বীপের মাঝে কাঁটাঝোপের ভেতর পুঁতে রেখেছে আস্ত একটা কাঁকড়া মেসিন!

আলফোঁসে গুপ্তচর! ভারত মহাসাগরের ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে বিদেশী রাষ্ট্রের নৌ-ঘাঁটি বসছে, এ খবর সকলেরই জানা। ফলে টনক নড়েছে প্রত্যেকের। পশ্চিমের কয়েকটা রাষ্ট্র তাই গুপ্তচর মোতায়েন করেছে ইণ্ডিয়ায়। ডিয়েগো গার্সিয়ার সামরিক আয়োজন পণ্ড করার জন্যেই কি ইণ্ডিয়ান গভর্নমেণ্ট প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রকে পাঠাচ্ছে

বিজন দ্বীপে গোপন এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে? ভারত-সরকারের আসল উদ্দেশ্য কি, তা জানা নেই, হয়ত প্রফেসরের কাঁকড়া মেসিন দিয়ে খনি থেকে বিনা খরচে ধাতু তুলে আনত। অথবা অন্য কোন সমাজ-সেবায় কাঁকড়াকে নিয়োগ করা হত। কিন্তু তার উলটো অর্থ করে সন্দিগ্ধ রাষ্ট্ররা আলফোঁসের মত বৈজ্ঞানিককে হাত করল টাকা দিয়ে—পাঠালো প্রফেসরের সহযোগী বানিয়ে!

ডায়মণ্ডের লোমের তলায় লুকোনো প্লাস্টিক কৌটোয় এক্সপেরিমেণ্টের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখে রেখেছে আলফোঁসে। লুকিয়ে রেখেছে একটা কাঁকড়া মেসিন বালির তলায়। একুশ দিন পর দ্বীপ ছেড়ে সবাই চলে যাওয়ার পর সে আবার আসত, কাঁকড়া নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসত ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে। পৃথিবীর নানান জায়গায় শত্রু ঘাঁটির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হত তাদের জাতভাইদের। সর্বনাশ হত পৃথিবীর ধাতু ভিত্তিক সভ্যতায়! দুর্ভেদ্য সাবমেরিন, জাহাজ, বোমারু বিমান মুছে যেত পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে! প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হত মানুষ জাতটাকে! শুধু একটি কাঁকড়ার জন্যে ব্যর্থ হত লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন আর সভ্যতা। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় তা নয়। তাই পৃথিবীবাসীরা বেঁচে গেল শুধু একটি দাঁতের জন্যে! শুধু একটি দাঁত! ইস্পাতের তৈরী বাঁধানো দাঁত!

এরপর কিভাবে অনাহারে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে দ্বীপে পড়েছিলাম আমি আর প্রফেসর, সে বর্ণনা দিতে চাই না। মাঝেমাঝে সমুদ্রের জলে মুখ ডুবিয়ে রোদেপোড়া চামড়া ঠাণ্ডা করতাম। শেষকালে ভুল বকতে লাগলেন প্রফেসর। আমিও মড়ার মত পড়ে রইলাম বালির ওপর। জানি না কতদিন পরে একটা ছায়া এসে পড়ল আমার চোখে। দেখলাম, বিশাল একটা কাঁকড়া আমার পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে দূর সমুদ্রে।

ডায়মণ্ডকে, আমাকে আর মৃতপ্রায় প্রফেসরকে ধরাধরি করে তোলা হল জাহাজের নৌকোয়। খালাসীরা অবশ্য বলেছিল, তীরের কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রটাকে নৌকোয় তুলতে হবে কিনা।

আমি রাজী হইনি।

———



সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তোমাদের মধ্যে অনেকেই কুকুরকে ভীষণরকম ভালবাস। আর কেউ কেউ ভয় কর—সাত হাত দূরে থাক। বলতে লজ্জা নেই, ছেলেবেলায় আমি কুকুর-টুকুর বিশেষ পছন্দ করতাম না। কিন্তু লণ্ডনে এক কুকুরের আশ্চর্য কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হয়ে যাই! আর তারপর থেকে আমার কোন বন্ধুর বাড়িতে কুকুর দেখলে আমি ভয়ে জড়োসড়ো হই না, ওকে কাছে ডেকে ভাব করি—ওর গলা চুলকে দি।

লণ্ডনে আমার ছাত্রজীবনে আমি অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি। কত দেশের কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে তা ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু অনেককেই আজ আর মনে নেই। কত কিছুই যে ভুলে গেছি।

এমন কি আমার আগের বন্ধু-বান্ধবী যাদের সঙ্গে খেলেছি, পড়েছি, দূর-দূরান্তে চলে গেছি কতবার—তাদের নাম মনে করতেও এখন সময় লাগে। আর তাদের চেহারাও আমার কাছে আজ বেশ ঝাপসা হয়ে গেছে।

কিন্তু শুধু এক জনেরই স্মৃতি এখনো মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাকে কেন যে ভুলতে পারি না কে জানে। তার নাম নিপ। সে মানুষ নয়, কুকুর।

আজও হঠাৎ এক-এক সময় আমার মনে পড়ে যায় কান-ঝোলা লম্বা-মুখো নিপের কথা। মনে পড়ে তার জ্বলজ্বলে চোখ, কালো লেজ। আর কানে বেজে ওঠে তার ভৌ ভৌ ডাক। এক-একবার এখনো আমার মনে প্রশ্ন জাগে, আসলে কী ছিল নিপ? কুকুর না মানুষ?

আর নিপের কথা ভাবলে পল্‌কেও মনে পড়ে যায়। পল্‌ ছিল নিপের ছোট্ট প্রভু। তার বয়েস সাত কিংবা আট। পল্‌ই আমাকে প্রথম বলেছিল নিপ কুকুর নয় মানুষ। হাবা-গোবা ছেলে পল্‌। বয়েসের তুলনায় ওর বুদ্ধি পরিণত নয়। তাই ওর কথা শুনে সেদিন আমার হাসি পেয়েছিল।

ব্যাপারটা এবার তোমাদের প্রথম থেকে খুলেই বলি।

অনেক চেষ্টা করবার পর একটা মনের মত থাকবার জায়গা শেষ অবধি পেয়ে গেলাম। লণ্ডন শহর থেকে একটু দূরে ফিন্সব্যারী পার্ক টিউব স্টেশন। সেখান থেকে আর কিছু পথ যেতে হয় বাসে। রাস্তা উঁচু-নীচু। ঠিক যেন পাহাড়ের চড়াই আর উতরাই। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। আর যত বাড়ি আছে এ পাড়ায় সবগুলির সামনে খানিকটা বাগান। বাড়িগুলো দেখতেও একরকম। কত বার নিজের বাড়ি চিনতে আমারই ভুল হয়েছে।

ইণ্ডিয়া হাউসে বিজ্ঞাপন দেখে পড়াশুনোর সুবিধার জন্যে আমি নিরিবিলি পাড়া ফিন্সব্যারী পার্কে থাকবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললাম। খাঁটী ইংরেজ পরিবার। কর্তার নাম উইলিয়ম হল্‌। গিন্নীর নাম অ্যান। ওদের বয়েস কম। দুজনেই অতি চমৎকার মানুষ। ভারতবর্ষের ওপর ওদের একটা আন্তরিক টানও আছে। আমাকে ওরা প্রায়ই আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে।

ফিন্সব্যারী পার্কে বাস করতে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমিও এই পরিবারের একজন আপনার লোকের মত হয়ে গেলাম। আর মজা করবার জন্যে কর্তা গিন্নীর নতুন নামকরণও করে দিলাম। উইলিয়ম দি কঙ্কারার আর কুইন অ্যান। আমার রসিকতায় স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুব খুশী।

কিন্তু অ্যান আর উইলিয়ম ছাড়াও ফিন্সব্যারী পার্কের বাড়িতে আরও দুজন

আছে। একজন হল, এদের সাত আট বছরের ছেলে পল্। আর একজন—পলেরই বড় আদরের জীব নিপ।

নিপ কিন্তু মানুষ নয়, কুকুর। কথাটা যদিও পল্ স্বীকার করে না। তার বদ্ধমূল ধারণা নিপ কুকুর নয়, মানুষ। একেবারে প্রথমেই পল্ কথাটা আমাকে শুনিয়ে রাখে। আমি তাকে খুশী করবার জন্যে এ বাড়িতে বাস করতে আসার প্রথম দিনেই বলেছিলাম, "বাঃ, তোমার কুকুরটি তো বেশ।"

শুনে কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নিপ গরর্ গরর্ করে উঠেছিল। পলের চোখ-মুখ করুণ হয়ে উঠেছিল। একটু পরে আমার ভুল শুধরে দেওয়ার জন্যে সে বলেছিল, "নিপ কুকুর নয়, মানুষ। ও আমার ছেলে। ওকে তুমি কুকুর বলবে না। কখখনো না। আমি তাহলে কাঁদব—ভ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—"

সত্যিই খুব জোরে কেঁদে উঠল পল্। ওর এই রকম কাণ্ড দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না হঠাৎ কী হল পলের। এখন কী করব তাও ঠিক করতে পারলাম না। পল্ কেঁদে চলেছে আর বোধ হয আমাকে বেশ ভাল মত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নিপ ডেকেই যাচ্ছে "ভৌ, গরর, ভৌ—"

ভয়ে আর লজ্জায় বিমূঢ়ের মত আমি বসে থাকলাম। এ বাড়িতে থাকতে এসে প্রথম দিনই কী করে বসলাম কে জানে। তবে খুব বেশী সময় আমাকে কাঠ হয়ে বসে থাকতে হল না। বোধহয় পলের কান্না শুনে একটু পরেই সে ঘরে ছুটে এল অ্যান।

সে আসতেই বিব্রত হয়ে বললাম, "মিসেস হল্, আমি খুবই দুঃখিত। কী করলাম বুঝতে পারছি না।"

অ্যান অল্প হেসে পল্‌কে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার? হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলে কেন তুমি?"

পল্ ঢোঁক গিলে গিলে তার মাকে বলল, "নিপকে ও কুকুর বলেছে। ওই দেখ নিপও কাঁদছে—"

পলের এই রকম ন্যাকামি আমার একটুও ভাল লাগল না। ইচ্ছে হচ্ছিল তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে। কিন্তু তা দিই কেমন করে! তাই ওর মার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে শুধু বললাম, "ন্যাকা!"

● সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অ্যান পল্‌কে বলল, "আঙ্কল্‌ এ বাড়িতে নতুন এসেছে কিনা, তাই নিপকে ঠিক চিনতে পারে নি—" বলেই আমার দিকে ফিরে চোখ টিপে বলল, "তুমি জান না যে নিপও মানুষ—পলের ছেলে?"

আমি এবার সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব জানি। মানুষই তো।"

আমার কথা শুনে পল্‌ কান্না থামিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল, "হি-হি-হি—" পরে নিপকে বলল, "আঙ্কল্‌ খুব দুঃখিত। ও নতুন—বুঝলে নিপ? এবার তুমি ওকে বল, থ্যাঙ্ক ইউ।"

নিপ আমার একেবারে পায়ের কাছে এসে পলের কথা মত ডাকল, "ভৌ।"

ওরা দুজনে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে খেলা করতে। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম, একবার পোস্ট অফিসে যেতে হবে কিন্তু অ্যান বাধা দিল। বলল, "একটু বস। তোমাকে একটা কথা বলব।"

অ্যানের চেহারা দেখে অবাক্‌ হলাম। তার স্বর ধরা-ধরা। মুখও বেশ করুণ হয়ে এসেছে। দুপুর হলেও বাইরে এখন রোদ নেই। ফ্যাকাসে একটা ছায়া যেন নেমে এসেছে আকাশ থেকে। আমার ঘর দোতলায়। জানলা দিয়ে এ বাড়ির পিছনের বাগানটাও দেখা যায়। এখন ভরা গ্রীষ্ম। দেখলাম বাগানে অনেক রঙ বেরঙের ফুল হাওয়ায় দুলছে। আর সারা বাগানময় ছুটোছুটি করে খেলা করছে পল্‌ আর তার ছেলে নিপ।

অ্যানও জানলা দিয়ে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে থেমে থেমে বলল, "তুমি কী যে ভাবলে! পল্‌কে ক্ষমা ক'রো—" কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল অ্যান।

পরে গলার স্বর খুব নামিয়ে বলল, "তুমি আমাদের এখানে থাকতে এসেছ, তোমাকে কোন মতেই বিব্রত করা আমার উচিত নয়। তবে একটা কথা, আমার মনে হয়, তোমাকে জানিয়ে রাখা ভাল—"

অ্যান কী বলবে বুঝতে না পারলেও আমি সহজ স্বরে বললাম, "এত ভূমিকা করছ কেন, বল কী বলবে?"

অ্যান বলল, "পলের ব্যবহারে তুমি কখনো কিছু মনে কর না। জন্ম থেকেই ও একটু অস্বাভাবিক। বুদ্ধিসুদ্ধি ওর হল না। একমাত্র ছেলে আমাদের—আমি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছি, কিছু মনে কর না—ওর কথা ভাবলে এক-এক সময় আমাদের সব অন্ধকার লাগে।"

শুনেছিলাম ইংরেজের হৃদয় বড কঠিন। ওদের চোখে জল-টল সহজে আসে না। অ্যানের চেহারা চেখে আমার সে ধারণা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। বুঝলাম সব দেশের মা একই রকম।

তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, "এ নিয়ে এত ভাববার কিছু নেই অ্যান। তোমাদের দেশে রোজই তো নতুন-নতুন চিকিৎসার কথা শোনা যাচ্ছে—পল্‌ নিশ্চয়ই একদিন স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।"

"তাই যেন হয়।"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "হবেই।"

নিজেকে সামলে নিয়ে একটু পরে অ্যান আবার বলল, "তবে সুখের কথা যে পল্‌ এখন অনেক ভাল আছে। ওই যে নিপ—" অ্যান হাসল, "পলের ছেলে। ওকে পেয়ে ও খুব খুশী। আগে কী রকম গুম হয়ে থাকত, কথা-টথা বেশী বলত না। আশ্চর্য, ওর সমবয়েসী বন্ধুবান্ধব—কারুর সঙ্গে ও মিশতে পারে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ইস্কুলে যায় না পল্‌?"

"ওদের মত ছেলেদের জন্যে যে বিশেষ ইস্কুল আছে সেখানে ভরতি করে দিয়েছিলাম। একেবারেই যেতে চায় না। আসছে বছর আবার দেখব চেষ্টা করে।"

আমি অ্যানকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "নিপই ওকে সুস্থ করে তুলবে—একটু ধৈর্য ধর।"

আমার কথা মেনে নিল অ্যান। বলল, "নিপ নাকি পল্‌কে এর মধ্যেই একটু বুদ্ধিমান্‌ করে তুলেছে। এখন সে একা-একাই রাস্তা পার হতে পারে, দোকান থেকে জিনিস কিনে আনতে পারে।"

অ্যান আরও বলল, "কিন্তু একা ওকে যেতে দিচ্ছে কে! নিপ যে কত বুদ্ধিমান তোমাকে কেমন করে বোঝাব। পল্‌ যে একটা হাবাগোবা ছেলে সেকথা ও বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে। তাই সব সময় ওকে আগলে আগলে রাখে। রাস্তায় বেরিয়ে পল্‌ একটু এদিক-ওদিক করলে নিপ ওকে সতর্ক করবার জন্যে জোরে ডেকে ওঠে—" অ্যান একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "সত্যি একটা মানুষের মত নিপ পলের ভার নিয়েছে। আমি এখন একেবারে নিশ্চিন্ত।"

পল্‌ যে একেবারেই হাবাগোবা ছেলে আর নিপ যে খুব বুদ্ধিমান্‌ সেকথা আমি কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে নিলাম। অ্যান যা বলেছে তা-ই ঠিক। নিপই সারাদিন

পল্‌কে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ছোটখাট দু-একটা গল্প বললে তোমরাও সেকথা বেশ ভাল করে বুঝতে পারবে।

দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির গায়ে একটা বেশ চওড়া কাঠের রেলিঙ আছে। পল্ ওপর থেকে নীচে নামবার সময় ঘোড়া ঘোড়া খেলবার জন্যে সেই রেলিঙ-এ উঠে স্লাক করে নীচে নামতে চায়। কিন্তু নিপ তা কিছুতেই হতে দেবে না। পল্ যেই রেলিঙ-এ উঠতে যায় অমনি নিপ দু-পা তুলে চিৎকার করতে করতে লাফালাফি করে তাকে ঘিরে। পল্ কিছুতেই আর রেলিঙ-এ চড়তে পারে না। নিপ জানে সে ওখানে চড়লেই পলের মত বোকা ছেলের মাটিতে পড়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা।

একবার বোকা পল্ তার নিজের হাতেই আগুনের ছেঁকা লাগিয়েছিল। ব্যাপারটা ঘটেছিল আমারই সামনে। তোমরা সকলেই জান শীতকালে বিলেতের সব বাড়িতেই গ্যাস কিংবা কয়লার আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখা হয়। ম্যাণ্টেলপিসের নীচে জ্বলে গনগন করে কয়লার আগুন। পাশেই একরাশ কয়লা জড়ো করা থাকে। আগুন যখন নিভে নিভে আসে তখন নতুন কয়লা দিয়ে তা ভাল করে আবার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল সে বছর। তিন-চারদিন ধরে হু-হু করে বরফ পড়েছে। হাওয়াও ধারালো তীরের মত চোখা। দাঁতে দাঁত লেগে যায়। জবুথবু হয়ে এইরকম এক শীতের সন্ধ্যায় আমরা সকলে লাউঞ্জে বসে আছি। অ্যান আপন মনে পলের জন্যে একটা সোয়েটার বুনছে। উইলিয়ম-এর হাতে একটা নভেল। আমি পড়াশুনো করছি। নিপ শীতের চোটে পুরু কার্পেটের ওপর ঝিমোচ্ছে আর এক-একবার মাথা তুলে লক্ষ্য করছে পল্‌কে।

লণ্ডনের সেই ভয়ংকর শীত হাবাগোবা পল্‌কে কিন্তু একটুও কাবু করতে পারে নি। সে ঘুরে-ঘুরে একবার নিপের গায়ে হাত বুলোচ্ছে, একবার আমার কাছে এসে বলছে, “বাইরে যাবে? চুপ! বাইরে তুষারপরী আছে। এখন যদি গ্রীষ্মকাল হত আর বরফ পড়ত তাহলে আমি তুষারপরীকে ধরতে পারতাম—”

অ্যান পল্‌কে ধমক দিয়ে বলল, “আঙ্কল পড়াশুনো করছে, ওকে বিরক্ত কর না পল্।”

“আঙ্কল্ তুমি পড়ছ নাকি? কী পড়ছ? আমিও পড়তে পারি—” অ্যানের কথা কানে না তুলে পল্ আমার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তার বিদ্যে জাহির করবার চেষ্টা করে—

হাম্পটি ডাম্পটি স্যাট অন এ ওয়াল
হাম্পটি ডাম্পটি হ্যাড এ গ্রেট ফল
অল দি কিংস হর্সেস এণ্ড অল দি কিংস মেন
কুড নট পুট হাম্পটি টোগেদার এগেইন”

—বলেই পল্ হি-হি করে হাসতে হাসতে ধপ করে তার ছড়ার হাম্পটি ডাম্পটির মত কার্পেটে গড়িয়ে পড়ল। তাকে পড়ে যেতে দেখে নিপ ছুটে এল তার কাছে। এসেই বুঝল সে ইচ্ছে করেই পড়েছে। তখন নিপ পলের রসিকতা উপভোগ করবার জন্যে তার লম্বা জিব বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে লেজ নাড়তে লাগল।

উইলিয়ম অল্প হেসে একটু গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললে, “পল্, তুমি নিপের সঙ্গে একদিকে গিয়ে গল্প-টল্প কর, আঙ্কলকে ডিস্টার্ব কর না।”

আমিও হাসলাম, “না-না, পল্ আমাকে মোটেও বিরক্ত করছে না।”

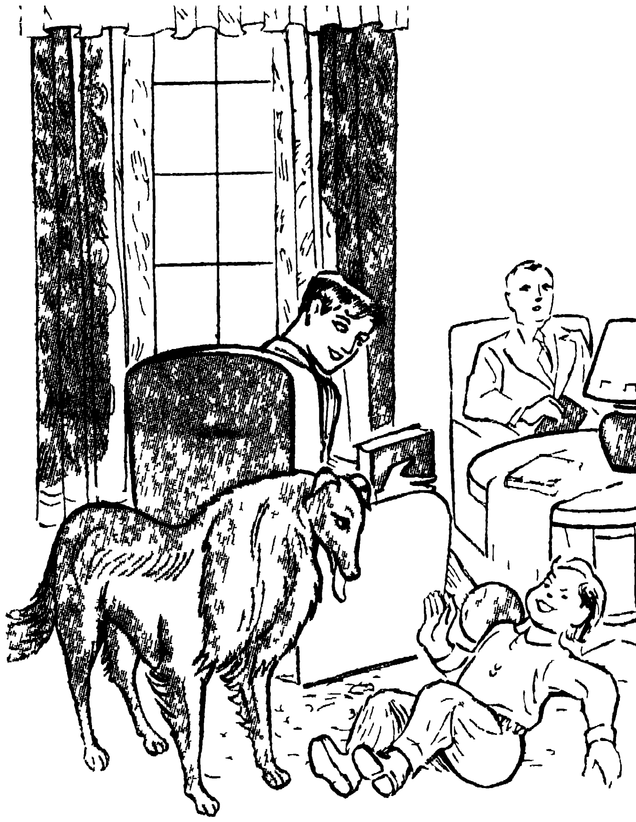
যাহোক, একটু পরেই ঘটল দুর্ঘটনা। হয়তো ম্যাণ্টেলপিসের দিকে তাকিয়ে পলের মনে হল আগুন বেশ নিভে এসেছে। এখন আর একটু কয়লা দেওয়া দরকার। সে এল ম্যাণ্টেলপিসের কাছে। আর কয়লা দিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল জ্বলন্ত কয়লার ওপর। পড়েই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। এবার একটা আর্ত কোলাহলে ঘর ভরে গেল।

অ্যান তার হাতের পশম-টশম ছুড়ে ফেলল। উইলিয়ম উঠে দাঁড়াল। আমরা সকলেই ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলাম ম্যাণ্টেলপিসের কাছে। আগুনের কাছে ঝুঁকে পড়ে নিপ কান্নার মত এক সুরে কুঁই-কুঁই করেই চলেছে।

পল্ কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়িয়েছে। উইলিয়ম তাকে কোলে তুলে নিল। ব্যাপার যদিও খুব সাংঘাতিক নয় তবুও পলের গায়ে যেন ফোসকা না পড়ে তাই তার শরীরে যেখানে যেখানে ছেঁকা লেগেছিল সেখানে সেখানে যত্ন করে মলম লাগিযে দিল অ্যান। পোড়ার মলম বাড়িতেই ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, আর একজনকে তখন কেউ লক্ষ্য করেনি, আমি কিন্তু দেখেছিলাম। আর জানি না কী রকম করে আমি যেন তার মনের কথাও সে রাতে বুঝতে পেরেছিলাম। ওপরের ঘরে অ্যান আর উইলিয়ম ব্যস্ত পল্‌কে নিয়ে। একটু ঠাণ্ডা হয়েছে পল্। আমি আবার আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম।

সে-ঘর এখন খালি একেবারে। শুধু এখনো পাগলের মত কয়লার আগুনের কাছে



লম্বা জিব বের করে নিপ হাঁপাতে হাঁপাতে লেজ নাড়তে লাগল। [পৃঃ ৩৮৯

কুঁই-কুঁই করতে করতে ঘোরাঘুরি করছে নিপ। কিন্তু কেন? তার গায়েও কি আগুনের ছেঁকা লেগেছে?

আমি নিপের কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে আস্তে ডাকলাম, 'নিপ?' সে মুহূর্তের জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। তার চোখের করুণ দৃষ্টি দেখে সত্যি আমি যেন তার মনের বেদনাও বুঝে নিতে পারলাম। তার চোখ দুটো আমার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। বুঝলাম অনুশোচনায় জ্বলে যাচ্ছে নিপের মন। সে স্থির হয়ে থাকতে পারছে না, পলের সামনে যেতেও যেন লজ্জা পাচ্ছে।

নিপের রকম সকম দেখে আমি স্পস্ট করেই বুঝতে পারলাম এই দুর্ঘটনার জন্যে সে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। সে যেন অবহেলা করেছে তার কর্তব্যে। সে যদি একটু সতক থেকে পলকে আগলে রাখত তাহলে এমন কখনই ঘটত না।

নিপের এমন অবস্থা দেখে হঠাৎ তাকে আমার বড় মায়া হল। আর একবার একটু ধরা গলায় তার নাম ধরে ডাকলাম। আবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল নিপ। বললে, তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমি কী দেখলাম জান? নিপের দু চোখে জল টলমল করছে। তোমাদের বলতে লজ্জা নেই, সে-রাতে নিপকে কিন্তু আমার সত্যিই মানুষ বলে মনে হয়েছিল।

ব্যস, এই ঘটনার পর থেকে পলের আর সাধ্য কি আগুনের কাছে যায়। ম্যাণ্টেলপিসের নীচে যখন আগুন জ্বলে তখন তার কাছে পুলিসের মত বসে থাকে নিপ। পল্ সেদিকে এক পা বাড়ালেই সে চিৎকার করে ডেকে ওঠে, খবরদার! খবরদার! আর পল্‌কে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসে আগুনের কাছ থেকে অনেকটা দূরে।

পল্ হাবাগোবা হলেও নিপকে মানুষ বলে চালাতে গিয়ে সে খুব ভুল করেনি তা আর একটা গল্প শুনলে তোমরাও বেশ ভাল করে বুঝতে পারবে। আমি তো নিপের কাণ্ড-কারখানা দেখে সেদিন হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। আর একটু হলেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আমাদের ফিন্সব্যারী পার্কের বাড়িতে লণ্ডনের লম্বা-চওড়া পুলিস ঠিক এসে হাজির হত।

লণ্ডনে পৌঁছবার দিন কয়েক পরেই প্রচণ্ড শীতের চোটে আমি সিগ্রেট খাওয়া ধরেছিলাম। নতুন-নতুন তো কাজেই মাত্রাও বেশ ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। পঁচিশ-তিরিশটা সিগ্রেট খেতাম একদিনে। অ্যান আর উইলিয়ম আমার এত বেশী সিগ্রেট খাওয়া বিশেষ পছন্দ করত না। আমারই ভালর জন্যে তারা প্রায়ই আমাকে নানা উপদেশ দিত।

বলত, "এ দেশের হালচাল বড় খারাপ। দেখছ তো ঠাণ্ডার জোর কী রকম! একটু অসাবধান হলেই ঠাণ্ডা লাগে, বুকের নানারকম অসুখ হয়। তুমি এসেছ এত দূর দেশে—অত সিগ্রেট খেও না বুঝলে। একটা কঠিন রোগে পড়ে যাবে কিন্তু—"

অ্যান আর উইলিয়মের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। ঠিক যেন, দাদা কিংবা বৌদি—আমার আপনার লোক। কিন্তু ওই অবধি। শেষ পর্যন্ত কে শোনে কার কথা! আমাকে উপদেশ দিয়ে দিয়ে ওদের বোধ হয় মুখ ব্যথা হয়ে যেত, আমি কিন্তু রোজ কিনে যেতাম প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগ্রেট আর খেয়েও যেতাম ঠিক-ঠিক।

তারপর থেকে শুরু হল এক আজগুবি কাণ্ড। সকালে কিংবা সন্ধ্যায় হঠাৎ এক-এক সময় টেবিলের ওপর থেকে আমার সিগ্রেটের প্যাকেট উধাও হয়ে যেত। ব্যাপার দেখে আমি মনে মনে হাসতাম। ভাবতাম অ্যান কিংবা উইলিয়ম আমারই ভালর জন্যে সিগ্রেটের প্যাকেট সরিয়ে ফেলে। ফেলুক। আমি যে সব বুঝতে পেরেছি তা ওদের জানতেই দিলাম না।

এত রাতে ডিনার খেয়ে ওপরে আমার ঘরে এসে দেখি যে সিগ্রেটের প্যাকেট উধাও হয়েছে। খাওয়াটা ভালই হয়েছে। সিগ্রেটের জন্যে মন উসখুস করছিল। হঠাৎ



নিপ মুখে করে নিয়ে এল আমারই হারানো
সিগ্রেটের প্যাকেট।

বড় মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম বাইরে বেরিয়ে আবার সিগ্রেট কিনে আনব। যদিও এখন দোকান-পাট সব বন্ধ। একটু দূরে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় হয়তো সিগ্রেট পাওয়া যেতে পারে।

বেরুতে যাবার মুখে পল্ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ?" নিপ তার কাছেই ছিল।

আমি বেশ বিরক্ত হয়ে বললাম, "চোর ধরতে।"

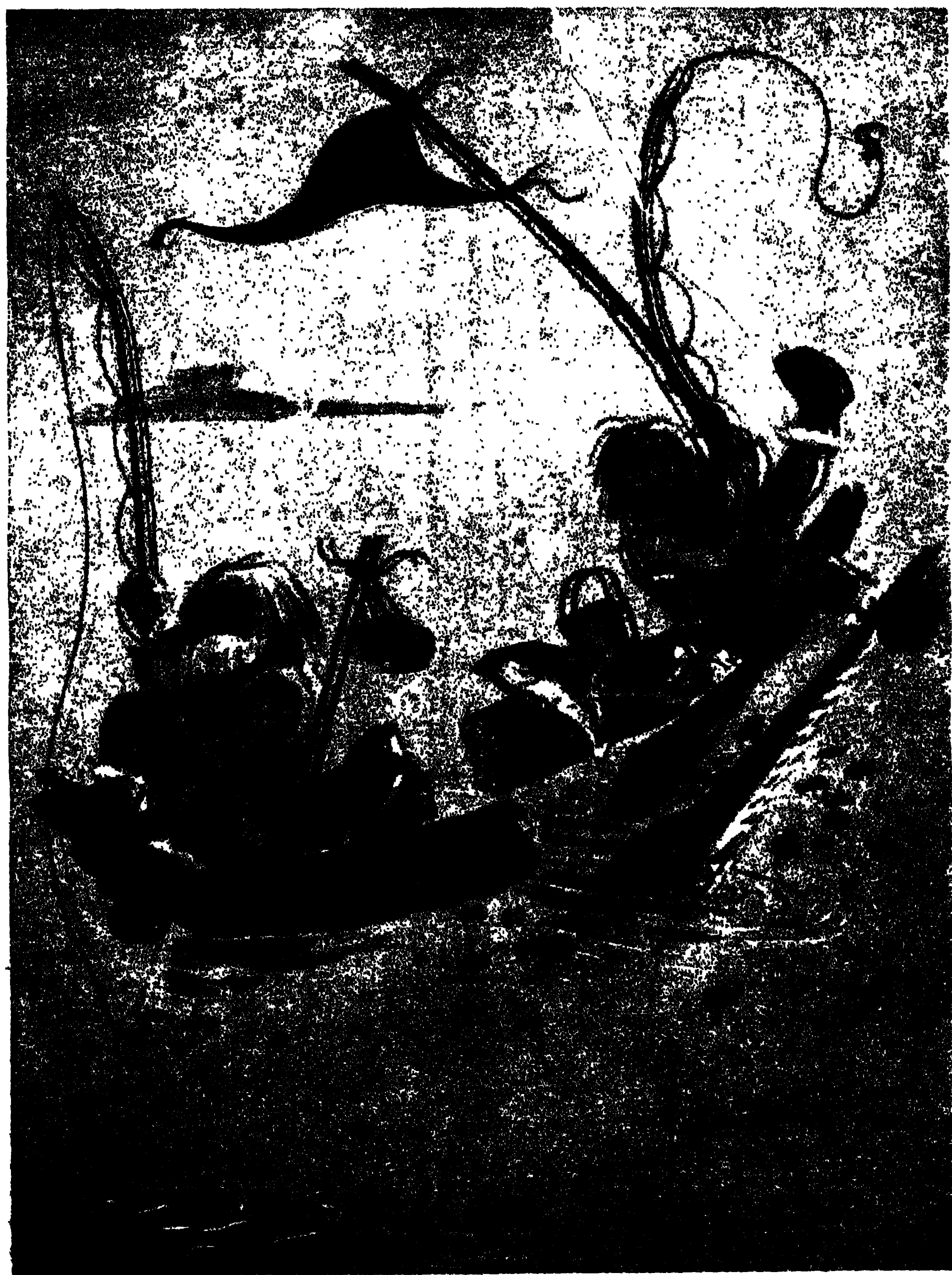
"চোর?"

"রোজ আমার সিগ্রেটের প্যাকেট চুরি হচ্ছে পল্—"

পল্ আমাকে আর বেশী কথা বলবার সুযোগ দিল না, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল টেলিফোনের কাছে। বলল, "দাঁড়াও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এখুনি টেলিফোন করে দিচ্ছি। হ্যালো, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড?"

আমি পলের কাণ্ড দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। নিপ ভীষণ জোরে চিৎকার করতে করতে পলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তার কাণ্ড দেখে টেলিফোন ছেড়ে দিতে বাধ্য হল পল্। আর তার গালে একটা চড় মেরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে নিপ? অত চেঁচাচ্ছে কেন?"

নিপ আমাকে আর পল্‌কে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে চাইল লাউঞ্জের দিকে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেলাম। আর একটা সোফার পেছন থেকে একে-একে নিপ মুখে করে নিয়ে এল আমারই অনেক হারানো সিগ্রেটের প্যাকেট। তার কাণ্ড দেখে আমি হাঁ হয়ে গেলাম।



ছিপ ফেলে পিছনেতে ফিরে সে তাকায়। [পৃঃ ৩৫৫

কেন নিপ চুরি করেছিল আমার সিগ্রেটের প্যাকেট? অ্যান আর উইলিয়ম-এর কথা সে কি বুঝতে পেরেছিল? সে-ও কি জানত বেশী সিগ্রেট খেলে এদেশে আমার বুকের রোগ হতে পারে?

নিপের কাণ্ড দেখে তোমরাও কি অবাক্ হচ্ছ না আমার মত?

কিন্তু মানুষের মত নিপ পল্‌কে আগলে আগলে রাখলেও হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল! শোকের একটা থমথমে ছায়া নেমে এল আমাদের ফিন্সব্যারী পার্কের বাড়ির ওপর। নিপের ভৌ-ভৌ ডাক একেবারেই থেমে গেছে। কোথায় সে থাকে কে জানে! আমি আর যখন-তখন তাকে দেখতেও পাই না। অ্যান থেকে থেকে চোখের জল মোছে শুধু। উইলিয়ম-এর মুখ বড় করুণ। তার দিকে তাকাতেও আমার কষ্ট হয়।

কী ঘটে গেছে এ পরিবারে—এবার শোন। খুব সকালে পলের ঘুম ভাঙায় নিপ। ওরা দুজনে লাফাতে-লাফাতে একসঙ্গে বাইরে আসে। একটু পরেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ঝমঝম শব্দ করতে করতে দুধের বোতল ভরা ঘোড়ার গাড়ি। ভরা বোতল দিয়ে খালি বোতল ফিরিয়ে নিয়ে যায় ডেয়ারীর লোক। দুধের গাড়ির ঘোড়াগুলো, ভীষণ বড়। এত বড় ঘোড়া আমি আর দেখি নি।

একদিন, তখন নাকি কুয়াশা খুব ঘন ছিল। রাস্তায় লোক চলাচল বেশী নেই। আস্তে আস্তে সবে ভোর হচ্ছে। দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, ঝম ঝম ঝম। হাতির মত বড় বড় ঘোড়ায় টানা দুধের গাড়ি আসছে। একটা উৎসাহের ঝোঁকে কুয়াশার মধ্যে রাস্তায় ছুটে গেল পল্। নিপও ছুটল তার পেছন পেছন।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। পল্ পড়েছে দুধের গাড়ির তলায়। বড় বড় ঘোড়ার পায়ের চাপে বীভৎস রূপ নিয়েছে তার ছোট্ট দেহ। এমন করেই অ্যান আর উইলিয়ম-এর একমাত্র সন্তান চলে গেল এই পৃথিবী ছেড়ে।

বুক ভেঙে গিয়েছিল অ্যানের। প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল উইলিয়ম। কিন্তু ইংরেজ তো ডাক ছেড়ে কাঁদে না। কেঁদে ছিল শুধু নিপ। তেমন কান্না আমি তো আর শুনিনি।

পল্-এর এইরকম মৃত্যুতে বড় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম এ বাড়িতে আর থাকব না, অন্য কোথাও চলে যাব। কিন্তু যাই-যাই করেই শেষ অবধি আর যাওয়া হয়ে উঠল না, ফিন্সব্যারী পার্কের বাড়িতেই থেকে গেলাম।

তোমরা তো জান শোকে মানুষকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। অল্পে অল্পে আঘাত সামলে উঠল অ্যান, উইলিয়ম-এর হাসি মুখ দেখলাম। কিন্তু নিপ?

বেশ থাকে সে। খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ডেকেও ওঠে। কিন্তু এক-এক সময় সে কীরকম যেন পাগলের মত হয়ে ওঠে। সব ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে কাকে খোঁজে, পরেই বাইরে ছুটে যায়, ফিরে এসে একটানা কাঁদে অনেকক্ষণ। আর তার কান্না শুনে অ্যানও কাঁদে তখন। নিপ এগিয়ে আসে অ্যানের কাছে। তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে। তাকে যতই দেখি আমার ততই পল্-এর কথা মনে পড়ে যায়।

দিন কাটতে লাগল। পড়াশুনোর চাপ বড় বেশী। অ্যান আর উইলিয়মও সংসারের নানা দায় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিপও যেন আস্তে আস্তে সামলে উঠছে পল্-এর শোক। আমার মনে হল সংসারের চেহারাটা আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। আবার শীত আসবে। খসে পড়েছে গাছের পাতা। ঘন কুয়াশা থমথম করে চার পাশে। ভোর রাতে হঠাৎ এক-একবার যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন শুনি বড় বড় ঘোড়ার খটখটাখট খুরের আওয়াজ। বুঝতে পারি দুধের গাড়ি আসছে। পল্ নেই বলে নিপ কিন্তু তার কাজ ভোলে নি। রোজ ভোরে সে ডাকাডাকি করে অ্যানকে টেনে নিয়ে আসে নীচে, দরজা খুলিয়ে রাস্তায় নামে। তারপর চিৎকার করে সকলকে সতর্ক করে, "সাবধান! সরে যাও। সরে যাও। দুধের গাড়ি আসছে।"

এত ভোরে দুধের বোতল তুলে আনবার কোন দরকার না থাকলেও পল্-এর কথা ভেবে নিপের ডাকাডাকিতে অ্যানকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই হয়। না হলে শুনবে না, সে অ্যানকে টেনে নীচে নামিয়ে আনবেই।

এই রকম এক ভোরের কথা। কুয়াশা খুব ঘন নয়। তবে শীত বেশ ভারী। অ্যান দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। নিপ এক-একবার মুখ তুলে দেখছে তাকে। আজ সে বড় চুপচাপ। একবারও চিৎকার করে কাউকে সতর্ক করছে না।

দুধের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে পাগলের মত নিপ ছুটে গেল রাস্তায়। একটু পরেই ভেসে এল তার কাতর চিৎকার। দুধের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠিক পল্-এর মত অবস্থা নিপের। তার জিভ বেরিয়ে আছে। গলার কাছে রক্তের দাগ।

অ্যান ছুটে আসতেই করুণস্বরে দুধের গাড়ির লোক তাকে বলল, "বিশ্বাস কর, আমাদের কোন দোষ নেই। নিপকে আমরা রোজ দেখি, ও বড় সতর্ক, বড় বুদ্ধিমান—" লোকটি একটু থেমে আবার বলল, "ও সোজা ছুটে এসে পড়ল গাড়ির তলায়—"

অ্যান দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। মুখে কথা ফুটছে না। ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মৃত নিপের দিকে। পল্ যেন এসেছে, তার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে অ্যান। বাগানে যেন খেলে বেড়াচ্ছে পল্ আর নিপ।

মৃত নিপকে নিয়ে গেল পুলিস। তার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে গেল আমাদের সকলকে। তারপর, বেশ কিছু পরে আমাকে আড়ালে ডাকল উইলিয়ম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল অ্যান কাছাকাছি নেই।

উইলিয়ম ভিজে স্বরে খুব আস্তে আমাকে বলল, "কী মনে হয় তোমার? নিপ কি দুর্ঘটনায় মরেছে?

বললাম, "হ্যাঁ, তাই তো।"

উইলিয়ম ম্লান হাসল, "জান, আজ নভেম্বরের দশ তারিখ—"

মাথা নেড়ে বললাম, "জানি।"

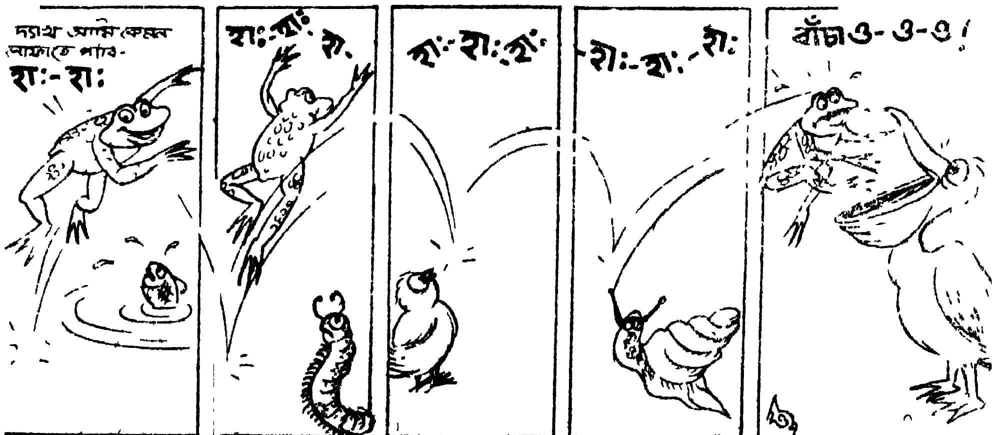
উইলিয়ম বলল, "গত বছর ঠিক এই তারিখেই এইরকম দুর্ঘটনায় পল্ মারা যায়!"

উইলিয়মের কথা শুনে চমকে উঠলাম। সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল আমার। তবে কি ইচ্ছে করে মরেছে নিপ ঠিক এক বছর পরে? তারিখের কথাটা সে কেমন করে মনে রাখল?

সেই থেকেই ভাবছি। আজও একটা অদ্ভুত রহস্যের মত হয়ে আছে ব্যাপারটা। তোমাদের কী মনে হয়, আমাকে বলবে?

———

ব্যাঙের কালোয়াতি





বিমলচন্দ্র ঘোষ

সিম্পু খুড়ো তীরন্দাজ,
লক্ষ্যভেদে কী আন্দাজ!
এক নজরে তাকিয়ে বলেন,
বাম দিকটাই ডান,
কান বিঁধতে নাক বেঁধেন
নাক বিঁধতে কান॥

বলেন খুড়ো, 'লিম্পু, দাঁড়া
একশো গজের মধ্যে খাড়া—
চাঁদির ওপর চাঁদমারিতে
চাটিম কলা রেখে,'
মোক্ষম তীর ছোড়েন খুড়ো
দৃষ্টি সিধে রেখে॥

অচল অটল আড়ষ্ট কাঠ
মাথায় কলা চারদিকে মাঠ,
লিম্পু বলে, 'দেখাও বটে
টিপের মতো টিপ্!
মাথার কলা মাথায় থাকে
বুক করে টিপ্ টিপ্॥

খুড়োর তাতে থোড়াই কেয়ার
তীরবাজীতে ডেভিল ডেয়ার
মাথার টুপি বিঁধতে বেঁধেন
পায়ের তলার নাগরা,—
পাহারাওলার; দেখেই বেকুব
দিল্লী লাহোর আগ্রা॥

সবাই বলে শাবাশ! শাবাশ!
লক্ষ্যভেদীর তত্ত্বতাবাস
ছাপায় কাগজ আঁকায় ছবি
খুড়োর দু'চোখ ট্যারা,
চাঁদমারিতে তীরন্দাজীর
কাটেন কেবল ঢ্যারা॥

ঘাসের ডগায় মারছে মাছি
ধনুর ছিলায় বাঁধেন কাছি
কান ছুঁয়ে গুণ টেনেই খুড়ো
ছাড়েন চোখা বাণ,
ভ্রূক্ষেপ নেই মক্ষি করে
ঘাস ফুলে মৌপান॥

● বিমলচন্দ্র ঘোষ

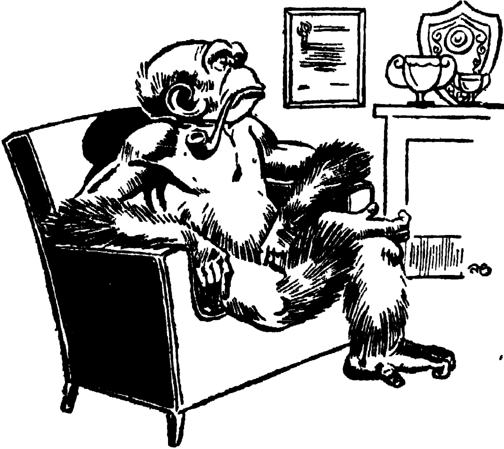
বাণ ছুটে যায় সনসনিয়ে
বিঁধতে চাকে ভনভনিয়ে
ঘেরাও করে তীরন্দাজে
মৌমাছিদের ঝাঁক,
হুলের জ্বালায় সিম্পু চেঁচায়
বুক ফাটা গাঁক্ গাঁক্ ॥



সিম্পু বলে, 'তোমায় খুড়ো—
যতই লোকে বলুক বুড়ো,
তীর ছোড়াতে তোমার জুড়ি
কেই বা বলো আছে?
রাম লক্ষ্মণ সব্যসাচী
বাচ্চা তোমার কাছে ॥'

গ্যাসের ভাপে সিম্পু ফোলে
দু'হাত দিয়ে ধনুক তোলে
রামের মতো একটি বাণে
সাতটি তালের গুঁড়ি
বিঁধতে গিয়ে আছাড় খেয়ে
কাটেন হামাগুড়ি ॥

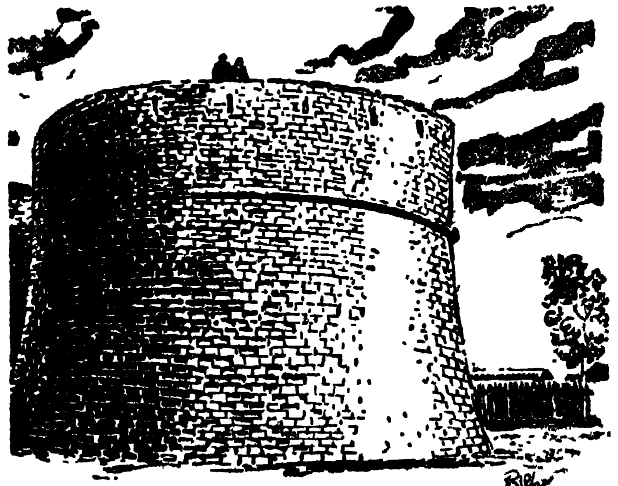
ভীষণ রেগে কঠোর পণ
গেলেন খুড়ো সোঁদর বন
গাছের তলার ঘুমন্ত বাঘ
মারন্ত করেন তাক্,
সে তীর বেঁধে গাছের ডগায়
ওড়ায় বাসার কাক ॥

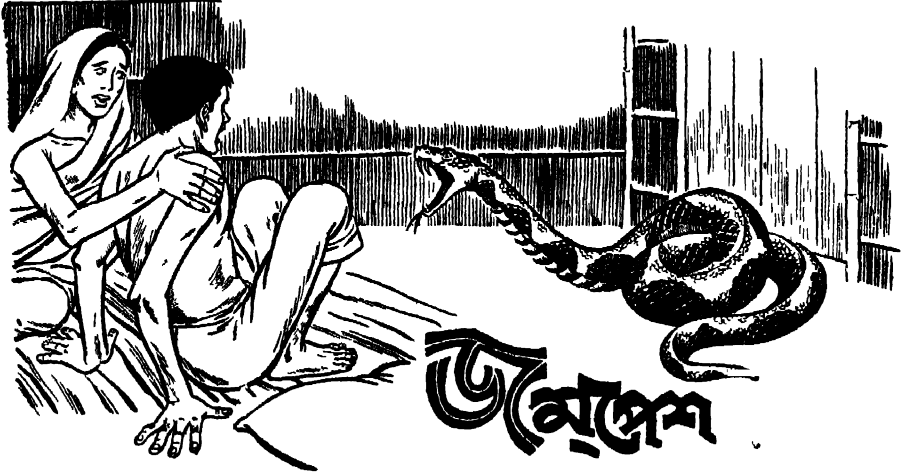


শেষটা পেলেন রঙবাহার
রাষ্ট্রপতির পুরস্কার,
ইনাম পদক মানপত্রে
লিম্পু সাজায় ঘর,
সোফায় শুয়ে পাইপ টানেন
সিম্পু ধনুর্ধর ॥

●সেক্সপীয়ারের ওথেলোর রং সাদা

ওপরের ছবিটা ক্রীট দ্বীপের ওথেলোর টাওয়ার। এই ওথেলোকে নিয়ে সেক্সপীয়ার এক অবিস্মরণীয় নাটক লিখেছেন। সেক্সপীয়ার বলেছেন ওথেলো মুর দেশের কাল আদমী। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন সাইপ্রাস দ্বীপের রাজ্যপাল সাদা আদমী —বলেছেন রিপ্লে।





বনফুল

তুনকার মা গরিব। গাঁয়ের বাইরে প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলের ধারে তার ছোট কুঁড়েঘর। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। তুনকার বয়স বছর কুড়ি। গ্রামে গিয়ে জনমজুরের চাকরি করে। তুনকার মা জঙ্গল থেকে কাটকুটো কুড়িয়ে আনে। তাই দিয়ে সে রান্না করে। জঙ্গলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। কোন এক রাজার সম্পত্তি নাকি। জঙ্গলের ভিতরটা অন্ধকার। সেখানে ঢুকতে সাহস হয় না।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন খুব ঝোড়ো হাওয়া বইছে। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা, চারদিকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। জঙ্গলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলো ঝড়ের দাপটে এঁকেবেঁকে আর্তনাদ করছে যেন। মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য দৈত্য দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

তুনকার মা উনুনে আগুন দেয় নি ঝড়ের ভয়ে। ভাবছিল রাতের জল-দেওয়া পান্তাভাত আছে ক্ষিধে পেলে তাই খাবে। ঘরের জানলা কপাট বন্ধ

করে বসেছিল তুনকার মা। বাইরে সোঁ সোঁ সোঁ ভীষণ শব্দ, জঙ্গল একেবারে তোলপাড়। তুনকা এখন কোথায়? কখন ফিরবে সে? এই ঝড়ে জনমজুরের কাজ পেয়েছে কি? এই রকম নানা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠছিল তার মন।

হঠাৎ তার কানে এল—বাইরে কে যেন বলছে—'তিন দিন খাই নি। বাঁচাও আমাকে, খেতে দাও চারটি—'

তুনকার মা জানলাটা একটু ফাঁক করে দেখলে—খুব রোগা জরাজীর্ণ একটি বুড়ী ভিখারিনী তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

তুনকার মায়ের ঘরের সামনে আসতেই তুনকার মা তাকে ডাকলে—'তুমি এখানে এস।'

কপাট খুলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তার মনে হল বুড়ী ঝড়ের ধাক্কায় এখনি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হাত ধরে নিয়ে এল তাকে ঘরের ভিতর।

'তুমি কে মা'?—জিগ্যেস করলে বুড়ী।

'আমি তুনকার মা।'

'তোমার ছেলে তুনকা কোথা।'

'কাজে বেরিয়েছে। সে জনমজুরের কাজ করে।'

'আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। একটু খাবার কোথায় পাই। তোমার ঘরে আছে কিছু।'

'আছে। পান্তা ভাত আছে। আর কাঁচা পেঁয়াজ।'

'বাঃ, সে তো চমৎকার হবে।'

তুনকার মা পান্তা ভাত নুন তেল দিয়ে মেখে দিলে।

বুড়ী পেঁয়াজ দিয়ে সেগুলি খেয়ে ফেললে চেটেপুটে।

'ভারী তৃপ্তি পেলাম। খুব আনন্দ হল—জম্পেশ তোমার ভালো করবে।'

'জম্পেশ কে?'

'সে আছে একজন। ভালো লোকদের সে উপকার করে। যখনই কোনও বিপদে পড়বে তখনি বোলো—জম্পেশ এস। সঙ্গে সঙ্গে সে হাজির হবে।'

আপনি তবে তাকে ডাকলেন না কেন। আপনি তো বিপদে পড়েছিলেন—'

'একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল বুড়ীর মুখে।

'আমার কখনও বিপদ হয় না। পৃথিবীতে অনেক ভালো লোক আছে। যখন বিপদে পড়ি তখন তাদেরই কেউ না কেউ এসে উদ্ধার করে দেয়। এই তো তুমি এখনই দিলে—আমার জম্‌পেশকে ডাকবার দরকার হয় না।'

হাসতে হাসতে উঠে পড়ল বুড়ী। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকল। তুনকার মা কপাটটা বন্ধ করতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। বুড়ীকে আর দেখতে পেল না। একটু আশ্চর্য হল। এত অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল কি করে।

কপাট বন্ধ করে দিয়ে তুনকার মা একটু চিন্তায় পড়ল। যে ক'টা ভাত ছিল বুড়ীকে দিয়ে দিলাম। তুনকা যদি ফিরে এসে খেতে চায় কি দেব তাকে। ভেবেছিলাম আমি নিজে না খেয়ে ওর জন্যে রেখে দেব ভাতগুলি। ঘরে চাল বাড়ন্ত। তুনকা জানে এ কথা। সে যদি চাল কিনে আনে ভাতে ভাত ফুটিয়ে দেব। ঘরে দুটো আলু আছে।

রান্নাঘরে গিয়ে কিন্তু সে অবাক্ হয়ে গেল। চারিদিকে খাবার সাজানো থরে থরে। হাঁড়ি ভরতি ভাত, গামলা ভরতি ডাল, নানারকম তরকারি, তাছাড়া অনেক মিষ্টি।

তুনকার মায়ের গা ছমছম করতে লাগল।

মনে হল কে এসেছিল আমার ঘরে···।

২

সেইদিনই রাত্রে আর একটা ঘটনা ঘটল।

রাত্রে তুনকা তার মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ একটা খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। মনে হল তার বিছানার চারিপাশে কি একটা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠল সে। সাপ! প্রকাণ্ড মোটা একটা ময়াল সাপ। জঙ্গলে ময়াল সাপ থাকে সে শুনেছিল। বোধ হয় ঝড়ের চোটে বেরিয়ে পড়েছে বন থেকে।

মা-মা ওঠ—ওঠ—সাপ—ময়াল সাপ ঢুকেছে ঘরে। আলো জ্বালো—

লণ্ঠন জ্বেলে শিউরে উঠল তার মা। সত্যি বিরাট একটা ময়াল সাপ। দরজার সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই। সাপটা গলা বাড়িয়ে তুনকাকে ধরবার চেষ্টা করছে। একবার যদি ধরতে পারে পিষে মেরে ফেলবে। হঠাৎ মনে পড়ল সেই বুড়ীর কথা। সে জম্‌পেশকে ডাকতে বলেছিল। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তুনকার মা।

জম্‌পেশ এস—জম্‌পেশ এস।

জানলাটা খুলে দিল। জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ছিল না একটুও। হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু মেঘ উঠল একটা। শুধু উঠল না, এগিয়ে আসতে লাগল তার বাড়ির দিকে। তার বাড়ির কাছে যখন দাঁড়াল তখন মনে হল মেঘ নয় পাহাড়, আর সেই পাহাড়ে যেন দুটো বড় বড় পা রয়েছে থামের মতো। আকাশ থেকে যেন আকাশবাণী হল। 'আমি জম্‌পেশ এসেছি। কি দরকার, তোমাদের—'

চিৎকার করে উঠল তুনকার মা।

'আমাদের ঘরে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ ঢুকেছে। বাঁচাও আমাদের।'

'তোমাদের ঘর যে বড্ড ছোট, আমি ঢুকব কি করে।'

'যেমন করে পার ঢোক। সাপটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে—'

প্রচণ্ড এক লাথিতে ভেঙে পড়ল ঘরের দেওয়াল। এক হেঁচকা টান দিয়ে ঘরের চালটা কে যেন দূরে ফেলে দিলে—।

তুনকার মা আর তুনকা দেখল এক বিরাটকায় মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

ময়াল সাপটা ঘরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল। ঘরের দেওয়াল তার উপর ভেঙে পড়াতে আর পালাতে পারেনি। সোঁ সোঁ শব্দ করছিল শুধু। একটু পরেই কিন্তু ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল তার মুণ্ডটা। দেখা গেল লকলক করে জিভ বার করছে। চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

জম্‌পেশ হাঁক দিলেন—'গরুড় গরুড়—শীগগির চলে এস তুমি—ময়াল সাপটাকে নিয়ে যাও—'

আকাশ থেকে ডানা ঝটপট করতে করতে নেমে এল পক্ষিরাজ গরুড়। নিমেষের মধ্যে ময়াল সাপটাকে নখে করে তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশে। যেন ময়াল সাপ নয়, সামান্য একটা খড়কুটো।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুনকা আর তুনকার মা।

'আর কি চাই তোমাদের?'

'আমাদের ঘর তো ভেঙে দিলেন। কোথায় এখন থাকব আমরা?'

'এখনই ঘর করে দিচ্ছি।'

আকাশের দিকে চেয়ে চিৎকার করলেন—'বিশ্বকর্মা, দু'জন ভালো মিস্ত্রী পাঠাও—'

দু'জন দেবদূত এসে হাজির হল সঙ্গে সঙ্গে। মাটি ফুঁড়ে উঠল যেন।

জম্পেশ বললেন—'এদের জন্যে এখুনি ভাল বাড়ি তৈরি করে দাও। তোমরা এদিকে একটু সরে দাঁড়াও। এখুনি বাড়ি হয়ে যাবে তোমাদের।'

তুনকা আর তুনকার মা সরে দাঁড়াল। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চতুর্দিক। অন্ধকারের ভিতরেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা। ভয় করতে লাগল। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ অন্ধকার চলে গেল, জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারদিক। তখন তারা দেখতে পেল তাদের কুঁড়ে ঘর নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার একটি মর্মর প্রাসাদ। যারা প্রাসাদ তৈরি করেছিল তারা কেউ নেই। জম্পেশ কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন—'তোমাদের ঘর হয়ে গেছে। ওই ঘরে গিয়ে বাস কর তোমরা।'

'আমরা গরিব। আমরা কি অত বড় বাড়িতে থাকতে পারব?'

'গরিব কেন, ব্যবসা কর, বড়লোক হয়ে যাবে। তোমার ছেলে কি কাজ জানে—'

'ও জনমজুরের কাজ করে। কিন্তু খুব ভালো পুতুল গড়তে পারে ও। ওর বাবা ভালো প্রতিমা গড়ত—'

'বেশ তো পুতুলের ব্যবসাই কর।'

‘কিন্তু তা করতে গেলে টাকা চাই বাবা। আমরা গরিব, কোথায় পাব টাকা—’

‘টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।’

আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করলেন—‘কুবের, কুবের শুনে যাও—’

জরির পাড় দেওয়া মিরজাই গায়ে বেঁটে মোটা একটি লোক এসে হাজির হলেন।

‘দেখ কুবের, এরা বড় ভাল লোক। মায়ের ইচ্ছে এদের ভাল হোক। এরা গরিব, আমি এদের ব্যবসা করতে বলেছি। তুমি টাকা দেবে তো—’



—‘বিশ্বকর্মা, দু’জন ভাল মিস্ত্রী পাঠাও—’ [পৃঃ ৪০৪

‘দেব।’

‘কি করে দেবে?’

‘কাছাকাছি কোন বটগাছ তলায় গিয়ে টাকা চাইলেই টাকা পাবেন। গাছের উপর থেকে টাকার থলি পড়বে। কিন্তু টাকাটা যেন সৎকার্যে ব্যয় হয়। এক পয়সাও যদি অসৎ কার্যে খরচ হয়, তাহলে আর টাকা আসবে না।’

জমপেশ বললেন—‘এরা ভালো লোক। এরা তা করবে না।’

‘তাহলে টাকা পাবে।’

বলেই কুবের অন্তর্ধান করলেন।

নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তুনকা।

তুনকার মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

'আপনি কে বাবা। আপনার পরিচয় দিন।'

জম্‌পেশ বললেন—'আমি? আমি মায়ের ছেলে।'

'কে আপনার মা।'

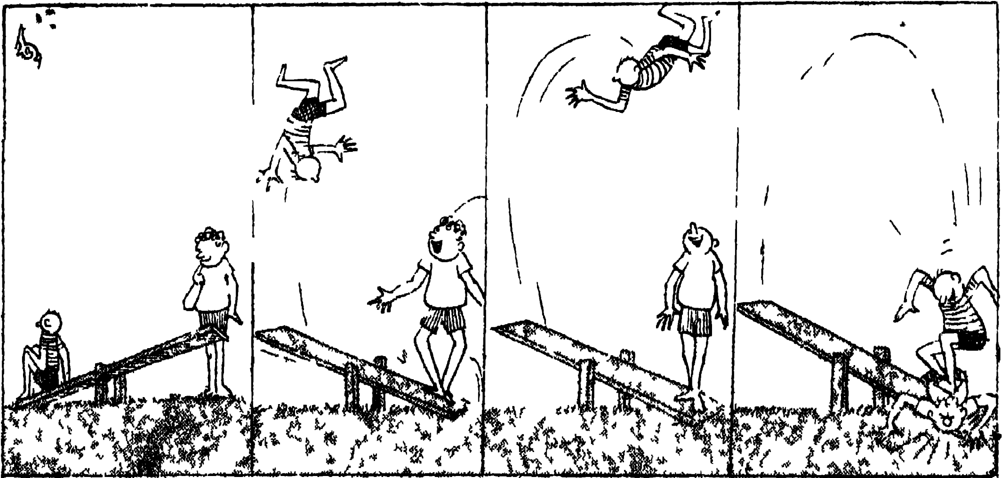
'শক্তি। তাঁর অনেক নাম। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী শক্তিরই নাম। আরও অনেক নাম আছে তাঁর। অনেক সময় তিনি ভিখারিনীর বেশেও ঘুরে বেড়ান। তিনি সন্ধান করে বেড়ান কোথায় ভালো লোক আছে। ভালো লোকেরা যখন বিপদে পড়েন তখন তিনি আমাকে খবর পাঠান। আদেশ দেন ওদের দুঃখ দূর কর। আমি তাঁর আদেশ পালন করি মাত্র।'

'আপনার নাম জম্‌পেশ কেন।'

'কারণ আমার মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। আমি যা করব ঠিক করি তা করে তবে ছাড়ি। মা-ই এ নাম দিয়েছেন আমাকে—'

বলেই জম্‌পেশ অন্তর্ধান করলেন।

● **উল্টো পুরাণ**





কুমারেশ ঘোষ

আমাদের সতু সেদিন একটা সরু ছড়ি হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলো।

সতু মাস্টারমশাই নয়। আমাদের মতোই ছাত্র। কাজেই সেকালের মাস্টারমশাইদের মত হাতে বেত বা ছড়ি নিয়ে ক্লাসে ঢোকার কোন মানেই হয় না। অথচ সতুর হাতে বই-খাতার বদলে ছড়ি কেন?

নিশ্চয় কোন মতলব আছে।

মতলব ছাড়া সতু এক পা-ও চলে না। আর মিথ্যে কথা ছাড়া সে কোন কথাই বলে না।

সতুর ভাল নাম সত্যসুন্দর।

ক্লাসের সময় সতু ছড়িটাকে বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখে একমনে স্যার-এর দিকে চেয়ে রইলো। যেন কত মন দিয়ে তাঁর পড়া শুনচে।

আমরা কিন্তু উসখুস করতে লাগলাম। কী ব্যাপার? হাতে ছড়ি দোলাতে-দোলাতে সতু যখন ক্লাসে ঢুকেছিলো, তখন আমরা তাকে ঘিরে ধরেছিলাম, হ্যাঁরে, হঠাৎ ছড়ি হাতে যে? কী ব্যাপার? সতু বলেচে, এখন নয়, টিফিনের সময় বলবো।

সে অনেক কথা! ঐ ওর এক রোগ। কিছুতেই কোন কথা সহজে বলবে না। আমাদের ভাবিয়ে তুলবে, তবে। ঐ যে নাটকে নভেলে সাসপেন্স না কী বলে, তাই।

আমরা স্যার-এর পড়ায় মনই দিতে পারলাম না। কেবল সতুর ছড়ির কথা ভাবতে লাগলাম।

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই আমরা সতুকে স-ছড়ি একটা ফাঁকা জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, এবার বল্!

সতু উদাস হয়ে বললো, কী বলবো বল্!

—যা বলবার তাই বল্।

—সে যে অনেক কথা।

—তা হোক।

আর সহ্য হয় না সতুর ঐ ভণিতা।

—তোদের বিশ্বাসই হবে না আমার কথা।

—হবে, হবে।—আমরা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম।

জ্যোতি বললো, কেন ভাই তোর ঐ ছড়ি দিয়ে মন আমাদের ছড়ে দিচ্চিস! যা বলবার বলে ফ্যাল একটু ঝটপট!

—তবে শোন্।—সতু উঁচু সরু রকটায় পায়ের ওপর পা রেখে বসলো। আমরা তার সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন শিষ্যরা গুরুদেবের কাছে বাণী শুনচে।

সতু তার হাতের ছড়িটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, ছড়িটা বাবার ঘরে ছিলো, লুকিয়ে নিয়ে এসেচি তোদেরই দেখাবার জন্যে। তারপর মনে হলো, এর জন্মবৃত্তান্ত বললে তোদের হয়তো বিশ্বাসই হবে না। তাই বলতে চাচ্ছিলাম না। তা তোরা যখন ধরেচিস্—

জয় বললো, হ্যাঁ, ধরেচিই তো। আর একবার যখন ধরেচি, সহজে তোকে ছাড়চিনে। ছড়িও তোর হাতছাড়া হতে পারে!

জয় একটু গুণ্ডা গোছের। কোথায় কী বলতে হয় ঠিক জানে না। পাছে সতু বিগড়ে যায়, আমরা তাড়াতাড়ি তার কথাটা মেরামত করে দিলাম, মানে সতু, জয় খুব অধৈর্য হয়ে পড়েচে কিনা। অবশ্য আমরাও। এই জয়, অমন ফ্যাচফ্যাচ করিসনে, চুপ কর্!

জয় বললো, ঠিক আছে। সতু মুখ খুলুক। শুরু হোক গান।

দেখলাম, সতুও রাগ করলো না বা তেমন কিছু বললো না। বুঝলাম, সেও ব্যাপারটা বলতে চায়। নইলে ছড়িটা আনবে কেন? ছড়ির জন্মবৃত্তান্ত বলবার জন্যে সতুরও পেট ফুলচে।

সতু ছড়িটা উঁচিয়ে বললো, এটা একটা গাছ থেকে তৈরি।

বিশ্বজিৎ আবার সব কিছুই তর্কে জয় করতে চায়। বললো, ছড়ি তো গাছ থেকেই হয়। গাছ ঠিক নয়, গাছের ডাল থেকে।

সতু বললো, ওই তো। তর্ক শুরু করে দিলি! বলচি যখন গাছ থেকে তৈরি, তখন জেনে রাখ মোটা গাছ থেকেই তৈরি।

জ্যোতি বললো, তুই বলে যা। কারোর কথায় কান দিসনে।

—হ্যাঁ, ডিসটার্ব করলে বলবো না।—সতু বললো, এই ছড়ির জন্ম আজকের নয়, আমাদের দু'পুরুষ আগের। আমার ঠাকুরদা ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। খুব জাঁদরেল লোক। সাহেবদের সঙ্গে ভারী মাখামাখি ছিলো। তার কারণ ছিলো। ফরেস্ট অফিসারের পারমিশন ছাড়া বনে শিকার করতে আসা সাহেবের বাবারও সাধ্যি ছিলো না। তাছাড়া রাত কাটাবে কোথায়, খানাপিনা করবে কোথায়, শিকারের ব্যবস্থা করে দেবে কে—সবই তো ফরেস্ট অফিসার। আমার ঠাকুরদার জুরিসডিকসনের মধ্যে। কাজেই ঠাকুরদাকে খাতির করতো সাহেবরা—

—ছড়ির গল্প করতে গিয়ে বেলাইনে চলে যাচ্চিস যে?—জয় হেসে বললো।

—হ্যাঁ। এ দেখচি ছড়ি ছেড়ে সাহেব।—জ্যোতি ফোড়ন কাটলো।

—হ্যাঁ তাই।—সতু গম্ভীর হয়ে বললো, আগে ছড়ি আর সাহেব একই ব্যাপার ছিলো। সাহেবের হাতের ছড়ির মার অনেক নেটিভকেই খেতে হয়েচে, জানিস? আবার কারোর সঙ্গে সাহেবদের বন্ধুত্ব হলে তা আবার টেনে ছেঁড়বার বা ছাড়াবার উপায় ছিলো না।

আমি দেখলাম, সতু অন্যদিকে ঘুরে যাচ্চে। তাড়াতাড়ি বললাম, যাক ভাই, যা বলছিলি বল্। তোর ছড়ির গল্প ছাড়্।

—আমি তো সুতো ছাড়চি, ওরাই তো আটকাচ্চে!—সতু পা নাচিয়ে বললো, হ্যাঁ যা বলছিলাম, সাহেবদের সঙ্গে মিশে মিশে ঠাকুরদার মেজাজও খুব কড়া হয়ে গেছলো। একবার খবর এলো উঁচু পাহাড়ের ওপরে একটা বড় পুরোন গাছ খানিকটা ভেঙে পড়েচে। শুনে ঠাকুরদা অর্ডার দিলেন, গাছটাকে কেটে ফেলো। তখুনি লোকজন দড়ি,



ঠাকুরদা দূরবীন নিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে
লাগলেন গাছ কাটা।

কোদাল, কুড়ুল, শাবল, করাত ইত্যাদি নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেলো। ঠাকুরদা কোট-প্যাণ্ট হ্যাট পরে তাঁর স্টাফদের নিয়ে পাহাড়ের নীচেয় কড়া মেজাজে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইলেন। উঁচু পাহাড়ের ওপরে গাছ কাটা হতে লাগলো ঠকাস-ঠক, ঠকাস-ঠক। ঠাকুরদা তাঁর এক স্টাফের হাত থেকে দূরবীন নিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে লাগলেন গাছ কাটা। বিরাট মোটা গাছ তো। কাটতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় গেলো। শেষে মড়মড় মড়াত করে গাছটা পড়লো ভেঙে। ভেঙে পড়েই ঐ বিরাট গাছ গড়গড় করে গড়াতে লাগলো পাহাড়ের গা দিয়ে! তারপর গডাচ্চে তো গড়াচ্চে, গড়াচ্চে তো গড়াচ্চেই—

—কেন, পাহাড়ের গাযে তো আরো গাছ ছিলো নিশ্চয়ই, তাতে আটকে গেলো না গাছটা?—অবাক্ হয়ে জিগ্যেস করলো বিশ্বজিৎ।

—না। জোর গলায় বললো সতু, যার গড়াবার ইচ্ছে থাকে, সে গড়াবেই। যার চলবার ইচ্ছে থাকে সে চলবেই। পথের কোন বাধাই মানবে না। পড়িসনি, হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

—তুই বল্, তুই বল্। জ্যোতি তাগিদ দিলো।

—গাছটা গড়াতেই লাগলো। সতু বলতে লাগলো, ঠাকুরদাও চোখে দূরবীন কষে দেখতে লাগলেন। কিন্তু কতক্ষণ দেখবেন? একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিনঘণ্টা কেটে গেলো। সারা দিনটা কেটে গেলো। তবু গড়াচ্চে তো গড়াচ্চেই গাছটা। শেষে ড্যাম ইট্ বলে দূরবীন ফেলে দিয়ে রাগ করে চলে এলেন বাংলোয়। তখনও ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ

করে আকাশ কাঁপিয়ে পাহাড় কাঁপিয়ে গাছ গড়াচ্ছে। ঠাকুরদা তখুনি কাগজ টেনে নিয়ে তাঁর বড় সাহেবকে রেজিগনেশান লেটার লিখতে বসলেন, একটা কাটা গাছের স্লো মুভমেণ্টের জন্যে আমার ভ্যালুয়েবল টাইম নষ্ট করতে চাইনে। অতএব এতদ্দ্বারা আমার কাজে ইস্তাফা দিলাম।

—সে কিরে? জয় বললো, আজকাল তো সব কাজই হচ্চে হবে করে হয়। আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতে কত দেরি হয় দেখিসনে? সেজন্যে আবার কেউ চাকরি খোয়ায় নাকি?

—হ্যাঁ, খোয়ায়। মেজাজ থাকা চাই!—সতু বললো, আর ঠাকুরদা ঐ গাছটার গড়ানোর ঢং থেকে বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন ঐ গাছ গড়িয়ে নেমে আসতে আরো সময় নেবে। বাড়িতে ঠাকুমা সব শুনে বললেন, সে কি, গাছের ওপর রাগ করে চাকরি ছেড়ে এলে? ঠাকুরদা বললেন, ড্যাম ইট্। একটা ঢালু পাহাড়ে কাটা গাছের ঢলামি দেখবার জন্যে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো? ওর চাইতে ধান চাষ করবো। বড় হলেই কাস্তে দিয়ে কাটবো। অমন আস্তে আস্তে গড়াবার ব্যাপার নেই। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়লেই ধান। অবশ্য আমাদের তখন ধানী জমি ছিলো তাই রক্ষে। বাবা তো তখন নাবালক।

—তারপর, তারপর কী হলো?—জিজ্ঞেস করলাম।

বেশ জমিয়ে ফেলেচে সতু।

—তারপর অনেকদিন কেটে গেচে।—সতু বললো, বাবা বড় হয়েচেন। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা মারা গেচেন। আমি জন্মেচি, বড় হয়েচি। কলকাতায় চলে এসেচি সবাই। কিছুদিন আগে বাবা কী একটা কাজে বাইরে গেছলেন ঠাকুরদার ঐ ফরেস্টের কাছাকাছি। সেখানে তাঁর জানা ভদ্রলোকের মোটর ঠিক করে দেখতে গেলেন ঠাকুরদার, মানে তাঁর বাবার পুরোন কর্মস্থল। সেখানে চৌকিদার রাম সিং বাবার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী। বুড়ো মানুষ। হাঁপানিতে ভুগচে। বাবাকে পেয়ে পুরোনোদিনের গল্প শুরু করে দিলো, আপুনার পিতাজী তো বহুৎ কড়া আদমী থা। গাছ গিরনে কো দেরি হুয়াথা তো নোকরি ছোড়্ দিয়া। তো সা'ব ঠিক কিয়া থা। উ গাছ বহুৎ বরিষ বাদ মাট্টিমে গিরা থা। উ বকত হামভি বুড্ডা হো গিয়া থা। ঠারিয়ে থোরা।—বলে রামসিং ঢুকলো তার ঘরে। একটু পরে একটা ছড়ি হাতে বেরিয়ে এলো রামসিং।—সতু তার হাতের ছড়িটা দেখিয়ে বললো, এই সেই ছড়ি।

—তার মানে? আমরা সবাই অবাক্ হয়ে গেলাম।

● কুমারেশ ঘোষ



—এ ছড়িটা আপ লিজিয়ে।

সতু মুচকে হেসে বললো, রামসিং যা বললো, শুনে বাবাও অবাক্ হয়ে গেছলেন। বললো, গাছটা নাকি গড়াতে গড়াতে তার ছাল উঠে গেলো। শেষে ঐ মোটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে রোগা হতে হতে যখন মাটিতে এসে পড়লো, তখন দেখা গেল একটা ছড়ি হয়ে গেচে। হবেই তো। মোটা মানুষের ক্ষয়রোগ ধরলে রোগা হয়েই যায় তো। রামসিং বাবাকে ছড়িটা দিয়ে বললো, এ ছড়িঠো আপ লিজিয়ে। আপকো পিতাজী গাছ দেখা, আপ উসকো ছড়ি দেখতা। লিজিয়ে। খুশী হয়ে বাবা ছড়িটা নিয়ে এলেন।

হঠাৎ একটা চাপা খি-খি আওয়াজ হতে লাগলো। লক্ষ্য করে দেখি সবাই হাসি চাপবার চেষ্টা করচে। হাসি আমারও গলায় ঠেল দিচ্ছিলো, আমি আবার ঠেলে ঠেলে ভেতরে চেপে রাখছিলাম। সতু তখন নিজের গল্পেই মজগুল। তাই হয়তো লক্ষ্য না করে বললো, বাবা কী বলেচেন জানিস? ঠাকুরদার স্মৃতি হিসেবে যে স্পষ্টবক্তা বা সত্যবাদী তাঁকে এই ছড়িটা উপহার দেবেন।

জয় সঙ্গে সঙ্গে বললো, তবে তো তুই-ই পাবি।

—আ, আ, আমি কেন?

—তুই সত্যসুন্দর কিনা।—আমি বললাম।

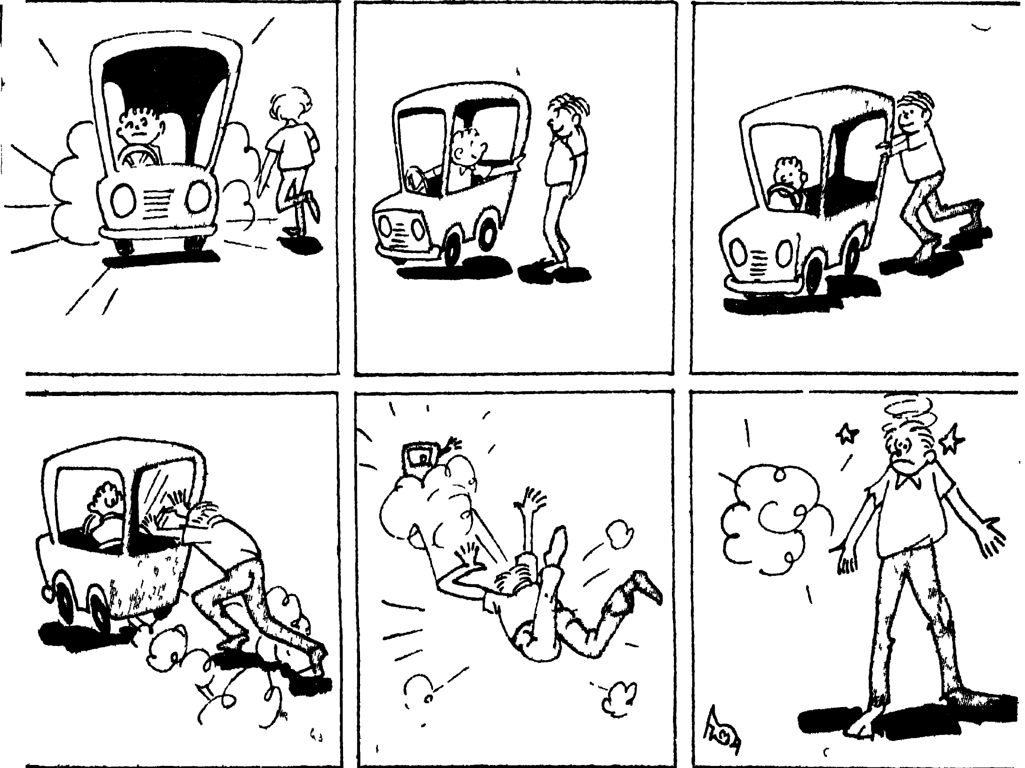
—ও, বুঝেচি। —বলেই সতু ছড়ির একটা খোঁচা দিয়ে আমাদের ব্যূহ ভেদ

করে চলে গেল বাইরে। টিফিনের পরও তাকে পাওয়া গেলো না। সে নাকি ছুটি নিয়ে চলে গেচে বাড়িতে।

ক'দিন আগে আমার মাসীমার বাড়িতে বেড়াতে গেছলাম। কথায় কথায় আমার মাসতুতো বোন রুপাকে বললাম সতুর ছড়ির মজার গল্প। শুনেই রুপা বললো, সেকি দাদা, আমরা তো দেওঘরে গেছলাম। ঐ তোমাদের সতু আর তার বাবা মা ভাই বোনরা গেছলেন দেওঘরে বেড়াতে। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকতেন ওঁরা। আমার সামনে সতু একটা ছড়ি কিনেছিলো আট আনা দিয়ে। সরু, হলদে রং। মাথাটা গোল তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিকই তো।

● **গাড়ির ম্যাজিক**





সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বরাবরের মত হাতে ফোলিও ব্যাগ, পরনে ঢিলে স্যুট, মাথায় টাক, মুখে নির্মল বিনীত হাসি নিয়ে নামল নিলয় রায় ট্যাক্সি থেকে। ট্যাক্সির দরজা খোলার ও বন্ধ হবার শব্দ হতেই আমাদের দুই ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা সবাই ছুটে নীচে চলে গেল তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। আমি দোতলায় আমার ঘরের জানলায় দাঁড়ালাম হাসি মুখে। এমন একটি সুন্দর ও প্রসন্ন অতিথি গৃহস্বামীর মহাভাগ্যে মেলে।

নিলয় রায়, চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস, উত্তর বঙ্গের অধ্যাপক, আমাদের দুই ভাইয়ের একমাত্র ও কনিষ্ঠ ভায়রাভাই। আমাদের ছেলেমেয়েদের মেসোমশাই।

আমি দরজার মুখে দাঁড়ালাম। নিলয় উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে পিছনে হইহই করা অজ্ঞান বাহিনী নিয়ে। অজ্ঞান বাহিনী মানে আমার বাড়ির ছেলেরা। আমি নিলয়কে অজ্ঞান দলের দলপতি বলে ডেকে থাকি। কারণ নিলয় অজ্ঞান দলের হিরো। সে এলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম, লেখাপড়া ছেড়ে সব সময় তাকে ভিড় করে

ঘিরে রাখে। যে ছেলে কুঁড়ের হদ্দ, কিংবা কাজকর্মে মহাদুষ্ট, মানে যাকে বলে হুকুম দিয়েও কোনও কাজ করানো যায় না, সেই ব্যক্তি নিলয়ের হুকুম তামিল করবার জন্য প্রাণ দিতে পারে। এমনি ম্যাজিক নিলয় রায়ের।

সদাপ্রসন্ন মানুষটি সিঁড়ির মাথায় আমাকে দরজার মুখে দেখতে পেয়ে, মুখের হাসি আরও বাড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম করলে আমাকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সেই হাতটি সে মাথায় বুলিয়ে নিলে।

আমি বললাম—ভাল আছ ভাই?

বিনয়ে আরও নত হয়ে সে মাথা আরও নীচু করে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ!

তার সঙ্গে আর কথা বলা হল না। তাকে ছেলেমেয়েরা হইহই করে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল আমার। আমি ছেলেদের পিছন পিছন ও যে ঘরে ঢুকল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। নিলয় খাটের উপর বসেছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সম্ভ্রম প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে ওর অভ্যাসমত। বললাম —আরে তুমি ট্রেনে এসেছ। ক্লান্ত হয়ে আছ। বস, তুমি বস!

নিলয় বসল না। বসেও না সে গুরুজন দাঁড়িয়ে থাকলে।

আমি একেবারে ভণিতা না করে আসল কথাটিই বললাম—গতবার তোমার কি হয়েছিল নিলয়?

নিলয় অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসল। ঘাড় নীচু করে, একটু মাথা চুলকে সে বললে—হয়েছিল একটা ব্যাপার। আপনি আজ অফিস থেকে ফিরে আসুন। আপনাকে বলব সন্ধ্যেবেলায়!

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

শীতের দিন, স্নান করতে হবে। গরম জল দেবার জন্যে হাঁক দিলাম। শুনতে পেলাম—গরম জল বাথরুমে দেওয়া হয়েছে।

শীতের ছোট দিন। আলো বেলা চারটে থেকেই কমে আসে। তার উপর সে দিন মেঘ করে এল আলো কমার সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি যখন ফিরলাম তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। হিমেল ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে বাদলার আমেজ মিশেছে।

● সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌনে সাতটার সময় যখন বাড়ি পৌঁছুলাম তখন পাড়া অন্ধকার লোড শেডিংয়ের জন্যে। সেই সঙ্গে হিমেল বাদলার বাতাসে রাস্তা জনহীন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন বাড়ি ঢুকলাম তখন বাড়ির ভিতরে মাত্র কটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছে। তারই আবছা লালচে আলোয় বাড়ির ভুতুড়ে অন্ধকার কমেনি, বরং বেড়েছে যেন!

বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলাম—ছেলেমেয়েরা সব ফিরেছে তো?

সবাই ফিরেছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—নিলয় বেরোয় নি তো?

জবাব পেলাম—না, সে বাড়িতেই আছে।

সারাদিন কাজের ভিড়ে সকালের কথাটা মনে হয়নি। এতক্ষণে মনে হল। অতি ঠাণ্ডা, সজ্জন, বিনয়ী মানুষ নিলয়। মেজাজ অতি স্নিগ্ধ, মনের স্থায়ী মাধুর্য, মুখে সব সময়েই হাসিটি হয়ে লেগে থাকে তার। সেই মানুষ সেবার কেমন ভিন্নতর ব্যবহার করেছিল। ভিন্নতর কেন, প্রায় তার স্বভাবের বিপরীত।

ঘটনাটা মনে পড়ল ভাল করে।

মাস তিনেক আগে নিলয় তার বড় ছেলে দশ বছরের দোলনকে রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুলে ভরতি করতে নিয়ে এসেছিল। এসেছিল নিজের স্বভাববশতঃ মধুর শান্ত মেজাজ নিয়েই। ছেলেকে ভরতি করার সব ব্যবস্থা আগে থেকেই হয়েছিল। সব ব্যবস্থা করে ছেলেকে তার দু দিন পরে হোস্টেলে দিয়ে সে চলে যাবে।

আসল কাজ সেরে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সে দেখা করে ফিরছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় ছাড়ছে এমন সময় টেলিফোন এল একটা। নিলয়ের ফোন।

ফোন ধরেই নিলয় চমকে উঠল—কে বলছেন আপনি? কি বলছেন, মধুর অসুখ? মধু হাসপাতালে? কি হয়েছে ওর?

তারপর ফোন ধরে অনেকক্ষণ ফোনের কথা শুনলে নিলয়। নিজে আর একটাও কথা বলেনি!

অনেকক্ষণ পর টেলিফোন রেখে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—আচ্ছা!

আমাকে বললে—দাদা, আমাকে একবার এক্ষুণি আবার বের হতে হবে!

আমি আশ্চর্য হলাম। বিরক্ত হলাম তার চেয়ে বেশী। এই মাত্র সারা কলকাতা শহর চাষ ফিরে এল। এখন আটটা বাজছে। মনের বিরক্তি চেপে বললাম—এই রাত আটটার সময় আবার কোথায় যাবে তুমি?

নিলয় বললে—হাসপাতালে। আমার ভাগলপুরের এক বন্ধুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে!

তার মুখেই বন্ধুর সব কথা শুনলাম।

নলিনাক্ষ দুবে তার সঙ্গে একসঙ্গে ভাগলপুরে পড়ত। উনিশ শো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সালে। এক কলেজে একই ইয়ারে তারা দুজনে পড়ত না শুধু, দু বছর হোস্টেলে একই ঘরে ছিল তারা। পরবর্তী কালে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না তাদের। তারপর বছর তিনেক আগে হঠাৎ আবার কলকাতায় দেখা হল দুজনের। দুবে এখন কলকাতায় এক নামকরা ব্যাঙ্কের একটা বেশ বড় ব্রাঞ্চের এজেণ্ট। নিলয় কলকাতা এলে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে একবার দেখা করেই।

জিজ্ঞাসা করলাম—এবার এসে কবে দেখা করেছিলে?

নিলয় বললে—এই তো কাল দুপুরেও ওর ব্যাঙ্কে গিয়েছি। ওর ঘরে বসে কফি খেয়েছি। একখানা ড্রাফ্‌ট্‌ ছিল, ভাঙিয়েছি। তারপর এই দেখুন না, এই টেলিফোন! স্ট্রোক হয়েছে। ওর স্ত্রীই ফোন করলেন।

আমি আর কি বলব! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—যাও তা হলে! তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এস! কোন্ হাসপাতালে আছেন তোমার বন্ধু?

—মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

বললাম—একখানা ট্যাক্সি নিয়ে যাও। ট্যাক্সি ডেকে দিক।

একজন চাকরকে ট্যাক্সি ডাকতে বললাম। ফিরে এসে দেখি ছেলে দোলন বাপের কাছে কি একটা আবদার করে হাত-পা ছুড়ছে আর নিলয় বাধা দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

নিলয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—দেখুন না, আমার সঙ্গে হাসপাতালে যেতে চাইছে!

আমি দোলনকে মৃদু ধমক দিলাম। বললাম—না বাবা, তুমি এই এত রাত্রে কোথায় যাবে হাসপাতালে?

দোলন এমনি বেশ ভাল ছেলে। লেখাপড়ায় ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে। কিন্তু বাপের অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয়ের জন্য কতখানি আবদার করা উচিত, কতখানি করা উচিত নয় সে বোধটা এখনও তৈরী হয়নি।

নিলয় ছেলেকে বললে—তুমি দাদাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ো,

ঘুমিয়ে যেও। তুমি মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখবে আমি 'তোমার পাশে, তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছি। কেমন?

দোলন বললে—তা হলে তুমি আসবার সময় আমার জন্যে একটা 'ক্যাডবেরি' নিয়ে এস।

নিলয় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। যদিও আমার মনে হল এত রাত্রিতে কোথায ক্যাডবেরি পাবে নিলয়? আমি হলে নিশ্চয়ই রাজী হতাম না। পুরানো কালের বাপ, আর এ কালের বাপে দেখছি তফাত অনেক।

নিলয় চলে গেল।

অনেকখানি রাত্রি তখন। হঠাৎ চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আধো ঘুমের মধ্যে শুনলাম কে অচেনা গলায় আমার দরজার পাশে চেঁচামেচি করছে।

উঠে বসলাম ধড়ফড় করে। কি হল?

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, নিলয় অত্যন্ত রাগ করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর অত্যন্ত রাগতভাবে ডাকছে ছেলের নাম ধরে—এই দোলন, খোল, দরজা খোল!

ভিতর থেকে কোন সাড়া নেই। নিলয়ের গলা আরও চড়ে উঠেছে—এই ইডিয়ট, গবেট কোথাকার! খোল, দরজা খোল!

আমি ঘুম চোখে বললাম—তুমি এত রাগ করছ কেন? ছোট ছেলে, ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিলয় বেশ রেগে চড়া গলায় বললে—কিন্তু দরজা বন্ধ করে ঘুমোল কেন? আমি ফিরে আসব এটা কি ওর মনে নেই?

আমি একটা কৈফিয়ত দিলাম—ছোট ছেলে, একা শুতে ভয় পাবে বলে বোধহয় দরজা বন্ধ করে শুয়েছে।

নিলয় আর কোন কথা বললে না। রাগে থমথমে মুখে সে চুপ করে রইল।

সমস্ত গোলমালের মাঝখানে এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। মধ্যরাত্রির নীরবতা যেন চারিপাশেই অপেক্ষা করছিল। আমরা একটু চুপ করতেই চারপাশের স্তব্ধতা যেন বাঁধ ভাঙা জলের মত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এরই মধ্যে ছোট্ট একটি শব্দ হল—খুট!

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে নিলয় আমার কাছে সরে এল। আমার মনে হল সে যেন ছিটকে সরে এল আমার কাছে। সিঁড়ির ম্লান, লালচে আলোয় মনে হল তার মুখখানা কেমন বিবর্ণ। সে যেন হাঁফাচ্ছে দরজার দিকে চেয়ে!

দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

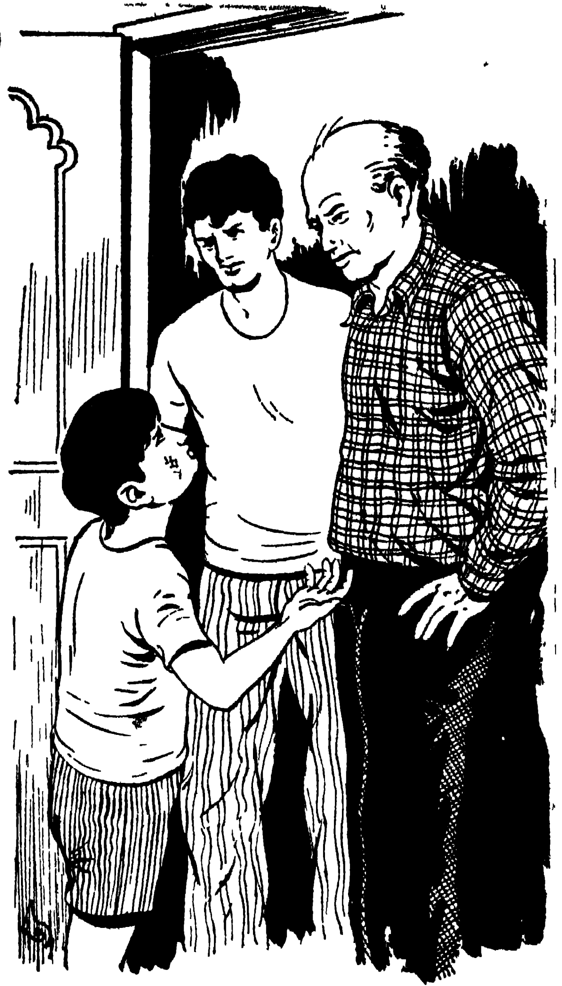
আমার যেন মনে হল নিলয় নিশ্বাস বন্ধ করে বড় বড় চোখে স্থির-দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দিলে দোলন। তারপর দরজার দুই পাল্লায় দুটো হাত দিয়ে সে চাইল বাপের মুখের দিকে। তারপর হাত পেতে বলল, আমার ক্যাডবেরি!

নিলয় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। নিজের ভারী থাবায় তার একখানা হাত ধরে চড়া গলায় বললে—তোমাকে ক্যাডবেরি দেব? সোয়াইন, গবেট, কেন তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলে? কেন? আমাকে তার কৈফিয়ত দাও!

আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম। দোলন অবাক্ হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে!

নিলয় কি পাগল হয়ে গিয়েছে?



দোলন হাত পেতে বলল, আমার ক্যাডবেরি।

ছেলের কান্না দেখে সে সংবিত ফিরে পেলে যেন। সে সঙ্গে সঙ্গে ছেলের হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পরদিন সকালে আমি একটু বেলাতে উঠেছিলাম। আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম, নিলয় খুব ভোরেই দোলনকে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে উত্তরবঙ্গে ফিরে যাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? এত সকালে গেল কেন?

স্ত্রী বললেন—কি জানি, কাল রাত্তিরেও কিছু খেলে না। চুপ করে শুয়ে রইল। সকালে উঠেই চলে গেল ছেলেকে নিয়ে।

● সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ছেলেদের মধ্যে একজন বললে—হ্যাঁ। যাবার সময় আমাদের বেলগাছের তলায় একটা ডালসুদ্ধ বেল পড়েছিল, সেইটা নিয়ে গেলেন!

ডালসুদ্ধ বেল? অবাক্ হলাম মনে মনে। কি দরকার পড়ল তার ডালসুদ্ধ বেলে?

কিছু বুঝতে পারলাম না।

তাই কাপড়-চোপড় বদলে গতবার ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানবার জন্য আমি ওর ঘরে গিয়ে বসলাম। নিলয় খাটের নিজের জায়গা থেকে সরে গিয়ে আমার বসার জায়গা করে দিয়ে আমাকে সম্ভ্রম সমাদর দেখালে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—গতবার কি হয়েছিল নিলয়?

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জরুরী প্রশ্ন মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার সেই অসুস্থ বন্ধু, তাঁর খবর কি?

নিলয় বললে—সেই রাত্রিতেই সে মারা গিয়েছিল! আর ও মারা যাবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

সব চুপচাপ। যে কোন মৃত্যুর খবর যেন মানুষকে অন্ততঃ একটা মুহূর্তও ধমকে থামিয়ে দেয়।

নিলয় সংকোচের সঙ্গে বললে—দাদা, গতবার আমার সেই রাত্রির ব্যাপারটার জন্যে বড্ড খারাপ লেগেছিল। সেই জন্যে পরদিন ভোরে আমি আর কারও সঙ্গে দেখা না করে চলে গিয়েছিলাম।

চুপ করে গেল নিলয়। বললে—সেদিনের সেই ব্যাপারের সঙ্গে আমার অল্প বয়সের একটা অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে। সেটা এবার আপনাদের বলব বলেই মনে মনে ঠিক করে এসেছি।

নিলয় গল্প বলতে লাগল। নিলয়ের জবানীতেই গল্পটি বলছি।

উনিশ শো চুয়ান্ন পঞ্চান্ন সালের কথা। আমি তখন আমাদের বাড়ি মুঙ্গের থেকে ভাগলপুর টি. এন. জি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে গিয়ে ভরতি হয়েছি। আমরা ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে। তাই হোস্টেলে ভাল ঘর পাইনি আমরা। হোস্টেলের 'বি' ব্লকে একখানা 'ফোর-সিটেড' রুমে আমরা একই ইয়ারের চারজন বন্ধু থাকি! আমি, নলিনাক্ষ

ডুবে, যে মারা গেল সে দিন। আরও দু জন রমেশ উপাধ্যায় আর ইন্দু ভাদুড়ী। আমার বাড়ি মুঙ্গের, নলিনাক্ষ আর রমেশ ভাগলপুরের আশপাশের দেহাতের ছেলে। আর ইন্দুর বাড়ি ভাগলপুর থেকে একটু দূরে কহলগাঁও। ওর বাবা সেখানে ডাক্তার। আমরা চারজনেই ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্এ পড়ি।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের চারজনের মধ্যে খুব ভাব-ভালবাসা হয়ে গেল। আমরা দলে চারজন, একই ইয়ারে পড়ি, একই সাবজেক্ট্। সেইজন্যে আমাদের আর কারও সঙ্গে মিশতে হত না। আমরা চারজনেই সব সময় দল বেঁধে থাকতাম। অন্য সকলে আমাদের বলত—ফোর মাস্কেটিয়ার্স!

আমার অবস্থা যেমনই হোক, ওদের তিনজনেরই অবস্থা ভাল। রমেশ আর নলিনাক্ষের দুখানা সাইকেল ছিল। বিকেল বেলা আমরা চারজনে সেই দুখানা সাইকেলে চেপে বেড়াতে বেরুতাম। সাইকেল দুখানা আমাদের চারজনেরই সম্পত্তি ছিল। আমরা দুজন চালাতাম, আর দুজন দুই সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে বসে যেতাম। একজন হয়তো একা সাইকেল চড়ে চলেছি, হঠাৎ চলতি সাইকেলে আর একজন না বলে কয়ে কেরিয়ারে উঠে পড়ল পেছন থেকে। সেও প্রায় আমাদের একটা খেলার মত ছিল।

দুখানা সাইকেলে আমরা চারজন চেপে ঘুরতাম শহরের যত্রতত্র। বিকেলে গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াতে যেতাম। বড় বড় আমবাগানের পাশ দিয়ে রাস্তা, খুব নির্জন। সেই সব রাস্তায় বেড়াতাম। কখনও কখনও চারজনে যেতাম সিনেমায়।

প্রথম দেড় বছর ভারী আনন্দে কেটেছিল। তেমন আনন্দ আর সারা জীবনে পাইনি। তখন আমরা সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি। সামনেই পূজোর ছুটি। এমন সময় আমাদের আনন্দের হাটে ধাক্কা লাগল।

আমরা চারজন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সিনেমা দেখে ফিরছি চার জনে। রাত্রি সাড়ে আটটা পৌনে ন'টা হবে। একটা অন্ধকার নির্জন আমবাগানের পাশ দিয়ে আসছি। আমি আছি নলিনাক্ষের সাইকেলের কেরিয়ারে, আর রমেশের সাইকেল চালাচ্ছে ইন্দু, রমেশ তার কেরিয়ারে বসে আছে। আমরা চারজনেই একটা হিন্দী সিনেমার গানের কলি গাইছিলাম এক সঙ্গে। হঠাৎ রমেশ বললে—আরে বাপ, বহুত্ জাড়া লাগতা হ্যায়!

গঙ্গার ধারের নির্জন ফাঁকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। গঙ্গার দিক থেকে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। আমাদের ভালই লাগছিল। আমি তাই রেগে বললাম—বহুত জাড়া

লাগতা হ্যায়? বাঁদর, তোকে বললাম, শরীর খারাপ লাগছে যদি তো যাস না আজ! তা না মেনে তো চলে এলি! এখন জাড়া লাগছে বললে কি হবে?

আমি সাইকেল থেকে নেমে পড়ে ইন্দুকে বললাম—থাম রে!

সেই আমবাগানের ধারে নেমে উপাধ্যায়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখি ওর বেশ জ্বর এসে গিয়েছে। শীতে কাঁপছে বেচারা। কি করি! আমি, নলিনাক্ষ আর ইন্দু তিনজনেই আমাদের গায়ের জামা খুলে রমেশকে পরিয়ে দিলাম। ওকে একটার পর একটা জামা পরাই আর হাসি সবাই মিলে। রমেশও হাসে। সে বেশ একটা খেলার মত হল। ওকে ওর জামার ওপরে আরও তিনটে জামা পরিয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম হাসতে হাসতে।

রাত্রিতে ওর খুব জ্বর বাড়ল। আমরা সবাই মিলে হাসিঠাট্টা করে সারারাত ওর সেবা করার অছিলায় ওর কাছে বসে সারারাত জেগে ওকে জাগিয়ে রেখে গল্প করলাম।

সকাল বেলায় ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার দেখে যা বললেন তাতে আমাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ডাক্তার বললেন—ওর ডবল নিউমোনিয়া হয়েছে। এখনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

হোস্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট এলেন। তাঁর তদারকে আমি আর ইন্দু রমেশকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আর নলিনাক্ষ গেল রমেশের বাড়িতে খবর দিতে।

তারপর সাতদিন যমে-মানুষে টানাটানি। আমরা হাসপাতালের বারান্দায় থাকি স্পেশাল পারমিশন নিয়ে। যতটা পারি ওর কাছে থাকি ওর সেবা করি। রমেশের বাড়ির লোকেরাও থাকে কেউ কেউ।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সাতদিনের দিন রাত্রি সাড়ে আটটা ন'টায় রমেশ মারা গেল। আমরা কাঁদলাম, রমেশের মা-বাবা, ভাই-বোনরা আমাদের সঙ্গে কাঁদল। রমেশের বাবা রমেশের সব জিনিস নিয়ে গেলেন। কিন্তু সাইকেলটা আমাদের দিয়ে গেলেন। আমরা নিতে না চাইলেও তিনি জোর করে দিয়ে গেলেন আমাদের। যাই হোক, সাইকেলটা থাকল আমাদের কাছে।

আই. এ. পরীক্ষার টেস্ট তারপর ফাইন্যাল পরীক্ষা হল। পরীক্ষার ফল বেরুল। আমরা তিনজনেই পাস করে আবার বি. এ. ক্লাসে থার্ড ইয়ারে ভরতি হলাম। যথারীতি

লেখাপড়া করি, আগের মতই সাইকেলে চড়ে বেড়াই। তবে এখন চারজনের জায়গায় তিনজনে চড়ি দুখানা সাইকেলে।

একটা বিশেষ দিনের ঘটনা বলছি। আমি সেদিন ছিলাম না। মুঙ্গেরে গিয়েছিলাম। আমাদের ঘরে আমাদের তিনজনের জায়গায় সেদিন ছিল ইন্দু আর নলিনাক্ষ। শনিবার বিকেল বেলা। ইন্দু ফিরে নলিনাক্ষকে বললে—এই নলিনী, চল সিনেমা দেখে আসি। একটা ভাল ছবি হচ্ছে।

নলিনাক্ষ যেতে রাজী হয়নি।

ইন্দু ওকে বার বার যেতে বলেছে—চল, আমি তোর পয়সা দেব!

নলিনাক্ষ বলেছে—না রে, আমার মামার দেখা করতে আসার কথা আছে। আমি যাব না।

তখন সাইকেল নিয়ে একাই চলে গিয়েছে ইন্দু। নলিনাক্ষ বাধা দিয়ে বলেছিল—আজ না গেলেই পারতিস! কাল আমি যেতাম তোর সঙ্গে!

কিন্তু ইন্দু তার কথা শোনেনি। সে রাগ করে চলে গিয়েছিল সাইকেল নিয়ে।

তারপর যেমন যেমন ঘটেছিল, পরে আমরা যা শুনেছি বুঝেছি, তেমনিভাবে বলছি আপনাদের।

ইন্দু মনের আনন্দে সিনেমা দেখে ফিরছে সাইকেলে। রাত্রি তখন সাড়ে আটটা পৌনে ন'টা হবে।

সাইকেলে একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে চলে আসছে গঙ্গার ধারের সেই নির্জন রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ তার মনে হল—আরে, এ তো সেই গানটা! যা আগের বছর চার বন্ধু এক সঙ্গে, রমেশের যেদিন জ্বর আসে সেদিন, গাইতে গাইতে ফিরছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বন্ধু রমেশকে মনে পড়েছে। আবার দুঃখ হয়েছে নতুন করে বন্ধুর জন্য। দেখ তো, তারই সাইকেল চেপে যাচ্ছি, অথচ তাকে মনে পড়ে না!

হঠাৎ ইন্দুর মনে হল তার সাইকেল টানতে কষ্ট হচ্ছে। ভারী লাগছে সাইকেল। ভারটা যেন কেরিয়ারে!

সাইকেল চালাতে চালাতেই সে পিছন ফিরে চাইল। নাঃ, কেউ তো নেই কেরিয়ারে! তবু মনে হচ্ছে কে যেন বসে আছে কেরিয়ারে! মনে হচ্ছে যেন রমেশ এসে কেরিয়ারে বসেছে।

মনে হতেই ইন্দুর খুব ভয় হল। সে সজোরে সাইকেল ছোটাতে লাগল।



আঁতকে উঠল ইন্দু। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না।

কিন্তু রমেশ এল কোথা থেকে? তবে কি রমেশ যে আমবাগানে ওর শীত লেগেছিল সেই আমবাগান থেকে এসে উঠল সাইকেলে? সাইকেলের স্পীড় সে আরও বাড়িয়ে দিলে!

সাইকেলের স্পীড বাড়ালে কি হবে, রমেশ তো সাইকেলেই বসে আছে! তার হাত থেকে পরিত্রাণ মিলবে কি করে?

সে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাইকেল চালিয়ে হোস্টেলে ঢুকে সাইকেলখানা প্রায় ফেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল।

শনিবার, হোস্টেল প্রায় খালি। খালি, প্রায়-নির্জন বারান্দা দিয়ে ছুটে গিয়ে সে নিজের ঘরের সামনে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ ভিতর থেকে।

কি মুশকিল! আজ তো ঘরে একমাত্র আছে নলিনাক্ষ।

সে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে—এই নলিনাক্ষ, দরজা খোল! শুনছিস! খোল তাড়াতাড়ি।

ভিতর থেকে খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হল! ইন্দুর মনে হল, আঃ, সে বাঁচল যেন। এখনও মনে হচ্ছে রমেশ যেন সাইকেলের কেরিয়ারে তার পিছনে বসে এসে, এখনও তার পিছন ছাড়েনি, তার পিছনে পিছনেই উঠে এসে এখনও তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে সে পিছন দিকে তাকাতে পারছে না! যাক, এবার রমেশ পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলেও নলিনাক্ষকে সামনে পাবে সে।

দরজাটা আস্তে আস্তে কোন শব্দ না করে খুলে গেল। খুলে দিলে নলিনাক্ষর



মোক্ষম তীর ছোঁড়েন খুড়ো, দৃষ্টি সিধে রেখে। [পৃঃ ৩৯৬

বদলে রমেশ উপাধ্যায়। খুলে দিয়ে দরজার পাল্লা দুটো দু'হাতে ধরে সে ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আঁতকে উঠল ইন্দু। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। সে ক'টা মুহূর্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন সাড় ফিরে পেতেই দরজার দিকে পিছন ফিরে দুড়দুড় করে ছুটে নেমে চলে গেল। একেবারে গেটের মুখে গিয়ে থামল সে যেখানে দারোয়ান জেগে বসেছিল।

তাকে অমনভাবে হাঁফাতে দেখে দারোয়ান জিজ্ঞাসা করলে—কিয়া হুয়া সাহাব?

ইন্দু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। অনেকখানি ভেবেও নিয়েছে। সে বললে—কুছ নেহি। শুনো, হম ঘর যার্তে হেঁ! তুমি নলিনাক্ষকে বলে দিও।

পকেট থেকে টাকা-পয়সা বের করে একবার দেখেও নিলে সে।

তারপর সে সেই কলেজ হোস্টেল থেকে ভাগলপুর স্টেশনে, সেখান থেকে ট্রেনে ওদের বাড়ি কহলগাঁও, কহলগাঁও স্টেশন থেকে কেমন করে নিজের বাড়ি পৌঁছেছিল সে কথা থাক। কহলগাঁও স্টেশনে সেই দুপুর রাত্রিতে নেমে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

বাড়ি পৌঁছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চাকরকে ডেকেছিল আস্তে করে।

আশ্চর্য ব্যাপার! চাকর যেন জেগেই বসেছিল তার জন্যে। কারণ দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে খুলে গিয়েছিল খুট্ করে। ইন্দু একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, যাক, এবার নিজের বাড়ির নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছে গিয়েছে সে। একবার পিছনটা দেখে নিলে সে। নাঃ, রমেশ তার পিছনে দাঁড়িয়ে নেই! যাক বাঁচা গেল! এবার তার হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছে।

দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। আবছা জ্যোৎস্নার আলোতে ইন্দু দেখতে পেলে তার সামনে চাকরের বদলে দাঁড়িয়ে আছে রমেশ দরজার দুই পাল্লায় দুটো হাত দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার করে ইন্দু দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

আমি আর নলিনাক্ষ খবর পেলাম দুদিন পর।

আমরা দারোয়ানের কাছে অবশ্য শুনেছিলাম যে ইন্দু সিনেমা দেখে এসে সেই রাত্রিতেই বাড়ি চলে গিয়েছে। কেন তা তো আর জানতাম না। আমি আর নলিনাক্ষ

দুজনেই পরামর্শ করছিলাম, চল একবার কহলগাঁও ঘুরে আসি, জেনে আসি ব্যাপারটা কি?

আমরা যাব যাব করছি এমন সময় ইন্দুর কাকা এসে হাজির হলেন হোস্টেলে। তাঁর মুখে শুনলাম ইন্দুর খুব জ্বর, ডিলিরিয়াম হয়েছে, বিকারে ভুল বকছে। তিনি বললেন—কোন কিছুতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ইন্দু! বাড়ির দরজায় চিৎকার করে অজ্ঞান হয়েছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছিল এখানে?

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। খবরাখবর করলাম, কিন্তু কিছু জানতে পারলাম না। তারপর ইন্দুকে দেখতে আমরা দুজনে ইন্দুর কাকার সঙ্গে গেলাম কহলগাঁও, ইন্দুদের বাড়ি।

ওদের বাড়ি পৌঁছে দেখলাম বাড়ির সবারই মুখে হাসি ফুটেছে। ইন্দুর জ্ঞান বেশ ভাল ফিরেছে, জ্বরও কমেছে। আমরা দুই বন্ধু যেতেই ও হাসিমুখে আমাদের দুজনের হাত নিজের দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে বললে—তোরা এসেছিস? আয়! দরজাটা ভেজিয়ে দে!

আমাদের মনে হল ও যেন কত আশ্বস্ত হয়েছে।

নলিনাক্ষ বললে—কি হয়েছিল রে তোর?

ইন্দু ওর হাত ধরে হেসে বললে—তুই সেদিন জেগে থাকলে তো কোন গোলমাল হত না।

তারপর আস্তে আস্তে টুকরো টুকরো করে ওর ব্যাপারটা শুনলাম আমরা দুজনে। গল্প শেষ করে সে বললে—তোরা এসেছিস, এবার আর কোন গোলমাল হবে না, আমি সেরে উঠব।

পরক্ষণেই সে দরজার দিকে তাকিয়ে কেমন হয়ে গেল। আমরা দেখলাম দরজাটা বাতাসের ধাক্কায় খুলে গেল। কিন্তু চিৎকার করে উঠল ইন্দু—ওই তো, ওই তো, দরজার দু পাল্লায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

কে দাঁড়িয়ে আছে তা আর বললে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান। সে জ্ঞান তার আর ফিরে এল না। সেই দিন রাত্রিতেই সে মারা গেল অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকতে বকতে।

* * * *

নিলয়ের গল্প শেষ হল।

সবাই, সবাইয়ের সঙ্গে আমিও চুপ করে গল্পটা শুনলাম। গল্প শুনে বললাম —কিন্তু তাতে কি হল? তুমি সেদিন ভোর বেলা অমন না জানিয়ে চলে গেলে কেন?

নিলয় আস্তে আস্তে বলল—না গিয়ে সেদিন আমার কোন উপায় ছিল না দাদা!

—কেন?

—বলি আপনাকে। মনটা এমনি খারাপ ছিল হাসপাতাল থেকে এসে, তার ওপর দোলনকে বকে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। সেই জন্যে সবাই বলা সত্ত্বেও আমি কিছু খেলাম না!

আমি বললাম—দেখ নিলয়, তুমি যদি কিছু মনে না কর তো বলি, তুমি সেদিন খুব ভয় পেয়েছিলে।

নিলয় চুপ করে রইল একটু। তারপর বললে—কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম না। সেদিনও আমি যে খুব ভয় পেয়েছিলাম সেটাও নিজের কাছে স্বীকার করতে চাইছিলাম না। কিন্তু ভয় আমি পেয়েছিলাম। কেবল অকারণে মনে হচ্ছিল যদি দরজার ওপাশে দেখতে পাই নলিনাক্ষ দাঁড়িয়ে আছে!

একটু চুপ করে থেকে নিলয় বললে—সেই ভয়-ভয় মন নিয়েই আমি দোলনকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। তবু ভয়-ভয় ভাবটা গেল না। কেবল মনে হতে লাগল, এর পর একে একে যা ঘটবে তা আমি জানি। আর সেগুলো ঘটবে, ঠিক ঠিক ঘটবে।

—তারপর জানেন, রাত্তির তখন বোধ হয় দেড়টা। আমার আবছা আবছা তন্দ্রা এসেছে। তারই মধ্যে বুঝতে পারছি দোলনটা আমার হাতের বেড়ের মধ্যে ঘুমের ভেতরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। আমি সেই আবছা তন্দ্রার মধ্যেও বুঝতে পারছি এখুনি টেলিফোনটা বাজবে।

—টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি উঠে টেলিফোনটা ধরতে চাচ্ছিলাম না। ভয়ে। আপনাদের বাড়ি, কত লোক আপনাদের বাড়িতে! আমি মাত্র দু তিন দিনের জন্যে এসেছি। অথচ টেলিফোনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হতে লাগল ও কলটা আমার, আমাকেই চাইছে, মেডিকেল কলেজ থেকে। আর কি খবর দেবে তাও আমি জানি!

—অনেকক্ষণ বাজার পর আমি উঠে টেলিফোনটা ধরলাম। কাকে চাইছে, কি বলবে আমি তো জানি! ওপাশ থেকে ভারী গলায় একজন বললে—মিঃ রায় আছেন,

নিলয় রায়? উত্তর দিলাম—বলছি, আমি মিঃ রায় বলছি! আমার গলা তখন কাঁপছে! ওপাশ থেকে ভারী গলায় উত্তর দিলে—মিঃ রায়, মিঃ দুবে এই পাঁচ মিনিট আগে মারা গেলেন। মিসেস্ দ্বিবেদী আপনাকে খবরটা দিতে বললেন। আমরা এই মেডিকেল কলেজেই আছি এই ভোর পাঁচটা পযন্ত।

—টেলিফোনটা ছেড়ে দিলাম। আবার কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লাম দোলনকে জড়িয়ে ধরে। ঘুম আসছে না। একবার মনে হল বাথরুমে গিয়ে মুখ, ঘাড়, মাথা ধুয়ে আসি। কিন্তু আমার কেবল মনে হচ্ছে দরজার ওপাশে নলিনাক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। ভাবতেই আমার কেমন কাঁপুনি আসছে। আপনি জানেন, আমি খুব ভীতু লোক নই। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধমক দিয়ে উঠে পড়লাম। ঝট করে ছিটকিনি নামিয়ে দরজা দুটো হাট করে খুলে দিলাম। কেউ নেই, নাঃ কেউ নেই কোথাও। তবু আমার মনে হল, কে যেন সট্ করে দরজার সামনে থেকে সরে গেল!

—যাক, তবু খানিকটা সাহস যেন ফিরে পেলাম। বাথরুমে গিয়ে হাত, মুখ, ঘাড় ধুয়ে, তোয়ালেতে মুখ মুছে আবার শুয়ে পড়লাম দোলনের গায়ে হাত রেখে। অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হলাম। আস্তে আস্তে ঘুমও এল। ঘুমের মধ্যে মনে হতে লাগল, নলিনাক্ষ আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

—হঠাৎ একসময় আমার ঘুম ভেঙে গেল ছ্যাঁৎ করে। কে যেন আমার গায়ে হাত দিলে। তারপরই মনে হল, নাঃ, এটা দোলনের হাত, আমার গায়ে পড়েছে ঘুমের ঘোরে। তবু মনে হতে লাগল, সে হাত দোলনের নয়।

—তারপর সে ঘুম কি তন্দ্রা না জেগেছিলাম জানি না। মনে হল নলিনাক্ষ আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। একা নলিনাক্ষ নয়; ওর সঙ্গে, ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দু আর রমেশ দুজনেই। নলিনাক্ষ যেন বললে—এই নিলয়, আমি চললাম। এই দেখ, তুই তো দেখলি না, ইন্দু আর রমেশ এসেছে আমাকে নিতে। তুই ভয় পাবি, তাই আর তোকে বেশী ডাকলাম না। জাগালাম না ভাল করে। আমরা চললাম রে।

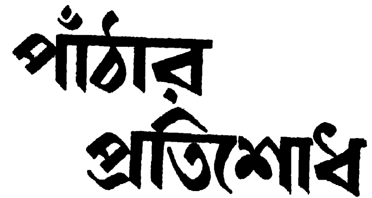
—আমার ঘুমটা এবার পরিষ্কার ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, একেবারে চুপচাপ। আমার আর দোলনের নিঃশ্বাসের শব্দ-সুদ্ধ শুনতে পাচ্ছি! হঠাৎ মনে হল, আমার ঘরের জানলার ওপারে বারান্দায় বাতাস উঠল। বাতাসে বোগেনভেলিয়ার ডাল, তারপর মাধবীলতার পাতাগুলো কাঁপতে লাগল,

ভুলতে লাগল। তারপর সে বাতাস গিয়ে লাগল বেলগাছের ডালে ডালে। বেলগাছটা ঝটপট করে উঠল। তারপর কি একটা পড়ল ঠক করে ডাল ভেঙে। মনে হল ডাল ভেঙে একটা বেল মাটিতে ফেলে দিয়ে ওরা জানিয়ে গেল ওরা তিনজনে এসেছিল, এবার চলে গেল বাতাসে ভর করে। অন্ধকারের মধ্যে বিছানায় শুয়েই শুনতে পেলাম, সেই ঝড়ো বাতাসটা পার্কের বাদামগাছের মাথায় দোলা দিয়ে চলে গেল, মিলিয়ে গেল অসীম শূন্যে আধভাঙা চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নার পথ ধরে।

—সকালে, খুব ভোর বেলা উঠে দেখলাম, বাগানে বেলগাছের তলায একটা ডালসুদ্ধ কাঁচা বেল পড়ে আছে। মনে হল, ওরা জানান দিয়ে গেল, ওরা এসেছিল, ওরা চলে গিয়েছে।

● **শিল্পী বাহাদুর**





গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মহিমবাবু পুলিসে বড় চাকরি করতেন—সে সময় সবাই তাঁকে ভয় করত, খোশামোদও করত। তাঁর কড়া মেজাজের কথা গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর যখন অবসর নিলেন তখন আর কেউ তাঁর তোষামোদ করতে আসত না, আগের মতো গালাগাল খেয়ে মাথা নীচু করে থাকত না। উনি কারও ওপর কড়া মেজাজ দেখালে তারাও চড়া চড়া জবাব দিত।

এইসব দেখে মহিমবাবুর মনে কেমন ধারণা হ'ল মানুষ বড় বেইমান। উনি যে কোন উপকার করেছেন, তারা সে কৃতজ্ঞতা মনে রাখে নি—এমন নয়। ওঁর মেজাজ তখন সহ্য করত এখন করে না—এইটেই বেইমানী বলে মনে হ'ল তাঁর।

যেখানে একদিন যথেষ্ট দাপটে কাটিয়েছেন লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে হাঁটতেন বলতে গেলে—সেখানে এখন কেউ পুঁছবে না—এ অবস্থায় থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল এই ভেবে মহিমবাবু তাঁর পৈতৃক বাড়ি বেচে কলকাতা শহরের মায়া ত্যাগ ক'রে চলে এলেন শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে—এইখানে। অনেকখানি জমি নিয়ে বিরাট বাগান করলেন, লোহার ফেন্সিং বা চ্যাপটা সিক দিয়ে

ঘিরলেন। বাগানের ঠিক মধ্যিখানে বাড়ি—রাস্তা কিংবা আশপাশের বাড়ি থেকে এত দূরে যে কারও মুখ চোখে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। (সাধ্যমতে কারও মুখ দেখবেন না এই প্রতিজ্ঞা)। বাড়িও বড়, বাগানে পুকুর, টিউবওয়েল কিছুরই অভাব নেই। দেদার জমি—ফলফুলুরী সবজির বাগান করবেন। মানে বাইরে যাবার বিশেষ দরকারও রইল না। পয়সা অনেক করেছিলেন—বাড়িও বেশ বড় দেখেই করলেন—যদিও সে বাড়িতে বাস করার লোক বিশেষ নেই। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—তারা বিদেশে থাকে। ছেলেরও পুলিসের চাকরি, বদলির কাজ। সে বাইরে বাইরে ঘোরে বলে তার ছেলেকে মহিমবাবুর কাছে রেখে গেছে—এইখানেই ইস্কুলে পড়ে। অতবড় বাড়িতে কর্তা গিন্নী আর এই নাতি, আর থাকত এক বিধবা ভাগ্নী ঊষা, কোন কুলে কেউ নেই বলে এখানে বিনা মাইনের ঝিয়ের কাজ করত। এছাড়া যা ঠাকুর, চাকর, মালী। এখানকার এক ঠিকে ঝি এসে বাসন মেজে ঘর মুছে যেত।

বাগানের শখ ছিল খুব, হাতে বিশেষ কাজও তো নেই—ঐ নিয়েই থাকতেন। সকাল বিকেল বাগানে গিয়ে মালীর সঙ্গে লেগে থাকতেন—কখনও কখনও নিজের হাতেও খুরনি বা নিড়ানি নিয়ে কাজে লেগে যেতেন। সেদিন হয়েছে কি, ফুলগাছে ঠেকনো এবং এক রকমের লতানে গাছের চারায় বেড়া দেবার জন্যে আগের দিন এক ঘরামি ডেকে বাঁশ চিরিয়ে বেড়া দেওয়ার মতো ক'রে পাতলা বাখারি করিয়ে রেখে-ছিলেন, আবার মাটিতে পোঁতবার জন্যে বাখারির একদিকটা সরু ক'রে বল্লমের মতো ধারালো করিয়েছিলেন—সেইগুলো তুলে তুলে দেখছেন ঠিক মতো কাজ হয়েছে কিনা, হঠাৎ দেখেন পায়ের কাছে কি একটা নড়ছে, কালোপানা। বাখারির দিক থেকে চোখ সরিয়ে দেখেন—একটা ছোট ছাগলছানা, পরমানন্দে তাঁর সিজন্‌-ফ্লাওয়ারের গাছগুলো খাচ্ছে।

জমির চারিদিকে ঘেঁষ ঘেঁষ ক'রে লোহার বেড়া দেওয়া—সেখান দিয়ে গরুছাগল ঢুকতে পারবে না, এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। এত ছোট বাচ্চা ছাগলের কথা ভাবেন নি কখনও। বিশেষ লোহার বেড়ার নীচে একহাত উঁচু ইটের পাঁচিল আছে। অতটা লাফিয়ে উঠল কী ক'রে এইটুকু বাচ্চা?

বিষম রাগ হ'ল তাঁর। এই ফুলগুলো তিনি গত দুবছর ধরে ফোটাবার চেষ্টা করছেন—কিন্তু মাটিতে অত্যধিক জল থাকায় গাছগুলো চারা অবস্থাতেই মারা যায়। এই বছর কি ভাগ্যি একটু বড় হয়েছে। সেইগুলোই মুড়িয়ে খেয়ে গেল পাজী ছাগলটা।

আশপাশে এত গাছ আছে খেতে পারল না। ছাগলে মুড়ুলে সে গাছ আর কিছুতেই হয় না—এ কথা কে না জানে! তাঁর ঐ ডানদিকে ভট্‌চাযরা থাকে—এদিকে তো বামুন—হাঁস ছাগল এমনকি মুরগীও পালে। লুকিয়ে ডিম বিক্রি করে তাও শুনেছি। তা সে যা খুশী করুক—এসব একটু সামলে রাখতে পারে না!

রাগটা ঐ ভট্‌চাযদের ওপরই বেশী হ'ল—কিন্তু তারা হাতের কাছে নেই—এটা আছে, এখনও মনের সুখে গাছে খেয়ে যাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপও নেই যে তাকে একজন এই-ভাবে লক্ষ্য করছে—সমস্তটা রাগ ওর ওপরই গিয়ে পড়ল। এর ওপর দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন তিনি। বুঝবে কত ধানে কত চাল।

মহিমবাবু সেই বাখারিটাই বাগিয়ে ধরলেন বল্লমের মতো, তারপর সজোরে বিঁধিয়ে দিলেন ছাগলটার গায়ে। সামনের ডান পাটার ওপরে গর্দান ও পায়ের মাঝামাঝি জায়গায় বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। বাচ্চাটা একবার 'ব্যা' করে উঠেই চুপ করল। মহিমবাবু বাখারিটা বার করে নিয়ে মাটিতে রক্তটা মুছে নিলেন, তারপর মরা ছাগলটার দুটো পা ধরে বেড়ার ধারে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ওপারে ফেলে দিলেন, রাস্তার ওপরে।

মালীটা ওদিকে কাজ করছিল—সে ততক্ষণে এসে পৌঁচেছে, মালিকের কাণ্ড দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল—একটিও কথা না বলে পা পা ক'রে পিছিয়ে গেল আবার।

মহিমবাবু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ফুল গাছের কেয়ারির খানিকটা মাটি যে রক্তে লাল হয়ে উঠল তা নিয়েও মাথা ঘামালেন না, যেমন বাখারিগুলো পরীক্ষা করছিলেন, ঘরামিটা ফাঁকি দিল কিনা দেখছিলেন—তেমনিই দেখে যেতে লাগলেন। যে অন্যায় করেছে তাকে শাস্তি দিয়েছেন—তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে, এই হ'ল তাঁর মনের ভাব।

কেদার ভট্‌চাযের ছাগল ওটা। তিনি হাঁস মুরগী পালেন রোজগারের জন্যে, কিন্তু ছাগলটা রেখেছেন নিজের দরকারে। নাতি দুধ খায়। গোরু পোষবার ক্ষমতা নেই, অথচ একটু দুধের দরকার তাই ছাগল রাখা। বাচ্চা হলে অবশ্য এক আধটা বেচেছেন—তবে আর একটু বড় ক'রে। এটা নেহাতই কচি বাচ্চা, তার ওপর নাতিটার বড় প্রিয়—সে দিনরাত ওর সঙ্গেই খেলা করে, এটা বড় হ'লেও বেচতে পারতেন না বোধহয়।

সেই ছাগলছানার এই পরিণাম দেখে তিনি দুঃখিত হলেন খুবই—কিন্তু একে অত বড় লোক, বিস্তর চাকর দারোয়ান নিয়ে বাস করেন, তায় এককালের বড় পুলিস অফিসার—কিছু বলতেও সাহসে কুলল না। ওঁর নাতিটা কেঁদে কেটে সারা হল—সেদিন দুপুরে খাওয়ানো পর্যন্ত গেল না—মরা ছাগলছানাটাকে কোলে করে বসে রইল—তবে কী আর করা যাবে, কেদার ভট্চায যতটা পারলেন তাকে সান্ত্বনা দেবার ভোলাবার চেষ্টা করলেন—এই পর্যন্ত। তাই বলে অত-বড় লোকের সঙ্গে তিনি তো আর ঝগড়া করতে যেতে পারেন না।



আস্তে আস্তে গাছে উঠে গেল অশোক। [পৃঃ ৪৩৪

সেইদিনই বেলা তিনটের সময় মহিমবাবুর নাতি অশোকের কী শখ হয়েছিল—বেড়ার ধারে বড় কদমগাছটা থেকে ফুল পাড়বে। সেদিন ইস্কুলের ছুটি ছিল—এখানে নয়, নিত্য গাড়ি গিয়ে অশোককে তিন মাইল দূরের বড় ইস্কুলে দিয়ে আসত, আবার নিয়ে আসত, এখানে কারও সঙ্গে মিশতে দিতেন না মহিমবাবু. ছুটির দিনগুলো তাই আর কাটতে চাইত না তার। সেজন্যে অবশ্য মহিমবাবু বাড়িতে যতরকম খেলা সম্ভব সবরকমই আয়োজন রেখেছিলেন, গান শেখাবার মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন, যাতে বিকেলের ঘণ্টা দুই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়—তবু দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে? খেলার সঙ্গী না থাকলেও অশোক বাগানে বা মাঠে খেলে বেড়ায় একা একা।

এই কদম গাছটার একটু বিশেষত্ব ছিল—বর্ষার সময় ছাড়াও, বারমাসেই দুটো একটা ফুল ফুটত। এটা শরৎ কালের শেষ—তবু অন্ততঃ দশ বারোটা ফুল ফুটে আছে—তা নীচে থেকেই দেখা যাচ্ছে। অশোক এদিক ওদিক চেয়ে—দাদু কাছাকছি কোথাও নেই

দেখে আস্তে আস্তে গাছে উঠে গেল। গাছে চড়াটাও তার শেখবার কথা নয়—মানে মহিমবাবু জানলে শিখতে দিতেন না—আপনি আপনিই চেষ্টা করে শিখেছে দাদুকে লুকিয়ে।

গাছে উঠে অশোক বুঝল—ফুলগুলো বড় পাজী, সরু সরু ডালের ডগায় ফুটে আছে। এত উঁচুতে যে নীচে থেকে লগি দিয়েও পাড়া যায় না, আবার এখান থেকে হাত বাড়িয়ে নেবে তাও সম্ভব নয়। এক এখানে ওঠার পর কেউ যদি লগিটা হাত বাড়িয়ে দিত তো কথা ছিল—কিন্তু তখন কথাটা মনে পড়ে নি। এখন এখান থেকে কাউকে ডাকতেও সাহস হ'ল না। তাহলেই দাদু টের পেয়ে যাবেন। অগত্যা যতটা সম্ভব—মাঝারি ডালগুলোয় পা দিয়ে ওপরের ডালের পাতা ধরে সরু ডালগুলো কাছে টেনে এনে, ফুল পাড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

আর তারই মাঝে একসময়—ঐ ডালের ওপরই আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টায় প্রাণপণে নিজেকে লম্বা ক'রে ওপরের ডালের পাতা ধরবে এই ইচ্ছা ছিল—একসময় প্রায় লাফ দেবার মতো ক'রেই পাতার দিকে হাত বাড়াল—সে পাতাও ধরা গেল না, পা-ও গেল ফসকে।

সেখান থেকে নীচে সেই লোহার বাখারি মতো রেলিং-এর ওপর—যার মুখগুলো বর্শার মতো সরু ও ধারালো করা, ছিঁচকে চোর বা পাড়ার ছেলেরা যাতে ফুল চুরি করতে আসতে না পারে—মাথা নীচু করে পড়ার ফলে—বুক আর কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল—ঠিক যেখানে ছাগল ছানাটাকে বিঁধে ছিল, ঠিক সেই খানটাতেই।

সে তবু একবার 'ব্যা' ক'রে চেঁচিয়ে উঠে ছিল, অশোক তাও পারে নি বোধহয়। অন্ততঃ কেউ শোনে নি।

কেউ সেদিকে ছিল না। সবাই বিশ্রাম করছে। আধঘণ্টারও পরে মহিমবাবুরই ঘুম ভেঙে বাইয়ের বারান্দায় এসেছিলেন—দূর থেকে সাদামতো কী একটা রেলিংএ ঝুলছে দেখে—চোর মনে ক'রে জোর পায়ে তেড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখেন—ঐ কাণ্ড!

চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এল—মায় পাড়ার লোক পর্যন্ত। কদম ফুল, ছোট ছোট ডাল আর পাতা ছড়ানো দেখে বুঝতে বাকী রইল না—কেন কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল অশোক; আর কী করে এ অবস্থা হ'ল।

কিন্তু কারণ জেনে আর তখন লাভ ছিল না—বেচারী অশোক তার অনেক
াগেই মারা গেছে।

ফুটফুটে মিষ্টি স্বভাবের ছেলে অশোক—তার এই শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই খুব দুঃখিত হ'ল। ঝি চাকর মালী সুদ্ধ কেঁদে আকুল। ঠাকুমা পিসীমাদের তো কথাই নেই। মামার বাড়ি থেকেও হাহাকার করতে করতে ছুটে এল সবাই—ছেলে বউ এসে মহিমবাবুকে একরকম তিরস্কার করলেন—ছেলে রাখার শখ অথচ নজর রাখার ক্ষমতা নেই বলে—কিন্তু সে কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কারণ তাঁরা তখন শোকে পাগলই হয়ে গেছেন বলতে গেলে—কিন্তু মহিমবাবুর চোখে এক ফোঁটা জল কেউ দেখতে পেল না। তিনি চেঁচালেন না, হায় হায় করলেন না—কাঁদলেন না, অদৃষ্টকে গালি-গালাজ করলেন না—পাথরের মতো হয়ে গেলেন একেবারে। কোন কথার উত্তর দেন না—অপরের কথা কানে যাচ্ছে কিনা তাও বোঝা যায় না। এত যে সবাই চারিদিকে হাহাকার করছে, কাঁদছে মাথা কুটছে—তাও যেমন শোনেন না, তেমনি ছেলে বউ এবং আরও কেউ কেউ যে তাঁকেই দোষ দিচ্ছে সেদিকেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এর মধ্যে ছাগলছানার ব্যাপারটাও এদের কানে গেছে—মালী চাকররাই বলে থাকবে, তাদের বিশ্বাস এটা ভগবানেরই শাস্তি—সে কথাও তুলল কেউ কেউ। মহিমবাবুর ছেলেমেয়েরাও দোষ দিল কিন্তু তারও কোন উত্তর দিলেন না। দোষ স্বীকারও করলেন না, কাটাবারও চেষ্টা করলেন না। চুপ ক'রে শুনেই গেলেন শুধু। তারপর সব গোলমাল চেঁচামেচি কান্নাকাটি একসময় থিতিয়েও গেল। মেয়েরা যে যার বাড়ি চলে গেল, ছেলে-বউও কর্মস্থানে ফিরল—অশোকের মামারা তো শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্তও অপেক্ষা করেন নি—আবারও সেই বুড়ো আর বুড়ী পড়লেন একা। আর অবশ্য সেই ঊষা—সে তো বেশির ভাগ সময় ভাঁড়ারেই ব্যস্ত থাকে।

ছাগলছানার ব্যাপারটা নিয়ে যত লোক মহিমবাবুকে দোষ দিয়েছে তার মধ্যে একজন মহিমবাবু স্বয়ং। মানুষের মনে ছোটবেলা থেকেই একটু একটু করে ন্যায় অন্যায় বোধ জেগে ওঠে। এ কাজটা করা উচিত নয়। এটা করা কি বলা ঠিক হ'ল না; এটা খুব অন্যায় হয়ে গেল—মানুষ যখন কোন দোষ কি অন্যায় করে তখন প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে আর একটা কোন লোক যেন ঐ কথাগুলো বলে। একে বলা হয় মানুষের

বিবেকবোধ। এই বিবেক প্রত্যেকেরই মনে আছে, সে ঠিকসময় তাদের সাবধানও করে দেয়—তবু মানুষ অন্যায় করে, যখন করে তখন জোর করে সেই বিবেকের দিক থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখে।

মহিমবাবুরও একটা বিবেক ছিল বৈকি।

যে সময় ছাগল ছানাটাকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে মারেন তখনও সে বিবেক যে বাধা দেবার চেষ্টা করে নি তা নয়, কিন্তু রাগে পাগল হয়ে গিছলেন বলেই সে দিকে কান দেন নি। এখন ফাঁক পেয়ে সে যা-তা বলতে লাগল। বাইরের লোকের সঙ্গে সেও বলতে শুরু করল, 'এই জন্যেই তোমার নাতিটা অমন বেঘোরে মারা গেল। তোমার পাপেই তোমার বংশনাশ হ'ল।'

ঘরে বাইরে এই অভিযোগ শুনতে শুনতে যেন ক্ষেপে গেলেন মহিমবাবু।

আসলে ঐ যে চুপ ক'রে ছিলেন—তার মানে তখন থেকেই প্রচণ্ড রাগ পুষে রেখেছেন। এত রাগ হয়েছিল বলেই অমন চুপ করে গিছলেন। রাগটা হওয়া উচিত নিজের ওপর কিংবা বড়জোর বরাতের ওপর, কিন্তু মহিমবাবুর সবই উলটো—তিনি কেদার ভট্চাযদের ওপরই রেগে উঠলেন। ওরা যদি ছাগল না পোষে, তাহলে তো আর ঐ ছানাটা এখানে আসে না, ওঁর গাছও খায় না। বামুনের ছেলে হাঁস, মুরগী, ছাগল পোষা কি? সে তো তাদের দেশে নিকিরীরা পুষত—ছেলেবেলায় দেখে ছিলেন। এখানেও দেখছেন ঐ ধরনের লোকরা পোষে। বামুন কায়েত কখনও ওসব কাজ করে!

যত ভাবেন তত রাগ বাড়ে। শেষে আর যেন থাকতে পারেন না—কেবলই ভাবেন কি করে এর শোধ তুলবেন, কেমন ক'রে কেদার ভট্চাযদের সর্বনাশ করবেন। কদিন ধরেই এই একটা কথা ভাবছেন, কোন উপায় হয়ত মাথায় যাচ্ছে কেদারবাবুদের ওপর শোধ তোলবার—আবার সেটার মধ্যে খুঁত দেখছেন, সেটা বাতিল ক'রে দিচ্ছেন মনে মনে—আবার অন্য উপায়ের কথা ভাবার চেষ্টা করছেন; এই সব তোলাপাড়া করছিলেন বলেই কারও কথা তাঁর কানে যায় নি, তিনিও কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি।

নিজের কোন অনিষ্টের জন্যে, বিশেষ যদি নিজের দোষেই সে অনিষ্টটা হয়—অপর কাউকে দায়ী করলে, আর প্রায়ই সেটা করে মানুষ, নিজের দোষটা কমিয়ে দেবার জন্যে—যত সময় যায় তত নিজের দোষ বা দায়িত্বের কথাটা মন থেকে মুছে

যায়—ক্রমশঃ সেই লোকটার অপরাধই সত্যি বলে মনে হয়, আর সেটা বিরাট হয়ে ওঠে। মহিমবাবুরও ক্রমশঃ মনে হতে লাগল যে কেদারবাবুরা ইচ্ছে করেই এটা করেছেন। ওঁকে দিয়ে ঐ গর্হিত কাজটা করিয়ে নেবেন বলেই ছাগলছানাটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা, নইলে ঐটুকু বাচ্চার সাধ্য কি যে অতটা উঁচুতে উঠে বেড়া গলে আসে। শেষে এও মনে হতে লাগল মহিমবাবুকে বিপদে ফেলার জন্যেই ওঁরা ছাগল পুষেছেন।



একটা ন্যাকড়া নিয়ে পাকিয়ে লম্বা সলতের মতো করলেন মহিমবাবু।

আত্মীয়-স্বজন সবাই চলে গেলে, যখন ক্রমশঃ বাইরের লোক দুর্ঘটনার কথাটা ভুলেই এল তখন মহিমবাবু মন ঠিক ক'রে ফেললেন, আগুন দিয়ে ওদের পুড়িয়ে মারবেন। কেদারবাবুরা গোরু পোষেন না—সুতরাং গোরুমারার ভয় নেই, আর যা আছে, ছাগল হাঁস মুরগী সবসুদ্ধ যমালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

মন স্থির করলেন। এবার কাজটাও করা দরকার। অন্য লোক হ'লে আর কাউকে টাকা দিয়ে হাত করত, সেই লোকটাকে দিয়েই কাজ হাসিল করত। কিন্তু মহিমবাবু অত বোকা নন। দীর্ঘদিন—চল্লিশ বছর পুলিসে কাজ করেছেন, তিনি জানেন, এ সব কাজে পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। প্রথমতঃ লোকটা যদি বোকা হয়—এমন সব চিহ্ন রেখে আসবে যাতে দোষীকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। নইলে পেট আলগা হয়ে হয়ত কাউকে বলব না মনে করেও দু একজনকে বলে ফেলবে, তা থেকে কথাটা ক্রমশঃ

ছড়িয়ে পড়বে। আরও যেটা ভয়ের কথা—যে করবে সে তখনকার মতো একটা মোটা টাকা পেয়ে খুশী হ'লেও পরে আরও টাকা চাইবে—না পেলে লোককে কি পুলিসকে বলে দেব বলে ভয় দেখাবে।

না, তিনি অত কাঁচা কাজ করবেন না। যা করবেন, একাই করবেন। কাউকে সাক্ষী না রেখে, কাউকে না জানিয়ে।

কাউকেই জানালেন না তিনি। এমনকি স্ত্রীকেও নয়। একটা বোতলে ভরতি করে কেরোসিন তেল ঢেলে নেওয়া এমন কঠিন নয়। এ ছাড়া তিনি একটা ন্যাকড়া নিয়ে পাকিয়ে লম্বা সলতের মতো করলেন, সেটাতে মোমবাতির মোম মাখিয়ে নিলেন। দেশলাই ফস করে জ্বাললে অনেকদূর থেকে লোক দেখতে পায়—সিগারেটের লাইটার যোগাড় করলেন একটা' সব ঠিক করে গভীর রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ করে ঠিক সময় লোক দেখানোর জন্যে শুতেও চলে গেলেন। স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি ঘরে শুতেন। স্ত্রী আর ঊষাও শুয়ে পড়লেন, ক্রমশঃ তাঁর নাক ডাকতে শুরু হ'ল—বোঝা গেল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। মালী ঠাকুর চাকররাও একে একে ঘুমিয়ে পড়ল। মহিমবাবু জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, দূর গ্রামে কোথাও কোন বাড়িতে আলো দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার আলোও বেশির ভাগই নেভানো, মানে বাল্‌ব্ চুরি গেছে—দু একটা যা জ্বলছে তা বহুদূরে।

মহিমবাবু আস্তে আস্তে উঠে খালি পায়ে বাইরে এলেন। বাড়ির সব চাবিই তাঁর কাছে জমা দিয়ে শুতে যেতে হ'ত চাকরদের—সেদিক দিয়েও কোন অসুবিধা নেই। বাগানের কাজ করেন রবারের জুতো পায়ে, সেটা বাইরের রকে পড়ে থাকে—বেরিয়ে এসে জুতোটা পায়ে দিলেন, রবারের জুতোর আওয়াজ হয় না—তারপর দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দিনের বেলা দরজার কবজায় তালায় তেল দিইয়েছেন—জং ধরার নাম করে—কোথাও এতটুকু শব্দ হ'ল না তাই।

মতলব ঠিক করাই ছিল।

গিয়ে আগে এই মোম লাগানো সলতেটা জ্বালিয়ে পেছনের একটা বেড়ার গায়ে লাগিয়ে দেবেন; ওদিকটা অনেক গাছ-গাছালি—অন্য কোনও বাড়ি থেকেও দেখা যাবে না, মৃদু মোমের আলো। তারপর ঐ বোতলের কেরোসিনটা তাড়াতাড়ি চারিদিকের

বেড়ায় বাড়ির দরজা জানলায় ঢালতে ঢালতে এগিয়ে যাবেন ঐ সলতেটার দিকে, কাছাকাছি গিয়ে সলতেটার গোড়া পর্যন্ত ঢেলে ভিজিয়ে দিয়ে দ্রুত ফিরে আসবেন নিজের বাগানে। সলতেটা জ্বলতে জ্বলতে গিয়ে ঐ তেলে ভিজনো বেড়া পর্যন্ত পৌঁছলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে—সমস্ত কেরোসিন তেলটা, একেবারে বেড়া আগুন লেগে যাবে, বাড়িটার চারিদিক ঘিরে—কারও পালাবার কোন পথ থাকবে না।

সব তো ঠিক—কিন্তু সলতেটা লাগিয়ে জ্বালতে যাবেন, কী একটা এসে তাঁর পায়ে ধাক্কা দিল। অপরাধী ষড়যন্ত্রকারীর মন ভয়ে চমকে উঠে নিজের দিকে চাইতেই তাঁর বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগল, মনে হ'ল দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল এক নিমেষে।

লাইটার ধরাই ছিল, দেখার কোন অসুবিধা হল না। নীচু হয়ে আলো ফেললেন ও।

একটা ছাগলছানা।

ছাগলছানাটাই এসে ঢুঁ মারছে তাঁকে।

কিন্তু এ কী।

এ যে অবিকল সেই ছাগলছানাটা! সেই কপালে সামান্য একটু সাদা দাগ। একটা কান একটু কাটা।

এটা কোথা থেকে এল?

একে তো তিনি নিজে হাতে মেরেছেন এই মাসখানেক আগে।

যতদূর শুনেছেন আর কোন বাচ্চা ছাগল তো কেদার ভট্চাযের নেই। তবে কি সেটারই যমজ ভাই?

কিন্তু—ঐ একটুখানি সময়ের মধ্যেই ঢুঁদে পুলিস অফিসারের বুদ্ধি তার কাজ করে যাচ্ছে—ছাগলছানারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়, তার যমজ হ'লে এই একমাসের মধ্যে অনেকখানি বেড়ে যেত।

তবে?,

তা, যাই হোক, ছাগলছানা ছাড়া তো কিছু নয়। আবারও মনে বল আনলেন মহিমবাবু!

বড্ড জ্বালাতন করছে বেটা, ক্রমাগত ঢুঁ মারছে তাঁর পায়ে। তিনি মারলেন টেনে এক লাথি। সে লাথিতে না মরুক—অনেক দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ার কথা।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। মনে হ'ল এক ইঞ্চিও নড়াতে পারলেন না তিনি ছাগলটাকে।

আর—

এ কি! চোখকে যে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। ছাগলটা যেন একটু একটু করে বড় হচ্ছে না?

লোকে বলে গোখরো সাপ যখন ফণা ধরে দোলে—তখন তার চাউনিতে মানুষের কেমন যেন নেশা লাগে। সেও এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর চোখের দিকে—পালাতেও পারে না, সাপটাকে মারবারও চেষ্টা করতে পারে না।

মহিমবাবুরও সেই অবস্থা হ'ল।

লাইটারটা নিভে গেছে—কিন্তু কোথা থেকে যেন একটু আলোর মতো এসে পড়েছে সেই জায়গাটাতে। তাতেই তিনি দেখছেন, ছাগলটা নিমেষে নিমেষে বাড়ছে।

প্রথম বড় বাচ্চা, তারপর সাধারণ ছাগল, পরে দেখতে দেখতে রামছাগল, ক্রমে একটা বাছুর, আরও একবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গোরুর মতো হয়ে উঠল—

মনে হ'তে লাগল মহিমবাবুর, সেই প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো ছাগলটার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। আর একটু পরে মনে হ'ল সে চোখ দিয়ে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। সে আগুন যেন ওঁকে এখনই ঘিরে ফেলবে।

এবার একটা বড় ঘোড়ার মতো হয়ে গিয়ে শিং বাগিয়ে তাঁকে গুঁতোতে আসছে—

আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে মহিমবাবু। বিকট চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালালেন। পিছনে যে ঐ দৈত্য কিংবা রাক্ষস কিংবা ভূতটা তেড়ে আসছে—সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। এখনই মেরে ফেলবে তাঁকে।

গ্রাম-জাগানো গলাফাটানো সে চিৎকারে সবাই উঠে পড়ল। ওঁর বাড়ির লোকও। তারা দেখল কেউ কোথাও নেই, উনিই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন আর চেঁচাচ্ছেন আঁ-আঁ ক'রে।

কোন মতে ফটক পেরিয়ে বাগানের রাস্তাটুকু পার হয়ে ওঁর বাইরের বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দড়াম ক'রে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে।

কেউই কিছু বুঝল না, কেউই কিছু দেখে নি। পরের দিন কেরোসিনের বোতলটা আর পলতেটা দেখে, কেদারবাবুরা আন্দাজ করেছিলেন মহিমবাবুর শয়তানী মতলবটা।

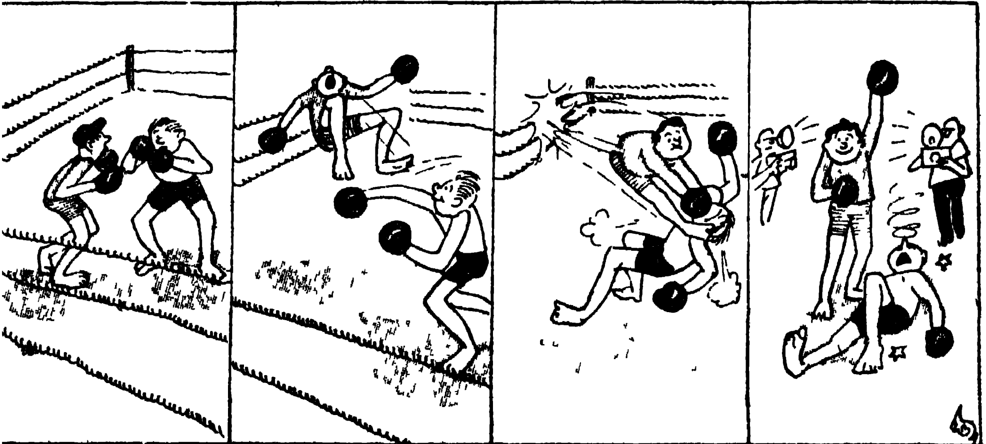
কিন্তু এর কোন শাস্তি দেওয়া গেল না আর।

জ্ঞান হ'ল বটে, কিন্তু জ্ঞান হওয়া তাকে ঠিক বলে না। কারণ সেই থেকেই উন্মাদ পাগল হয়ে আছেন মহিমবাবু। কাউকে চিনতে পারেন না, কারও সঙ্গে কথা বলেন না—শুধু থেকে থেকে আঁ-আ করে বিকট চিৎকার ক'রে ওঠেন—দিন রাত সবসময়ই। ছেলেমেয়েরা ডাক্তার দেখিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেছে ভাল করার, কোন ফল হয়নি।*

---

* গল্পটা কিন্তু অনেকখানিই সত্যি। তোমরা বিশ্বাস করো চাই না করো।

● কপালে থাকলে কিনা হয়





ত্রিমূর্তি

[জে. ব্লিশ-এর "দ্বীপ" অবলম্বনে]

শ্রীবৈজ্ঞানিক

কাপ্তেন অবাক্। টেলিভিশনে দরাজ গালাগালি দেওয়ার পরে ডানা কী বলে আবার আফিসে এল আজ?

দানা লী। বাপ ছিল ওলন্দাজ, মস্ত লোক। এ অঞ্চলটা দখল করবার সময় সে ছিল অন্যতম সেনানায়ক। তারপর সেই হয় রেসিডেন্ট। বলতে গেলে রাজাই।

হ্যাঁ, বাপ ছিল শ্বেতাঙ্গ, মা তা নয়। তার বাড়ি এই বালি দ্বীপেই। গায়ের রং বাদামী। কিন্তু রূপ—

তার রূপ যে কী অসামান্য ছিল, তা আজকের এই তরুণী ডানাকে দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এরও রং বাদামী, চোখ-মুখে বালিনিজ আভিজাত্যের ছাপ, তার উপরে কী যে একটা অনির্বচনীয় জৌলুস! রৌদ্র-ঝলমল তরোয়াল যেন একখানা।

এই জৌলুসের উৎস আবার ডবল। যৌবন-সুষমা ত বটেই, তার উপরে আবার বুদ্ধির দীপ্তি। বাপ তাকে শিক্ষা দিয়েছিল ইওরোপীয় ধাঁচে। সে-শিক্ষা ষোল-আনা

সার্থক হয়েছে ডানার ক্ষেত্রে। টেলিভিশনে ওকে দেখবার জন্য, ওর কথা শুনবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক উন্মুখ হয়ে আছে।

কাপ্তেন রবিন উইনবুম অবাক্ হতে পারেন, কিন্তু অভদ্র হতে পারেন না। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে দিয়েছেন। ডানা বসেছে, পায়ের উপরে পা তুলে দিয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করছে। কাপ্তেন কীভাবে তাকে অভ্যর্থনা করেন, তাই দেখবার জন্য।

কাপ্তেনের কথা কইতে দেরি হল। তার কারণ অন্য কিছু নয়। তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল ডানার চুলের দিকে। নীলচে কালো কেশপাশে ইলেকট্রিকের আলো খেলছে। যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী।

যাহোক, অবশেষে তিনি কথা কইলেন—"খুব যে খুশী হয়েছি, তা বললে সত্যের অপলাপ হবে মিস লী! আপনার চাবুকের ঘা থেকে এখনও রক্ত ঝরছে আমার সর্বাঙ্গে। কিন্তু সে কথা থাকুক, কেন এ-শুভাগমন, সেইটেই বলে ফেলুন সোজাসুজি।"

"সমালোচনাটাকে ব্যক্তিগত বলে ধরে নিয়েছেন কেন? সরকারী কাজে গাফিলতি দেখলে দু'কথা বলতেই হয়। আপনি যখন বিভাগীয় কর্তা, খানিকটা দোষ আপনার মাথায় এসে পড়বে ঠিকই। কিন্তু, বুঝতেই ত পারছেন, আক্রমণের লক্ষ্য আপনি নন।"

"খুব যে সান্ত্বনা পেলাম, তা অবশ্য নয়"—বললেন উইনবুম—"তবু ধন্যবাদ। কিন্তু আগমনের উদ্দেশ্যটা— ?"

"বলি এইবার। ইণ্টারস্টেলার মানে আন্তর্নক্ষত্র বার্তা-বিনিময় সংস্থা এদের নাম কখনও শুনেছেন নাকি?"

মাথা নাড়লেন উইনবুম—"বেসরকারী গোয়েন্দা অফিস-টফিস হবে। নাম শুনে তাই ত মনে হয়। কিন্তু নক্ষত্রলোকে গোয়েন্দাগিরি ব্যাপারটা ত সোজা নয়।"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু চিঠি যা লিখেছে আমাকে, তা আনাড়ী গোয়েন্দার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। খানিকটা শোনাতে চাই আপনাকে সেই চিঠির।"

পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে ডানা পড়তে লাগল—

"টেলিভিশন টিপ্পনীকার হিসেবে নাম আছে আপনার। শ্রোতাও আপনার অনেক, দায়িত্বও সেই অনুপাতে প্রচুর। কাজেই সংবাদের উৎসগুলি আপনার খুবই যাতে নির্ভরযোগ্য হয়, তা দেখতে হবে আপনাকে। আমাদের সঙ্গে প্রাথমিক কিছু কারবার আপনি করে দেখুন, এই আমাদের অনুরোধ। এর দরুন খরচা আপনার হবে না।

আমরা শুধু এইটিই প্রমাণ করতে চাই প্রথমে যে সংবাদের যোগানদার হিসেবে পৃথিবীতে আমরাই শ্রেষ্ঠ। নমুনাস্বরূপ তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী আমরা আপনাকে শোনাচ্ছি। "হারকিউলিস" ও 'থ্রী-গোস্ট' এলাকার মহাকাশে অদূর ভবিষ্যতে যে-সব ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তারই সম্পর্কে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি শতকরা একশো ভাগ সত্য বলে প্রমাণ হয়, তবেই যেন আপনি আমাদের সঙ্গে বৈষয়িক সূত্রে আবদ্ধ হন, এইটুকুই আমরা চাই। লক্ষ্য করুন, শতকরা নিরানব্বুই ভাগেরও কথা আমরা বলছি না, পুরোপুরি একশো ভাগ। যদি কোন দিক্ দিয়ে হেরফের হয়, আমাদের আবেদন সরাসরি নাকচ করে দেবেন।

ঐ দুটো এলাকার কথাই আমরা বলছি আপাততঃ, হারকিউলিস আর থ্রী-গোস্ট দরদস্তুরের কথা পরে।"

"হুঁ-উ-উম্"—টেনে টেনে বললেন উইনবুম—"লোকগুলোর আর কিছু না থাকুক, আত্মবিশ্বাসটা টনটনেই আছে। পাশাপাশি দুটো নামও মিলিয়েছে ভাল। সৌরমণ্ডলদের ভিতর থ্রী-গোস্ট হচ্ছে একেবারে বালখিল্য, আর হারকিউলিস হচ্ছে, মানে এত বড় যে গোটা নক্ষত্রজগৎটাকেই প্রায় ভরে ফেলা যায় তার ভিতরে। ওরা হয়ত এই কথাই বোঝাতে চায় আপনাকে যে সংবাদ সংগ্রহের সূত্র গবর্নমেণ্টের চাইতে ওদের কম নয়। আজকাল ত আর আস্ফালন করতে কম যায় না কেউ!"

"স্রেফ আস্ফালন কিনা, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে ওদের ভবিষ্যদ্বাণী অন্ততঃ একটা শুনে নিলে ভাল হয় না?"—বলল ডানা, তারপর উইনবুমের অনুমতির অপেক্ষা না করেই হাতের কাগজখানা থেকে পড়তে শুরু করল—"২০৯০ সালের নববর্ষ দিবসে রাত্রি ৩টা ১৬ মিনিট ১০ সেকেণ্ডের সময় আন্তর্নক্ষত্র বিমান ত্রিগুিসি আক্রান্ত হবে চারখানি শত্রুবিমানের দ্বারা থ্রী-গোস্ট এলাকার সন্নিকটেই—"

উইনবুম চেয়ারে খাড়া হয়ে উঠে বসলেন, ছিলা-কাটা ধনুকের মত তীরবেগে হাত বাড়িয়ে বললেন—"দেখি দেখি, চিঠিখানা দেখি—"

ধীরে সুস্থে স্কার্ট পালিশ করতে করতে ডানা বলল—"এই যে দিচ্ছি, আগে শুনে নিন আর একটু—চারখানি শত্রুবিমান, আগাপাশতলা রণসজ্জা তাদের, মাথায় হ্যামারস্মিথ-২এর বিশেষ ধরনের আলো। ত্রিগুিসির অবস্থান সে-সময়ে থাকবে—সাংকেতিক সংখ্যা ৮৮এ-থিটা-৮৮ আলেফ-ডি-পার্সি—"

"ব্যস্, ব্যস্"—হুংকার দিয়ে উঠলেন উইনবুম—"আর না পড়লেও চলবে। যেটুকু

শুনেছি, তাইতেই আপনাকে গারদে পাঠাতে আমি বাধ্য, তাতে আপনার টেলিভিশন কোম্পানি যতই চেঁচাক। এই আন্তর্নক্ষত্র সংস্থার কথা কিছুই জানিনে আমি। যে চিঠির খানিকটা বয়ান আমাকে পড়ে শোনালেন আপনি। সেটা আসল না জাল, তা নিয়েও কথা কইতে চাইনে আমি। কিন্তু যে বিষয়বস্তুটি আপনি শোনালেন, তা এই মুহূর্তে আমার এবং অন্য জনা-চারেক মাত্র লোকেরই জানা থাকবার কথা। অন্য কেউ তা জেনে থাকলে, তার স্থান ইয়াংক্ষপের অন্ধকূপে।"

ডানার ভাবে-গতিকে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নি এতক্ষণ, সর্বশক্তিমান ব্যুরো-চীফের এত দাপাদাপি সত্ত্বেও। এইবার সে নীলচে-কালো কেশপাশে হাত বুলোতে বুলোতে বিশ্রম্ভালাপের সুরে বলল—"ব্রিণ্ডিসি তা হলে সত্যিই ঐ সাংকেতিক সংখ্যায় ঐ নির্দিষ্ট সময়ে যাচ্ছে। একটা অতি-গোপনীয় নবাবিষ্কারের কথাও বলছে ঐ আন্তর্নক্ষত্র-সংস্থা, তার যন্ত্রপাতিও থাকবে ব্রিণ্ডিসিতে?"

"আমাকে আপনি বাধ্যই করবেন দেখছি, আপনাকে জেলে পুরতে—" দাঁতে দাঁত ঘষছেন উইনবুম—"না কি, একটা বাজে গল্প ফেঁদে আমাকে ধোঁকা দিতে এসেছেন? বলতে চান যে আমার আফিসটা বিশ্বাসঘাতকে গিজগিজ করছে?"

"বিশ্বাসঘাতকে গিজগিজ?"—ডানা উপর-নীচে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে—"তা হতেও পারে, না-ও পারে। আন্তর্নক্ষত্র সংস্থা ইয়ে করে থাকতে পারে, থ্রী-গোস্ট এলাকা থেকেই খবর সংগ্রহ করে থাকতে পারে।"

"অসম্ভব!" উইনবুম জোর দিয়ে বলে উঠল—"অ-স-ম্ভ-ব!"

"কেন? অসম্ভব কীসে?"

"কারণ, এই যে নবাবিষ্কারের ব্যাপারটা, ওটা থ্রী-গোস্ট এলাকায়, আমারই চরদের কাছে পৌঁছোয়নি এখনো—না থ্রী-গোস্টে, না হ্যামারস্মিথ-২তে। কথাটা বুঝে দেখুন একবার। চিঠি যাবে ত বিমানে? না গিয়ে উপায় নেই। ইথার-তরঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতি যার, সেই আলট্রা-ওয়েভে খবর পাঠালেও আমার থ্রী-গোস্টের এজেন্ট সেটা পাবে তিন শো চব্বিশ বছর পরে। আর বিমানে পাঠালে, দুই মাসও লাগবে না।"

"তা ঠিক"—উদারভাবে স্বীকার করে নিল ডানা।

"তবেই দেখুন"—তাকে বুঝিয়ে চলেছেন উইনবুম—"এই আবিষ্কারের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্রিণ্ডিসি এখান থেকে যাত্রা করেছে মাত্র পাঁচটি দিন আগে। বিমানের কোন লোক

বিমানে বসে যদি সে-সব দেখে শুনে থাকে, সে এখন পর্যন্ত থ্রী-গোস্টে সে-খবর পাঠাবার সময় পায় নি। ত্রিশুঁসির চেয়ে দ্রুতগামী বাহন ত' তার নেই! কারোই নেই।"

ডানা এবার উদাসীন—"তাহলে ত অনিবার্যভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে আপনার আফিসেই বিশ্বাসঘাতক আছে—"

হিংস্র শোনালো উইনবুমের প্রশ্ন—"কিন্তু আপনার ঐ যে পত্র, ওর লেখকটি কে?"

"সই করেছে কে-এক শেলবি স্টিভেন্স।"

উইনবুম আভ্যন্তরীণ ফোনে ডায়াল ঘুরিয়ে দিলেন—"মার্গারেট! কারবারীদের তালিকায় দেখ ত, আন্তর্নক্ষত্র বার্তা-বিনিময় সংস্থা' কেউ আছে কিনা। থাকে যদি, তার মালিক কে?"

"বাদ বাকী ভবিষ্যদ্বাণী শুনবার জন্য আপনার আর আগ্রহ নেই বোধ হয়?"—জিজ্ঞাসা করল ডানা।

"তা আর নেই?" উইনবুম বললেন—"শুনব সব, কিন্তু তার আগে জানতে চাই, ঐ অভাগা সংস্থা, ওরা যোগাযোগের কোন্ প্রণালী অবলম্বন করে কাজ চালায়, তা কিছু বলেছে কিনা চিঠিতে।"

"বলেছে বই কি! কী এক ডিরাক প্রেরক।"

উইনবুমের মুখ থেকে যা বেরুলো, তাকে বলা যায় নির্ভেজাল নৈরাশ্যের আওয়াজ। আবার আভ্যন্তরীণ ফোনে ডাকলেন মার্গারেটকে—"ডক্টর ওয়াল্ডকে পাঠিয়ে দাও ত!"

ওদিক থেকে রিসেপ্‌শনিস্ট মার্গারেট যা বলল—তাতে মুখ বিকৃত হয়ে গেল উইনবুমের—"ল্যাবরেটরিতে ফিরলেই এখানে পাঠাবে। দুই ঘণ্টার জন্যে টেকো বুড়োর কোথায় কী দরকার পড়ল এই সময় বল ত!"

আবার মার্গারেট কিছু বলল হয়ত। এবার উইনবুম প্রশ্ন করলেন—"তখন যে খবরটা নিতে বলেছিলাম—আন্তর্নক্ষত্র—"

তারপরই কান পেতে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই ছেড়ে দিলেন এই কথা বলে—"ওয়াল্ড এলেই পাঠিয়ে দিতে চাও—"

ডানার দিকে তাকিয়ে এইবার বললেন উইনবুম—"এই ওয়াল্ডই হচ্ছেন আমাদের নতুন আবিষ্কারের জনক। আর যে ডিরাক প্রেরকের কথা আপনি বলছিলেন এইমাত্র, সেই ডিরাকই হচ্ছে ওয়াল্ডের নবাবিষ্কার। যার কার্যকারিতার হাতে-কলমে পরীক্ষা নেবার জন্যই ত্রিশুঁসি রওনা হয়ে গিয়েছে থ্রী-গোস্ট এলাকার মহাশূন্যে!"

"খুব আশ্চর্য ত!"—ডানার কথার সুরে নিছক বিস্ময়—"যে ডিরাকের কার্যকারিতা সম্পর্কে তার আবিষ্কর্তাই এখনও নিঃসংশয় হতে পারেন নি, সেই ডিরাকেরই সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করছে—আন্তর্নক্ষত্র সংস্থার শেলবি স্টিভেন্স?"

"হ্যাঁ, ঐ শেলবি স্টিভেন্স!"—চিবিয়ে চিবিয়ে উইনবুম বললেন—"ওর নাম পাওয়া গিয়েছে আমাদের খাতায়। আন্তর্নক্ষত্র বার্তা-বিনিময় সংস্থা আসলে একটি-মাত্র লোকের কোম্পানি, সেই একটি মাত্র লোকই হল আপনার শেলবি স্টিভেন্স।"



"হ্যাঁ গো চীফ! মার্গারেটের মেজাজ অমন কড়া কেন?" [পৃঃ ৪৪৮

"আশ্চর্য!"—ডানা আগের কথারই আবৃত্তি করল আবার।

"মাত্র একটি লোক"—ডানার মন্তব্যে মনোযোগ না দিয়েই উইনবুম বলছেন—"মাত্র এক বছর আগে আমাদের দপ্তরে নাম উঠেছে ওর। আফিস রিকো সিটিতে। আপনি চিঠি পেয়েছেন রিকো সিটি থেকেই ত?"

মাথা নাড়ল ডানা, সায় দেওয়ারই মাথা-নাড়া।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসে ডানার দিকে চোখা নজরে তাকালেন উইনবুম, "আপনার এখন করণীয় কী, জানেন ত? করণীয়, মানে যা না করলে আপনাকে আমি অন্ধকূপে আটক করতে বাধ্য হব?"

"বলুন"—উদাসীন উক্তি ডানার।

"শেলবি স্টিভেন্সের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না-করা এবং টেলিভিশনের প্রোগ্রাম ছাড়া অন্য কোন দিকে মন না দেওয়া—"

ডানা উঠে দাঁড়াল—"তাহলে নমস্কার—"

ডক্টর ওয়াল্ড এসে উইনবুমের ঘরে ঢুকলেন প্রায় দুই ঘণ্টা পরে! কী মস্ত মাথা লোকটির! আর সেই মাথা জোড়া কী বিরাট টাক! মুখখানা সে-অনুপাতে পাতলা বলতে হবে, গায়ের রং প্রায় কালো। তার কারণ, কয়েক পুরুষ ধরে ওরা বাসিন্দা ছিলেন পূর্ব আফ্রিকার, আমেরিকায় পাড়ি দেওয়া, মাত্র এই বছর কুড়ি আগের ঘটনা, ওয়াল্ড তখন প্রথম যৌবনে পা দিয়েছেন সবে।

ঘরে ঢুকেই ওয়াল্ড বললেন—"হ্যাঁ গো চীফ! মার্গারেটের মেজাজ অমন কড়া কেন? এই মারে ত এই মারে অবস্থা! আমায় কিনা তম্বি করে—'আপনি ছিলেন কোথায়? আমরা খুঁজে খুঁজে হাল্লাক!'"

"মার্গারেটের কথা ছেড়ে দিন"—মোলায়েম সুরে কথা কইছেন চীফ, ডিরাকের আবিষ্কারককে কোন অবস্থাতেই রাগানো চলে না—"মার্গারেটকে নিয়ে কাজ করাই মুশকিল, কিন্তু সত্যিই আপনি ছিলেন কোথায়? ডানা লীর সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেওয়া দরকার ছিল খুব। সে একখানা চিঠি নাকি পেয়েছে, চিঠির কথা বিশ্বাস করি আর না-করি, এটা স্বীকার করতেই হচ্ছে যে ডিরাক প্রেরকের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। কে এক শেলবি স্টিভেন্স—"

"ডিরাকের কথা জানাজানি?"—রাগে ফেটে পড়লেন টেকো ওয়াল্ড, "তা হলে আপনার ঐ মার্গারেট ছাড়া অন্য কেউ এর জন্য দায়ী নয়! আমি সেই কবে থেকে পইপই করে বলছি কিনা যে এ জিনিস জানাজানি হয়ে গেলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে? আপনার বা আমার সর্বনাশের কথা আমি বলছি না। বলছি সমগ্র পৃথিবীর কথা, মানব জাতিটারই কথা। ডিরাকের রহস্য যদি হ্যামারস্মিথ-২ জানতে পারে, বা আরস্কিনেরা জানতে পারে, কী হবে বলুন ত?"

"হবে এই যে—পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস করে দেবার জন্য ঐ শত্রুরা যুগ যুগ ধরে যে ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা এইবারে সার্থক হবে তাদের। হাজার আলোকবর্ষ তফাতে কোথায় কী ঘটছে, তা যদি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যের সর্বত্র একসাথে জানাজানি হয়ে যায়—তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ।"

উইনবুমকে হঠাৎ থেমে যেতে হল। বিব্রত, হতবাক্ হয়ে। ডিরাকের আবিষ্কারক

মনস্তাপে কপাল চাপড়াচ্ছেন। মাথায় চুল নেই, থাকলে এতক্ষণ ছিঁড়ে উপড়ে ফেলতেন সব। কালো মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়, থেমে থেমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলছেন—"আমি কোথায় ল্যাবরেটরিতে বসে ডিরাকের রিসিভারটা নিখুঁত করবার চেষ্টা করছি—"

"ল্যাবরেটরি? মার্গারেট যে বলল আপনি ল্যাবরেটরিতে নেই?" বাধা দিতে বাধ্য হলেন উইনবুম।

"মার্গারেট যা জানে, তাই বলেছে, তার দোষ কী? আমি তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, আর পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এলাম গুপ্তদ্বার দিয়ে। ল্যাবরেটরিতে একটা গোপন ঘর আমি বানিয়ে নিয়েছি, তা আপনাকেও জানতে দিই নি। সেইখানে বসেই আমার সবচেয়ে দামী গবেষণাগুলি আমি করি। যখন সেখানে থাকি, মার্গারেট জানে—আমি বেরিয়ে গিয়েছি"—

গড়গড় করে এই কথাগুলি বলে নিয়ে অবশেষে ওয়াল্ড জিজ্ঞাসা করলেন—কী করে জানাজানি হল? জানাজানি যে হয়েছেই, তার কী প্রমাণই বা পেয়েছেন আপনি?"

উইনবুম তখন সব ব্যাপার খুলে বললেন ওয়াল্ডকে। শুনতে শুনতে ক্রমাগত মাথা চাপড়াতে থাকলেন বেচারী আবিষ্কারক।

সেইদিনই রিকো সিটিতে হানা দিলেন উইনবুম। শেলবি স্টিভেন্সের ছোট্ট অফিসে। রিসেপশনিস্ট একজন না আছে, তা নয়। কিন্তু তার কাজ অল্প, আর সে কাজের সঙ্গে খাতাপত্র চিঠিচাপাটির কোন সংশ্রব নেই। লোকজন এলে তাদের খাতির করা, আর স্টিভেন্সের অনুপস্থিতিতে ফোনটা ধরা, ব্যস, এই পর্যন্ত।

আর সব কাজই একা হাতে করেন শেলবি স্টিভেন্স।

যাকে বলে থুত্থুড়ে বুড়ো। শণের নুড়ি চুল দাড়ি, দুটোই অতিরিক্ত লম্বা। মুখে অমায়িক হাসি, রং ধবধবে সাদা। এ লোক ডিরাক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, থ্রী-গোর্স্টে ব্রিগুিসির উপর শত্রুবিমানের সুনিশ্চিত হামলার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করছে। একথা উইনবুম কদাচ বিশ্বাস করতে পারতেন না। ডানার কাছে আগে থাকতে সব খবর না পেলে।।

"কী করে ডিরাকের রহস্য জানলেন আপনি?"—রুক্ষ প্রশ্ন উইনবুমের।

"তা কি বলতে পারি আপনাকে?"—মধুর হাসি হেসে বৃদ্ধ জবাব দিলেন—"ব্যবসার রহস্য কেউ প্রকাশ করে?"

"গুপ্তচরবৃত্তির মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়ে থাকি আমরা"—হুংকার করে ওঠেন উইনবুম।

"বড় বড় উকিলের পরামর্শ নিয়েছি মশাই"—মুখের হাসি অম্লান শেলবির, "সবাই একবাক্যে বলেছে—আমার কেশাগ্র আপনি স্পর্শ করতে পারেন না। আমি আপনার ব্যুরো থেকে খবর বার করেছি। এর প্রমাণ কী? আমার এজেণ্ট আছে মহাশূন্যের সর্বত্র। তারা অকুস্থল থেকে খবর পাঠাচ্ছে।"

"ঘটনা ঘটার মুহূর্তেই?"

"ঘটনা ঘটার মুহূর্তেই। ডিরাক কী পরিমাণ কাজ দেবে, তার পরীক্ষা নেবার জন্য আপনি ত ত্রিগুিসিকে এই সবে পাঁচ দিন আগে পাঠালেন। আমার সে-পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে এক বছর আগে।"

"তা হ'লে বলুন আপনিই ডিরাকের আবিষ্কর্তা? ওয়াল্ডম্যান?"—শাণিত বিদ্রূপ উইনবুমের কথায়।

"দু'জনেই! দু'জনেই! দু'জন বিজ্ঞানী পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে একই আবিষ্কার করে বসল, এমনটা আগেও কি হয় নি?"

একটুখানি চুপ করে থেকে উইনবুম বললেন—"আপনি যদি সারা জীবন অন্ধকূপে বাস করতে না চান, তাহলে আপনাকে আমার ব্যুরোর শামিল হতে হবে। কী চান আপনি পারিশ্রমিক?"

"প্রথম কথা, অন্ধকূপে আমাকে নিক্ষেপ করার মত আইন পৃথিবীতে নেই। আর আপনি যতই শক্তিমান হোন, আইন লঙ্ঘনের সাহস নেই আপনার। তা হলে আসছে ঐ পারিশ্রমিকের কথা। ওর একটা হিসেব আমার করাই আছে। আপনি ব্যুরোর খরচা বাবদ পৃথিবীর রাষ্ট্রসংঘের কাছ থেকে যা অর্থ পেয়ে থাকেন, ঐটে সব দিয়ে দিলেই আপনি পাবেন আমার সহযোগিতা।"

বলতে বলতেই এক এক টানে শেলবি স্টিভেন্স মাথা থেকে সাদা চুল এবং মুখ থেকে সাদা দাড়ি খুলে ফেললেন। স্তম্ভিত উইনবুম বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সাদা চুলের নীচে থেকে বেরিয়ে পড়ছে নীলচে-কালো বব-ছাঁটা চকচকে চুল। আর সাদা দাড়ির নীচে থেকে আত্মপ্রকাশ করছে ডানা লী'র বাদামী-রং মসৃণ মুখকান্তি।

"কিছু মনে করবেন না চীফ্। আবিষ্কারককে বিদায় করবেন তুচ্ছ একটি মিলিয়ন ডলার দিয়ে, আর তারপর ডিরাকের মুনাফা বাবদ আপনি আর আপনার কেরানীরা এজেণ্টরা লুটতে থাকবেন মাস মাস পাঁচ মিলিয়ন, এটা আমার কাছে ন্যায্য মনে হয় নি। তাই আপনাকে প্যাঁচে ফেলতে হল খানিকটা।"



"বড় বড় উকিলের পরামর্শ নিয়েছি মশাই।" [পৃঃ ৫

এতক্ষণে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন উইনবুম, তিনি তিরিক্ষে মেজাজে বলে উঠলেন—"আবিষ্কারক আবিষ্কারক কী বলছেন মিস্ লী? আবিষ্কারক ত ডক্টর ওয়াল্ড।"

"আমিও! আমিও! একজন মিলিয়ন পাবেন, আর একজন কিছুই পাবেন না। এই কি ন্যায় বিচার? বিশেষ, ওয়াল্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেখানে শেষ হয় নি এখনও, অথচ আমার হয়ে গিয়েছে।"

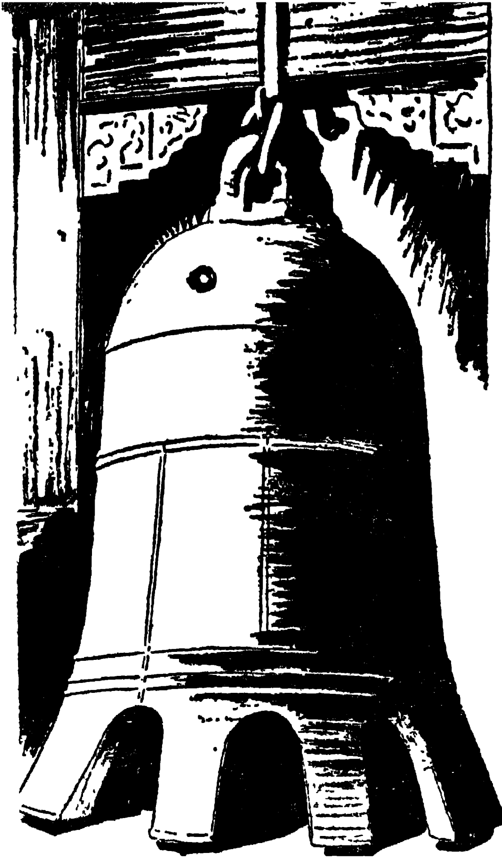
"আমি ওয়াল্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাব।" এই বলে দীর্ঘপদক্ষেপে উইনবুম বেরিয়ে গেলেন শেলবি স্টিভেন্সের আফিস থেকে।

ডানা ফোনে ডাকল রিসেপশনিস্টকে—"আমি বেরুচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি, তুমি থাকবে আফিসে।"

তারপর দেরাজ থেকে একটা রবারের টুপি সে বার করল, পরে ফেলল মাথায়। মাথা-জোড়া টাক দেখা দিল এক সেকেণ্ডের ভিতর। মুখে একটা কালো রং মাখানো, নাকটা মোটা আর চোয়ালটা উঁচু করে তাতে একটা আঁচিল লাগিয়ে নিতে লাগল এক মিনিট। তারপর পোশাক বদলানো পাঁচ মিনিট আরও।

তারপর—শলবি স্টিভেন্সের পিছনের দরোজা দিয়ে যে ভদ্রলোক সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন, তিনি ডক্টর ওয়াল্ড।

———



ঘণ্টার মসলা

রঞ্জা দে

ঢং ঢং ঢং। ছবিতে দেখানো ঘণ্টাটি যখন শব্দ করে বাজে তখন তার মিষ্টি সুরেলা সুর যেন রুপোর তৈরী ঘণ্টা থেকে বেরিয়ে আসছে মনে হয়। ঘণ্টাধ্বনি শুনে কানের পরদা ফেটে যাবার ভয়ে লোকে আর কানে হাত চাপা দেয় না।

ঘণ্টাটির নাম "দি বেল অফ দি মেডেন" অর্থাৎ কুমারীর ঘণ্টা।

ঘণ্টাটির বিষয়ে এক ইতিহাস আছে। রাজা-রাজড়ারা চিরকালই খামখেয়ালী। একবার চীনের সম্রাটের খেয়াল হয়, তিনি এমন বিরাট একটা ঘণ্টা করাবেন যার শব্দ শুধু সাঁইত্রিশ মাইল দূর থেকে শোনা যাবে তা নয়, এর আওয়াজ হবে রুপোর আওয়াজের মতই সুরেলা। তখনই ঘণ্টা তৈরী-করা কারিগরের ডাক পড়ল।

সম্রাটের আদেশে কারিগর কাজ শুরু করলে। বার বার দুবারই ঘণ্টা ঢালাই করার পর ফেটে গেল। সম্রাটের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। তিনি বললেন, তৃতীয়বার অকৃতকার্য হলে তোমার গর্দান যাবে। কারিগরের মনে ভীষণ ভয় হল। সে এক গণৎকারের কাছে গিয়ে গোনাল। গণৎকার বললে, যদি কোন নিষ্পাপ কুমারীকে এই কাজে উৎসর্গ করতে পার তাহলেই সফল হবে। এই কথা শুনে কারিগর পড়ল মহা মুশকিলে। কে আর তাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের প্রাণ দেবে।

কারিগরের মেয়ে আড়াল থেকে সব কথা শুনেছিল। সে বাবাকে বাঁচাবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করবে বলে ঠিক করলে। এদিকে কারিগর কোন উপায় না দেখে যা আছে বরাতে ভেবে তৃতীয়বার ঘণ্টা তৈরি করবার জন্যে যখন লোহা গলাচ্ছিল তখন তার মেয়ে এসে হঠাৎ গলন্ত লোহার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে তার দেহ গলিত লোহার সঙ্গে মিশে গেল। ঢালাই করার পর দেখা গেল নিখুঁত ঘণ্টা তৈরী হয়েছে।

কথাটা আজগুবী মনে হয়। কিন্তু আসলে চীন দেশের লোহায় ফসফরাস কম থাকায় ঠিকমত ঢালাই হয় না। মেয়েটির শরীর লোহার সঙ্গে মেশাতে ফসফরাসের অভাব দূর হল আর ঘণ্টাও নিখুঁত হল। * রিপ্লে

———



কলম আর তলোয়ার

বন্দে আলী মিয়া

মুঘল বাদশাহ্ সম্রাট্ সাজাহান তখন দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন।

রাজদপ্তরে শুমারনবীশ আর মুনশীরা রাজ্যের আয় ব্যয় আর টাকা পয়সার হিসাব রাখতো।

একবার রাজদপ্তরে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিলো। একজন মুনশী ছিলো—তার কাজ ছিলো প্রতি মাসের শেষে হিসাব করে একদল সৈন্যের বেতন মিটিয়ে দেওয়া।

এক সময়ে একজন সৈন্য অনেক দেরি করে সেই মুনশীর কাছে মাইনে নিতে এলো। তার দলের সৈন্যরা অনেক আগেই বেতন নিয়ে চলে গেছে।

মুনশীটি তখন খুব মন দিয়ে একটা হিসাব করছিলো। সৈন্যটিকে দেখে বললোঃ একটুখানি বসো। হাতের কাজটা সেরে নিয়েই তোমার মাইনেটা চুকিয়ে দিচ্ছি।

অগত্যা সৈন্যটিকে বসতে হলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই সে উঠে দাঁড়ালো। বললোঃ আমি আর দেরি করতে পারবো না। জলদি জলদি আমাকে বিদায় করো।

মুনশীটি তখন মন দিয়ে একটা দশকের যোগ মিলাচ্ছিলো। সৈন্যটির কথায় তার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। সে মনে মনে বিরক্ত হলো। মুখ তুলে বললোঃ এত তাড়াহুড়া করলে আমি নাচার। তুমি নিজেই তো দেরি করে এলে! তোমার দলের লোকেরা অনেকক্ষণ আগে মাইনে নিয়ে চলে গেছে। একটুখানি বসতেই হবে তোমাকে।

সৈন্যটি তার কথায় কর্ণপাত মাত্র করলো না। জোর গলায় দাবি জানালোঃ না, বসতে আমি পারবো না। এক্ষুণি আমার মাইনে তোমাকে দিতে হবে।

মিলিটারী লোকের মিলিটারী মেজাজ।

মুনশীটি চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। গম্ভীর গলায় বললোঃ এত ব্যস্ত হলে তো চলবে না। আমার হাতের কাজ শেষ না হলে তোমার মাইনে দিতে পারবো না।

সৈন্যটি জিদ করে বললোঃ মাইনে তা হলে দেবে না তুমি?

মুনশীটি তেমনি জোর গলায় বললোঃ তোমাকে মাইনে দেবো না এমন কথা তো বলছি না। একটু পরে দেবো এতে এত মেজাজ দেখাচ্ছো কেন!

সৈন্যটি হঠাৎ তলোয়ারখানা মুনশীর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললোঃ মাইনেটা এক্ষুণি না দিলে তোমার সামনের দুটো দাঁত এই তলোয়ার দিয়ে খুলে দেবো এ কথা মনে রেখো।

মুনশী রুখে উঠলোঃ কি, এত বড়ো আস্পর্ধা তোমার! তলোয়ার দেখাচ্ছো আমাকে! বেশ, তোমার মাইনে এক্ষুণি মিটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, এই তলোয়ারের খোঁচার চেয়ে আমার কলমের খোঁচার দাম অনেক বেশী।

এই কথা বলতে বলতে মুনশী তার কলমটা সৈন্যের নাকের কাছে নিয়ে গেল।

সৈন্যটি বললোঃ সে তখন দেখা যাবে। এবারে ভালো মানুষের মতো আমার বেতনটা দিয়ে দাও।

মুনশী আর কথা না বাড়িয়ে তার মাইনেটা দিয়ে দিলো।

● কলম আর তলোয়ার



খাতায় লেখা আছে তোমার সামনের দু'টো দাঁত নেই। [পৃঃ ৪৫৬

সৈন্যটি টাকাগুলো গুনে পকেটে পুরলো তারপর মুচকি হেসে বললোঃ মুনশীজি, যদি চাও তবে মাঠে গিয়ে দু'জনে লড়াই করতে নামি। সেদিন দেখা যাবে তোমার কলম আর আমার তলোয়ার—দু'টোর মধ্যে কার জোর বেশী।

মুনশীও হেসে বললোঃ সেজন্যে আর মাঠে যেতে হবে না। এখানে বসেই সেটা পরখ করা যাবে। এবারে তুমি নিজের কাজে যাও।

বহুৎ আচ্ছা। বলে জোরে জোরে পা ফেলে সৈন্যটি চলে গেল।

এই ঘটনার এক মাস পরে সেই সৈন্যটি আবার বেতন নিতে এলো। মুনশী গম্ভীরভাবে তার পাশের লোকটিকে দেখিয়ে দিলো। সৈন্যটি তার কাছে গিয়ে মাইনে চাইলো।

সেই লোকটি খাতা খুলে সৈন্যটিকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলো।

সৈন্যটি তার নাম বললো।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলো তার বাপের নাম।

সৈন্যটি নিজের বাপের নাম তাকে বললো।

লোকটি এবারে প্রশ্ন করলো: তোমার গায়ে কোনো চিহ্ন আছে কি?

সৈন্যটি তার বাঁ হাতের কাটা আঙুলটা দেখালো।

লোকটি মাথা দুলিয়ে বললো: না, না, ওসব নয়।

সৈন্যটি অবাক্ হয়ে বললো: তা'হলে আর কোনো চিহ্ন তো আমার শরীরে নেই। এই কাটা আঙুলটাই তো বরাবর দেখিয়ে আসছি।

লোকটি খাতার দিকে চেয়ে বললো: খাতায় লেখা আছে তোমার সামনের দুটো দাঁত নেই।

দাঁত নেই! সেকি কথা!! এই তো আমার দাঁত রয়েছে। সৈন্যটি অবাক্ হয়ে বললো।

লোকটি গম্ভীর গলায় বললো: দাঁত দেখালে তো কাজ হবে না—দাঁত নেই তাই দেখাতে হবে। তা না দেখালে মাইনে পাবে না।

সৈন্যটি তার কথা বুঝতে পারলো। এটাও সে বুঝতে পারলো এই কাণ্ডটা ঐ মুনশীই করে রেখেছে। খাতায় তার চিহ্ন হিসাবে দুটো দাঁত নেই লিখে রেখেছে।

মুনশীটি আপন মনে কাজ করে যেতে লাগলো।

সৈন্যটি দারুণ দুঃখে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো: এখন আমি কি করি বলো দিকি?

লোকটি জবাব দিলো: মাইনে পেতে হলে তোমার দাঁত দুটো বাদ দেওয়াই ভালো।

সৈন্যটি মলিন মুখে বললো: অগত্যা তাই করতে হবে। বুঝতে পারলাম, তলোয়ারের খোঁচার চাইতে কলমের খোঁচার জোরই বেশী। সেটা পরখ করবার জন্যে মাঠে যেতে হলো না—এখানেই হয়ে গেল। ওগো মুনশী সাহেব, সেলাম আপনাকে—আপনিই জিতলেন।

এই কথা বলে হেকিমের কাছে গিয়ে সে হাজির হলো। তার নির্দেশ মতো তিনি তার সামনের দু'টো কাঁচা দাঁত তুলে দিলেন—সৈন্যটি রক্তমাখা মুখে রুমাল চেপে সেখানে এসে মাইনে নিয়ে গেল।

